তৃতীয় সংস্করণ
অগস্ট ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
উন্মেষ প্রকাশন

ছেপেছেন
শিবব্রত ভট্টাচার্য
জোনাকি প্রেস
৭৯-এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৯

অসংখ্য সহৃদয় পাঠকের অনুরোধে দীর্ঘকাল পরে আবার 'জীবন পিয়াসা' প্রকাশিত হল। অনুবাদ-সৌকর্যে এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

মলাটের সূর্যমুখীর ছবি আর বইয়ের পেছনের আলুভোজীদের ছবিদুটি ভ্যান গক-এর আঁকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবির অন্যতম। আর শিল্পীর আত্মপ্রতিকৃতির ছবি অনুসরণে আঁকা একটা ছবিও এই গ্রন্থে স্থান পেল।

অকাল-প্রয়াত ঋষিপ্রতিম অনুবাদকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

প্রকাশক

জীবনরঙ্গিনীকে—

লণ্ডন

১

—উঠুন মশিয়েঁ ভ্যান গক্, কতো ঘুমোবেন ? বেলা হোলো যে !

ঘুমের মধ্যেই যেন ভ্যান গক্ উর্সুলার এই ডাকের প্রতীক্ষায় ছিল। চোখ না খুলেই বললে,—বাঃ, ঘুমিয়ে কই ? জেগেই তো আছি।

হেসে উঠল মেয়েটি খিলখিলিয়ে,—তাই বই কি ? না ডাকলে বুঝি ঘুম ভাঙত ?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল রান্নাঘরে। ভ্যান গক্ শুনল তার পায়ের শব্দ। না, আর শুয়ে থাকা চলে না। দুই কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে ভ্যান গক্ লাফিয়ে নামল বিছানা থেকে। খুব চওড়া তার কাঁধ আর বুক, শক্ত পেশীবহুল দুই বাহু। তাড়াতাড়ি পোশাকের মধ্যে ঢুকে সোরাই থেকে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে নিয়ে সে ক্ষুরে শান দিতে বসল।

দাড়ি কামানোর এই প্রাত্যহিক ব্রত-উদ্‌যাপন ভিনসেণ্ট ভ্যান গকের ভালোই লাগে। ডানদিকের জুলপির ঠিক তলা থেকে প্রশস্ত গাল বেয়ে ক্ষুরটা নামে মুখের কিনার পর্যন্ত, তারপর নাকের তলা দিয়ে ওপরকার ঠোঁটের ডান দিকের আধখানা অংশের ওপর দিয়ে চলে যায়। আবার একই প্রক্রিয়া। মুখের বাঁ দিকটা মসৃণ করার পালা। তারপর চিবুক বেয়ে ক্ষুর নামে গলা পর্যন্ত। চিবুক যেন গোল একটা শক্ত পাথর।

মুখটা পরিষ্কার করে নিয়েই সে ঝুঁকে পড়ল নিচু শেল্‌ফটার ওপর। ব্রাবাণ্টের ঘাস আর ওক্ পাতার একটা তোড়ার মধ্যে নাক ডুবিয়ে জোরে নিশ্বাস নিল কবার। জুণ্ডেয়ার্টের প্রান্তর থেকে সংগ্রহ করে তার ভাই থিয়ো তাকে তোড়াটা লণ্ডনে পাঠিয়েছে। আজকের এই সকালবেলাটিতে সব কিছুর আগে তাকে এসে সমাদর করল হল্যাণ্ডের গন্ধ। দিনের আরম্ভটি চমৎকার।

বাইরের থেকে দরজায় ধাক্কা। আবার উর্সুলার গলা—মশিয়েঁ ভ্যান গক্, চিঠি।

খামের ওপরকার হাতের লেখা দেখেই বোঝা গেল চিঠিটা এসেছে মার কাছ থেকে। থাক এখন পকেটে, পড়া যাবে অবসর-মত। ঘন লম্বা লালচে চুলের রাশ পিছন দিকে ঠেলে আঁচড়ে ভ্যান গক্ জামাটা বদলালো। কড়া-ইস্ত্রি-করা নিচু কলারের একটা শার্ট পরে সে বাঁধল খুব চওড়া একটা কালো টাই। এবার গটমট করে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। নিচে তার জন্যে অপেক্ষা করছে গরম প্রাতরাশ আর উর্সুলার প্রভাতী হাসি।

বাড়ির পিছনে বাগানের ওধারে শিশুদের একটি পাঠশালা। এটি চালান উর্সুলার মা,—মেয়েও সাহায্য করে। উর্সুলার বয়েস উনিশ। ছিমছাম তন্বী মেয়েটি,—বড়ো বড়ো চোখ, গোলগাল মুখে সর্বদা খুশির গোলাপি আভা। সে-রঙের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যান গকের নেশা ধরেছে।

খেতে বসল। উর্সুলার পরিবেশনের হাতে ত্বরিত স্বচ্ছন্দ গতি। ভ্যান গকের বয়েস একুশ, প্রথম প্রেম। ভাবে, বাকি জীবনের প্রতিটি সকালে উর্সুলার পরিবেশিত প্রাতরাশ যদি সে খেতে পায়, তবেই না জীবন তার ধন্য হবে!

রাঙা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে উর্সুলা বললে,—মনে আছে সেই যে বীচি পুঁতেছিলেন বাগানে? তার অংকুর বেরিয়েছে।

—তাই নাকি? দেখাবে চলো তো!

—কী বুদ্ধি! নিজের হাতে পুঁতেছেন, আর এখন দেখিয়ে দেব আমি?

চোক গিলল ভিনসেণ্ট। যেমন চেহারাটা তার লম্বা চওড়া, তেমনি কথাবার্তাও তার আড়ষ্ট। ঠিক কোন্ কথাটি কখন উর্সুলাকে বলতে হবে তা চট করে তার মাথায় আসে না।

দুজনে গেল বাগানে। এপ্রিল মাস, আপেল গাছে মঞ্জরী ধরেছে। কদিন আগে ভিনসেণ্ট বীজ পুঁতেছিল সুইট-পী আর পপির। মাটি ফুঁড়ে উঠেছে সবুজ কিশলয়। দুই পাশে উবু হয়ে বসে দেখতে লাগল দুজনে। ভিনসেণ্টের নাকে উর্সুলার কেশ-সুরভি।

—উর্সুলা! অস্ফুট গলায় বললে ভিনসেণ্ট।

মাথাটি হেলিয়ে হাসিমুখে মেয়ে বললে,—বলুন।

—আমি—আমি........মানে, আমি বলছিলাম কি—

—কী হোলো? অতো আমতা আমতা কিসের?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পেছনের পাঠশালা-বাড়ির দিকে পা বাড়ালে উর্সুলা। ঠিক সময়ের কথাটি জোগায় না ভিনসেণ্টের মুখে। সে শুধু চলল সঙ্গে সঙ্গে।

উর্সুলা আবার বললে,—এখুনি আমার ছাত্ররা এসে পড়বে। আপনারও গ্যালারিতে যেতে দেরি হচ্ছে না?

—না, দেরি কিসের? স্ট্র্যাণ্ডে পেঁছিতে আর কতোক্ষণ? বড়ো-জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

আর কথা নেই কারো মুখে। একটু অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। দুহাত তুলে ঘাড়ের পেছনের একটি অবাধ্য কেশগুচ্ছকে উর্সুলা সংযত করতে লাগল। পেলব দেহতটে ফুটে উঠল সুস্পষ্ট বঙ্কিম রেখা। তারপর বললে,—আমার পাঠশালার জন্যে ব্রাবাণ্টের যে ছবি দেবেন বলেছিলেন, তার কী হোলো?

কৃতার্থ ভিনসেণ্ট বললে,—সিজার দ্য ককের একটা ছবির প্রিণ্ট শিল্পীর কাছেই পাঠিয়েছি। নিজের হাতে তিনি সেটাতে সই করে দেবেন তোমার

জন্যে।

—কী চমৎকার! সত্যি, এইজন্যেই তো মাঝে মাঝে আমার আপনাকে ভারি ভালো লাগে!

সর্বশরীরে একটা মধুর হিল্লোল তুলে সে ফিরে দাঁড়ালো যাবার জন্যে। ভ্যান গক্ তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে তাকে থামালো। অনেক সাহস করে বললে,—জানো! কাল রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তোমার একটা নতুন নাম আমি আবিষ্কার করেছি। নামটা হচ্ছে—

খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল উরসুলা। বললে,—বটে? ইয়ারকি? দাঁড়ান, মাকে ঠিক বলে দেব!

হাসির লহর তুলে ভ্যান গকের হাত ছাড়িয়ে সে দৌড় দিল, অদৃশ্য হয়ে গেল পাঠশালার দরজায়।

২

মাথায় টপ্-হ্যাট, হাতে দস্তানা,—ভিনসেণ্ট বার হোলো ক্ল্যাপহামের রাস্তায়। লণ্ডনের দূর পাড়া এটা, ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। বাগানে বাগানে লাইলাক হথর্ন আর লাবার্নাম ফুলের মেলা।

সোয়া আটটা মাত্র বেজেছে, নটার আগে গুপিলে পৌঁছতে হবে না। তবু জোরে হাঁটাই তার অভ্যাস। বাড়ি-ঘরের ভিড় ক্রমে বাড়ছে, পথে জুটছে তারই মতো অনেক অফিস-যাত্রী। সবাই যেন তার বন্ধু, সবাই যেন মনে মনে জানে কী মধুর তার এই নতুন প্রেমে পড়া।

স্ট্র্যাণ্ডের ওপর ১৭ নম্বর সাউদাম্পটন—এই ঠিকানায় গুপিল অ্যাণ্ড কোম্পানির লণ্ডন শাখার অফিস। সারা ইয়োরোপ জুড়ে এ কোম্পানির আর্টের বেসাতি।

অফিসে ঢুকতেই সামনের ঘরটা মহামূল্য ঘন কার্পেট আর ভারি পর্দা দিয়ে মোড়া। ঘরভর্তি বুটন, টার্নার, মিলে প্রভৃতি শিল্পীদের ছবি। একজন কেরানি ডেকে বললে,—লিথোগ্রাফ টেবিলে আপনার জন্যে একটা প্যাকেট রয়েছে,—নিয়ে নেবেন। দ্বিতীয় ঘরটিতে এচিং আর লিথোগ্রাফের সমাবেশ। তৃতীয় ঘরটি ভিনসেণ্টের এলাকা। সবচেয়ে বেশি বিক্রি এই ঘরেই। এ ঘরে মেলে ছবির প্রিণ্ট। ছাপা ছবি—ভিনসেণ্ট বোঝে, সবচেয়ে শস্তা আর বাজে মাল বিক্রির কাজ নিয়েই সে আছে। ভিড় অবশ্য এ ঘরেই সবচেয়ে বেশি—সবচেয়ে নির্বোধ ক্রেতার ভিড়। তবে, তাতে তার বয়েই গেছে। বিক্রি নিয়ে কথা। যতো প্রিণ্ট সে বিক্রি করতে পারবে ততো না অফিসে তার খাতির বাড়বে।

নিজের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্যাকেটটা সে খুলল। সিজার দ্য কক ছবিটা ফেরত পাঠিয়েছেন। শুধু নাম সই করেই দেননি, নিজের

হাতে লিখে দিয়েছেন—ভিনসেণ্ট আর উরসুলাকে।

—আজ রাত্রে ছবিটা যখন উরসুলাকে দেব, ভিনসেণ্ট ভাবতে লাগল,—তখন বলব তাকে। কিসের দেরি আর? বাইশ বছরে তো দুদিন পরেই পড়ব,—আর মাসে পাঁচ পাউণ্ড তো বাঁধাই!

কোথা দিয়ে হু-হু করে সময় কেটে যায়। তার হাত দিয়ে দৈনিক বিক্রি হয় অন্তত পঞ্চাশটি ছবির ফোটোগ্রাফ। কতো পয়সা সে কোম্পানির জন্যে কামাচ্ছে। অফিসের অন্যান্য কেরানিদের সঙ্গে তার খুব ভাব। বেশ কিছুটা সময় যায় তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেও। আগে কিন্তু এমন ছিল না। লোকজনকে সে তখন এড়িয়ে চলত, মিশতে পারত না সহজভাবে। সহকর্মীরাও ভাবত, কেমন পাগলাটে যেন লোকটা। উরসুলাই তার স্বভাবটা একেবারে বদলে দিয়েছে। তাকে চেনার পর থেকেই আসক্তি এসেছে সহজ হবার স্বাভাবিক হবার,—সকলের পরিচিত ও প্রিয় হবার।

ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হোলো দিনের কাজ। পথে বার হবার মুখে দরজার সামনে মিঃ ওবাক ভিনসেণ্টকে দাঁড় করালেন। বললেন,—তোমার কাকা চিঠি লিখেছেন তোমার খোঁজ-খবর নিয়ে। আমি তাঁকে লিখলাম তুমি চমৎকার কাজ করছ, এখানকার শ্রেষ্ঠ কর্মীদের তুমি একজন।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে স্যার!

—আর শোনো, আমি ঠিক করেছি গরমের ছুটির পর তোমাকে মাঝের ঘরে নিয়ে আসব, এচিং আর লিথোগ্রাফ বিক্রির ভার তোমাকে দেব।

—আমার মস্ত সৌভাগ্য সেটা হবে স্যার। কেননা, মানে—মানে কিনা—আমি ভাবছি আমি বিয়ে করব।

—তাই নাকি? বাঃ! এ তো খুব ভাল খবর! কবে হে? বেশ বেশ, খুব ভালো। বিয়ে-থাওয়া করে ছুটি থেকে ফিরে এসে তোমার মাইনের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ো আমাকে, দেখা একটা ভালো ব্যবস্থা তখন করতে পারা যায় কি না। কেমন?

৩

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ভিনসেণ্ট বললে,—তোমার ছবি এসে গেছে উরসুলা।

—তাই নাকি? উঃ কী মজা!

—একটা আলো নিয়ে চলো, ছবিটা একেবারে পাঠশালার দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে আসি।

আড়চোখে উরসুলা তাকালো ভিনসেণ্টের দিকে,—ঠোঁটদুটি এমন করে ফোলালো, ঠিক যেন তারা একটি চুমুরই প্রত্যাশী। বললে,—এক্ষুনি কী করে, মাকে এখন সাহায্য করতে হবে না? ঠিক আধ ঘণ্টা পরে যাব, কেমন?

নিজের ঘরে পৌঁছেই ভিনসেণ্ট দাঁড়ালো আরশিটার সামনে। নিজের চেহারা সম্বন্ধে এতদিন সে সচেতন ছিল না, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই হয়নি হল্যাণ্ডে থাকতে। সে জানতই যে ইংরেজদের তুলনায় তার মুখ আর মাথা অনেকটা ভারি-ভারি দেখতে। আরশিতে যে মুখটা ফুটে উঠল তার পাহাড়ে কপালের নিচে গভীর খোদলে ঢোকা দুটি চোখ, খাঁড়ার মতো উঁচু আর সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া নাক, মোটা কালো ঘন ভ্রূ, সুপুষ্ট কামুক দুটি ঠোঁট, চওড়া চোয়াল আর মস্ত কড়া চিবুক—খাঁটি হল্যাণ্ডবাসীর চরিত্রের এই চিবুকেই প্রকাশ।

আরশির কাছ থেকে সরে সে অলসভাবে এসে বসল বিছানার ধারে। হল্যাণ্ডে নিজের পরিবারের খুব বড়া বিধানের মধ্যে সে মানুষ হয়েছে। এর আগে কোনো মেয়েকে সে ভালোবাসেনি। চোখ তুলে তাকাতেই শেখেনি কোনো মেয়ের দিকে, হাল্কা আলাপের সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা। উরসুলার প্রতি তার এই যে প্রেম এতে লালসার মালিন্য নেই। সবে তার যৌবন, নব যৌবনের আদর্শধৌত এই তার প্রথম প্রেম।

ঘড়িতে দেখল পাঁচটা মিনিট মোটে কেটেছে। আরো পঁচিশ মিনিট বাকি—দুস্তর কাল! মার চিঠির খামের মধ্য থেকে আর-একটি চিঠি বার করে সে আর-একবার পড়তে শুরু করল। ভাই থিয়ো লিখেছে। ভিনসেণ্টের থেকে থিয়ো চার বছরের ছোট। ব্রুসেলসে গুপিলের দোকানে ভিনসেণ্টের জায়গায় সে এখন লেগেছে। বাবা থিয়োডোরাস আর কাকা ভিনসেণ্টের মতো ভিনসেণ্ট আর থিয়ো এই দুই ভাইয়ের অন্তরঙ্গতা ছেলেবেলা থেকেই।

টেবিল থেকে কাগজ টেনে নিয়ে ভাইকে চিঠি লিখতে বসল সে। চিঠি লেখা শেষ হতে ড্রয়ার থেকে টেনে বার করল কয়েকটি পেনসিল-স্কেচ। টেম্‌সের বাঁধে এগুলি তার আঁকা। স্কেচগুলি সে আলাদা একটা খামে ভরল, সঙ্গে জাক্‌-এর আঁকা 'তলোয়ার হাতে যুবতী' ছবিখানির একটি ফোটোগ্রাফ। চিঠি আর ছবি সব যাবে থিয়োর কাছে।

হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল।—আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম উরসুলার কথা যে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, দেরি হয়ে গেছে পনেরো মিনিটেরও বেশি। তাড়াতাড়ি ঢেউ-খেলানো লাল চুলের রাশের ওপর একবার চিরুনি বুলিয়ে সে টেবিল থেকে সিজার দ্য ককের ছবিটা হাতে নিয়ে দৌড়ে বার হোলো ঘর থেকে।

নিচে বসবার ঘরে উরসুলা তখন তার ক্ষুদে ছাত্রদের জন্যে কয়েকটা কাগজের পুতুল বানাচ্ছিল। ভিনসেণ্ট ঘরে পা দিতেই সে বলে উঠল,—বাঃ, আমি তো ভাবলাম ভুলেই বুঝি গেলেন আপনি! কই, আমার ছবি এনেছেন? দেখি, দেখি—

—না, এখন না। আগে টাঙিয়ে দিই, তারপর দেখো। আলো কই?

—মার কাছ থেকে নিয়েই আসুন না!

রান্নাঘর থেকে আলো নিয়ে আসতেই উরসুলা ভিনসেণ্টের হাতে দিল আসমানি রঙের সিল্কের একটা স্কার্ফ তার কাঁধে জড়িয়ে নেবার জন্যে। ভালো লাগল সেই স্পর্শটুকু। বাগানে আপেল-মঞ্জরীর সুরভি। অন্ধকার পথে উরসুলা নরম আঙুলগুলি রেখেছে তার কালো মোটা কোটের হাতায়। একবার হোঁচট খেতেই সে শক্ত করে চেপে ধরল তার বাহু, নিজেরই অসাবধানতায় হেসে উঠল খিল-খিল করে। নিজে নিজে হোঁচট খেলে তাতে আবার হাসবার কী আছে বুঝতে পারে না ভিনসেণ্ট, তবে সেই হাসি উরসুলার আবছা দেহবল্লরীতে যে হিল্লোল তোলে তা দেখতে ভালোই লাগে। পাঠশালার ছোট দরজাটা সে খুলে দাঁড়ালো, উরসুলা আগে ঢুকল। যাবার সময়ে উরসুলার মুখটা যেন বড় কাছাকাছি এল তার মুখের, কেমন রহস্যভরা চোখে তাকালো উরসুলা তার চোখে।

টেবিলের ওপর আলোটা নামিয়ে রাখল ভিনসেণ্ট।

—কোনখানে ছবিটা টাঙাব বলো?

—ঠিক আমার ডেস্কের ওপরের দেয়ালে। তাই ভালো হবে না?

সারা ঘর জুড়ে গোটা-পনেরো ছোট-ছোট টেবিল আর বেঞ্চি। একধারে একটি উঁচু প্ল্যাটফর্ম, তার ওপর উরসুলার ডেস্ক আর চেয়ার। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবিটাকে তুলে ধরল দেয়ালে। হাত ঠিক রাখতে পারছে না ভিনসেণ্ট, যতোবারই পেরেকটি বসাতে যায় ঠিক জায়গায়, হাত থেকে খসে পড়ে মাটিতে। হেসে ওঠে উরসুলা,—বড়ো নিবিড় আর নিকট সেই হাসি।

বলে,—দূর বোকা, পারে না! সরুন, আমাকে দিন।

মাথার ওপর যুগল বাহু উঁচু করে তুলে নিপুণভাবে সে কাজ শুরু করল, সারা দেহের স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন রেখায় চঞ্চল যৌবনের সাড়া। সহসা ভিনসেণ্টের মনে হোলো, স্বল্প আলোর এই প্রায়ান্ধকারে দুহাতে সে জড়িয়ে ধরুক উরসুলাকে, আশা-নিরাশার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হোক একটি দ্বিধাবিহীন আলিঙ্গনে। উরসুলার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে বারে বারে, কিন্তু ঠিক সুযোগটি মিলছে না একবারও। আলোটা সে উঁচু করে ধরল, ছবির নিচের লেখাগুলি পড়ে খুশিতে হেসে উঠল আবার। তার পুলকিত দেহের আঁকু-বাকুকে আলিঙ্গনে কি ধরা যায়?

উরসুলা বললে,—আপনার বন্ধু তাহলে তো আমারও বন্ধু হয়ে গেলেন, তাই না? একজন খাঁটি শিল্পীর সঙ্গে ভাব হবে, এ আমার কতোদিনের স্বপ্ন!

ভিনসেণ্ট চাইল এমন একটি কথা বলতে যাতে মুহূর্তটি মধুর হয়,—আসল প্রস্তাব করাটা তারপরে সহজ হয়ে ওঠে। উরসুলা মুখ ফিরিয়েছে তার

দিকে। লণ্ঠনের আলো উর্‌সুলার চোখে ছোট-ছোট ফুলকি ফুটিয়েছে। মুখখানি তার আবছায়ায় ঢাকা,—সে মুখের মসৃণ শুভ্রতার মাঝে লাল দুটি ঠোঁটের ইঙ্গিতে হঠাৎ দোলা লাগে রক্তে।

একটু স্তব্ধতা। এবার কথা বলুক ভিনসেণ্ট,—যা হোক অর্থহীন কথা, ভালোবাসার কথা। সেই কথার প্রতীক্ষাই তো উর্‌সুলা করছে এই মুহূর্তের অর্থপূর্ণ স্তব্ধতায়। জিব দিয়ে ঠোঁটটা সে ভিজিয়ে নিল মাত্র কয়েকবার। দেরি হয়ে গেল; মুখ ঘুরিয়ে নিল উর্‌সুলা, মৃদু একটি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে পেছন ফিরে ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

সুযোগ বুঝি হারিয়ে যায়! আতঙ্ক-চকিত ক্ষিপ্রতায় সে দৌড়ল উর্‌সুলার পেছনে।

—দাঁড়াও, উর্‌সুলা, থামো একটু দয়া করে!

মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালো তরুণী, তাকালো তার দিকে। অন্ধকার আকাশে তারাগুলি জ্বলজ্বলে। বাতিটা পাঠশালাতেই পড়ে রয়েছে, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে একটুমাত্র আলোর আভা। কাছে পৌঁছতেই নাকে লাগল উর্‌সুলার কেশ-সুরভি। একটু কেঁপে উঠে উর্‌সুলা স্কার্ফটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বুকের সামনে দুহাত জড়ো করে নিলে।

—একি উর্‌সুলা, তোমার যে ঠাণ্ডা লাগছে!

—তা লাগছে। ঘরে চলুন।

রাস্তা আটকে দাঁড়ালো ভিনসেণ্ট। না উর্‌সুলা, না!

স্কার্ফ দিয়ে থুতনি ঢেকে আশ্চর্য-হওয়া বড়ো-বড়ো চোখ মেলে উর্‌সুলা ভিনসেণ্টের দিকে চাইল। বললে,—কেন মশিয়ে ভ্যান গক্, আপনার কথা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

—না না, কিছু না। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলাম। মানে কি না, আমি—আমি বলছিলাম কি—

—কথা এখন থাক। বড্ডো শীত করছে আমার—

—শোনো শোনো। খবরটা তোমাকে দিই। জানো, আজ কাজে আমার উন্নতি হয়েছে। লিথোগ্রাফ রুমে কাল থেকে আমি যাচ্ছি। এই নিয়ে এ বছরেই দুবার আমার মাইনে বাড়ল।

এক পা পিছিয়ে গেল উর্‌সুলা। গলা থেকে স্কার্ফটা সরিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কঠিন ঠাণ্ডা গলায় বললে,—আসলে আপনার কী বক্তব্য তা জানতে পারি?

নিজেকে ধিক্কার দিল ভিনসেণ্ট। উর্‌সুলার কণ্ঠে এ কী দূরত্বের আভাস! মূর্খ সে, কেন সে সংযত করতে পারে না নিজেকে! একটু থেমে মনের সমস্ত শক্তি সংহত করে আস্তে আস্তে স্পষ্ট ভাষায় সে বলতে লাগল,—তোমাকে যা আমি বলতে চেষ্টা করছি উর্‌সুলা, তা তুমিও নিশ্চয়ই জানো। আমি

তোমাকে ভালোবাসি, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি! তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও তাতে জীবন আমার সার্থক হবে।

লক্ষ করল ভিনসেণ্ট, তার প্রস্তাবের এই স্পষ্টতায় উরসুলা যেন চমকে উঠল একটু। এইবার কি তাকে আলিঙ্গন করার ক্ষণটি এসেছে?

কিন্তু উত্তর দিতে দেরি করল না উরসুলা। গলাটা চড়িয়ে বললে,—বিয়ে? আপনাকে? এ অসম্ভব!

—এবার কিন্তু তোমার কথা আমিই বুঝতে পারছি না উরসুলা!

—কী আশ্চর্য! আপনি জানতেন না যে এক বছরের ওপর হোলো আমি বাগদত্তা?

নির্বাক নিঃস্পন্দ হয়ে গেল ভিনসেণ্ট। কতক্ষণ পরে নিষ্প্রাণ প্রেত-কণ্ঠে শুধু বললে,—কে সে ভাগ্যবান?

—ওহো, ঠিকই তো। আমার ভাবী স্বামীর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। আপনি আসার আগে আপনার ঐ ঘরেই সে থাকত। তবে, আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো জানেন—

—কী করে জানব বলো?

—না, মানে, আমি ভেবেছিলাম কি,—উরসুলা একবার রান্নাঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে বললে,—আমার ধারণা ছিল কারুর কাছে আপনি হয়তো শুনেছেন।

ভিনসেণ্টের গলায় আর কোনো দ্বিধা নেই। স্পষ্ট সে প্রশ্ন করলে,—তুমি কেন আমাকে বলোনি? এই এক বছরের মধ্যে কেন কথাটা গোপন রেখেছিলে? বুঝতে পারোনি—দিনে দিনে তোমার ভালোবাসায় আমি পড়ছি?

—বাঃ! তাতে আমার কী দোষ? আমি তো আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই চেয়েছিলাম।

ভিনসেণ্ট জিজ্ঞাসা করলে,—আমি এ বাড়িতে আসার পর থেকে সে কি কোনদিনই আসেনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে?

—না। এখন সে ওয়েলসে। গরমের ছুটিতে আসবে এখানে।

—এক বছর তাকে দেখো নি? তাহলে এক বছরে তাকে তো ভুলেই গেছ! এখন যাকে তুমি ভালোবাসো সে হচ্ছে আমি। আমি—আমি ছাড়া আর কেউ নয়!

ছিঁড়ে ফেলল স্থৈর্যের বন্ধন। সবল হাতে উরসুলাকে জড়িয়ে ধরল ভিনসেণ্ট, তার মুখ ভরে দিল অবাঞ্ছিত কঠিন চুম্বনে চুম্বনে। চুম্বন করল তার চুলের গুচ্ছে। বাঁধন-ছাড়া প্রেম মুহূর্তে যেন পাগল হয়ে গেল।

—উরসুলা, উরসুলা, লক্ষ্মীটি! কে বলেছে ও লোকটকে তুমি ভালোবাসো? কিছুতেই না! তোমার ভালোবাসা আমার, তুমি আমার! আমাকে বিয়ে তোমায় করতেই হবে। ওকে ভুলে যদি না যাও—আমাকে

বিয়ে যদি না করো, কিছুতেই তোমাকে আমি ছাড়ব না! বলো বলো, কথা দাও, উরসুলা।

—আপনাকে বিয়ে করব? বললেই হোলো? পাগল নাকি আমি আপনার মতো? ছাড়ুন, ছাড়ুন বলছি এক্ষুনি, নইলে ঠিক আমি চেঁচাব! ছেড়ে দিন।

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল উরসুলা। তারপর রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিল বাড়ির দিকে। রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একবার সে পেছন ফিরে তাকালো। তারপর দাঁতে-দাঁত-চাপা মৃদু কণ্ঠে হানল প্রচণ্ড আঘাত—

বোকা, লালচুলো বোকা কোথাকার!

৪

পরদিন সকালবেলা কেউ তাকে ডাকল না। ক্লান্তিভরা দেহে মনে নিজেই সে বিছানা ছেড়ে উঠল। কোনো রকমে ক্ষুরটা গালে মুখে বোলালো—ভালোভাবে দাড়ি কামানো হোলো না তাতে। খাবার সময় উরসুলা সামনে এসে দাঁড়ালো না। নিঃশব্দে প্রাতরাশ সেরে সে পা বাড়ালো গুপিলসের পথে। রাস্তায় গতকাল যেসব লোক চোখে পড়েছিল, আজও তারাই চোখে পড়ল। কিন্তু লোকগুলো সবাই বদলে গেছে নাকি? সবাই যেন আশাহারা নিঃসঙ্গ জীব, চলেছে নিরর্থক পরিশ্রমের দিনযাত্রায়। পথের ধারের চেস্টনাট গাছের সার আর ল্যাবার্নাম ফুলের মেলা আজ আর ভিনসেণ্টের চোখে পড়ল না। ব্যর্থ হোলো বসন্ত-সূর্যের উজ্জ্বলতর রশ্মিপাত।

সারাদিনে কাজ সে কম করল না। ইনগ্রেসের অনুকরণে ভিনাস অ্যানোডোমিনি ছবির রঙিন প্রিণ্টই তো বেচল প্রায় কুড়িটা। এগুলোতে খুব লাভ, কিন্তু এতে তার আর উৎসাহ নেই। কোম্পানির লাভ কম বা বেশি হোক—কী এসে যায় তার! ক্রেতাদের সঙ্গে ধৈর্য ধরে ব্যবহার করে যাওয়া অসম্ভব মনে হতে লাগল বারে বারে। আশ্চর্য ওরা! আর্টের কী যে ভালো আর কী মন্দ—তাই যে শুধু ওরা বোঝে না তা নয়,—যা নিতান্ত মেকি আর সাধারণ আর শস্তা—তাই পছন্দ করার ক্ষমতা ওরা পেল কোথা থেকে!

সহকর্মীরা ভিনসেণ্টকে খুব একটা আমুদে লোক বলে কখনোই ভাবত না, তবে কিনা এতদিন সে চেষ্টা করছিল সহকর্মীদের সঙ্গে মোটামুটি ভদ্র আর মিশুক হয়ে থাকতে। আজ আর তার দরকার নেই।

একটি কেরানি জিজ্ঞাসা করল অপরকে,—ভ্যান গক্ পরিবারের বিখ্যাত বংশধরটির আজ সারাদিন কী হয়েছে বলো তো? কী ভাবছে এতো?

—কাল রাত্রে বোধহয় সুনিদ্রা হয়নি, আর কী?

—ঠিক বলেছ। সত্যিই তো, ওর তো দুশ্চিন্তার অবধি নেই! ভিনসেণ্ট ভ্যান গকের ভাইপো,—যে কিনা প্যারিস বার্লিন আর ব্রুসেলসের সমস্ত গুপিল গ্যালারিগুলোর অর্ধেক মালিক। বুড়োর তো ছেলেপুলে নেই,

রোগেও ভুগছে। সবাই জানে তার অংশের অন্তত আধাআধি ছোকরার কপালে নাচছে।

—হু, কপাল কি আর তোমার-আমার মতো?

—আহা, বাকি অর্ধেকটা শোনো। আর-এক খুড়ো হেনড্রিক ভ্যান গক্ হচ্ছেন ব্রুসেলস্ প্যারিস আর আমস্টার্ডামের বড়-বড় দোকানগুলোর মালিক, আর তৃতীয় খুড়ো কর্নেলিয়াস হচ্ছেন সারা হল্যাণ্ডের সবচেয়ে জাঁদরেল আর্ট-কারবারী। সারা ইউরোপের ছবি বিক্রির ব্যাবসা এই ভ্যান গক্ পরিবারের একচেটে। আর হয়তো আমাদের পাশের ঘরের লাল-চুলো বন্ধুটির হাতের মুঠোয় এর সবকিছু আসবে একদিন।

রাত্রে যখন লয়্যারদের খাবার ঘরে ভিনসেণ্ট ঢুকল, দেখল মেয়ে আর মা নিচু গলায় কী কথাবার্তা বলছে। তাকে দেখেই দুজনে চুপ করল। উরসুলা দৌড়ে অন্তর্ধান করল রান্নাঘরের মধ্যে। ম্যাডাম লয়্যারের চোখে কঠিন দৃষ্টি। তিনি বললেন শুধু,—গুড ইভনিং।

বড় টেবিলটার ধারে একলা বসে ভিনসেণ্ট ডিনার সারল। উরসুলা কথায় তাকে আঘাত দিয়েছে, আঘাত দিচ্ছে ব্যবহারে। কিন্তু হার সে মানবে না। উরসুলার 'না'-কে সে 'হ্যাঁ' করাবেই।

সাত দিন কেটে যাবার পর একদিন সে উরসুলার সঙ্গে আবার কথা বলার সুযোগ পেল। এতদিন সে ভালোভাবে খায়নি, ঘুমোয়নি। বিশ্রান্তি আর দুশ্চিন্তা দুর্বল করেছে তার নার্ভগুলোকে। চোখের সবুজ রঙ মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে বেদনা-ব্যথিত নীলাভা। আড়ষ্টতা আরো বেড়েছে।

সেদিন রবিবার। সান্ধ্য ভোজের পর বাগানে উরসুলাকে সে ধরল। বললে,—মাদামোজেল উরসুলা, সেদিনকার ব্যবহারের জন্যে আমি খুব লজ্জিত।

—ওঃ, তাতে কি? কিছুই হয়নি সেদিন। ভুলে যান সেদিনকার কথাটা।

—আমার সেদিনের ব্যবহারটা যদি ভুলে যাও তাহলে অনুগৃহীতই হব। তবে, সেদিন যা বলেছিলাম তা কিন্তু সত্যি।

এক পা এগোলো ভিনসেণ্ট। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল উরসুলা।

—ও কথা আবার কেন তুলছেন? ওসব আমি মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। চলুন ভেতরে যাই। মার কাছে লোক আসবার কথা আছে।

—আর কাউকে তুমি যে ভালোবাসো তা আমি বিশ্বাস করি না উরসুলা। তাহলে তোমার চোখ দেখে এতদিনে তা আমি বুঝতে পারতাম।

—মাপ করবেন, আমার আর সময় নেই।—ভালো কথা, কবে যেন আপনি ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছেন?

ঢোক গিলে ভিনসেণ্ট বললে,—জ্বলাইতে।

—ভালোই হোলো। আমি যাকে বিয়ে করছি সে জ্বলাই মাসেই ছ্বটি নিয়ে এখানে বেড়াতে আসছে। ঘরটা খালি থাকাই চাই তার জন্যে।

—বিয়ে করবে তোমাকে? আর কেউ? আমি কিছ্বতেই তা হতে দেব না উর্‌স্বলা! তুমি আমার!

—দেখ্বন, এসব কথা আপনি বন্ধ করুন। নইলে মা বলেছে আপনাকে অন্য বাসা খ্বঁজে নিতে হবে।

উর্‌স্বলা চলতে শ্বরু করল। ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বললে, —তব্ব আমাকে আবার বলতে হবেই উর্‌স্বলা। তুমি জানো না কী ভয়ংকর আমি তোমাকে ভালোবাসি। কেন তুমি এমনি করে আমাকে এড়াতে চাও?

আরো দ্বটি সপ্তাহ কাটল। সে ব্যর্থ প্রেমিক, নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ সে। উর্‌স্বলাকে পাওয়া যদি-বা অসম্ভব,—উর্‌স্বলার ধ্যানে বাধা দেবে কে? সহকর্মীদের সঙ্গে সামান্য সহযোগিতাটুকুও তার ঘ্বচল। ঘ্বচল সব কিছ্বরই প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ। যে আলো জবলেছিল প্রেমের ইন্ধনে, নিবে গেল তা একেবারে। যেমন নিঃসঙ্গ গম্ভীর একগ্বঁয়ে ছিল তার স্বভাব জ্বণ্ডেয়ার্টে থাকতে, ফিরে এল আবার সেই চরিত্র।

জ্বলাই এল। মিলল দ্ব-সপ্তাহের ছ্বটি। লণ্ডন ছেড়ে যেতে তার ভয় করে। সে যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ উর্‌স্বলা আর কাউকে ভালো-বাসতে পারবে না নিশ্চয়ই।

নিচে বসবার ঘরে সে নামল। মা মেয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই দ্বজনে দ্বজনের দিকে অর্থবোধকভাবে একবার তাকালো।

সে বললে,—আমি শ্বধ্ব একটা স্বটকেস সঙ্গে নিচ্ছি মাদাম লয়্যার। আমার জিনিসপত্র সব কিছ্ব ঘরে রইল। আর, যে দ্ব-সপ্তাহ আমি থাকব না এই রাখ্বন তার ভাড়া।

মাদাম বললেন,—আমি বলছিলাম কি, আপনার বাকি সব জিনিসপত্রও এইসঙ্গে আপনি নিয়ে যান।

—কিন্তু কেন?

—আসছে সোমবার সকাল থেকে আপনার ঘরে নতুন ভাড়াটে আসছে। আমাদের ইচ্ছে আপনি অন্যত্র কোথাও থাকুন।

—আপনি বলছেন—'আমাদের' ইচ্ছে? ফিরে সে তাকালো উর্‌স্বলার দিকে গর্তে-ঢোকা কর্বণ চোখ মেলে। সে দ্বষ্টিতে বক্তব্য কিছ্ব নেই, একট্ব শ্বধ্ব ব্যথিত প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, আমাদের ইচ্ছে। আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। জামাই চান না যে আপনি এ বাড়িতে থাকেন। সত্যি কথা বলতে, মিস্টার ভ্যান গক্, আপনি যদি কখনো এখানে না আসতেন তাহলেই হোতো সবচেয়ে ভালো।

ব্রেডা স্টেশনে ছেলের জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন থিয়োডোরাস ভ্যান গক্। গায়ে তাঁর সাদা খড়মড়ে-ইস্ত্রি-করা শার্টের ওপর ভারি কালো পাদ্রি-কোট, সরু খাড়া কলারের ওপর বিরাট একটা কালো বো-টাই। ভিনসেণ্টের সর্বাগ্রে চোখে পড়ল বাবার মুখের বৈশিষ্ট্যটা। চোখের ডান পাতাটা বাঁ পাতার চাইতে বেশি ঝুলে পড়া। মুখের বাঁ দিকটা ডান দিকের চেয়ে বেশি শীর্ণ ও রেখাঙ্কিত। স্থির গম্ভীর দৃষ্টি, ভাবটা এই,—দ্যাখো এই আমি।

জুণ্ডেয়ার্টের লোকেরা প্রায় বলত যে ডমিনি থিয়োডোরাস সিল্কের উঁচু টুপি মাথায় দিয়ে পরোপকার করে বেড়ান।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভিনসেণ্টের বাবার মনে এই প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল, প্রতিষ্ঠার উচ্চতর শিখরে পৌঁছতে তিনি পারলেন না কেন? কেন এত দিনের মধ্যে কখনো আমস্টার্ডাম বা হেগ শহরের মতো জায়গার কোনো গির্জায় তিনি বদলি হলেন না? কেন সারা জীবন কাটল এইভাবে? চেহারায় তিনি সুপুরুষ, শিক্ষা তাঁর যথেষ্ট, স্নেহশীলতা ধৈর্য চারিত্রবল প্রভৃতি সর্বগুণের তিনি অধিকারী, ধর্মকর্মের প্রত্যক্ষ উৎসাহে তাঁর ক্লান্তি নেই কখনো। কিন্তু পঁচিশ বছর ধরে এই অজ্ঞাত জুণ্ডেয়ার্ট গ্রামে তিনি পড়ে আছেন, নিতান্ত অবহেলিত হয়ে। তাঁরা ছ-ভাই। আর পাঁচ ভাইকে এক ডাকে সারা দেশের লোক চেনে, তিনিই শুধু ভাগ্যহীন।

বাজারের সামনেকার বড়ো রাস্তার প্রান্তে কাঠের একটি বাড়ি। এই হচ্ছে পাদ্রির বাসগৃহ। রান্নাঘরের পেছনে ছোট্ট একটি বাগান,—সরু সরু পায়ে-চলা পথের এধারে ওধারে রকমারি ফুল গাছের কেয়ারি করা বাগান। তার পেছনেই বড়ো-বড়ো গাছের আড়ালে ছোট্ট কাঠের তৈরি গির্জাটি। গির্জার দুপাশে দুই দেয়ালে ছোট্ট-ছোট্ট প্লেন কাঁচের গথিক জানালা, মেঝেয় পাতা ডজনখানেক কাঠের শক্ত বেঞ্চি। পাদ্রির আসনের পেছনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি-কটি উঠলে পুরোনো অর্গানটি যেখানে আছে সেখানে পৌঁছোনো যায়। আড়ম্বর-বিহীন এই উপাসনা-গৃহ ক্যালভিনের ধর্মবিপ্লবের সাক্ষী।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়ির দরজায়।

ভিনসেণ্টের মা আনা কর্নেলিয়া প্রতীক্ষা করছিলেন জানালায় দাঁড়িয়ে, ছুটে এলেন তিনি। স্নেহকরুণ আগ্রহে ছেলেকে বুকে নিতেই হঠাৎ তাঁর মনে হোলো, কী যেন একটা হয়েছে ছেলের।

আনা কর্নেলিয়ার নীলাভ-সবুজ চোখে সর্বদা যেন মৃদু কৌতূহলের আভাস। সে চোখ মানুষের মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছয় সহজ ঔৎসুক্যে, কিন্তু কখনো বিচারের দাবিতে কঠিন হয়ে ওঠে না। মানুষ পাথর নয়—তার বেদনা আছে, কামনা আছে, যেমন প্রলোভন আছে তেমনি আছে ব্যর্থতা—তা তিনি

বোঝেন ; সে উপলব্ধি ক্ষমা আর সহানুভূতিতে মেদুর। তাঁর স্বামী যেখানে আদর্শের বিচারে কঠোর, তিনি সেখানে সংবেদন-করুণ।

বাবার ঘরেই সকলের আড্ডা। রাত্রের খাওয়া দাওয়ার পর ঘরোয়া কথাবার্তা এই খাবার টেবিলেই জমে। আনা কর্নেলিয়ার মনে কেমন একটা দুশ্চিন্তা, ছেলে রোগা হয়ে গেল কেন এতটা! আচারে ব্যবহারেও কেমন যেন ছটফটে অশান্ত ভাব।

সাপার শেষ হবার পর তিনি ভিনসেন্টকে শুধোলেন,—হ্যাঁরে, কী হয়েছে বল্ তো? তোর শরীরটা তো বড় কাহিল দেখছি।

—কিছু না। কিছুই হয়নি মা।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন,—লণ্ডন লাগছে কেমন তোমার? ওখানে ভালো না লাগে তো তোমার ভিনসেন্ট কাকার সঙ্গে কথা বলি, প্যারিসের কোনো দোকানে তোমাকে বদলি করুক।

হঠাৎ যেন চমকে উঠল ভিনসেন্ট। উত্তেজিত গলায় বললে,—না না, খুব ভালো—লণ্ডন আমার খুব ভালো লাগছে, আপনি আবার ও নিয়ে কাকাকে কিছু বলবেন কেন?

একটু সামলে নিয়ে সে কথাটা শেষ করল,—মানে, আমি বলছিলাম কি, কাকা যদি আমাকে কোথাও বদলি করতে চান, তা তিনি নিজেই করবেন, তাই না?

থিয়োডোরাস বললেন,—বেশ তো, তোমার যা ইচ্ছে।

আনা কর্নেলিয়া মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয়ই সেই মেয়েটা। ওর চিঠিপত্রের ধরন কেন বদলেছিল এইবার ঠিক ধরেছি।

গ্রামের প্রান্তে মস্ত জলাভূমি। মাঝে-মাঝে পাইন আর ওক গাছের মেলা। সারাদিন ভিনসেণ্ট এই প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় একলা। একমাত্র আনন্দের খোরাক ছবি আঁকায়। বাগানের স্কেচ কয়েকটি আঁকে, কয়েকটি বাড়ির জানালা থেকে দেখা শনিবারের বিকেলবেলাকার হাটের বিভিন্ন দৃশ্যের। হাতে যে সময়টুকু কাগজ পেন্সিল থাকে, সেটুকু সময় ভুলে থাকে উরসুলাকে।

বড় ছেলে তাঁর বৃত্তি গ্রহণ করল না—দুঃখ ছিল থিয়োডোরাসের। একদিন ছেলেকে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন এক অসুস্থ চাষীকে দেখতে,—সন্ধেবেলা ফেরার পথে কথাটা তিনি পাড়লেন।

—আমার বাবাও পাদ্রি ছিলেন ভিনসেণ্ট। আমার ইচ্ছা ছিল তুমিও এই বৃত্তিই নাও।

—কিন্তু আমি তো কাজ বদল করতে চাইনে বাবা!

—না, আমি জোর করছি না, তবে যদি তুমি ইচ্ছে করো,—তাহলে আমস্টার্ডামে কাকা জ্যানের কাছে থেকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারো। আর তোমার পড়াশুনোর ব্যাপারে রেভারেণ্ড স্ট্রিকারও সাহায্য করতে রাজি।

—আপনি কি উপদেশ দেন আমি গুপিলদের কাজ ছেড়ে দিই ?

—না না, তা নয়। তবে, ওখানে মনে হয় তুমি খুব সুখী নও। তা ছাড়া লোকে তো কাজও বদলায়,—আর এই তো তার বয়স—

—তা ঠিক বাবা, কিন্তু গুপিল ছাড়বার আমার ইচ্ছে নেই।

ছুটি শেষ হলো। আবার ফিরে যেতে হবে লণ্ডনে। আনা কর্নেলিয়া জিজ্ঞাসা করলেন,—হ্যাঁরে লণ্ডনে ঐ ঠিকানাতেই চিঠি দেব তো ?

ভিনসেণ্ট বললে,—না, আমি অন্য বাসায় যাব। গিয়ে ঠিকানা জানাব।

বাবা বললেন,—লয়্যারদের বাসা যে তুমি ছাড়বে স্থির করেছ, এতে আমি খুশিই হলাম। পরিবারটাকে আমার মোটেই ভালো লাগেনি।

কথাটা শুনে শক্ত হয়ে উঠল ভিনসেণ্ট। থিয়োডোরাসের আড়ালে ছেলের বাহুতে হাত রেখে আনা বললেন,—মন খারাপ করিসনে বাছা। কাজকর্মে উন্নতি কর, আমাদের নিজেদের দেশের খুব ভালো মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। সুখী হবি তাতে। এই উরসুলা মেয়েটাকে নিয়ে কিছুতেই সুখী হতে তুই পারতিস নে। ও মেয়ে আমাদের ধাতেরই নয়।

ভিনসেণ্ট ভাবল,—মা কেমন করে জানল ?

৬

লণ্ডনে ফিরে ভিনসেণ্ট কেনসিংটন নিউ রোডে বাসা নিল। বাড়িওয়ালী এক নিরীহ প্রকৃতির বুড়ি; রাত আটটা বাজতেই তার ঘরের আলো নেবে। ভিনসেণ্ট বিনিদ্র চোখে লড়াই করে নিজের সঙ্গে রাতের পর রাত। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করার পর কখন আবার দরজা খুলে বাড়ি থেকে বার হয়ে ছুটে চলে যায় লয়্যারদের বাড়ির উদ্দেশে।

একলা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় উরসুলার গৃহের চারপাশে। এত কাছে, তবু এত দূরে—দুস্তর, অপার দূর! নির্বাক নিঃসঙ্গ অসহ্য যন্ত্রণা। যুক্তি-বিহীন আত্মপীড়ন!

এই যন্ত্রণা দিনে দিনে তাকে অপরের বেদনা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। সঙ্গে-সঙ্গে সহজ আর সুলভ চরিতার্থতার প্রতি জাগিয়ে তোলে তীব্র বিতৃষ্ণা। গ্যালারির কাজে তার মন বসে না। কোনো ক্রেতা যদি কোনো শস্তা ছবি সম্বন্ধে তার মত জিজ্ঞাসা করে, সে আর রেখে-ঢেকে উত্তর দেয় না, বিক্রি হোক আর না হোক। যেসব ছবির মধ্যে শিল্পীর অন্তর্বেদনা পরিস্ফুট, কেবল সেইসব ছবিই তাকে কিছুটা তৃপ্তি দেয়।

অক্টোবর মাসে একদিন দোকানে এক মহিলার পদক্ষেপ হোলো। ভদ্রমহিলার বিরাট বপু, গলায় উঁচু লেসের কলার, গায়ে ঝকমকে পোশাক, মাথায় রঙিন-পালক-গোঁজা ভেলভেটের টুপি। শহরে তাঁর নতুন বাড়ি উঠছে। ঘর সাজাবার জন্যে ছবি সওদা করতে এসেছেন। তাঁর ভার পড়ল ভিনসেণ্টের ওপর।

মহিলাটি বললেন,—দামের জন্যে ভেবো না। তোমার দোকানে সবচেয়ে সেরা যে মাল আছে দেখাও আমাকে। এই ধরো আমার বসবার ঘরের প্ল্যান—পঞ্চাশ ফুট লম্বা, দুদিকে দুই দেয়াল—একটা দেয়ালের মাঝখানে এই দ্যাখো জানালা.........

সমস্ত বিকেলটা ভিনসেণ্ট অপব্যয় করল ভদ্রমহিলাটিকে কয়েকটি ভালো ছবির প্রিণ্ট বিক্রি করবার চেষ্টায়,—রেমব্রাঁ, টার্নার, করো ও ডবিনির ছবি এসব। যা সত্যিকারের ভালো শিল্প তাকে চোখের পলকে বর্জন করার আর যা শিল্প হিসেবে নিতান্ত শস্তা আর নোংরা তা পছন্দ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা মহিলাটির। যতো সময় কাটে, তাঁর আচার ব্যবহারে রুচিতে হঠাৎ-উঠতি মধ্যবিত্তের স্থূল বিকৃতি বিষাক্ত করে ভিনসেণ্টের মন।

শেষ পর্যন্ত পছন্দ শেষ হোলো। গর্বিত আত্মপ্রসাদে মহিলা বললেন,—আঃ, চমৎকার ছবিগুলো কিন্তু বেছেছি, কী বলো?

ভিনসেণ্ট বললে,—নিশ্চয়ই,—তবে কিনা, এত কষ্ট না করে চোখ বুজে যদি কখানা ছবি তুলে নিতেন এর চেয়ে তা মন্দ হোতো না।

সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন মহিলা। সযত্ন-উন্নীত বুক থেকে কপাল পর্যন্ত টকটকে লাল হয়ে উঠল।

—কী বললে? কথা বলতে জানো না ভদ্রমহিলার সঙ্গে? গেঁয়ো ভূত কোথাকার!

সক্রোধে তিনি ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড মাথা নাড়ার সঙ্গে টুপির নীল পালক কাঁপতে লাগল।

মিঃ ওবাক ফেটে পড়লেন বিস্মিত বিরক্তিতে।—মাই ডিয়ার ভিনসেণ্ট, তোমার হয়েছে কী? এত বড় খদ্দেরকে তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলে? সারা সপ্তাহের সবচেয়ে মোটা বিক্রিটাই মাটি! এর জবাবদিহি করবে কে?

—আমিই করব, ভিনসেণ্ট বললে,—তার আগে আমার একটি কথার শুধু জবাব দিন। মূর্খ লোককে যাচ্ছেতাই ছবি গছিয়েই কি আমার সারাটা জীবন কাটবে? ছবির একবিন্দু জ্ঞান যাদের নেই, তাদের খোসামোদ করতে হবে দিনের পর দিন, কেননা তারা পয়সার মালিক? আর যারা সত্যি ছবি বোঝে, ভালোবাসে শিল্পকলাকে, তারা শুধু মুখ শুকিয়ে দূরে থেকে ফিরে ফিরে যায়, কেননা তারা গরিব। একটা প্রিণ্ট কেনবার ক্ষমতাও তাদের নেই। দোকানদার হতে পারি, কিন্তু মানুষও তো আমি? সহ্যের সীমাও তো আছে।

একটু চুপ করে থেকে মিঃ ওবাক বললেন,—এ দেখি সোশ্যালিজম আওড়াচ্ছ তুমি! এমনি করলে আমার পোষাবে না। আমি বরং খোলাখুলি তোমার কাকাকে লিখি।

বড়দিনের সপ্তাহখানেক বাকি। লয়্যারদের বাড়ির সামনে জানালার ধারে মস্ত একটা ক্রিসমাস গাছ সাজানো হয়েছে। দিন-দুই পরে রাত্রিবেলা ভিনসেণ্ট

দূরে থেকে দেখলে বাড়িভর্তি আলো, সামনের খোলা দরজা দিয়ে লোকজনের আসা যাওয়া। কানে এল হাসির কলোচ্ছ্বাস। লয়্যাররা বড়দিনের পার্টি দিচ্ছে। ভিনসেণ্ট দৌড়োলো বাড়িতে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে ফরসা পোশাক পরে আবার দৌড়োলো।

—যাবো আজ ওদের বাড়ি। আজ তো শুভদিন, এ দিনটা আমার বিস্মরণের। ক্ষতি কী আজ ওখানে গেলে।

পরিচিত সিঁড়ি বেয়ে আবার সে উঠল। ধাক্কা দিল দরজায়। কান পেতে শুনল পরিচিত পদশব্দ, পরিচিত কণ্ঠ। এইবার দরজা খুলবে।

খুলল দরজা। ঘরের আলো এসে পড়ল তার মুখে। সামনে উরসুলা, সবুজ রঙের অস্পষ্ট একটি পোশাক তার পরনে। অনাবৃত দুটি বাহু। রূপের আঘাতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ভিনসেণ্টের।

অস্ফুট গলায় সে উচ্চারণ করল,—উরসুলা!

উরসুলার মুখে এ কী ভাবোদ্রেক! সেই সেদিন বাগানে তার মুখে যে রূঢ় ঘৃণাভরা ভাব ফুটে উঠেছিল, এ কি তারই প্রতিচ্ছবি?

—চলে যান, চলে যান বলছি!

দরজা বন্ধ হয়ে গেল মুখের ওপর।

পরদিন আবার জাহাজে চাপল ভিনসেণ্ট। হল্যাণ্ডেই সে ফিরে যাবে।

ক্রিসমাসের সময় গুপিলের গ্যালারিতে খরিদ্দারের সবচেয়ে ভিড়। মিঃ ওবাক ভিনসেণ্টের কাকাকে না লিখে পারলেন না যে তাঁর ভাইপো ছুটির অনুমতিটুকু পর্যন্ত চায়নি—না বলে-কয়ে কাজ ছেড়ে চলে গেছে।

খুড়ো ঠিক করলেন ওকে প্যারিসের গ্যালারিতে নিযুক্ত করবেন।

ভিনসেণ্ট সরাসরি ঘোষণা করল, আর্টের ব্যবসায় তার ইতি। খুবই আঘাত পেলেন কাকা, মর্মাহত হলেন,—বললেন তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, ভাইপোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আর তিনি মাথা ঘামাবেন না কখনো।

ডর্টরেকট-এ একটা ছোট বইয়ের দোকানে সামান্য কেরানির কাজ জুটল। যান্ত্রিক কাজ,—নিরবলম্ব জীবন। একদিন শনিবার রাত্রে ভিনসেণ্ট ডর্টরেকট থেকে ট্রেনে উঠে উডেনবকে পেঁছিল। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জুণ্ডেয়ার্ট। অন্ধকার রাত্রে দিগন্তবিস্তীর্ণ ঘুমন্ত মাঠ, বাতাসে শস্য-সুরভি, হাঁটাপথের দূরে-অদূরে মধ্যে-মধ্যে কালো কালো পাইন গাছ। বাবার পড়ার ঘরে ঝোলানো ঠিক যেন বডমারের আঁকা ছবিটার মতো। সারা আকাশ জুড়ে পাতলা মেঘ, তার পেছনে তারার উঁকি। শেষ রাত্রে সে পেঁছিল জুণ্ডেয়ার্টের কাছাকাছি। পেছনে ফেলে-আসা শস্যক্ষেত্রে কোথায় লার্ক পাখিরা ডাক শুরু করেছে।

বাবা মা বুঝতে পেরেছেন ছেলের মনে কী বেদনার আক্ষেপ। কয়েক মাস পরে থিয়োডোরাস বদলি হলেন ইটেন বলে ছোট একটা শহরে। আবার

কথা বলার সময় এল।

থিয়োডোরাস বললেন,—ঐসব দোকানদারির কাজ তোমার জন্যে নয় ভিনসেণ্ট। নিজের মনকে তুমি বুঝে দ্যাখো—ঈশ্বরের কাজই তোমার উপযুক্ত কি না।

—আমি জানি বাবা।

—তবে এসব ছেড়ে আমস্টার্ডামে গিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করো না!

—তাই হয়ত যাবো, তবে কিনা—

—ভাবনা কিসের, মনস্থির করো ভিনসেণ্ট—

—বুঝিয়ে বলতে পারব না বাবা। আর কদিন আমাকে সময় দিন।

কাকা জ্যান একদিন ইটেন ঘুরে গেলেন। বললেন,—আমস্টার্ডামে আমার বাড়িতে তোমার জন্যে ঘর কিন্তু ঠিক করে রেখেছি ভিনসেণ্ট।

মা বললেন,—রেভারেন্ড স্ট্রিকারও তো লিখেছেন ওর পড়াশুনোর সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি সেরে রেখেছেন।

জানে, জানে সে। আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের শ্রেষ্ঠ সুযোগ সে পাবে। সেখানে ভ্যান গক্ আর স্ট্রিকার পরিবারে সে পাবে পূর্ণ সমাদর, সাহায্য আর সহানুভূতি। কিন্তু তা হবার নয়। বেদনার অঞ্জলি পূর্ণ হয়নি এখনো। উরসুলা এখনো অনূঢ়া।

ইংরেজি কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত পাঠিয়ে ভিনসেণ্ট আবার সে দেশে একটা চাকরি জোগাড় করল। সমুদ্রের ধারে নিউগেট শহর। লণ্ডন থেকে ট্রেনে যেতে সাড়ে চার ঘণ্টা লাগে। সেই শহরের এক ইস্কুলে মাস্টারি।

৭

লোহার রেলিং-ঘেরা মাঠ। তার গায়ে মিঃ স্টোক্‌সের ইস্কুল বাড়ি। দশ থেকে চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে চব্বিশটি ছাত্র। ভিনসেণ্টের কাজ তাদের ফরাসী জার্মান আর ডাচ ভাষা শেখানো আর সব সময়ে তাদের ওপর নজর রাখা। বিনিময়ে বিনামূল্যে আহার আর আশ্রয়। মাহিনা এক পয়সাও না।

জনবিরল মন-কেমন-করা জায়গা এই র‍্যামসগেট। ভিনসেণ্টের মনোভাবের সঙ্গে মিলে গেল এর আবহাওয়া। নিঃসঙ্গতাই তার কাম্য,—সে চায় নিমগ্ন থাকতে উরসুলার ধ্যানে, স্মৃতি-বেদনার রোমন্থনে।

এখানে আসার পর প্রথম শনিবার দিন রাত থাকতে সে বেরিয়ে পড়ল হাঁটাপথে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে। সারাদিন প্রচণ্ড গরম। পড়ন্ত বেলায় সে পৌঁছল ক্যাণ্টারবেরিতে। গির্জার বাইরে বুড়ো গাছের ছায়ায় বসে কিছুটা বিশ্রাম করে আবার সে চলল। থামল গভীর রাতে একটা দিঘির ধারে। সেখানে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রাত চারটে পর্যন্ত ঘুমোলো। পাখির

ডাকের সঙ্গে আবার হাঁটা শুরু। লণ্ডনে লয়্যারদের পাড়ায় শেষ পর্যন্ত যখন পেঁছিল তখন আবার সন্ধ্যা।

ঐ লয়্যারদের বাড়ি, ঐ উর্সুলার গৃহদ্বার। এই জন্যেই তো ইংল্যাণ্ডে আসা। যে দেশে উর্সুলা আছে, আমিও আছি সেই দেশে—সান্নিধ্যের এই' তো পাগল-করা আকর্ষণ।

বুকের মধ্যে হাতুড়ির আঘাত থামেই না। বাড়ির অদূরে একটা গাছে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়ায়, অন্তর মথিত হতে থাকে অবর্ণনীয় এক অদ্ভুত বেদনায়। বসে পড়ে গাছের ধারে। চেয়ে থেকে অপলক দৃষ্টিতে।

কখন নিবে গেল সব আলো। উর্সুলার ঘরের জানালাটা অন্ধকার, অন্ধকার সারা বাড়ি। জোর করে উঠে দাঁড়ালো ভিনসেণ্ট, ক্লান্ত স্খলিত পদে ফিরে চলল আবার। পথের বাঁকে হারিয়ে গেল উর্সুলার বাড়ি, হারিয়ে গেল উর্সুলা।

এমনি আশাহারা ব্যর্থ তীর্থযাত্রা তার শুরু হোলো প্রতি সপ্তাহ-শেষে। কখনো বা শুক্রবার শনিবার দুদিন সে হাঁটে শুধু রবিবার সকালে উর্সুলার বাড়ির কাছে পেঁছিবার জন্যে। উর্সুলা যখন গির্জায় যায়, দূর থেকে কয়েক মুহূর্তের চোখের দেখার জন্যে। শীত এল, তবু বিরাম নেই। পাথেয় নেই, খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই—তবু বিরামও নেই। প্রতি সোমবার সকালে যখন র‍্যামস্‌গেটে ফিরে আসে তখন প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা।

কয়েকমাস পরে ভিনসেণ্ট কাজ পেল আইলওয়ার্থে মিঃ জোন্‌সের মেথডিস্ট স্কুলে। এ কাজটা একটু ভালো। মিঃ জোন্‌স্ মস্ত একটা এলাকার ধর্মযাজক। ভিনসেণ্ট শিক্ষক হিসেবেই বহাল হোলো, কিন্তু তিনি তাকে গ্রাম্য পাদ্রিতে রূপান্তরিত করে ফেললেন।

উর্সুলার বিয়ের দিন যে ঘনিয়ে আসছে, তা ভাবতেই পারে না ভিনসেণ্ট। তার প্রণয়ের যে প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যিই আছে—তা আর কল্পনার বাইরে। সে কল্পনা করে, উর্সুলা যে তাকে বিমুখ করেছে তার কারণ তার নিজেরই কোনো অচরিতার্থতা। কিন্তু সামান্য দোকানদারি সে ছেড়েছে,—বরণ করতে চলেছে জনসাধারণের সেবাব্রত। এবার কি উর্সুলা বরণ করবে না তাকে? স্বপ্ন দেখে—দিন আসছে।

মিঃ জোন্‌সের ছাত্রেরা দরিদ্র। তারা অনেকে আসে লণ্ডন থেকে। ধর্মযাজক তাকে ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি পাঠান ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছ থেকে মাহিনা আদায় করবার জন্যে। ভিনসেণ্ট তাই চায়—লণ্ডন মানেই উর্সুলার সান্নিধ্য।

ছাত্রেরা থাকে হোয়াইট চ্যাপেলের দরিদ্রতম বস্তিতে। রাস্তাভরা নোংরা আর দুর্গন্ধ, আসবাবহীন গৃহ,—দারিদ্র্য ক্ষুধা আর ব্যাধির বীভৎস রূপ প্রতিটি অধিবাসীর চোখে মুখে। কতো পরিবারের অঙ্গে শুধু চীর বসন,

আহার্য তাদের রাস্তায়-কুড়িয়ে-পাওয়া গলিত মাংস আর পচা রুটির টুকরো। দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে রাত বাড়ে,—একটি পয়সাও কোনদিন সংগ্রহ হয় না—গভীর প্রহরে আইলওয়ার্থে ফিরে আসে খালি হাতে। উরসুলার কথাও মনে থাকে না—তার বাড়ির রাস্তায় পা পড়ে না কতদিন।

একদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা ধর্মযাজক তাকে পরীক্ষা করলেন। বললেন,—আজ আমার বড়ো ক্লান্ত লাগছে ভিনসেণ্ট। কতদিন তো তুমি আমার হয়ে ভাষণ লিখেছ, আজ তুমি নিজেই উপাসনাটা চালিয়ে নাও দেখি।

কম্পিত পদে ভিনসেণ্ট পুলপিটে উঠল। মুখ লাল, গলা দিয়ে স্বর বার হতে চায় না, বুঝতে পারে না হাতদুটোকে নিয়ে করবে কী। কাগজে এতদিন যেসব সুন্দর সুন্দর কথা সাজিয়েছে, মুখে সেগুলি উচ্চারণ করা কী কষ্ট! আড়ষ্ট ভাষা আর অনভ্যস্ত ভঙ্গীকে সে জয় করল কেবলমাত্র মানসিক শক্তি দিয়ে।

মিঃ জোনস্ বললেন,—বেশ হয়েছে ভিনসেণ্ট—আসছে সপ্তাহে তোমাকে রিচমণ্ডে পাঠাব।

রিচমণ্ডের লোকেরা মিঃ জোনস্‌কে জানালো, নূতন ওলন্দাজ পাদ্রিটিকে তাদের ভালোই লেগেছে। টার্নহাম গ্রীনের গির্জাটি খুব বড়ো, অধিবাসীরা সংখ্যায় যেমনি বড় রুচিও তেমনি তাদের কঠিন। মিঃ জোনস্ ভিনসেণ্টকে সেখানে পাঠিয়ে পরখ করলেন। সেখানকার প্রার্থনাকারীদের যদি সে প্রীত করতে পারে, কোনো পুলপিটে সে আর আটকাবে না।

উপাসনার শেষে ধর্মযাজকের বাণী। ভিনসেণ্ট ১৯ঃ১৯ শ্লোকটির ওপর ব্যাখ্যা শুরু করল। শ্লোকটির বাক্যগুলি এইরূপ ঃ

পৃথিবীতে আমি অপরিচিত আগন্তুক। তোমার যা নির্দেশ তা তুমি গোপন রেখো না আমার কাছ থেকে।

সহজ সরল উদ্দীপনাভরা কণ্ঠে ভিনসেণ্ট ভাষণ দিয়ে চলল। তার মস্ত বড় মাথা আর তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টি, তার অঙ্গের আড়ষ্টতা আর ভাষার সরল বলিষ্ঠ প্রকাশ মুগ্ধ করল ধর্মবিশ্বাসী শ্রোতাদের। উপাসনার শেষে কয়েকজন তার কাছে এসে তার হস্তমর্দন করল, ধন্যবাদ দিল সহৃদয়তার সঙ্গে। বাষ্পবিভোল দূরান্তবর্তী দৃষ্টি, মুখে মৃদু খাপছাড়া হাসি,—ভিনসেণ্ট বিদায় নিল এদের কাছ থেকে,—হাঁটা শুরু করল লণ্ডনের পথে।

ঝড় নামল পথে। ঘোলাটে হয়ে উঠল টেমস্ নদীর জল। আকাশ ভরা কালো মেঘ, চক্রবালে বিদ্যুৎ-রেখা। টুপি ওভারকোট সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছিল ভিনসেণ্ট। বৃষ্টিপাতে পায়ের চামড়া পর্যন্ত ভিজে গেল তার,—তবু চলল উদ্দাম বেগে।

বাধা সে মানবে না, বাধা সে জয় করেছে। অর্জন করেছে সাফল্য,—উপলব্ধি করেছে জীবনের অর্থ। দ্বিধা নেই মনে, আজ সে জয়ী। এই নবলব্ধ

জন্ম-পুলককে সে সমর্পণ করবে উরসুলার পায়ে।

পথের সাদাটে ধুলো ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টিতে, জলের ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন হথর্ন ঝোপের দল। দূরে শহরের ঝাপসা দৃশ্য,—যেন ডুরারের একটা চিত্র।

লণ্ডনে লয়্যারদের বাড়ি পেঁছিতে পেঁছিতে গড়িয়ে এল আসন্ন সায়াহ্ন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সপসপে ভিজে, জলে ডোবানো ভারি বুটজুতো। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কানে এল সঙ্গীতের মূর্ছনা, দেখল ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। সামনের ঘরে ন্যাচ চলেছে।

একটা বুড়ো গাড়োয়ানকে সে জিজ্ঞাসা করল,—কী ব্যাপার ও বাড়িতে ?

উত্তর শুনল,—বিয়ে।

গাড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ভিনসেণ্ট। মাথার লাল চুলের গুচ্ছ বেয়ে বৃষ্টির জল মুখ ভাসিয়ে দিতে লাগল তার। একটু পরে সামনের দরজাটা খুলল। উরসুলা, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছিপছিপে চেহারার যুবক। লোকজনের আনন্দ-কোলাহল। দম্পতির গায়ে চাউলবৃষ্টি।

ভিনসেণ্ট গাড়িটার পেছনে আত্মগোপন করল। গাড়িতে উঠল উরসুলা ও তার স্বামী। গাড়োয়ান চাবুক মারল ঘোড়ার পিঠে। গাড়িটা চলতে শুরু করল আস্তে আস্তে। গাড়ির পেছনে কয়েক পা দৌড়ে ভিনসেণ্ট জানালা দিয়ে দেখল আলিঙ্গনে আবদ্ধ চুম্বনরত দম্পতি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো সে। গাড়িটা মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে, বর্ষণ-ধূসর সায়াহ্ন অন্ধকারে।

কী যেন একটা ছিঁড়ে গেল—ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে গেল ভিনসেণ্টের বুকের মধ্যে। ঘুচে গেল বন্ধন, মুহূর্তে হোলো চরম মোহমুক্তি, আচম্বিত পরিত্রাণ।

অক্লান্ত বর্ষণের মধ্যে ক্লান্ত পদক্ষেপে সে ফিরে গেল আইলওয়ার্থে। তারপর ইংল্যাণ্ড ছেড়ে গেল চিরদিনের মত।

বরিনেজ

১

ভাইস-অ্যাডমিরাল জোহানেস্ ভ্যান গক্ ডাচ নৌবাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অফিসার। আমস্টার্ডামে তাঁর বিরাট কোয়ার্টার। ভাইপোকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে আজ তিনি নৌবাহিনীর ঝকঝকে ইউনিফর্ম পরেছেন সযত্নে। দুকাঁধের ওপর সোনার তকমা জবলজবল করে জবলছে। মস্ত তাঁর চিবুক, ভ্যান গক্ পরিবারের যা বিশেষত্ব,—চওড়া কপাল থেকে ঝুলে-পড়া উঁচু খাঁড়ার মতো নাক।

—তুমি আসাতে বড় খুশি হয়েছি ভিনসেণ্ট ;—বুঝতেই তো পারছ, ছেলে-মেয়ের বিয়ের পর থেকে আমার বাড়ি একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

ভিনসেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে তিনি ওপরের একটা প্রশস্ত ঘরে ঢুকলেন।

—এটা তোমার ঘর ভিনসেণ্ট। তুমি যে শেষ পর্যন্ত ধর্মযাজকের পদের জন্যে পড়াশুনো করবে ঠিক করেছ, এ খুবই আনন্দের কথা। আমাদের পরিবারের একজন করে ঈশ্বরের কাজ সর্বদা বেছে নিয়েছে।

ভিনসেণ্ট বললে,—আমি ভেবেছি কাকা আমি ধর্মপ্রচারক হব, যত শীঘ্র সম্ভব কাজে লেগে যাবার চেষ্টা করব।

—বলো কি, প্রচারক ? সে তো অশিক্ষিতের কাজ। বোকা লোকের কাছে তারা গেঁয়ো ভাষায় ধর্মের বুলি আওড়ায়। তোমাকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, সে-ই না হবে আমাদের পরিবারের উপযুক্ত কাজ। তবেই না ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারবে! শিক্ষা, শিক্ষাই তো আসল! কিছু ভেবোনা তুমি। সব ব্যবস্থা হবে।

এলেন রেভারেন্ড স্ট্রিকার। ইনি ভিনসেণ্টের মেসোমশাই। আমস্টার্ডামের বিখ্যাত ধর্মযাজক। পরনে কালো রঙের দামি কাপড়ের নিখুঁত পরিচ্ছদ। প্রাথমিক সম্ভাষণের পর বললেন,—তোমাকে গ্রীক আর ল্যাটিন শেখাবার জন্যে যে শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছি তাঁর জোড়া পণ্ডিত আর নেই। মেণ্ডিস দ্য কস্টা তাঁর নাম, জিউইস কোয়ার্টারে থাকেন। সোমবার বিকেলে তিনটের সময় তুমি তাঁর কাছে যাবে। আর কাল রবিবার দুপুরে আমার বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন। তোমার মাসি উইলহেমিনা আর বোন কে—এরা ভারি খুশি হবে তোমাকে দেখলে। ভুলো না।

আমস্টার্ডামের সবচেয়ে অভিজাত পল্লীতে রেভারেন্ড স্ট্রিকারের বাস। বন্দরের দক্ষিণ দিক থেকে চতুর্থ খালটির ধারে ধারে এই পল্লী। খালের জল কাকচক্ষুর মতো,—নেই একবিন্দু শ্যাওলার আবিলতা। রাস্তার ধারের বাড়িগুলি ছবির মতো দেখতে,—প্রত্যেকটি পাকা ফ্লেমিশ স্থাপত্যের পরিচ্ছন্ন নিদর্শন।

পরদিন সকালে ভিনসেণ্ট গির্জায় রেভারেন্ড স্ট্রিকারের প্রার্থনাবাণী শুনল, তারপর দুপুরের দিকে গেল তাঁর বাড়ি। খালের ধারে ধারে বজরার মেলা। কতো পরিবার এইসব বজরার বাসিন্দা। মাস্তুলে বাঁধা আড়াআড়ি দাঁড়, তাতে কাপড় শুকোচ্ছে। মেয়ে পুরুষ কাজ করছে, বাচ্চারা খেলা করছে পাটাতনের ওপর। খালের মাঝখান দিয়ে কতো ছোট-ছোট নৌকো চলছে উজান-স্রোত ঠেলে।

মাসি উইলহেমিনা সাদরে আহ্বান করলেন ভিনসেণ্টকে, নিয়ে গেলেন সোজা খাবার ঘরে। ঘন বার্নিস করা দেয়াল। একটি দেয়ালে ক্যালভিনের মস্ত একটি ছবি, নিচে শেলফের ওপর রুপোর একটি ক্রস।

ঘরের স্বাভাবিক অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হতে-না-হতেই দীর্ঘাঙ্গী একটি যুবতী এসে সাদর সম্ভাষণ জানালো ভিনসেণ্টকে, বললে,—আমাকে তুমি চেনো না। আমি তোমার মামাতো বোন,—কে।

ভিনসেণ্ট করমর্দন করল। কতদিন পরে তার হাতে নারীর কবোষ্ণ কোমল করস্পর্শ!

মেয়েটি বললে,—আমাদের আর কক্ষনো দেখা হয়নি এতদিন। ভারি আশ্চর্য, না? আমার বয়স হোলো ছাব্বিশ, আর ধরো তোমার হোলো—

হাঁ করে তাকিয়ে চমকে উঠে ভিনসেণ্ট উত্তর দিলে,—অ্যাঁ? হ্যাঁ, কম কী? চব্বিশ আমার।

কে বললে,—তুমিও কখনো এর আগে আমস্টার্ডামে আসোনি, আর আমিও ব্রাবাণ্টে যাইনি। কী করে এর আগে আমাদের আলাপ হবে বলো? যা হোক, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভিনসেণ্ট? দ্যাখো কাণ্ড, তোমাকে বসতে বলিনি বুঝি?

আড়ষ্ট হয়ে একটা কাঠের চেয়ারে সে বসল। একটু ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বললে,—মা প্রায়ই বলতেন তোমার কথা। আসোনি কেন ব্রাবাণ্টে? এলে নিশ্চয়ই ভালো লাগত।

—আমি জানি। আনা মাসি কবার চিঠি লিখেছেন আমাকে যাবার জন্যে। এবার একবার যাবই।

কথোপকথনে ভিনসেণ্টের মন নেই। তৃষার্ত আকুলতায় সে সমস্ত চৈতন্য ভরে পান করছে কে-র রূপামৃত। ডাচ মেয়ের শক্ত সুস্পষ্ট চেহারা কে-র,

কিন্তু কোন নিপুণ ভাস্কর যেন তার প্রতি অঙ্গে এনেছে পেলব কমনীয়তা। চুলে তার লালের সঙ্গে সোনালির খেলা, অগ্নিশিখার সঙ্গে স্বর্ণরেখার। দেহের শুভ্রতার সঙ্গে মুখের রক্তিমাভার সংমিশ্রণ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রং-তুলিকে হার মানায়। গভীর নীল চোখ, তাতে প্রতি মুহূর্তের খুশির ঝিলিক,—আরক্ত স্ফুট ওষ্ঠে আমন্ত্রণের ইশারা।

বাক্যহারা ভিনসেণ্টকে সে বললে,—কী ভাবছ?

ভিনসেণ্ট বললে,—ভাবছি তোমাকে আঁকতে পারলে রেমব্রাঁ কতো খুশি হোতো।

হেসে উঠল কে,—সুস্পষ্ট উচ্চারিত হাসি, সুপক্ব ফলের মতো। বললে,—রেমব্রাঁ? ইস্! সে তো কেবল কুচ্ছিত বুড়িদের আঁকত। আমি বুঝি তাই?

—ভুল তোমার, ভিনসেণ্ট বললে,—রেমব্রাঁ বুড়ি আঁকত ঠিক, কিন্তু তারা সব পরমাসুন্দরী বুড়ি। তারা গরিব দুঃখী হয়তো,—কিন্তু দুঃখের দাহনে পবিত্র তাদের আত্মা—শিল্পীর চোখে তাদের রূপের তুলনা ছিল না।

এই প্রথমবার কে ভালো করে ভিনসেণ্টকে দেখল। প্রথমে আলগোছে চোখে পড়েছিল ঝাঁকড়া লালচুল-ভরা তার মস্ত মাথাটা, এবার ভালো করে লক্ষ করল তার গভীর চোখের জ্বালাময়ী দৃষ্টি।

প্রায় চুপি-চুপি বললে,—মাপ করো, বুঝেছি তোমার কথা। দুঃখশোকে জর্জরিত এই সমস্ত বুড়িদের মুখের অসংখ্য বলিরেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রেমব্রাঁ বঞ্চিত জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে খুঁজে পেত, তাই না?

দরজার কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে রেভারেণ্ড স্ট্রিকার বললেন,—কী ছেলেমেয়েরা, কী এত গল্প হচ্ছে তোমাদের?

হাসতে হাসতে কে বললে,—খুব আলাপ জমিয়েছি আমরা। ভাইটি খুব মজার,—আগে তো জানতামই না!

প্রসন্ন মুখ ছিপছিপে চেহারার সুপুরুষ এক যুবক ঘরে প্রবেশ করল। কে উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে চুম্বন করল তাকে। বললে,—ভিনসেণ্ট, এই আমার স্বামী,—মিন্‌হার এস্।

একছুটে বাইরে গিয়ে কে কোলে করে নিয়ে এল তার ছেলেটিকে—দু-বছরের একটি ফুটফুটে বাচ্চা। মিন্‌হার দুহাত দিয়ে তাদের দুজনকে জড়িয়ে আদর করে দিল।

খাবার টেবিলে ভিনসেণ্টের সামনাসামনি বসল কে,—একধারে তার স্বামী, অপর ধারে শিশুপুত্রটি। স্বামীকে পাশে পেয়ে কৌতুকের তার অন্ত নেই। চোখদুটি নাচছে, গালদুটি আরক্তিম। ভিনসেণ্টের কথা আর তার মনে নেই।

তাদের এই উচ্ছ্বলিত ভালোবাসার ঢেউ ভিনসেণ্টকে স্পর্শ করল। অন্তরের

কোন গোপন উৎসমুখ থেকে উরসুলার জন্যে বেদনাটা আবার নতুন করে ঝরতে লাগল। সামনে এই হাসি-মুখ আর খুশি-প্রাণ স্বামী স্ত্রী আর শিশু— পারিবারিক প্রেমবন্ধনের এই মধুর চিত্র,—চকিতে মনে পড়ল এমনি ভালোবাসার জন্যে গত ক-মাস ধরে তার সারা প্রাণ শুষ্ক তৃষিত হয়ে রয়েছে,—এ তৃষ্ণা কিছুতে ভোলার নয়।

৩

প্রত্যেকদিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে ভিনসেন্ট ঘুম খেকে উঠে বাইবেল পড়তে বসে। আকাশে আলো যথন ফুটে ওঠে সে কিছুক্ষণের জন্য জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। সামনে বন্দরের ইয়ার্ড, শ্রমিকরা ছায়ার মতো গেটের মধ্যে ঢোকে। দূরে জুইডার জী-তে ছোটবড় জাহাজে নৌকোয় পাল ওঠে। শুরু হয় দিনের কর্মব্যাকুলতা।

ভিনসেন্ট একটুকরো রুটি আর এক গ্লাস বিয়ারে প্রাতরাশ সেরে নেয়। তারপর শুরু হয় ল্যাটিন আর গ্রীক নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাতঘণ্টার সাধনা। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সে এক নাগাড়ে পড়ে চলে। মাথা ঝিম-ঝিম করতে থাকে। তারপর সময় আসে মেন্ডিস দ্য কস্টার কাছে যাবার।

শিক্ষকটিকে দেখে ভিনসেন্টের রুই পারেজের আঁকা 'খ্রীস্টানুসরণ' ছবিটির কথা মনে পড়ে। গর্তে-ঢোকা গভীর চোখে উধাও দৃষ্টি, রেখাঙ্কিত শীর্ণ মুখে নিরাসক্ত নির্লিপ্তি। সাতঘণ্টা ধরে গ্রীক আর ল্যাটিন, ইতিহাস আর ব্যাকরণ পড়ার পর শিক্ষকের সঙ্গে মাঝে মাঝে অন্য বিষয়ে কথাবার্তা বলতে ভিনসেন্টের ভালো লাগে। বিশেষ করে ছবির কথা, শিল্প আর শিল্পীর কথা। কিন্তু নষ্ট করার মতো সময় কই? শিক্ষকের মোটা বেতন যে জোগাচ্ছেন রেভারেন্ড স্ট্রিকার।

মেন্ডিস ডা কস্টাও বোঝেন, তাই তিনি প্রায়ই পড়াশুনা শেষ হবার পর ভিনসেন্টকে শহরে পেঁছে দিতে বার হন। তখন হাঁটতে হাঁটতে নানা গল্প হয়।

একদিন তিনি ভিনসেন্টকে নিয়ে চললেন শহরতলীর নতুন অঞ্চল দিয়ে। ভন্ডেল পার্ক থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত এ রাস্তাটা ভিনসেন্টের অচেনা। মাঝে-মাঝে বহু ছোট-ছোট খাল, অনেক কলকারখানা আর অসংখ্য শ্রমিক-গৃহ। ভিড়ের শেষ নেই।

ভিনসেন্ট বললে,—এইরকম একটা এলাকার পাদ্রি হতে পারলে চমৎকার হয়।

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে মেন্ডিস উত্তর দিলেন,—ঠিক বলেছ, আর ঈশ্বরের প্রয়োজন শহরের লোকদের চাইতে এদের অনেক বেশি।

—এ কথার মানে, মিনহার?

সামনেই একটা পুল। পুলের ওপর উঠে দুধারে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে মেণ্ডিস বললেন,—এইসব শ্রমিক, জীবন এদের সুখের নয়। হাড়ভাঙা খাটুনি, তবু আজ যদি কাজ না জোটে, তাহলে কাল আর আহার জুটবে না। রোগ হলে সামান্য চিকিৎসার সম্বলটুকুও ওদের নেই। শিয়রে দুর্ভিক্ষ নিয়ে ওদের জীবন কাটে। জীবনে ওরা ঠকেছে, ঈশ্বর ছাড়া ওরা সান্ত্বনা পাবে কোথা থেকে ?

—আর শহরের লোকেরা ?

—তারা তো এমনি গরিব নয়! তাদের স্বাচ্ছন্দ্য আছে, সঞ্চয় আছে। তাদের ভাবনা কী ? তাদের কল্পনায় ঈশ্বর দিব্যি গোলগাল পাকাবুড়ো বনেদি ভদ্রলোকটি!

সেদিন রাত্রিবেলা টেবিলের ওপর গ্রীক বই খোলা রেখে অনেকক্ষণ সামনের দেওয়ালের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইল ভিনসেণ্ট। মনে তার ভেসে উঠতে লাগল লণ্ডনের শ্রমিক বস্তি—সেখানকার অধিবাসীদের দুরন্ত দারিদ্র্য আর হতাশা। মনে পড়ল, তার কল্পনা ছিল সে প্রচারক হবে—ঐ-সব ভাগ্যহতদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। এই মুহূর্তের কল্পনায় ভেসে উঠল রেভারেণ্ড স্ট্রিকারের গির্জাটা। ওখানে যারা যায় উপাসনায় তারা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, স্বচ্ছল; ভরপুর জীবনের অনায়াস তাদের ভাগ্য। কাকা স্ট্রিকারের বাণীতে মাধুর্য আছে, আছে অনেক সান্ত্বনার আশ্বাস—কিন্তু তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে সাত্বনার প্রকৃত পিয়াসী কজন ?

ছমাস হোলো সে আমস্টার্ডামে এসেছে। যে শিক্ষায় তার স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি নেই, তাকে সে জয় করতে চাইছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম দিয়ে। বইপত্র খুলে বসল। মধ্যরাত্রেও আলো জ্বলছে। জ্যান কাকা দরজা ঠেলে ঢুকলেন।

—এখানো জেগে আছ ভিনসেণ্ট ? এদিকে রোজ ভোর চারটের সময় তুমি দিন শুরু করো। ক-ঘণ্টা পড়ো তুমি ?

—ঠিক নেই কাকা। কোনো দিন আঠারো, কোনো দিন কুড়ি।

—কী সর্বনাশ! কুড়ি ? কিন্তু এত পড়ার তোমার কী দরকার ?

—কী করি বলুন, পড়াটা তো সারতে হবে।

—তা হোক। শরীর এত সইবে না। এখুনি শুয়ে পড়ো। এতটা রাত আর কোনো দিন জেগো না।

বইপত্র সরিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল ভিনসেণ্ট। ঘুম আসে না। বিশ্রাম চাইনা, সুখ চাইনা, শুধু এই অসম্ভব পড়াটা সারতে চাই। গ্রীক আর ল্যাটিন, অংক আর গ্রামার—এদের পরীক্ষা সাগর পার হতে চাই—যাতে করে ধর্মযাজকের যোগ্যতা অর্জিত হতে পারে—ঈশ্বরের কাজে জীবনকে লিপ্ত করার সুযোগ মিলতে পারে।

একটি বৎসর কাটল। আবার মে মাস। ভিনসেন্ট হার মানল। এ লেখাপড়া তার হবে না, পাণ্ডিত্য-অর্জন তার জন্যে নয়। বৃথা তার এতদিনের পরিশ্রম।

নিজের অসামর্থ্যের উপলব্ধিই যে তাকে মুষড়ে ফেলেছে তা নয়,—সঙ্গে রয়েছে জ্বালাময়ী জিজ্ঞাসা—কেন এই পরিশ্রম? সে কি চায় রেভারেণ্ড স্ট্রিকারের মতো সম্ভ্রান্ত ধর্মযাজক হতে? কোথায় তার আদর্শ, কোথায় তার সেবার স্বপ্নসম্ভাবনা? পড়াশুনো শেষ করতে আরো পাঁচ বছর বাকি। এ আদর্শ, এ স্বপ্ন, পাঁচ বছরে কোথায় মিলিয়ে যাবে!

একদিন সন্ধেবেলা পড়াশুনো শেষ করার পর সে শিক্ষককে বললে,—মিনহার ডা কস্টা, একটু বেড়াতে বার হবেন আমার সঙ্গে?

মেণ্ডিস বুঝেছিলেন তাঁর ছাত্রের মনে কী একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে, বুঝেছিলেন একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় সন্নিকট। গলায় মাফলার পেঁচিয়ে বললেন,—চলো। বাইরে চমৎকার হাওয়া, তোমার সঙ্গে একটু ঘুরেই আসা যাক।

দুজনে বার হলেন পথে। যেতে যেতে পাশে পড়ল সেই ইহুদী ধর্মমণ্ডলটি, যেখানে তিন শতাব্দী আগে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষিত হয়েছিল স্পিনোজা। আর একটু এগোতে রেমব্রাঁর পুরোনো গৃহ।

বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিতান্ত সহজ গলায় মেণ্ডিস বললেন,—দ্যাখো, লোকটা কী ভাবে মরল শেষ পর্যন্ত। সমস্ত দারিদ্র্য আর অসম্মান মাথায় নিয়ে!

চমকে তাঁর মুখের দিকে তাকালো ভিনসেন্ট। মেণ্ডিসের কথাবার্তার ধরনই এমনি। সহজ কথার আড়ালে গভীর একটি তত্ত্ব কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে। নিবিড় অনুভূতি আর অন্তর্দৃষ্টির স্রোতোমুখ থেকে যেন তাঁর কথাগুলি উৎসারিত।

আস্তে আস্তে ভিনসেন্ট উত্তর দিলে,—তাতে তাঁর দুঃখ ছিল না, মিনহার।

—ঠিক বলেছ। রেমব্রাঁর মৃত্যু সুখের মৃত্যু। যা চেয়েছিল তা লোকটা পেয়েছিল,—আত্মবিকাশের পথে কোনো বাধা মানেনি; সারা জীবনে তার যা অবদান, তার দাম যে কী তাও বুঝেছিল ঠিকই। এই তো সাফল্য, নয় কি?

—কিন্তু এমনি বোঝার মূল্য কী, মিনহার? এটা ঝুটো আত্মাদেরও তো হতে পারে। এও তো হতে পারত যে শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে পৃথিবীর অবহেলাটাই সত্যি হয়ে উঠল!

—বয়ে যেত তাতে তার। দ্যাখো ভিনসেন্ট, রেমব্রাঁর কাজ ছিল ছবি আঁকা। তার আঁকা ভালোই হোক আর খারাপই হোক, কিছুই তার এসে যায় নি। আঁকতে পারার মধ্যেই ছিল তার জীবনের সার্থকতা। শিল্পের

একমাত্র দাম হচ্ছে এই যে, এর মধ্য দিয়েই শিল্পী আত্মপ্রকাশ করতে পারে। রেমব্রাঁর জীবন এই আঁকার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, পরিপূর্ণ হয়েছিল। কালের হাতে তার ছবির কানাকড়ি দামও যদি না মিলত, তাতেই বা কী এসে যেত তার? ছবি না এঁকে আমস্টার্ডামের সবচেয়ে ধনী ব্যাবসাদার যদি সে হোতো, তাতেই কি তার জীবনের উত্তর সে পেত?

—ঠিক মিনহার।

মেন্ডিস আগের কথার জের টেনে বলে চললেন,—আজ যে রেমব্রাঁর শিল্প সারা বিশ্বের আনন্দের খোরাক, এটা নিতান্ত অতিরিক্ত। তোমার আমার সাদা চোখে যে-জীবন ভাগ্যহত, আসলে সে জীবনের পূর্ণতার কোনো ফাঁক ছিল না। শিল্পসৃষ্টি লোকের কদর পেলে না সেটা কিছুই নয়, আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটল কি না, শিল্পীর জীবন শিল্প হয়ে উঠল কি না।

একটু স্তব্ধতার পর ভিনসেন্ট প্রশ্ন করলে,—কিন্তু একজন যুবকের কথা ধরুন, মিনহার। সে কী করে জীবনের আদর্শকে বেছে নেবে? যদি ভুল করে? যদি সে মনে ভাবে বিশেষ একটা ব্রত সে নেবে আর পরে দেখে সে অক্ষম অপারগ, তার আদর্শ তার ক্ষমতার বাইরে?

মেন্ডিসের কালো চোখদুটো চকচক করে উঠল, কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন,—দ্যাখো ভিনসেন্ট, সূর্যাস্তের আভা মেঘের মাথায় কেমন রঙ ছড়িয়েছে দেখছ?

বন্দরের কাছে তাঁরা পেঁছে গেছেন। জাহাজের মাস্তুল, বাড়ির ছাদ আর গাছের মাথায় সূর্যাস্তের সোনা। জাইডার জি-র সোনালি জলে ছায়া ফেলেছে এরা সব।

—চলো বাঁধের ওপর দিয়ে জিবুর্গের দিকে এগোই। সেখানে ইহুদি কবরের ধারে একটু বসব, কেমন? ওখানে আমার পূর্বপুরুষরা সবাই ঘুমুচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে মেন্ডিস ভিনসেন্টের প্রশ্নের জবাব এতক্ষণে দিলেন। বললেন,—দ্যাখো ভিনসেন্ট, কী যে তোমার ব্রত, কোন্ কাজ যে ঠিক তোমার কাজের মতো কাজ, সারা জীবনেও এ প্রশ্নের চরম জবাব তুমি পাবে না। যা করা উচিত মনে করো, সাহস আর নিষ্ঠা নিয়ে সেই কাজে যদি নিজেকে ভরিয়ে দিতে পারো, ব্যাস,—তাহলেই হোলো। হয়তো ভুল করেছ, কিন্তু তাতে কী? করেছ তো কিছু? তাহলেই হোলো। ভুলের ভরসা ভগবান, বিশ্বাসের মালিক তুমি নিজে। ঈশ্বরের কাজের জন্যে তৈরি হচ্ছ,—কী ভাবে করবে, কোন্ পথে চলবে—তোমার মনই তার উত্তর দেবে। মন যা বলছে তাই করো। এরই নাম আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসকে ভয় কোরো না কোনোদিন।

কিছুক্ষণ পরে ভিনসেন্ট বললে,—আচ্ছা মিনহার, এই শিক্ষায় যদি সফল হই?

মেণ্ডিস বললেন,—তার মানে ?

—আমি বলছিলাম, পাঁচ বছর এইভাবে পড়ার পর পরীক্ষা যদি পাশ করতে পারি, তার পরে আমার কী হবে ? স্ট্রিকার মেসোর মতো শহুরে ধর্মযাজকের জীবন—সে কি আমি পারব ?

কবরস্থান সামনেই। সারি সারি অনাড়ম্বর সমাধি,—কতকগুলি ঘাসে ঢাকা, কতকগুলির ওপর হিব্রুভাষায় লেখা চৌকো পাথরের ফলক। একটা কোণ ডা কস্টা পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট করা আছে, সেখানে একটি বেঞ্চি পাতা। দুজনে বেঞ্চিতে বসল। নিঃশব্দ নির্জন সায়াহ্ন।

কবরগুলির দিকে তাকিয়ে মেণ্ডিস বললেন,—পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। যে কাজই সে করুক না কেন, এই বৈশিষ্ট্য এই চরিত্রগুণ থেকে যদি সে ভ্রষ্ট না হয় তাহলে তার জীবন ব্যর্থ হতে পারে না। যদি তুমি আর্টের ব্যাবসাতেই লেগে থাকতে, তাহলে তোমার এই চরিত্রগুণ তোমাকে ভালো ব্যবসায়ী করেই গড়ে তুলতে পারত। শিক্ষক হয়েছিলে, তাতেই বা কী ? নিজের প্রকাশ যদি সত্যি করতে চাও, যাই করো না কেন তার মধ্য দিয়েই পারবে।

—কিন্তু যদি আমস্টার্ডামে না থাকি ? পেশাদার ধর্মযাজক হবার মনোবৃত্তি যদি আমার না থাকে ?

—না থাকে, না থাকুক। সেবাব্রতী হতে পারো, দোকানদার হতে পারো, ব্রাবান্টের চাষী হতে পারো। তোমার আসল হওয়াটা তাতে আটকাচ্ছে কোথায় ? সৎ লোক সার্থক লোক হবার গুণ তোমার মধ্যে আছে ভিনসেন্ট। এ আমি দেখেছি। জীবনে অনেকবার মনে হবে ব্যর্থ হলে, হেরে গেলে, ভুল পথে বুঝি চলেছ ; কিন্তু তা নয়,—যে পথই তোমার হোক, সার্থকতার আসল পরিচয় সেই পথেই তুমি পাবে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা।

চব্বিশ ঘন্টা ধরে ভিনসেন্ট একটি কথাই শুধু ভেবেছে। ঈশ্বরের কাজ করবে, এই ছিল অভিলাষ। যারা দুঃখী যারা অবনত তাদের সঙ্গে মিলবে, এই ছিল ব্রত। কবে ? আরো পাঁচ বছর পরে? জীবনের পাঁচটি বছর পাণ্ডিত্য পেশার পুষ্টিসাধনের চেষ্টার অবশেষে ? না অবিলম্বে ? এখন যদি সে পড়াশুনো ছেড়ে দেয়, আত্মীয়দের এত চেষ্টা আর অর্থব্যয় ব্যর্থ হবে। চুনকালি দেবে সে ভ্যান গক্ পরিবারের মুখে। আবার প্রমাণ হবে সে কোনো কাজের নয়।

কিন্তু যদি সে ঈশ্বরের প্রকৃত কাজের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ? শুধু উপাসনা-সভায় বক্তৃতাই তো ঈশ্বরের কাজ নয়। দুঃখীর দুঃখ মোচন, আর্ত রোগার্তের সেবা, শোকার্তের সান্ত্বনা, দীন দরিদ্রের সাহায্য—বিনা দ্বিধায় বিনা বিলম্বে এই কর্তব্যকে সে যদি বরণ করে নেয়—সে কি কাজের মতো কাজ হবে না ?

সে কাজের মধ্যে কি সার্থক হবে না তার জীবন? পৃথিবীতে কোন্ পথ তার পথ, কোথায় তার স্থান তা সে জানে। আর মেন্ডিস দিয়েছেন সাহস। ঈশ্বরের কাজে আত্মোৎসর্গ এই মুহূর্তেই শুরু হোক।

রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলল। ভিনসেণ্ট তার ব্যাগটা গুছিয়ে কারো কাছে বিদায় না নিয়ে কাকার গৃহ ত্যাগ করল।

৫

খ্রীস্টীয় সুসমাচার প্রচারণী সংস্থার বেলজিয়াম সমিতি ব্রুসেলসে একটি নতুন স্কুল খুলেছিলেন। এখানে বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হবে। ছাত্রদের শুধু আহার ও বাসের জন্যে সামান্য কিছু দক্ষিণা দিতে হবে। এই কমিটির সদস্য ভ্যান ডেন ব্রিংক, ডি জঙ ও পীটারসেন—এই তিন ধর্মযাজক। ভিনসেণ্ট এই কমিটির সঙ্গে দেখা করে এই স্কুলের ছাত্র হবার সুযোগ পেল।

রেভারেন্ড পীটারসেন বললেন,—তিন মাস এখানে তুমি পড়ো, তারপর তোমাকে প্রচারকের একটা কাজ জোগাড় করে দেওয়া যাবে।

রেভারেণ্ড ডি জঙ পীটারসেনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, অবশ্য যদি পরীক্ষায় সফল হতে পারে।

রেভারেণ্ড ভ্যান ডেন ব্রিংক উপদেশ দিলেন,—এই কথাটি মনে রাখবেন মশিয়ে ভ্যান গক যে, ভালো সুসমাচার প্রচারক হতে গেলে খুব সুন্দর ও জনপ্রিয় করে বক্তৃতা দিতে পারা চাই। লোককে আকর্ষণ করতে হবে,— আর তা করতে হবে মিষ্টি মধুর বাণী দিয়ে।

সাক্ষাৎকার শেষ হবার পর গির্জা থেকে ভিনসেণ্টের সঙ্গে বার হয়ে এলেন রেভারেণ্ড পীটারসেন। তার বাহুতে হাত রেখে বললেন,—তোমার নির্বাচনে আমি ভারি খুশি হয়েছি ভিনসেণ্ট। সত্যিই যদি কাজ করতে চাও, তোমার মতো ছেলের সারা বেলজিয়ামে কাজের অন্ত নেই।

ভিনসেন্ট কৃতজ্ঞতায় গলে গেল। উত্তরে কিছু বলবার মতো ভাষা জোগালো না তার মুখে। তার হাতে একটি কার্ড দিয়ে পীটারসেন বললেন,— এই আমার বাড়ির ঠিকানা। সন্ধেবেলা যেদিন কোনো কাজ থাকবে না আমার ওখানে এসো। কথা বলব তোমার সঙ্গে।

স্কুলে তিনজন মাত্র ছাত্র ভিনসেন্টকে নিয়ে। শিক্ষকটি বেঁটেখাটো জীর্ণশীর্ণ চেহারার তিরিক্ষে মেজাজের মানুষ। বাঙলার পাঁচের মতো মুখ। নাম মাস্টার বক্‌মা।

ভিনসেণ্টের দুজন সহপাঠী উনিশ কুড়ি বছরের গ্রাম্য যুবক। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠল, আর ভিনসেন্টকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করাই হোলো তাদের প্রধান বন্ধুত্ব-বন্ধন। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হোলো মাস্টার বক্‌মাকে নিয়ে। শিক্ষক চাইতেন তাঁর ছাত্রেরা যাতে বেশ ভালো রকমের উপস্থিত-বক্তা

হয়ে উঠতে পারে। তাঁর নির্দেশ ছিল ছাত্রেরা প্রতি রাত্রে বাড়িতে বসে খুব ভালো একটি বক্তৃতা রচনা করে মোটামুটি মুখস্থ করে নেবে, সকালে ক্লাসে দাঁড়িয়ে কাগজ না দেখে যেন তারা ঠিকভাবে বক্তৃতাটি দিতে পারে। তাই অপর দুজন ছাত্র মিষ্টি মিষ্টি গালভরা বাঁধা বুলির বক্তৃতা লিখে মুখস্থ করে সেই বক্তৃতা ক্লাসে শুনিয়ে শিক্ষককে খুশি করতে লাগল। ভিনসেন্টও রাত্রি জেগে এমনি ধর্মোপদেশ লিখতে লাগল। অন্তরের সমস্ত ভাবনা আর বেদনা দিয়ে সে রচনা করতে লাগল এক-একটি বাক্য। কিন্তু যে বাণীকে প্রাণের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সে গেঁথেছে, তাকে মুখস্থ করে নিয়ে সহজভাবে বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা তার পক্ষে অসাধ্য।

বক্‌মা বকাবকি করতে শুরু করলেন। দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করতে যে পারে না, মুখে-মুখে বানাবার এতটুকু ক্ষমতা যার নেই, সে নাকি হবে প্রচারক!

এমনি অনেক ধমক সত্ত্বেও বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস ভিনসেন্টের রপ্ত হোলো না। গভীর রাত পর্যন্ত সে ধর্মোপদেশ রচনা করে—প্রতিটি শব্দ অর্থময়, প্রতিটি বাক্য ভাবগম্ভীর। পরের দিন অন্য ছাত্রেরা যখন সুলভ বক্তৃতায় শিক্ষককে সন্তুষ্ট করে, সে তখন তার রাত্রের রচনাটি পাঠ করতে চায়। শিক্ষক শুনতেই চান না, রুষ্টস্বরে বলেন,—এক বছর আমস্টার্ডামে বসে বসে এই শিক্ষাই বুঝি পেয়েছিলে? আমার হাত থেকে যেসব ছাত্র তৈরি হয়েছে তারা কথায় কথায় ধর্মের বক্তৃতা দিয়ে পাঁচ মিনিটে শ্রোতাদের কাঁদিয়ে দিতে পারে। তবে না?

ভিনসেন্ট অনেক চেষ্টা করে হাল ছাড়ল। বক্‌মা রেগে আগুন হলেন। ধমকে অপমানে জর্জরিত হোলো ভিনসেন্ট। উল্টে একবার প্রতিবাদও জানালো সে। শিক্ষক হলেন শত্রু।

নভেম্বরে কমিটির সামনে উপস্থিত হোলো ছাত্রেরা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ভিনসেন্ট—আর মাস্টারি সইতে হবে না। এবার কাজ পেয়ে বাঁচবে। কমিটিতে বক্‌মা উপস্থিত, চোখে ক্রূর দৃষ্টি।

তার সহপাঠী দুজনকে প্রশংসা করলেন রেভারেন্ড ডি জঙ, প্রচারকের কাজে নিযুক্ত করা হোলো তাদের। এবার ভিনসেন্টের পালা।

রেভারেন্ড ডি জঙ বললেন,—মঁশিয়ে ভ্যান গক্, কমিটি স্থিরনিশ্চয় হতে পারেন নি যে তুমি ঈশ্বরের কাজের উপযুক্ত। তাই তোমাকে এবার কোনো কাজ দেওয়া সম্ভব হোলো না।

কিছুটা স্তব্ধতার পর ভিনসেন্ট বললে,—কী দোষ আমি করেছি?

—শিক্ষকের নির্দেশ তুমি মানোনি। খ্রীস্টধর্মের প্রধান নীতি হোলো নির্দেশ মানা, বিদ্রোহ করা নয়। তাছাড়া ঠিকমতো ধর্মনির্দেশ দিতেও তুমি শেখোনি। তোমার শিক্ষকই তোমার কাজে সন্তুষ্ট নন।

ভিনসেন্ট রেভারেন্ড পীটারসেনের দিকে তাকালো। তিনি মুখ ঘুরিয়ে

রেখেছেন অন্যদিকে। আপন মনেই যেন সে বললে অস্ফুট গলায়,—তাহলে, তাহলে আমি কী করব এখন?

রেভারেন্ড ভ্যান ডেন ব্রিংক উত্তর দিলেন,—স্কুলে তুমি ফিরে যাও। আরো ছ-মাস পড়াশুনো কর। তারপর দেখা যাক।

কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল ভিনসেন্ট। মোটা বুটজুতোটার চামড়া প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। আর কোনো কথা বলার নেই, নীরবে সে বার হয়ে গেল গির্জা থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন সে লাইকেন অঞ্চলে চলে এসেছে নিজেই জানে না। একটা কাঁচা রাস্তা ধরে সে চলেছে এবার, দোকানপাট লোকজনের ভিড় পেছনে ফেলে। খানিকক্ষণ পরে সামনে পড়ল একটা ফাঁকা মাঠ। ঘাস খুঁটছে বুড়ো একটি ঘোড়া,—জীর্ণশীর্ণ, সারা জীবনের কর্মশেষের ক্লান্তিতে নড়বড়ে। মাটিতে এমনি আর-একটি ঘোড়ার সাদা সাদা হাড়ের কংকাল। মাঠের অদূরে একটা কুটির। কসাই-বাড়ি।

এতক্ষণের অনড় মনটা যেন একটু নড়ে উঠল এই ক্লান্ত করুণ দৃশ্যে। একটা গুঁড়ির ওপর বসে পাইপটা ধরালো। ধোঁয়াটা তেতো-তেতো লাগছে। একটু আদরের আবদারে বুড়ো ঘোড়াটা কাছে এসে হাতের সামনে গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে তার মনে নেমে এল ঈশ্বরের কথা। মনে পড়ল যিশুর কথা। কতো বাধা, কতো বিপর্যয়—যিশুকে টলাতে পারেনি। যিশু বলেছিলেন,—ভয় কী আমার, আমি তো একলা নই। ঈশ্বর আছেন আমার সঙ্গে। সান্ত্বনা পেল মনে মনে।

বাড়ি ফিরল ভিনসেন্ট সন্ধেবেলা। দেখল পীটারসেন অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন,—তুমি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে খাবে। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

পীটারসেনের বাড়ির সামনের ঘরটা যেন একটা স্টুডিয়ো। দেওয়ালে কয়েকটি জলরঙা ছবি, এক কোণে একটি ইজেল।

—ও, ভিনসেন্ট বললে,—আপনি ছবি আঁকেন? আমি জানতাম না তো?

পীটারসেন একটু লজ্জিত হলেন, —এ কিছু না, একেবারে শিক্ষানবিশি। হাতে সময় পেলে মাঝে মাঝে একটু তুলি ধরি।

ডিনার শুরু হোলো। সঙ্গে বসল পীটারসেনের বছর পনেরো বয়সের একটি মেয়ে,—এত লাজুক যে টেবিল থেকে মুখই তোলে না সারাক্ষণ। পীটারসেন এটা-ওটা নানা কথা বলতে লাগলেন, খাবারে রুচি না থাকলেও ভিনসেন্ট ভদ্রতা করে এটা-ওটা মুখে তুলতে লাগল। হঠাৎ তার কান খাড়া হয়ে উঠল পীটারসেনের একটি কথায়।

পীটারসেন বলছিলেন,—কয়লাখনির এলাকা এই বরিনেজ। এখানকার

প্রায় প্রতিটি লোকই খনির খাদে কাজ করে। জীবনযাত্রার জন্যে প্রতিটি দিন প্রতি মুহূর্ত 'কী বিপদের মুখোমুখি তাদের কাটে, অথচ জীবিকা যা জোটে তাতে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। বাস করে তারা জীর্ণ কুটিরে, অন্নহীন, বস্ত্রহীন।

ভিনসেণ্ট বুঝতে পারে না পীটারসেন হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুললেন কেন। সে জিজ্ঞাসা করে,—আচ্ছা বরিনেজ জায়গাটা কোথায়?

—বেলজিয়ামের দক্ষিণে, মনস্-এর কাছাকাছি। সম্প্রতি আমি কদিন সেখানে কাটিয়ে এসেছি। আমি দেখেছি, সত্যি যদি ধর্মের বাণী আশার বাণীর কারো দরকার হয় সে এই বরিনেজের অধিবাসীদের।

গলায় খাবার আটকে এল ভিনসেন্টের, হাতের ছুরি কাঁটা খসে পড়ে আর-কি। সে শুনল পীটারসেন বলছেন,—ভিনসেন্ট, তুমি কেন বরিনেজে যাও না? তোমার আদর্শবোধ আছে, উদ্দীপনা আছে—সেখানে গেলে অনেক ভালো কাজ তুমি করতে পারবে।

—আমি? আমি কী করে যাব? কমিটি তো আমাকে...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তা জানি। আগেই জানতাম, তাই সব ব্যাপারটা জানিয়ে কদিন আগেই তোমার বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম। আজই তাঁর উত্তর পেয়েছি। তিনি বলেছেন, যতোদিন না পর্যন্ত তোমার একটা চাকরির পাকাপাকি ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি, ততোদিন তোমার বরিনেজে থাকার খরচ তিনি দেবেন।

লাফিয়ে উঠল ভিনসেণ্ট,—তাহলে, কাজ আমাকে একটা করে দেবেন আপনি?

—দাঁড়াও, অত উতলা হোয়োনা। সময় নেবে কিছুটা বৈকি। কমিটি যখন দেখবে তুমি ভালো কাজ করছ, তখন তোমাকে তারা মনোনীত করবেই। তাছাড়া ধরো ডি জঙ আর ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক—তাদের অনেক উপকারে তো আমি আসি, আমার কথাও সময়ে অসময়ে তাদের রাখতেই হবে। একটা কথা আমি বিশ্বাস করি ভিনসেণ্ট, পৃথিবীতে দুঃখীর অভাব নেই, আর তোমার মতো লোকেরই দরকার তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে।

৬

ট্রেন প্রায় গন্তব্যস্থানে এসে পেঁছেছে। চক্রবালে ফুটে উঠল কালো কালো কয়েকটি পাহাড়। ভারি খুশি লাগল ভিনসেণ্টের। ফ্ল্যাণ্ডার্সের সমতলভূমি দেখে দেখে চোখের বিস্বাদ বুঝি ঘুচল এতক্ষণে। বেশ কিছুক্ষণ ঐ দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমে মনে হতে লাগল, ওগুলো যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের। ওগুলো কোনো পর্বতমালার অংশ নয়,—সমতল মাটির ওপরই হঠাৎ-হঠাৎ মাথা খাড়া করে উঁচু হয়ে ওঠা।

মনে-মনে ভিনসেন্ট বললে,—আশ্চর্য! ঠিক যেন কালো কালো পিরামিড।

পাশের সহযাত্রীটিকে সে শুধোলো,—আচ্ছা বলতে পারেন, ওখানে ঐ পাহাড়গুলো এল কী করে?

—তা আর বলতে পারিনে? ওগুলো হচ্ছে কয়লার খাদের পাহাড়,—খনি থেকে কয়লার সঙ্গে যে আবর্জনাটা উঠে আসে তারই স্তূপ। ঐ যে ছোট্ট গাড়িটা চলেছে দেখছেন, ওটাকে লক্ষ করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

ভিনসেণ্ট দেখল, একটা পাহাড়ের গা বেয়ে একটা গাড়ি উঠতে উঠতে হঠাৎ উল্টে গেল আর চারদিকে ছড়িয়ে গেল কালো ধোঁয়ার রাশি।

লোকটি বললে,—ঐ দেখুন, দিনে দিনে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পাহাড় বড়ো হচ্ছে। আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি অমনি।

গাড়ি থামল ওয়াম্‌স্‌ স্টেশনে। ভিনসেণ্ট ট্রেন থেকে নামল। নিঃস্ব রিক্ত বিশাল একটা উপত্যকার মাঝখানে এই ওয়াম্‌সের খনি এলাকা। আকাশের নীলিমার ঠিক নিচেই কয়লার ধুলোর ঘন কালো আস্তরণ। তার মাঝ দিয়ে সূর্যের ঝাপসা নোংরা আলো চুঁইয়ে পড়ছে। পাহাড়ের ধার বেয়ে বেয়ে দু-সার ইঁটের বাড়ি। এ জায়গাটা ওয়াম্‌সের সদর। পাকা ইঁটের কাঠামো একটু দূরে গিয়েই শেষ হয়েছে। সেখান থেকে পুরনো ওয়াম্‌স্‌ গ্রামের শুরু। কয়লা-খনির মজুরদের বাস সেখানে।

স্টেশন থেকে বার হয়ে রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করল ভিনসেণ্ট। পথে জনপ্রাণী নেই। কদাচিৎ কোনো বাড়ির দরজায় পাংশু নিষ্প্রাণ মুখে কোনো স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে।

ওয়াম্‌স্‌ গ্রামে একটি মাত্র পাকা বাড়ি। তার মালিক এখানকার রুটিওয়ালা, নাম জীন ব্যাপ্টিস্ট ডেনিস। এই ডেনিসের বাড়িতেই ভিনসেণ্ট চলেছে—পীটারসেনের ব্যবস্থা অনুসারে সেখানেই সে থাকবে।

মাদাম ডেনিস আন্তরিক সহৃদয়তার সঙ্গে ভিনসেণ্টকে বাড়িতে আহ্বান করলেন। টাটকা রুটির গন্ধভরা রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠে একেবারে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। ছোট্ট ঘরটি, রাস্তার ওপর জানলা। গৃহবাসিনী আগে থেকেই ঘরটিকে ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে ঝকঝকে করে রেখেছেন। ভারি ভালো লাগল ভিনসেণ্টের। শুধু ঘর নয়, ভালো লাগছে সমস্ত পরিবেশ। জিনিসপত্র খোলবার তর সইল না, মোটা মোটা সিঁড়ি বেয়ে রান্নাঘরে নেমে মাদাম ডেনিসকে বলে সে বার হোলো রাস্তায়। মাদাম ডেকে বললেন ফিরতে যেন খুব দেরি না করে, খাওয়ার সময় যেন পিছিয়ে না যায়।

—না না, এই একটু চার-দিকটা ঘুরে এলাম বলে।

গতরাত্রে তুষার পড়েছিল। মাঠের ধারের বেড়াগুলোর কালিমা তুষার কিন্তু মুছে ফেলতে পারেনি। ডেনিসের বাড়ির পূবদিকে মস্ত একটা খাড়াই, তার গায়ে শ্রমিকদের কুটির, উল্টোদিকে প্রান্তর। সেখানে কয়লার খাদের একটা আবর্জনা-পাহাড়, আর কয়লাখনির সার-সার চিমনি। খনির নাম

মার্কাস। গ্রামের অধিকাংশ লোক এই খনিতেই খাটে। প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা,—খানাখন্দ, কাঁটা চারা আর মরা গাছের শুকনো শেকড়ে ভরা।

মালিকদের আরো অনেক আছে,—তবে এই খনিটাই সবচেয়ে পুরোনো। আর সারা বরিনেজ অঞ্চলে এমনি বিপজ্জনক খনি আর দুটি নেই। হয় বিষাক্ত গ্যাসে না হয় বিস্ফোরণে, হয় জল উঠে না হয় ধস নেমে,—এই খনি যে আজ পর্যন্ত কতো শ্রমিকের বলি নিয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। দুখানি পাকা গাঁথুনির ইঁটের ঘর নিয়ে খনির কারখানা, সেখানে রয়েছে কয়লা তোলার ও কয়লা ছেঁকে গাড়িতে ওঠাবার যন্ত্রপাতি। খাড়া খাড়া চিমনিগুলো চব্বিশ ঘণ্টা কালো ধোঁয়া উদ্গিরণ করছে। খনির চারদিকে শ্রমিকদের অসংখ্য খুপরি, কাঁটা-ঝোপ, মরা গাছের শুকনো ডাল, ছাইগাদা আর আবর্জনার স্তূপ। সবার মাথার ওপর কালো পিরামিডের ভ্রুকুটি। তারও ওপরে আকাশ,—বর্ণহীন, কলঙ্ক-ধূসর। চারদিক যেন প্রাণহীন কৃষ্ণ মরু,—নির্জন পথে একলা ভিনসেণ্টের মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল।

খনির অদূরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ বাঁশি বাজল, খুলে গেল কারখানার গেট। শ্রমিকেরা বার হতে লাগল। গায়ে তাদের ছিন্নভিন্ন মোটা পোশাক, মাথায় চামড়ার টুপি। পুরুষ আর মেয়ে উভয়েরই একই পোশাক। প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ কালো,—কালো মুখে সাদা চোখগুলোর কেমন যেন কোটর-থেকে-বার-হওয়া রূপ। শেষ রাত্রি থেকে শুরু করে সারাদিন মাটির অতলে অন্ধকারে কাটানোর পর বিকেলের পড়ন্ত রোদের আলো তাদের দৃষ্টি যেন সইতে পারছে না। অন্ধের মতো জড়ো-সড়ো পায়ে এ-ওর কাছাকাছি ঘেঁসে ওরা এগোচ্ছে,—স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে নিচু গলায়। জীর্ণ শীর্ণ দেহ সকলেরই, ঝুঁকে-পড়া কাঁধ,ঝুলে-পড়া দুই হাত।

ভিনসেণ্ট বুঝতে পারল, এতক্ষণ চারদিক এত নির্জন বলে মনে হচ্ছিল কেন। ওয়াম্‌স্‌ আসলে মাটির ওপরে নয়,—মাটি থেকে সাতশো মিটার নিচে সুড়ঙ্গ-পথ-আকীর্ণ পাতাল-নগরই আসল ওয়াম্‌স্‌; দিন রাতের অধিকাংশ সময় এখানকার প্রতিটি লোকের কাটে পাতালে।

সান্ধবেলা খাবার টেবিলে মাদাম ডেনিস বললেন,—মার্কাসের একজন পুরোনো ফোরম্যান এখানে আসবে। তার সঙ্গে আলাপ করে এখানকার বিষয়ে অনেক কিছু আপনি জানতে পারবেন।

ভিনসেণ্ট বললে,—বেশ তো।

মাদাম ডেনিস আবার বললেন,—জ্যাকেস ভার্নি সামান্য শ্রমিক ছিল। খালি নিজের চেষ্টায় এত বড় হয়েছে, কিন্তু তবু সে শ্রমিকদের বন্ধু।

ভিনসেণ্ট প্রশ্ন করলে,—এ কথার মানে? বড়ো হলে কি আর শ্রমিকদের বন্ধু থাকে না নাকি?

—না, মশিয়ে ভ্যান গক্। যখনই কোনো লোক এই গ্রাম থেকে শহর বাজারে গিয়ে বাসা বাঁধে, তখনই তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। তখন থেকে সে পয়সার লোভে সব ব্যাপারে মনিবদের পক্ষ নেয়, ভুলে যায় যে এককালে সে এইখানেতেই গতর খাটাত। তবে জ্যাকেস সে রকম নয়। বড় সৎ, বড় বিশ্বাসী। ধর্মঘটের সময় কারো কথা শ্রমিকরা মানে না,—কেবল ওর কথা ছাড়া। কিন্তু আহা! বেচারি আর কতদিনই বা বাঁচবে!

—কেন? কী হয়েছে তার?

—সেই পোড়া ব্যায়রাম! বুকের দোষ। তবে, খনিতে যারা নামে, ও ব্যায়রাম তাদের মধ্যে হবে না কার?

একটু পরে জ্যাকেস ভার্নি এল। বেঁটে, আধকুঁজো চেহারার লোকটি, গভীর খোঁদলে-ঢোকা চোখে কেমন একটা বঞ্চনার আর হতাশার ছাপ। মাথা-জোড়া টাক। মোটা কালো ভুরু, আর কানের ধার আর নাকের ফুটো থেকে চুলের গুচ্ছ ঝুলছে। ভিনসেণ্ট একজন প্রচারক ও এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কাজ করতে এসেছে শুনে হতাশাব্যঞ্জক গলায় সে বললে,—আঃ মশিয়ে, কতো লোক আমাদের সাহায্য করতে চায়, কিন্তু আমাদের জীবন যেমন চলবার তেমনিই চলে।

ভিনসেণ্ট শুধোলে,—এখানকার জীবন-যাত্রার অবস্থা খুবই খারাপ, তাই কি?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জ্যাকেস বললে,—আমার অবশ্য তা নয়। মার কাছে ছেলেবেলায় কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিলাম, তাই ভাঙিয়ে ফোরম্যান পর্যন্ত হয়েছি। শহরে যাবার রাস্তায় ছোট একটা পাকা বাড়ি আমার আছে, খাবার ভাবনাও নেই। নিজের ভাগ্য নিয়ে কোনো দুঃখ আমার নেই।

হঠাৎ কথা বন্ধ করতে বাধ্য হোলো কাশির ধমকে। ভিনসেণ্টের মনে হোলো লোকটার জীর্ণ বুক এবার বুঝি ফেটে যাবে। সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় বার হয়ে থুথু ফেলে রান্নাঘরে এসে জ্যাকেস বসল।

শুরু করল সে,—ব্যাপারটা বলি মশিয়ে। ফোরম্যান যখন হলাম তখন আমার বয়েস প্রায় তিরিশে গিয়ে ঠেকেছে। বুকটা তার আগেই যা খারাপ হবার হয়ে গিয়েছিল। তবে কিনা এ ছাড়া আমার ভাগ্য ভালোই। খনির শ্রমিকদের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন....

মাদাম ডেনিসের দিকে ফিরে জ্যাকেস বললে,—কী বলো? হেনরি ডিক্রুকের কাছে নিয়ে যাব নাকি এঁকে?

—যান না নিয়ে। যা সত্যি, তা তো এঁকে জানতেই হবে।

একটু বিব্রত দৃষ্টিতে জ্যাকেস ফিরে তাকালো ভিনসেণ্টের দিকে, বললে,—যাই বলুন মশিয়ে, ওরা যখন আমাকে ফোরম্যান করেছে, তখন ওদের প্রতি কিছুটা আনুগত্য আমার আছে বৈকি। তবে কিনা, হেনরি—হ্যাঁ, সে-ই

আপনাকে সবকিছু দেখাবে।

রাতের কনকনে ঠাণ্ডায় জ্যাকেসের পেছনে পেছনে রাস্তায় বার হয়ে ভিনসেণ্ট চলল কুলিবস্তির দিকে। সারা খাড়াইটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই বস্তি। এক-একটি পরিবারের এক-একখানা করে কাঠের খুপরি। কোনো পরিকল্পনা নেই, যেমন-তেমন করে খুপরিগুলো গজিয়েছে,—তাই তাদের ঘিরে কতো যে গলিঘুঁজি তার ইয়ত্তা নেই। আর মোড়ে মোড়ে জড়ো করা জঞ্জাল। অন্ধকারে কখনো ঠোক্কর খেতে হয় গুঁড়িতে, কখনো বা পা ডুবে যায় আবর্জনার স্তূপে। শেষ পর্যন্ত ডিক্রুকের ঘরের সামনে পেঁাছে দরজায় ধাক্কা দিল জ্যাকেস।

দরজার একটা পাল্লা খুলে আগন্তুকদের দেখে নিয়ে তারপর দ্বিতীয় পাল্লাটি খুলে তাদের ভেতরে ডাকল ডিক্রুকের স্ত্রী। বিয়ের আগে অনেক বছর ধরে মেয়েটি ডিক্রুকের মতো এই খনিতেই নেমেছে, ঝুড়ি ধরেছে, লাইনে পাতা কয়লা-গাড়িগুলোকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়, কিন্তু রসকসের আভাস নেই শরীরে।

বস্তির অন্যান্য ঘরের মতনই ডিক্রুকের ঘর। মাটির মেঝে, কাঠের তক্তার ফাঁকে ফাঁকে কনকনে হাওয়াকে আটকাবার জন্যে দেয়ালে ছেঁড়া-ছেঁড়া বস্তা ঝোলানো। ঘরের পেছন দিকের দুই কোণে দুটো বিছানা, একটাতে তিনটি বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। মোটা তক্তার একটা টেবিল, দুধারে দুটো বেঞ্চি, এক কোণে নড়বড়ে চেয়ার,—দেয়ালে পেরেক দিয়ে আঁটা একটা খোলা বাক্সে কয়েকটা বাসনপত্র। এক কোণে একটা উনুন। বরিনেজের অনেকেই গৃহপালিত পশু পোষে। ডিক্রুকেরও আছে একটা ছাগল আর কয়েকটা খরগোস। ছাগলটা বাচ্চাদের চৌকিতে গিয়ে ঘুমোয়, খরগোসগুলো শুয়ে থাকে উনুনের ধার ঘেঁষে।

ডিক্রুক চেয়ারটায় বসে ছিল। লাফিয়ে উঠে বললে,—আরে জ্যাকেস, এসো এসো। কতোদিন পরে তোমার পায়ের ধুলো পড়ল, অ্যাঁ?—ইনি? তোমার বন্ধু নাকি? আরে আসুন আসুন স্যার!

ডিক্রুকের মস্ত বড়াই, খনি তাকে মারতে পারেনি, পারবেও না কখনো। তার মাথার ডানদিকে ঝাঁকড়া চুলের ফাঁকে মস্ত একটা চৌকো ক্ষতচিহ্ন চক-চক করছে। ঐটে তার জয়টীকা। একবার ক্রেনের দড়ি ছিঁড়ে একটা খাঁচা সোজা নেমে যায় একশো মিটার নিচে খনির গহ্বরে। উনত্রিশটি লোক মরেছিল। একজন কেবল মরেনি,—সেই একজন সে। একটা পা টেনে টেনে সে হাঁটে। কয়লা-খাদের খুপরির কাঠের খুঁটি একবার ভেঙে পড়ে, কয়লার চাঙড় ধসে পড়ে তার পায়ের সামনের হাড়টা চারটুকরো হয়ে যায়। পাঁচদিন সে আটক থাকে খুপরির মধ্যে। তার মোটা ময়লা শার্টটার ডানদিকটা ফুলে থাকে সর্বদা। বুকের অংশটা এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু নিচু। সেখানে চামড়ার তলায়

গুঁড়িয়ে আছে তিনটে পাঁজরা। একবার একটা বিস্ফোরণে সে ছিটকে পড়ে একটা কয়লা-গাড়ির ওপর—তারই ফল। এত মারেও সে মরেনি,—জড়িয়ে সে, জঙ্গী তার মেজাজ। মালিকদের বিরুদ্ধে সবচাইতে চড়া গলায় সে কথা বলে, তাই খনির সবচেয়ে বিপজ্জনক গলি-ঘুঁজিতে তার ডিউটি পড়ে। কষ্টে সে ডরায় না, ওরা যতো ভয় তাকে দেখায়, ওদের বিরুদ্ধে তার রাগ ততোই তেতে তেতে ওঠে। ওরা—যারা দুটি-দুটি খেতে দেয় আর রক্ত নিংড়ে নেয়, ঐ অ-ধরা আততায়ীর দল।

ডিক্রুক বললে,—মশিয়েঁ ভ্যান গক্, আপনি ঠিক আসল জায়গাটিতেই এসেছেন। এখানে এই বরিনেজের মেয়ে পুরুষ কুলি কামিন আমরা,—আমরা ক্রীতদাসও নই। কেননা আমরা মানুষই নই, স্রেফ জানোয়ার। শেষ রাত্তিরে তিনটের সময় আমরা খনির খোদলে নামি, মাটির ওপর আবার উঠে আসি বিকেল চারটেয়। এগারো ঘণ্টা খাটুনির মাঝখানে দুপুরে মাত্র পনেরো মিনিট খাবার ছুটি। ভেতরটা কেমন আপনি জানেন না—রাত্তিরের মতো কালো আর চুল্লির মতো গরম। ন্যাংটো হয়ে আমরা কাজ করি,—যেটুকু বাতাস মেলে তাতে কয়লা-গুঁড়ো আর বিষ ভর্তি—দম বন্ধ হয়ে আসে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে ভুলে গেছি—সারাদিন সুড়ঙ্গের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে কাটে—দাঁড়াবার তো জায়গা নেই সেখানে। আট বছর বয়স থেকে এখানকার ছেলেমেয়েরা খাদে নামতে শুরু করে। কুড়ি বছর পেরোতে না পেরোতেই বুকের দোষ জন্মে যায়, পরমায়ু বছর-চল্লিশ পর্যন্ত। অ্যাদ্দিনে যক্ষ্মায় বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়—অবিশ্যি তার মধ্যে অপঘাতে মরলে তো আপদ বিদায়। বলো, ঠিক বলছিনে ভার্নি?

—ঠিক ডিক্রুক।

ডিক্রুকের স্ত্রী দূরে বিছানার কোণে আধো-অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিল। স্বামীর এমনি উত্তেজিত কণ্ঠস্বর সে আরো হাজার বার শুনেছে। তার কিছুই হয় না এতে। এমনি চুপ করে এক কোণে মিশে থাকাই তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। যৌবনারম্ভ পর্যন্ত সে কয়লা-গাড়ি ঠেলেছে, তারপর তিনটি সন্তান আর বছরের পর বছর ছেঁড়া চটের ফাঁকে ফাঁকে হাড়-কাঁপানো শীতের আক্রমণ —এতদিনে তার সব রক্ত জমে ঠাণ্ডা।

ভাঙা পা-টাকে একধারে সরিয়ে ডিক্রুক আবার বলতে শুরু করল,—আর এর বদলে আমরা কী পাই জানেন মশিয়েঁ? এই এক-ঘরের একটা খুপরি, আর গাঁইতি মারার মতো শক্তিটুকু যাতে থাকে তার উপযুক্ত একমুঠো খাবার। পোড়া রুটি, কালো কফি, পচা পনির। এক টুকরো মাংস হয়ত সারা বছরে একবার কি দু-বার। মাইনে থেকে পঞ্চাশটা আধলা যদি কেটে নেয় তাহলে শুকিয়ে মরব, কয়লা তোলা আর হবে না। সেইজন্যেই ওটুকু আর ওরা কাটে না। তাই অনাহারের ঠিক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে

সারা জীবন কাটে। যে মরে সে মরে কুকুরের মতো,—তার বৌ ছেলে হাত পেতে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। আট বছর থেকে চল্লিশ—এই বত্রিশটা বছর পরে ভবযন্ত্রণা ঘোচে—তখন ঐ পাহাড়ের কোণায় গর্তের মধ্যে দেহটার সঙ্গে সঙ্গে সব দুঃখ মাটি-চাপা পড়ে।

৭

এ এক নতুন শিক্ষা শুরু হোলো ভিনসেণ্টের। কয়লা-খনির জাত-শ্রমিক;—এরা অশিক্ষিত—অনেকেই একেবারে নিরক্ষর। কিন্তু মূর্খ নয়। বুদ্ধি আছে, বোধ আছে, বিবেচনা আছে। এরা যে কাজ করে তা মূর্খে পারে না—সাফ মগজ না থাকলে অসম্ভব। এদের জীবনযাত্রা জন্তুর, কিন্তু জন্তু এরা নয়,—প্রাণ আছে, মমতা আছে,—আর এখনো বেশ কিছু অবশিষ্ট আছে আত্মসম্ভ্রম বোধ। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে, রোগে জীর্ণ-শীর্ণ এদের শরীর,—অসহায় শ্লথ গতি। গায়ের পাণ্ডুর চামড়ার রোমকূপে হাজার হাজার কালো কালো ফোঁটা। ঘা খাওয়াই যার ভাগ্য,—ঘা মারা নয়, সেই হতাশ বঞ্চিতের ব্যর্থ করুণ দৃষ্টি এদের চোখে।

ভিনসেণ্টের ভালো লাগে এদের। এরা সরল, সৎ, জুণ্ডেয়ার্ট আর ইটেনের লোকদের মতো নম্র ভদ্র এদের স্বভাব। বরিনেজের মাঠ-ঘাটের নির্জন মরু-রূপও ভালো লাগতে শুরু করেছে—কেননা এ রূপের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দিনে দিনে পরিচিত হচ্ছে সে।

কয়েকদিন পরে ভিনসেণ্ট তার প্রথম প্রার্থনা-সভা ডাকার স্থির করল। ডেনিসদের রুটি-ঘরের পেছনে একটা খালি শেড পড়ে ছিল। সেটা সে ভালো করে পরিষ্কার করে নিলে, বেঞ্চিও জোগাড় হোলো কয়েকটা। দিনের শেষে শ্রমিকরা এল স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে, যার যা শীতবস্ত্র সম্বল তা গায়ে চাপিয়ে। দু-বগলের নিচে ঠাণ্ডা হাতদুটোকে পুরে দিয়ে স্থির হয়ে শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে তারা বসল, মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল তাদের নতুন পাদ্রিকে। বাইরে শীত, সারা ঘর জুড়ে ছায়া-ছায়া অন্ধকার,—এক কোণে ধার-করে-আনা একটিমাত্র কেরোসিনের পুরোনো লণ্ঠন।

বাইবেলের পাতা ওল্টাতে লাগল ভিনসেণ্ট। কোন্ অনুচ্ছেদটি সে বেছে নেবে প্রথম দিনের এই সভায়? শেষ পর্যন্ত সে পড়ল ষোড়শ অ্যাক্টের নবম অনুচ্ছেদটি:

'অতঃপর রাত্রিকালে পলের এক স্বপ্নদর্শন হইল। তাঁহার সম্মুখে একজন মাসিডোনিয়া-বাসী দাঁড়াইয়া আছে ও বলিতেছে—আপনি মাসিডোনিয়াতে আসুন, আমাদের সাহায্য করুন।'

ভিনসেণ্ট বললে,—বন্ধুগণ, এই যে মাসিডোনিয়ার অধিবাসী, এ কে? এ একজন শ্রমিক—মুখে তার দুঃখ দৈন্য ক্লান্তির বলিরেখা। তবু সে-মুখে জ্যোতি

আছে, ভাতি আছে—কেননা সে তো সামান্য নয়—মৃত্যুঞ্জয় আত্মার সেও অধিকারী। পরম পিতা তাঁর সন্তান খ্রীস্টকে পাঠিয়েছিলেন কেন? মানুষ যাতে এই সন্তানকে অনুসরণ করে সেইজন্যে। নির্লোভ নিষ্কাম সহজ জীবন, দীনতমের সঙ্গে সহযোগ—এই তো খ্রীস্টানুসরণ। খ্রীস্টের এই বাণী, আমাদের ধর্মপুস্তকের এই শিক্ষা: বিনত হও, প্রণত হও, তবেই সেই নির্দিষ্ট দিনে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে, আত্মা অক্ষয় শান্তি লাভ করবে।

শুরু হোলো নব জীবন।

সারা গ্রামে রোগীর অভাব নেই। প্রতিদিন সকালে ভিনসেণ্ট বাড়ি থেকে বার হয়, রোগীদের বাড়ি বাড়ি ঘোরে। যাকে যখন যা পারে তাই বিলোয়। কাউকে রুটি কাউকে একটু দুধ, কাউকে একটি চাদর বা একজোড়া মোজা। ডাক্তার সে নয়, চিকিৎসা বিলোতে সে জানে না, বিলিয়ে বেড়ায় সেবা। গ্রামে আসে টাইফয়েড, ঘরে-ঘরে বিকারগ্রস্ত রোগী—বেকার শ্রমিক পরিবারে অধিকতর দারিদ্র্য—ভিনসেণ্টের কাজ বাড়ে। সারা গ্রামে এমন একটি বাড়ি নেই যেখানে সে যায়নি। হয় খাবার নিয়ে, না হয় সেবা নিয়ে, না হয় প্রার্থনা নিয়ে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তার পরিচয়।

বড়দিন এসে গেছে। মার্কাস খনির কাছে সে আবিষ্কার করল পরিত্যক্ত একটা আস্তাবল। বেশ বড়ো ঘরটা, একশো জনের বেশি লোক আঁটবে। ঘরটা পাথরের মতো ঠাণ্ডা, আসবাব নেই একটিও। তবু প্রার্থনার দিন সন্ধেবেলা সারা ঘরে তিলধারণের ঠাঁই রইল না। স্তব্ধ হয়ে শ্রমিকরা শুনতে লাগল যিশুখ্রীস্টের জন্মকাহিনী, বেথেলহেমের আকাশে নতুন তারার উদয়বার্তা। মাত্র ছ-সপ্তাহ ভিনসেণ্ট বরিনেজে এসেছে। এরই মধ্যে লক্ষ করেছে সে, দিনে দিনে শ্রমিকদের অবস্থা চূড়ান্ত খারাপের পথে এগিয়ে চলেছে। তার কাজ তবু সে করুক। খ্রীস্টের এই পুণ্য জন্মদিনে এই আশাহারা ব্যর্থকাম মানুষদের শূন্য প্রাণে চরম আশার বাণী ধ্বনিত হোক, পরম শান্তির স্বপ্ন জাগরিত হোক।

একটা দুঃখ এখনো তার রয়েছে। এখনো সে বেকার, বাবার মুখাপেক্ষী। এটা খচ্-খচ্ করে সর্বদা। রোজ রাত্রে সে প্রার্থনা করে—সে দিনটা শীঘ্র আসুক যেদিন থেকে তার এই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সামান্য চাহিদাগুলির দাম নিজেই সে মেটাতে পারবে।

নববর্ষের দিনে পীটারসেনের চিঠি এল:

প্রিয় ভিনসেণ্ট,

সুসমাচার প্রচারণী কমিটি তোমার চমৎকার কাজের সংবাদে খুশি হয়েছেন। এ বছরের প্রথম থেকে অস্থায়ীভাবে ছ-মাসের জন্যে তোমাকে বহাল করা হোলো। জুন মাসের শেষ পর্যন্ত তোমার কাজে যদি কোনো খুঁত পাওয়া না যায়, তাহলে এই নিয়োগ পাকা হবে। বর্তমানে মাসে পঞ্চাশ ফ্রাংক করে

তুমি পাবে।

যখনই সুবিধে পাবে আমাকে চিঠি লিখবে। আশীর্বাদ করি তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

পীটারসেন

আনন্দে দুহাত মুঠো করে লাফিয়ে উঠল ভিনসেন্ট। কবার গড়াগড়ি দিয়ে নিল বিছানায়। এতদিনে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, সে সফল হয়েছে,—হয়েছে স্বাধীন! পঞ্চাশ ফ্র্যাংক! কম নাকি? দরকারের চেয়ে অনেক বেশি! আদর্শ তার সামনে, জীবনের পথ তার সামনে,—আর তাকে কে রোখে?

তাড়াতাড়ি টেবিলে গিয়ে সে বাবাকে চিঠি লিখতে বসল। লম্বা চিঠি—আর ভাবনা নেই, আর সে পয়সার জন্যে হাত পাতবে না। আর তার লজ্জা নেই—আর তার জন্যে কাউকে লজ্জা পেতে হবে না। এতদিন সে ছিল পরিবারের মধ্যে অপাঙ্‌ক্তেয়,—এখন থেকে তার হয়ে ভালো কথা দুটো কাউকে না কাউকে বলতে হবে বৈকি!

উৎসাহভরা, অভিমানভরা চিঠি। লেখা যখন শেষ হোলো তখন দিনান্ত পড়ে এসেছে। আকাশ জুড়ে বজ্র-বিদ্যুৎ, মেঘ আর বৃষ্টি। সিঁড়ি দিয়ে তর্‌-তর্‌ করে ছুটে বেরিয়ে গেল ভিনসেন্ট,—দুর্যোগের বাধা না মেনে।

ভিনসেন্ট এখন রীতিমতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রচারক। তার কাজের জন্যে স্থায়ী একটা গৃহ এখন দরকার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে গ্রামের প্রান্তে পাইনবনের ধারে একটা ছোট খালি বাড়ি আবিষ্কার করল। এখানে এক সময়ে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নাচ গান সেখানো হত। সেসব অনেক দিন বন্ধ, পোড়ো বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে। এবার এটি হোলো তার নতুন উপাসনা-গৃহ। তার সমস্ত ছবির প্রিন্টগুলো দেয়ালে এঁটে এঁটে সে ঘরটাকে সুদৃশ্য করে তুলল। ঠিক করল এখানে একটা শিশু-বিদ্যালয়ও সে বসাবে। চার থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েরা তার অবৈতনিক ছাত্র। লিখতে পড়তে শিখবে, বাইবেলের গল্প শুনবে। শ্রমিকের সন্তানের পক্ষে এটুকু শিক্ষাই তো সব—আট বছর পার হলেই তো খাদে নামতে হবে।

বাড়িটা জোগাড়ের ব্যাপারে জ্যাকেস ভার্নি তাকে অনেক সাহায্য করেছিল। ভিনসেন্ট তাকে বললে,—আগুন জ্বালবার কয়লা পাই কোথায়? সন্ধেবেলা বাচ্চারা সে শীতে ঠক-ঠক করে কাঁপবে।

জ্যাকেস একটু ভেবে বললে,—আচ্ছা, কাল দুপুরে এখানে আসবেন, দেখা যাবে।

পরদিন ভিনসেন্ট যখন এই স্কুলবাড়িতে পেঁছিল, দেখে, শ্রমিকদের একগাদা মেয়ে-বউয়ের জটলা। সবাইয়ের পরনে কালো পোশাক, মাথার চুল ঢাকা নীল, কালো, রঙিন কাপড় জড়ানো। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে বস্তা।

ভার্নি'র মেয়ে এদের লীডার। বললে,—দেখছেন কী মশিয়েঁ ভিনসেন্ট, এই

নিন, আপনার জন্যেও একটা বস্তা এনেছি। আপনাকেও কয়লা বয়ে আনতে হবে আমাদের সঙ্গে।

আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে এগোতে এগোতে গ্রাম পার হয়ে মার্কাস খনি পেছনে ফেলে তারা পেঁছোলো সেই কালো পিরামিডটার গায়ে। তারপর সার-সার পিঁপড়ের মতো উঠতে লাগল পিরামিডের গা বেয়ে।

ভার্নি'র মেয়ে বললে,—এখানে কিন্তু কয়লা নেই মশিয়েঁ ভিনসেণ্ট। কবে লোকে ঝাঁটিয়ে নিয়ে গেছে। কয়লা চান তো উঠতে হবে একেবারে মাথায়। আসুন আমার সঙ্গে।

কিশোরীটির পেছনে পেছনে প্রায় হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে ঢালু বেয়ে উঠতে লাগল ভিনসেণ্ট। পায়ের চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো কয়লার ধুলো ঝরে পড়তে লাগল,—পদে পদে ভয় করে, পিছলে পড়ে আর-কি! অনেকটা এগিয়ে যায় মেয়েটি। উবু হয়ে বসে পেছন ফিরে ভিনসেণ্টের গায়ে ধুলোর চাবড়া ছুড়ে মারে,—ঠাট্টা করে বলে,—আসুন না, নইলে একেবারে সকলের পেছনে পড়ে যাবেন যে!

এই কয়লা-ধুলোর পাহাড় খুঁড়ে কয়লা খুঁজে বার করা সোজা কাজ নয়। মেয়েটি ভিনসেণ্টকে দেখিয়ে দিতে লাগল কেমন করে স্যাঁতসেঁতে চাবড়া খুঁড়ে খুঁড়ে আঙুলের ফাঁকে গুঁড়িয়ে ঝরিয়ে ফেলতে হয়, তার মধ্য থেকে কয়লার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ কেমন করে হাতের মুঠোয় ধরা পড়ে। তুষার জমে জমে মাটিটা শক্ত হয়ে আছে, সেগুলো খুঁড়ে তুলে আঙুল দিয়ে গুঁড়োতে গুঁড়োতে ভিনসেণ্টের হাত কেটে-কুটে গেল, লাল হয়ে ফুলে উঠল আঙুল। মেয়েরা যতক্ষণে বস্তা প্রায় ভরে ফেললে, ততক্ষণে তার বস্তার সিকিটুকুও ভর্তি হোলো না।

প্রত্যেকটি মেয়ে নিজের নিজের বস্তা স্কুলবাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে বাড়ি দৌড়ল। বিকেলের রান্নাবান্না এবার গিয়ে করতে হবে। সবাই প্রতিশ্রুতি দিলে সন্ধেবেলা স্বামীদের নিয়ে আসবে প্রার্থনায় যোগ দিতে। ভার্নি'র মেয়ে ভিনসেণ্টকে তাদের বাড়িতে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলে। খুশিমনে ভিনসেণ্ট তার সে নিমন্ত্রণ নিল।

ভার্নি'র বাড়িতে দুটি ঘর। একটি ঘর রান্নার, খাবার, বসার,—অপরটি শোবার। রাস্তার ধারে এক-গামলা জল নিয়ে সে হাত মুখ ধুলো। ভার্নি'র অবস্থা স্বচ্ছল হলেও তার বাড়িতেও সাবান পাওয়া অকল্পনীয়। যেদিন থেকে খনির কাজে বরেন-রা লাগে সেদিন থেকেই মুখে তাদের কালির দাগ। সারা জীবনে এ দাগ একেবারে মোছে না—মোছবার কথা কেউ চিন্তাও করে না!

জ্যাকেস বললে,—যাই বলুন মশিয়েঁ ভিনসেণ্ট—ছ-মাস হয়ে গেল আপনি এখানে আছেন, কিন্তু আসল বরিনেজের সঙ্গে আপনার পরিচয়ই

এখনো হয় নি।

ভিনসেণ্ট বললে,—তা সত্যি। তবে আস্তে আস্তে হয়ত পরিচয় জমছে।

—তা বলি নি। আমি কী বলছিলাম জানেন? আপনি শুধু আমাদের মাটির ওপরকার জীবনটাকেই দেখেছেন। মাটির ওপরে আমরা উঠি শুধু তো' ঘুমোবার জন্যে। আমাদের আসল জীবনের পরিচয় পেতে চান তো আমাদের সঙ্গে একদিন খনির মধ্যে নামুন, যেখানে আমাদের সারাদিনের কাজ।

—আমি তো উৎসুক, ভিনসেণ্ট বললে,—কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতি পাব কি?

ঠোঁটের ফাঁকে একটু চিনি নিয়ে কেটলিটা তুলে হাঁয়ের মধ্যে খানিকটা কফি ঢেলে নিয়ে জ্যাকেস উত্তর দিলে,—সে জন্যে আপনার ভাবনা নেই। কালকে আমি পরিদর্শনের জন্যে মার্কাসে নামব। আপনি ভোর পোনে তিনটে নাগাদ ডেনিসদের বাড়ির বোড়.গাড়ায় অপেক্ষা করবেন,—আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

জ্যাকেসের সমস্ত পরিবার ভিনসেণ্টের সঙ্গে উপাসনায় যাবার জন্যে পথে বার হোলো। বাড়ির গরম আবহাওয়ায় জ্যাকেস বেশ ছিল, এখন ক-পা যেতে না যেতেই এমন একটা সাংঘাতিক কাশির ধমক এল যে আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে কিছুটা বিশ্রাম না নিয়ে তার উপায় রইল না।

হেনরি ডিক্রুক তাদের অনেক আগেই পেঁাছে গেছে। মনোযোগ সহকারে অগ্নিকুণ্ডটা সে খোঁচাচ্ছে। খোঁড়া পা-টা টেনে টেনে দরজার কাছে এসে একগাল হেসে সে বললে,—এই যে গ্রাম উনুনটি দেখছেন, এটি আমি ছাড়া আর কেউ জ্বালাতে পারে না। অনেক কায়দা লাগে এটাকে জ্বালাতে।

গনগনে হয়ে আগুন জ্বলল, সারা ঘরে জ্বলল মধুর উত্তাপ। গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার দলে-দলে এসে জুটল এই নতুন গির্জায় ভিনসেণ্টের প্রথম ধর্মভাষণ শোনবার জন্যে। বেঞ্চি, চেয়ার, কাঠের বাক্স—সব এল। প্রায় তিনশো লোক—সারা হলঘরটা ভর্তি। ভিনসেণ্টের বুক ভরে উঠল আশ্বাসে, কৃতজ্ঞতায়। এই পুরোনো ভাঙা নিরাভরণ গৃহ—এই তার গির্জা। এইসব কালিমাখা পাণ্ডুর মুখ—এরাই তার আপন জন।

ভিনসেণ্ট বললে,—প্রবাদ আছে—উত্তম প্রবাদ—যে এই পৃথিবীতে আমরা পরবাসী। প্রবাসী পথিক, তবু একাকী নয়, কেননা আমাদের পিতা সুদীর্ঘ কাল রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আমরা তীর্থযাত্রী—মর্ত্য থেকে স্বর্গ, জীবনের তীর্থপথ।

....আনন্দের চেয়ে দুঃখ মহৎ;—এমনকি কৌতুকের মধ্যেও বেদনা লুকিয়ে থাকে। তীর্থপথিক বিশ্রামের জন্যে যাবে কোন্ ঘরে—যে ঘরে হাসি, না যে ঘরে কান্না? দ্বিতীয় ঘরেই সে যেন যায়,—কেননা অশ্রুজলেই মলিন হৃদয় পবিত্র হয়।

...দুঃখ কিন্তু অবিমিশ্র নয়। যিশুতে যে বিশ্বাসী, তার দুঃখ আশার আভাতে উজ্জ্বল। দুঃখের পর সুখ যেন নব নব জন্ম—অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে নব-নব পথে যাত্রা।

—হে পিতা, তোমার কাছে প্রার্থনা করি, অমঙ্গল থেকে আমাদের দূরে রাখো। দারিদ্র্য দিয়ো না, বিত্ত হতেও বঞ্চিত রাখো; যা প্রয়োজন সেই ক্ষুধার খাদ্য দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করো।

...আমেন।

প্রার্থনার পর সবার আগে তার পাশে এসে দাঁড়ালো ডিক্রুকের স্ত্রী। চোখের কোণে অশ্রু, কম্পিত ওষ্ঠপুট। বললে,—মশিয়েঁ, জীবনে এত কষ্ট পেয়েছি যে ঈশ্বরকে ভুলে গিয়েছিলাম। আবার তাঁকে বুকের মধ্যে ফিরে পেলাম। আপনারই দয়ায়।

একে-একে সবাই চলে গেল। উপাসনা-গৃহের দরজায় তালা বন্ধ করে ভিনসেন্ট ভাবতে ভাবতে চলল ডেনিসদের বাড়ির দিকে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আজ রাতে যতো সাধুবাদ সে শুনেছে তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই যে এদের সকলের আস্থা সে পেয়ে গিয়েছে। এইসব কালিমুখ দরিদ্র মানুষ সত্যিই তাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে গ্রহণ করেছে। কী করে এতটা সম্ভব হোলো? উপাসনার জন্যে নতুন বাড়ি হয়েছে বলে? নতুন বাড়ি আর পুরোনো বাড়িতে শ্রমিকদের কী এসে যায়? সে প্রচারকের পাকাপাকি নিয়োগপত্র পেয়েছে বলে? না, এ কথা সে তো কাউকে জানায় নি! নিয়োগপত্র যে তার এতদিন ছিল না তাও তো কেউ জানত না। আজকের ধর্মবাণী খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছে বলে? তাই বা কী করে হয়? এর চাইতে অনেক ভালো কথা আরো অনেক ভালো করে আগেও তো সে এদের বলেছে আগেকার আস্তাবলের উপাসনা-সভায়।

ডেনিসরা ঘুমিয়ে পড়েছে। রান্নাঘরের পাশের ইঁদারা থেকে বালতি করে জল তুলে একটা গামলা-ভর্তি জল নিয়ে সে তার ঘরে গেল। দেয়ালের ধারে আরশিটা দাঁড় করিয়ে সাবান নিয়ে সে হাত মুখ ধুতে বসল। আরশিতে দেখে, তার মুখ-ভর্তি কালি। ভার্নির বাড়িতে মুখ ধুলেও মুখের কালি সম্পূর্ণ ওঠেনি। পুরু হয়ে জমে আছে চোখের পাতায়, নাকের পাশে, চিবুকের তলায়। কী কাণ্ড! এমনি মুখ নিয়ে সে ধর্মবক্তৃতা দিচ্ছিল? এ মুখ যদি তার বাবা দেখত বা রেভারেণ্ড পিটারসেন!

দুহাতে সাবানের ফেনা ঘষে নিয়ে মুখে লাগাতে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। আবার তাকাল আরশিটার দিকে। হঠাৎ সে বুঝতে পারল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে অস্ফুট গলায় সে বললে,—বুঝেছি, কেন ওরা আজ আমাকে ওদের আপন করে নিয়েছে। আমি যে আজ ওদেরই সমান হয়েছি, ওদেরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি।

রাত আড়াইটে নাগাদ ভিনসেণ্ট ঘুম থেকে উঠল। ডেনিসদের রান্নাঘর থেকে একটুকরো রুটি চিবিয়ে নিয়ে ঠিক পৌনে তিনটের সময় দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জ্যাকেসও এসে পেঁছিল ঠিক সময়েই। রাত্রে ভয়ানক তুষারপাত হয়ে গেছে, মার্কাস যাবার রাস্তাটা একেবারে ঢেকে গেছে বরফে। বরফের ওপর দিয়ে এধার ওধার থেকে তাদেরই মতো আরো অনেক লোক ছুটে ছুটে আসছে, চলেছে খনির দিকে। ঠাণ্ডায় তাদের শরীর বেঁকে গেছে, পাতলা কোটের ফাঁকে মুখের থুতনি পর্যন্ত ঢেকে কুঁজো হয়ে চলেছে কালো কালো মানুষগুলো।

খনির কারখানায় প্রথম যে ঘরটায় তারা ঢুকল তার দেয়ালে দেয়ালে কেরাসিনের আলো ঝোলানো। প্রত্যেকটি আলোর নিচে দেয়ালে এক-একটি সংখ্যা লেখা। শ্রমিকরা ঘরে ঢুকেই এক-একটি করে আলো হাতে নিচ্ছে। জ্যাকেস বললে,—যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তখন কোন্ কোন্ নম্বরের আলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দেখেই আমরা ধরতে পারি, কোন্ কোন্ লোক খনির মধ্যে আটকা পড়ে আছে।

শ্রমিকদের পেছনে পেছনে তুষার-ছাওয়া উঠোন পার হয়ে দুজনে ঢুকল একটা চৌকো পাকা বাড়ির মধ্যে। সেখানে ক্রেন ঘুরছে, খাঁচায় করে লোক নামছে খনির মধ্যে। খাঁচাটার ছটা ভাগ, একের নিচে আরেকটা করে। প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে কয়লা-গাড়ি বসানো যায়। প্রত্যেকটায় দুজন করে মানুষ ভালোভাবে বসতে পারে, কিন্তু আসলে পাঁচজন করে গাদাগাদি। যেন তারা কয়লারই বস্তা।

ফোরম্যান বলে জ্যাকেসের কামরাটায় ভিড় বেশি হোলো না। সে, তার একজন সহকারী আর ভিনসেণ্ট। উঁচু হয়ে তারা বসল, মাথা ঠেকতে লাগল লোহার জালের ছাদে।

জ্যাকেস সাবধান করে দিলে,—হাতদুটো সামনের দিকে রাখুন মশিয়ে ভিনসেণ্ট। যদি একবার পাশের দেয়ালে লাগে তাহলে হাত আর খুঁজে পাবেন না।

সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে খাঁচা নামতে লাগল অন্ধকার গহ্বরে। অনভ্যস্ত ভিনসেণ্টের বুক শুকিয়ে এল ভয়ে। একটু দুর্ঘটনা যদি ঘটে তাহলে নির্ঘাত পাতাল-সমাধি। চারদিকে মিশকালো অন্ধকার, তার মধ্যে শুধু মিটমিট করে জ্বলছে হাতের লণ্ঠনগুলো।

জ্যাকেস বললে,—ভয় করছে? এতে লজ্জার কিছু নেই। কয়লাখনির প্রত্যেকটি লোকেরই এমনি ভয় করে।

ভিনসেণ্ট বললে,—আপনাদের তবু অভ্যেস আছে তো।

—অভ্যেস ? জ্যাকেস উত্তর দিলে,—অভ্যেসে কী করে ? খাঁচা ভেঙে পড়ে মরবার ভয় অভ্যেসে ঘোচে না। এ ভয় মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমাদের প্রতিদিনের নিত্য-সাথী। গত তেত্রিশ বছর ধরে আমি এমন খনিতে নামছি। আমারও বুক কাঁপছে ঠিক আপনারই মতো।

খনিকূপের ঠিক আধাআধি পৌঁছোনো যায় তিনশো পঞ্চাশ মিটার নামলে। অতদূর নেমে খাঁচাটা একটু থামল, তারপর আবার নামতে শুরু করল। ভিনসেণ্ট দেখল, চারপাশের ঝাপসা দেয়াল দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। ওপরদিকে তাকিয়ে দেখল ছোট্ট গোল একটা তারার মতো দেখাচ্ছে আকাশটা। আবার তার বুক কেঁপে উঠল। ছশো পঞ্চাশ মিটার নামবার পর খাঁচাটা আবার থামল। তারা তিনজন কামরা থেকে বার হবার পর অন্য শ্রমিকদের নিয়ে খাঁচাটা আরও গভীরে নেমে গেল। ভিনসেণ্ট দেখল তার চারপাশে অনেকগুলো চওড়া চওড়া সুড়ঙ্গ। জায়গাটা বেশ শীতল।

সে বললে,—মশিয়ে ভার্নি, খুব কষ্টকর বলে তো জায়গাটা মনে হচ্ছে না।

ভার্নি হেসে উত্তর দিলে,—ঠিক বলেছেন। এখানে কিন্তু কেউ কাজ করছে না। এই স্তরের সব কয়লা উঠে গেছে। এখানে হাওয়াও পাচ্ছেন মন্দ নয় ;—কিন্তু যেখানে আসল কাজ হচ্ছে সেখানে চলুন, তখন বুঝবেন।

সুড়ঙ্গ বেয়ে প্রায় সিকি মাইলটাক হাঁটবার পর ভার্নি বললে,—আসুন মশিয়ে ভিনসেণ্ট। কিন্তু খুব সাবধান, পা যদি ফস্কান,—দুজনেই মরব কিন্তু একসঙ্গে।

সামনে একটা অন্ধ গহ্বর,—যার মধ্যে কোনো রকমে একটা রোগা মানুষ খাড়া দাঁড়িয়ে ডুবতে পারে। গহ্বরটার গায়ে লাগানো দড়ির একটা সিঁড়ি। দেয়াল বেয়ে বেয়ে সমানে ঝির-ঝির করে জল গায়ে ঝরে পড়ছে। দড়ির পা-দানগুলো চটচটে শ্যাওলায় পিচ্ছিল। গহ্বর যেখানে শেষ হোলো সেখান থেকে আবার সুড়ঙ্গ। এ সুড়ঙ্গের মধ্যে মাথা উঁচু করে যাওয়া যায় না। মাটির কাছে নাক নামিয়ে ঘাড় গুঁজে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হোলো। এপাশে ওপাশে ছোট ছোট খুপরি। খুপরির ছাদগুলো কাঠের গোঁজ দিয়ে তুলে ধরা। প্রত্যেকটি খুপরিতে পাঁচজন করে শ্রমিক। দুজন কয়লা খুঁড়ছে গাঁইতি দিয়ে, একজন সেগুলো পেছন দিকে সরাচ্ছে, একজন কোদাল দিয়ে সেগুলো তুলছে ছোট-ছোট গাড়ির মধ্যে আর বাকি একজন গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে খুপরির বাইরে। দলে তিনজন ছেঁড়া মোটা কালো প্যাণ্ট পরা সমর্থ পুরুষ, একটি নেংটি-মাত্র পরা নগ্ন বালক, আর একজন মেয়ে।

গাড়ি ঠেলার কাজ মেয়েটার,—পুরুষদের পোশাকের সঙ্গে কোনো প্রভেদ নেই, তবে কিনা উর্ধ্বাঙ্গ-ঢাকা কালো মোটা একটা জামা।

খুপরির কাছ থেকে সর্বদা জল ঝরছে। নীরন্ধ্র কালো, আলো শুধু বাতি-কমানো নিবু-নিবু লণ্ঠনগুলির। বাতাস আসার কোনো পথ নেই

কোথাও, যেটুকু বাতাস খোপরে খোপরে জমা আছে, তার সঙ্গে জমাট বেঁধে আছে কয়লার কালো গুঁড়ো। অসহ্য গরম, শ্রমিকদের সারা শরীর ঘামে স্নান করা। ভিনসেণ্ট দেখল, প্রথম কটি খুপরিতে শ্রমিকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছে,—কিন্তু সুড়ঙ্গ দিয়ে যতো এগোয় খুপরিগুলোও ততই নিচু হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত মাটি আর ছাদের পার্থক্য ঘুচে যায়, শ্রমিকরা কাজ করে উপুড় হয়ে শুয়ে। গায়ে ফোস্কা পড়ার মতো গরম, ঘাম ঝরছে ঝর-ঝর করে—প্রতিটি দমের সঙ্গে নাক মুখ থেকে বার হচ্ছে কালো ধুলো,—প্রতিবারের কাশির সঙ্গে গলা থেকে নির্গত হচ্ছে তরল কালো ঝুল।

জ্যাকেস বললে,—এরা দিনে কতো করে পায় জানেন? আড়াই ফ্র্যাংক, তাও যদি ইন্‌স্‌পেক্টর এদের তোলা কয়লা পরীক্ষা করে ভালো বলে তবে। আগে আরো আধ ফ্র্যাংক বেশি পেত,—সম্প্রতি মজুরি কমেছে।

একটা খুপরির মধ্যে ঢুকে জ্যাকেস ছাদের সঙ্গে ঠেকানো কাঠের খুঁটিগুলো পরীক্ষা করে দেখল। শ্রমিকদের দিকে ফিরে সে বললে,—এ কাঠগুলো তো সব একেবারে পচে গেছে দেখছি। একটা যদি ভাঙে তো সারা ছাদটাই তো মাথার ওপর ভেঙে পড়বে। জ্যান্ত কবরে ঢোকার শখ হয়েছে নাকি তোমাদের?

গাঁইতি হাতে একটা শ্রমিক—এদের দলপতি—কুৎসিত ভাষায় সে গালাগাল দিয়ে উঠল। তারপর বললে,—কাঠগুলো বদলাবার পয়সা দেয় কোম্পানি? আর কাঠ বদলাতেই যদি সময় যায়, কয়লা তুলব কখন? এক গাড়ি কম উঠলে মজুরি কাটবে না? এদিকে ছাদ-চাপা পড়ে মরা আর ওদিকে না খেয়ে মরা, —এ আমাদের দুইই সমান।

শেষ খুপরিটার পরে মাটিতে অপর একটা গহ্বর। এর গায়ে একটা দড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত নেই। গহ্বরের দেয়ালের মাঝে মাঝে কেবল কয়েকটা কাঠের গোঁজ পোঁতা আছে। ভিনসেণ্টের হাতের লণ্ঠনটা নিয়ে জ্যাকেস সেটা তার কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিল। হাত বাড়িয়ে বললে,—আসুন এটার মধ্যে নামি। আমার পেছনে পেছনে নামুন। কিন্তু খবরদার, আমার মাথায় যেন পা ফেলবেন না। তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

এক-একটা গোঁজের ওপর পা ফেলে ফেলে দু-হাতে দেয়ালের পাথর চেপে ধরে ধরে ভিনসেণ্ট নামল খনির নিম্নতর স্তরে। এখানে কোনো খুপরির সাক্ষাৎও নেই। শুধু মাত্র অন্ধ সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের মধ্যে কোনো রকমে শরীরটা ঢুকিয়ে দেয়ালে ঘা মেরে মেরে কয়লা কেটে চলেছে শ্রমিকের দল। বাতাস এখানে পথ ভুলেছে, গরম এখানে শাণিত অস্ত্রের মতো। কালো কালো উলঙ্গ প্রেতমূর্তিরা অবিশ্রাম কাজ করে চলেছে,—চোখ তাদের ঠিকরে বার হয়ে আসছে, শুকনো জিভ হাঁ থেকে বার হয়ে রয়েছে, ঠোঁটের কোণে কোণে পাংশু রঙের গাঁজলা। বিশ্রাম নেই মুহূর্তের,—কয়লা যদি একগাড়ি কম ওঠে তাহলে বরবাদ হবে

মজুরি।

সুড়ঙ্গের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল দুজনে। এরই মধ্যে কয়লাগাড়ি চলেছে,—এক একটা গাড়ি যখন যায়, তখন তাকে রাস্তা দেবার জন্যে দেয়ালের ধারে পাশ ফিরে শুয়ে পড়তে হয়। গাড়িগুলো ঠেলছে অর্ধ-উলঙ্গ মেয়েরা—তাদের কারো বয়েস দশ বছরের বেশি নয়। শীর্ণ কালো কালো টিকটিকির মতো তারা ঘাড় মাথা গুঁজড়ে লেপটে আছে গাড়িগুলোর পেছনে,—ঠেলছে আপ্রাণ শক্তি দিয়ে।

এই সুড়ঙ্গটি যেখানে শেষ হোলো সেখান থেকে শুরু হোলো একটা ধাতব গহ্বর। গোল একটা চোঙা যেন ঢালু হয়ে নেমে গেছে—নিচে,—আরো নিচে। ছোট ছোট কয়লা-গাড়ি লোহার দড়ি বাঁধা অবস্থায় এই চোঙার মধ্যে নামছে, চোঙা থেকে উঠছে।

জ্যাকেস বললে,—চলুন মশিয়েঁ ভিনসেন্ট, এবার আমরা নামব সবচাইতে গভীর স্তরে,—সবশুদ্ধ সাতশো পঞ্চাশ মিটার মাটির নিচে। এমন জিনিস সারা পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

ধাতব চোঙার ওপর বসে বসে প্রায় ত্রিশ মিটার নামবার পর তারা পৌঁছল বেশ চওড়া একটা সুড়ঙ্গের মুখে। সুড়ঙ্গটা দু-দিকে চলে গেছে। একটা পথ ধরে প্রায় আধ মাইল হাঁটার পর হঠাৎ সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেল একটা দেয়ালের সামনে। দেয়ালের মাঝখানে বড়ো একটা ফুটো। সেই ফুটোর মধ্য দিয়ে দেয়ালের ওপারে পৌঁছতেই পাওয়া গেল একটা গহ্বর। সেই গহ্বর গিয়ে পড়েছে এই খনির নিম্নতম স্তরের ঠিক গায়ের ওপর। সেখানে আবার সদ্য-তৈরি-করা কয়েকটা সরু সরু সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গগুলির মধ্যে একটা মানুষের কাঁধ কোনো রকমে গলতে পারে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সাপের মতো বুকে ভর দিয়ে জ্যাকেস ঢুকল একটা গর্তের মধ্যে। ভিনসেন্ট ঢুকল তার পেছনে। সুড়ঙ্গটা চওড়ায় আড়াই ফুট, ফুট-দেড়েক খাড়াই। ঠিক যেন কোনো সরীসৃপের গর্ত। অন্ধকারে সরীসৃপেরই মতো তারা এগোতে লাগল। কাঁধদুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল ভিনসেন্টের। সে-যন্ত্রণা টের পাবার অবস্থাও তখন তার নেই।

এই ভয়াল সুড়ঙ্গের শেষে ছোট্ট একটি গহ্বর। কোনো রকমে মানুষ এখানে দাঁড়াতে পারে। দেয়ালে দেয়ালে কয়েকটা নীলাভ আলোক-বিন্দু। ভিনসেন্ট তখন প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। কালো ঝুলে আর ঘামে তার চোখের পাতা ঢেকে গেছে, জিভ বেরিয়ে এসেছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই,—মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে মার-খাওয়া জন্তুর মতো। একবিন্দু বাতাস—একটু স্বাভাবিক নিশ্বাসের জন্য খাবি খাচ্ছে প্রাণ। জ্যাকেস তাকে উঁচু করে তুলে বসিয়ে দিলে। সে নিশ্বাস নিলে—সঙ্গে সঙ্গে যেন তরল আগুন বুকের মধ্যে ঢুকে হাড় পাঁজর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিলে—শুকনো জিভ বার করে খক-খক করে কাশতে লাগল

সে,—কোটর থেকে ঠিকরে বার হতে চায় শুকনো সাদা-সাদা চোখদুটো।

একটা চেনা গলা এল কানে,—আরে আরে মশিয়েঁ ভিনসেণ্ট, আপনাকে এখানে এনেছে! দেখতে এসেছেন আমাদের পঞ্চাশ সেণ্টের রোজ-মজুরি কেমন করে আমরা রোজকার করি?

জ্যাকেস তাড়াতাড়ি গিয়ে আলোগুলো পরীক্ষা করলে। সাদা আলোকে খেয়ে ফেলেছে নীলাভ আভায়।

ডিক্রুক ভিনসেণ্টের কানে কানে বললে,—এখানে ওর আসা মোটেই উচিত হয় নি। টানেলের মধ্যে একবার যদি কাশতে কাশতে রক্তবমি করতে শুরু করে, তখন আর ওকে দড়ি বেঁধে টেনে তোলা ছাড়া উপায় থাকবে না।

জ্যাকেস হাঁক দিলে,—ডিক্রুক, আলোগুলো কি সকাল থেকে এমনিভাবে জ্বলছে?

ডিক্রুক বললে,—হ্যাঁ তা জ্বলছে বৈকি। গ্যাসের কথা বলছ তো? ঠিক, তাও জমছে প্রচুর। ফাটবে একদিন, আমাদের ভবযন্ত্রণাও সেদিন ঘুচবে।

—গত রবিবার পাম্প হয়নি?

—হয়েছে বৈকি। দাঁত বার করে ডিক্রুক উত্তর দিলে,—তাতেই বা কী? জমছে আবার, মিনিটে মিনিটে জমছে।

—কাজ বন্ধ রাখো কাল। আবার পাম্প করতে হবে।

হৈ হৈ করে প্রতিবাদ করে উঠল শ্রমিকরা। বললে,—ইয়ারকি? ঘরে একটুকরো রুটি নেই, একদিন কাজ বন্ধ? মরব নাকি শুকিয়ে? চালাকি পায়া হ্যায়?

হো হো করে হেসে উঠল ডিক্রুক—আরে ভায়া ঘাবড়িয়ো না। তোমার খনি আমাকে মারতে পারবে না। কত চেষ্টা করেছে আজ পর্যন্ত,—পেরেছে? আমি ঠিক বুড়ো হয়ে বিছানায় শুয়ে মরব, দেখো।—ভালো, খাবার কথা মনে পড়িয়ে দিলে। কটা বাজল হে ভার্নি?

নীল শিখার কাছে ঘড়িটা ধরে ভার্নি বললে—নটা।

—ঠিক আছে। কাজ বন্ধ করো, খানা শুরু করো ভাইসব।

বীভৎসদর্শন কৃষ্ণ প্রেতের দল কাজ বন্ধ করে দেয়ালের ধারে ধারে ঠেসান দিয়ে উঁচু হয়ে বসল। নড়ে দূরে যাবারও উপায় নেই। হাতে পনেরো মিনিট মাত্র সময়। ঝুলি থেকে প্রত্যেকে বার করল দু-টুকরো করে কালো শুকনো রুটি আর খানিকটা করে পচা পনির। খিদের জ্বালায় হাউ হাউ করে তাই তারা খেতে লাগল সাগ্রহে,—হাতের কালি ঝুলে খাবারে মাখামাখি হয়ে যেতে লাগল। রুটি চিবোবার পর গলা ভিজোবার জন্যে এক বোতল করে ক্যালো কফি। এই কফি আর রুটি আর দুর্গন্ধ পনির—এরই জন্যে এরা দিনে তেরো ঘণ্টা করে এই পাতালদুর্গে খেটে মরে।

ভিনসেণ্টের প্রায় ছ-ঘণ্টা কেটেছে। গরমে, পরিশ্রমে রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ায়

তার গা-বমি-বমি করছে, ঝিম-ঝিম করছে মাথা। ভয় করছে কখন বুঝি মূর্ছিত হয়ে পড়ে। এ যন্ত্রণা আর বেশিক্ষণ সে সইতে পারবে না। জ্যাকেস যখন ফেরবার কথা বললে, তখন যেন সে বাঁচল।

যাবার আগে জ্যাকেস বললে,—সাবধান ডিক্রুক, যখন গ্যাস জমছে, কখন ফাটবে বলা যায় না। তুমি বরং কাজ বন্ধ রাখো একদিন।

কঠোর হাসি হাসল ডিক্রুক, বললে,—দেবে একদিনের মজুরি? কোনো শর্মা দেবে?

আরো প্রায় আধঘণ্টা হাঁটার পর তারা একটা ক্রেনের নিচে পেঁছিল। এখান থেকে সোজা কয়লা উঠে যায়। মানুষও ওঠে।

কুয়ার মধ্য থেকে বালতি যেমন ওঠে, তেমনি ভাবে ওপরে উঠতে উঠতে ভিনসেণ্ট বললে,—বন্ধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? এরা কেন এ কাজ করে? এমনি খনির কাজ ছাড়া কি আর কাজ নেই? এরা পালাতে পারে না অন্য কোথাও অন্য কোনো কাজে?

—না মশিয়ে ভিনসেণ্ট, কোনো কাজ নেই এখানে এ ছাড়া। এখান থেকে অন্যত্র পালাবেই বা কী করে, পয়সা কোথায়? সারা বরিনেজে এমন একটা শ্রমিক পরিবার নেই মাত্র দশটা ফ্র্যাঙ্ক যার জমা আছে। আর যদি-বা কেউ পালাতে পারে, তবু সত্যি-সত্যি এখান থেকে নড়তে সে পারে না। খনি আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। একে আমরা ভালোবাসি নেশার মতো—মাটির তলার অন্ধকারের নেশা। বিনিময়ে কী পাই বলুন? শুধু বাঁচবার মতো মজুরি, আর বিপদ থেকে রক্ষার মোটামুটি ব্যবস্থা। তার বেশি নয়।

ক্রেন গিয়ে পেঁছোলো মাটির ওপরে। হাত-ধোয়ার ঘরে আরশিতে ভিনসেণ্ট দেখল তার সারা মুখ, সর্বশরীর কুচকুচে কালো। হাত মুখ ধোয়ার ধৈর্য আর রইল না। কোনো রকমে টলতে টলতে ফাঁকা মাঠে পেঁছে মাটিতে বসে পড়ে সে হাঁপাতে লাগল। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমনিভাবেও মানুষকে দিন গুজরান করতে হয়? না কি, তার এতক্ষণের অভিজ্ঞতা শুধু দুঃসহ দুঃস্বপ্ন?

ডেনিসদের বাড়ি যে রাস্তায় সেখানে মোটামুটি মধ্যবিত্ত লোকদের বাস। সে-রাস্তা ছেড়ে সে চলল চড়াইয়ের অলিগলির মধ্য দিয়ে ডিক্রুকের কুটিরের অভিমুখে। দরজায় ধাক্কা দিতে বার হয়ে এল ডিক্রুকের ছেলে। ছ-বছরের বাচ্চা, অস্থিসার দেহ, তবু বাপেরই মতো জ্বালা-ধরা চোখ। আর-দুবছর যাবে না, তার মধ্যেই এও আবার খনিতে নামবে।

রিনরিনে গলায় ছেলেটি বললে,—মা কয়লা কুড়োতে গেছে মশিয়ে, আর আমি বাচ্চাদের দেখছি। আপনি একটু বসুন।

মেঝের ওপর উলঙ্গ দুটি শিশু কাঠকুটো নিয়ে খেলছে। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে তাদের দেহ। বড়ো ছেলেটি উনুনে কয়লার ধুলো ফেলছে,

যৎসামান্য। ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি ছেলেদুটোকে বিছানায় শুইয়ে দিলে। ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে তাদের ঢেকে দিলে। এই দুরন্ত দুর্গতির পরিবেশে কেন সে পায়ে পায়ে হেঁটে এল তা সে জানে না। সে শুধু কোনো রকমে তাদের বোঝাতে চায়, যে তাদের সে সমব্যথী।

হাতে মুখে কালি-ঝুলি মেখে ডিক্রুকের স্ত্রী ঘরে ফিরল। ভিনসেণ্টের কালিমাখা মূর্তি দেখে প্রথমে সে তাকে চিনতেই পারল না। তারপর দৌড়ে দেয়ালের কাঠের বাক্স থেকে একটু কফি নিয়ে আধো গরম জলে তা গুলে নিয়ে তাকে পরিবেশন করল। কালিমাখা ভিনসেণ্ট দুহাত বাড়িয়ে নোংরা ঠাণ্ডা কফির পাত্রটা নিলে।

মেয়েটি বললে,—ধুলো ঘেঁটে ঘেঁটে কয়লা আজকাল একদানাও মেলে না, জানেন মশিয়েঁ ভিনসেণ্ট ? কোম্পানি যা কেপ্পন হয়েছে বলবার নয়। বাচ্চাগুলোকে কেমন করে গরম রাখি বলুন তো ? সম্বল তো এই চট,—চট গায়ে দিয়ে দিয়ে বাচ্চাগুলোর বুকে পিঠে ফোস্কা পড়ে গেল। সারা দিন যদি বিছানাতেই শুইয়ে রাখি, তাহলে ওরা বাড়বেই বা কী করে ?

উদ্‌গত অশ্রুকে প্রাণপণে গোপন করে রাখল ভিনসেণ্ট, নির্বাক হয়ে রইল সে। এমনি দুর্দশার দৃশ্য কখনো সে চোখে দেখেনি আগে। আজ এই প্রথম তার মনে সংশয় জাগল—এই নারী তার সন্তানকে বুকে নিয়ে যদি শীতে জমে মারা যায়, ধর্মবাণী প্রচারের তাহলে আর কী মূল্য ? ঈশ্বরের দৃষ্টি কি এদের ওপর পড়ে না ?

পকেটে যে কটা টাকা ছিল, সব সে তুলে দিল ডিক্রুকের স্ত্রীর হাতে। বললে,—ওদের কয়েকটা পশমের ড্রয়ার কিনে দিয়ো।

অর্থহীন,—এমনি হৃদয়াবেগের কোনো মানে হয় না। সে জানে সারা বরিনেজে শত-শত শিশু এমনি শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছে,—তার প্রতিবিধান নেই ! ড্রয়ার-কটা ছিঁড়লে ডিক্রুকের বাচ্চারা আবার শীতে কাঁপবে।

ফিরে গেল সে ডেনিসদের বাড়ি। রান্নাঘরটি জুড়ে মধুর আরামদায়ক উষ্ণতা। মাদাম ডেনিস তাড়াতাড়ি জল গরম করে দিলেন হাত মুখ ধুয়ে নেবার জন্যে, টেবিল সাজিয়ে খেতে দিলেন খরগোসের মাংসের গরম ঝোল। দেখলেন লোকটা বড় ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে,—তাই রুটিতে মাখন মাখিয়ে দিলেন অনেকটা বেশি করে।

দোতলায় নিজের ঘরে গেল ভিনসেণ্ট। উৎকৃষ্ট খাদ্যে উদরপূর্তির আরাম,—আরাম খাটজোড়া নরম বিছানায়। দেয়ালে দেয়ালে নামকরা শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রিণ্ট। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো ঝকঝকে আলমারিটা ভিনসেণ্ট খুলল,—প্যাণ্ট কোট শার্ট আণ্ডারওয়ার সব সারে সারে সাজানো রয়েছে। আলনাতেও পোশাক ঝুলছে—এমনকি একটা গরম ওভারকোট পর্যন্ত। নিচের তাকে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে অতিরিক্ত দু-জোড়া জুতো। মিথ্যা কথা সে

বলে এসেছে এতদিন—যে মিথ্যা নিতান্ত কাপুরুষের শোভা পায়। খনির এই শ্রমিকদের কাছে সে প্রচার করেছে দারিদ্র্যের ধর্ম—বলেছে দারিদ্র্যকে ভূষণ করো,—আর নিজে থেকেছে তোফা আরামের আতিশয্যে। নিষ্প্রাণ অর্থহীন ফাঁকা বুলি আওড়ানো—এই বুঝি তার পেশা? ক্লীব পলায়নী প্রবৃত্তি—এই বুঝি তার ধর্ম?

শ্রমিকরা এতদিন তাকে সহ্য করেছে কী করে। দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয় নি কেন বরিনেজ থেকে? সে বসে নেই, বেকার নয়,—এই মিথ্যা আত্ম-প্রসাদে সে ফুলে আছে—আসলে কাজ তার ফাঁকি—শুধু ভালো ভালো জামা কাপড় পরা, শ্রমিকরা সাতদিনে যা খেতে পায় না এক বেলায় তা উদরস্থ করা, নরম বিছানায় আয়েস করে ঘুমোনো, আর মাঝে মাঝে ভালো মানুষের মুখোস পরে লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধর্মের ফুটো ঢাক বাজানো। এই তার সাফল্য? এই কি তার জীবনের সার্থকতা? এই নাকি তার ব্রত উদ্‌যাপন? ছি ছি ছি। আলমারি থেকে সমস্ত জামাকাপড়গুলো নিয়ে সে ব্যাগের মধ্যে পুরলো। আলনার জামা জুতো, টেবিলের বইপত্র, দেয়ালের ছবি, সব সে জড়ো করে বাণ্ডিল বাঁধল। তারপর দৌড়ে বার হয়ে গেল বাড়ির বাইরে।

উত্‌রাইয়ের ধারে ছোট্ট একটা পচা নালা। তার পরে আবার একটা খাড়াই, মাঝখানে পাইন বন। বনের মধ্যে মধ্যে ইতস্তত কয়েকটা শ্রমিক-কুটির। খানিকটা খোঁজ করে ভিনসেণ্ট একটা খালি কুটির পেল। জরাজীর্ণ কাঠের বাড়ি, ঝরঝরে কড়িগুলোর ওপর কোনো রকমে ছাদটা ঝুলে আছে, দেয়ালের তক্তাগুলো এখানে ওখানে হাঁ হয়ে আছে। মেঝে বলতে খালি কাঁচা মাটি,—ভাঙা দরজা, জানলার কোনো বালাই নেই।

যে স্ত্রীলোকটি ঘরটার খোঁজ দিয়ে তাকে দেখাতে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে, ভিনসেণ্ট তাকে শুধোলে,—মালিক কে এটার?

—ওয়াম্‌সের একজন ব্যাবসাদার।

—ভাড়া কতো জানো?

—মাসে পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক।

—ঠিক হবে। এ ঘরটা আমি নেব।

—কিন্তু মঁশিয়ে ভিনসেণ্ট, এখানে তো আপনি থাকতে পারবেন না।

—কেন পারব না?

—মানে, মানে—এ যে একেবারে যাচ্ছেতাই ঘর। সারা তল্লাটে এমনি ভাঙা ঘর আর দুটি নেই। এ ঘর কি কেউ নেয়?

—ঠিক বলেছ। এমনি ঘরই আমার পছন্দ। এ ঘর আমার।

ভিনসেণ্ট ফিরে গেল ডেনিসদের বাড়ি মনে অনেকটা শান্তি নিয়ে।

মাদাম ডেনিস শুধোলেন,—একি মঁশিয়ে ভিনসেণ্ট, জিনিসপত্র বাঁধা। ফিরে যাচ্ছেন নাকি হল্যাণ্ডে? হঠাৎ কোনো দুঃসংবাদ এল নাকি?

—না মাদাম, আমি চলে যাচ্ছি নে। বরিনেজেই আমি থাকব।

সব কথা শুনে মাদাম ডেনিস মৃদু গলায় বললেন,—আমার কথা বিশ্বাস করুন মশিয়েঁ ভিনসেণ্ট,—ওভাবে আপনি থাকতে পারবেন না। যা অভ্যেস নেই তা করতে যাবেন না। যিশুখ্রীস্টের যুগ তো এখন সত্যি-সত্যি আর নয়,—এখন যে যতটা ভালোভাবে থাকতে পারে তাই থাকাই উচিত। বরিনেজের লোক সবাই আপনাকে বিশ্বাস করে,—এমনিতেই তারা জানে আপনার মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই।

ভিনসেণ্ট মত বদলালো না। ওয়াম্‌সের ব্যাবসাদারটির সঙ্গে দেখা করে ঐ জীর্ণ গৃহই সে ভাড়া নিল, ডেনিসদের বাড়ি ছেড়ে উঠে গেল সেখানে। কদিন পরে প্রথম মাসের মাহিনা পঞ্চাশ ফ্র্যাংক যখন এল, সে একটা চৌকি আর একটা পুরোনো স্টোভ কিনল। হাতে রাখল খালি সারা মাসের শুকনো রুটি, পচা পনির আর কফি কেনবার মতো কিছু টাকা। কাদামাটি গুলে তাই দিয়ে সে বাইরের দেয়ালের ফুটোগুলো পুরোনো চট দিয়ে ঢাকল। এইবার সে ওদের সমান হয়েছে, সমান দুঃখ সুখ, সমান জীবনযাত্রা। ওদের কানে ঈশ্বরের বাণী শোনাবার অধিকার এবার সে অর্জন করেছে।

৯

সে বছরের মতো দুরন্ত শীত আর কখনো পড়ে নি। অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ন বাতাস পাহাড়ের মাথায় আর সারা প্রান্তর জুড়ে হু-হু করে বয়ে যায়,—পথে বার হওয়া দুষ্কর। কয়লাগুঁড়োর পাহাড় খুঁড়ে খুঁড়ে কয়লাদানা সংগ্রহ করাই সবচেয়ে প্রয়োজন এখন,—কিন্তু বাইরে বার হলে মেয়েগুলোর হাড়শুদ্ধ জমে যায়। তাদের পিঠে একটুকরো গরম পোশাক কোথায়?

দিনের পর দিন বস্তা-চাপা হয়ে শিশুরা বিছানার মধ্যে কুঁকড়ে পড়ে থাকে, শিঁটিয়ে যায় তাদের ছোট-ছোট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সারাদিন অগ্নিগর্ভে কাটাবার পর দিনান্তে শ্রমিকরা উঠে আসে তুহিনশীতল মাটির বুকে—শীত-ঝটিকার ঝাপট খেতে খেতে অবসন্ন পশুর মতো ঘরে যায়। সারাদিন তারা কয়লা তোলে,—ঘরে কিন্তু কয়লা নেই, আগুন নেই, নেই একফোঁটা গরম জল বা একমুঠো গরম খাবার। প্রতি সপ্তাহে কোনো-না-কোনো লোক হয় যক্ষায় নয় তো নিউমোনিয়াতে মরে,—ভিনসেণ্টের কাজ বাড়ে,—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ।

ছেলেদের পড়াশুনো করানো ভিনসেণ্ট বন্ধ করেছে। এখন সে সারাদিন পাহাড়ে কয়লা কুড়িয়ে বেড়ায়—যেটুকু কয়লা পায় সন্ধ্যাবেলা বিলিয়ে দেয় এ-বাড়ি ও-বাড়ি। মুখে হাতে সারা শরীরে কয়লার কালি এখন তার নিত্য ভূষণ। অপরিচিতের চোখে তার আর খনিমজুরের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

একদিন এমনি কয়লা কুড়োবার পর অপরাহ্ণে সে ফিরে আসছে পিঠে বস্তা নিয়ে, এমন সময় মার্কাসে ছুটির বাঁশি বাজল। শ্রমিকের দল গেট থেকে বার

হয়ে বাড়ি ফিরতে লাগল তার সামনে দিয়ে। ঘাড় তাদের হেঁট, দৃষ্টি নিচের দিকে, ক্লান্তিভরে আচ্ছন্ন চলৎশক্তি। কয়েকজন তাকে চিনতে পেরে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে গেল।

মার্কাসের গেট থেকে সবশেষে বেরিয়ে এল একজন জীর্ণশীর্ণ অতি বৃদ্ধ মজুর। কাশছে লোকটা সমানে, কাশির দমকে কেঁপে-কেঁপে উঠছে সারা শরীর, পা দুটো থর-থর করে কাঁপছে,—ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা যেন মুগুর মারছে তার যক্ষ্মাজীর্ণ বুকের পাঁজরে। একবার সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তুষারের ওপর,—তারপর কোনো রকমে খাড়া হয়ে উঠে ধুঁকতে ধুঁকতে আবার হাঁটতে লাগল পায়ে পায়ে। ওয়ামুসের একটা মুদিখানার দোকান থেকে বোধহয় সে বহুকষ্টে জোগাড় করেছে একটা বস্তা, সেইটে দিয়ে সে পিঠ ঢেকেছে। ঐ বস্তায় মুড়ে কোনো কাঁচের জিনিসপত্র হয়ত চালান হয়েছিল, লোকটার পিঠে বস্তাটার গায়ে বড়ো-বড়ো করে লেখা আছে—'ভঙ্গুর'।

পিঠের কয়লাগুলো ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেবার পর ভিনসেণ্ট ঘরে ফিরল। নিজের সব জামাকাপড়গুলো সে বার করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখল বিছানায়। কম নাকি তার ঐশ্বর্য? পাঁচটা শার্ট, তিনটে গরম আণ্ডারওয়ার, চার জোড়া মোজা, দু-জোড়া জুতো, দুটো পুরো সুট,—আর তার ওপর গায়ে রয়েছে গরম ওভারকোট। তাড়াতাড়ি একটা শার্ট, একজোড়া মোজা আর একটা আণ্ডার-ওয়ার একধারে সরিয়ে রেখে বাকি সব সে পুরে নিলে সুটকেসের মধ্যে। সুট-কেসটা কাঁধে ফেলে আবার সে বার হোলো পথে।

প্রথমেই গেল সেই 'ভঙ্গুর' বৃদ্ধটির বাড়ি। তাকে দিলে সুট। আণ্ডারওয়ার আর শার্টগুলোকে বিলিয়ে দিলে শিশুদের মধ্যে,—সেগুলো কেটে কেটে বাচ্চাদের জামা করা চলবে। কয়েকজন যক্ষ্মারোগী শ্রমিকের হাতে তুলে দিলে মোজাগুলো। মনে পড়ল অন্তঃস্বত্বা সেই নারীটির কথা, স্বামী যার দুদিন আগে খনির মধ্যে ধ্বসের চাপে মরেছে,—আর যে এখন থেকে নিজে নামছে খনিতে দুটি সন্তানের মুখ চেয়ে। গেল তার ঘরে। গা থেকে কোটটি খুলে তাকে দিলে।

উপাসনা-গৃহ বন্ধ;—কেমন করে সে শ্রমিকদের স্ত্রীদের হাত থেকে সভা গরম করার জন্যে কয়লা ছিনিয়ে নেবে! কেমন করে বলবে সে শ্রমিক পরিবারকে ঘর ছেড়ে পথে বার হতে—হোক না সে উপাসনায় আসার জন্যে! ভিনসেণ্টই এখন দিনশেষে ঘরে ঘরে যায়—ধর্মের কথা, যিশুর কথা শোনায়। নতুন কাজ জুটেছে। কোথাও সে রোগীর সেবা করে, কোথাও করে শিশুর পরিচর্যা, কারো জন্যে ওষুধ আনে, কারো ঘরে সে উনুন ধরায়, পথ্য রান্না করে দেয়। বাইবেলটা সঙ্গে আনতেও আর মনে থাকে না। ঈশ্বরের গুণগান এখন বিলাসিতা,—আতিশয্য!

মার্চ মাসে শীত কমল—সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোলো জ্বরের মড়ক। গত মাসের

জন্যে যা মাইনে পেল, তার থেকে মাত্র দশটি ফ্র্যাঙ্ক ভিনসেণ্ট নিজের জন্যে রাখল; বাকি সব টাকা দিয়ে সে কিনল রোগীর ওষুধ আর পথ্য। নিজের জন্যে আহার তার জোটে না—সর্বদা পেটের মধ্যে জ্বলতে থাকে,—কণ্ঠা আর গালের হাড় উঁচু হয়ে ওঠে, গর্তে বসা চোখদুটো দপ্-দপ্ করে জ্বলন্ত কয়লার মতো, শুকিয়ে সামনের দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে ভ্যান গক্-মার্কা হাতুড়ির মতো চোয়াল। উত্তপ্ত শরীর, সর্বদা জ্বালা করে হাত পা,—চলা-ফেরার নার্ভাস মুদ্রাদোষগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

ডিক্রুকের বড়ো ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছে। ঘরে দুটিমাত্র চৌকি। একটিতে শোয় মা বাপ, আর-একটিতে তিনটি ছেলেমেয়ে। ছোট দুটি বাচ্চা যদি দাদার সঙ্গে এক বিছানায় শোয় তাহলে তাদেরও টাইফয়েড অনিবার্য। মাটিতে তারা যদি শোয় তাহলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া। আর বাপ মা যদি রাত্রে মাটিতে শোয়,—মরবে না বটে তারা, কিন্তু ভোরে উঠে খনিতে যাবার আর ক্ষমতা থাকবে না বাপের, মায়েরও থাকবে না দৈনন্দিন সংসার-শ্রমের শক্তি।

সন্ধেবেলা খনি থেকে ডিক্রুক ফিরে দেখে, দোরগোড়ায় পাদ্রি দাঁড়িয়ে। ভিনসেণ্ট বললে,—ডিক্রুক, একবার আমার ঘরে চলো তো, একটু কাজ আছে।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে ডিক্রুকের, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, তবু সে দ্বিধা করলে না, অশক্ত পা-টা টেনে টেনে চলল ভিনসেণ্টের পিছু-পিছু। বাড়ি পৌঁছে ভিনসেণ্ট তার বিছানার তোশকের একটা দিক তুলে বললে,—নাও, ওদিকটা ধরো। এটা তোমার বাড়িতে নিয়ে যাই। ছেলেটার একটা শোবার ব্যবস্থা হওয়া চাই তো!

দাঁতে দাঁত নিষ্পেষণ করে ডিক্রুক রুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—তিনটে বাচ্চা আছে আমাদের আলবৎ,—ভগবান যদি চান তো তাদের একটা না-হয় যাবে। কিন্তু সারা গ্রামে মশিয়ে ভিনসেণ্ট আর দুটি নেই, আমার জন্যে সে আত্মহত্যা করবে আর আমি তা সইব?

এই বলে মুখ ফিরিয়ে খোঁড়া ক্লান্ত পা টেনে টেনে সে ফিরে গেল নিজের খুপরিতে।

চৌকি-সমেত সমস্ত বিছানা একসঙ্গে কাঁধের ওপর তুলে নিল ভিনসেণ্ট। ডিক্রুকের বাড়ি পৌঁছে নিঃশব্দে সে বিছানাটা পাতল। ডিক্রুকের রুগ্ন শিশুটিকে সে এই আলাদা বিছানায় শুইয়ে তার সেবা করতে লাগল। নির্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল ডিক্রুক আর তার স্ত্রী।

রাত্রিবেলা ডেনিসদের বাড়ি গেল কিছুটা খড়ের সন্ধানে। মাদাম ডেনিস তাব কাহিনী শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন। বললেন,—মশিয়ে ভিনসেণ্ট, আপনি এখানে যে ঘরে ছিলেন, সে ঘর এখনো খালি পড়ে আছে আপনারই জন্যে। এখুনি আপনি চলে আসুন।

ভিনসেণ্ট উত্তর দিলে,—আপনি ভারি ভালো মাদাম, কিন্তু সে হয় না।

—কেন হয় না মশিয়ে ভিনসেণ্ট ? টাকার কথা ভাবছেন ? জীন ব্যাপ্টিস্ট আর আমি অনেক উপায় করি। দুঃখ আমাদের নেই। টাকা আপনাকে দিতে হবে না। আপনি তো বলেন ভগবানের চোখে সব ভাই-ভাই, সবাই তাঁর সন্তান। আপনি ভাই হয়ে আমাদের কাছে এসে থাকুন।

ভিনসেণ্ট তখন ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। সপ্তাহ-দুই ধরে তার গায়ে জ্বর,—মাথা যেন টলছে। পেটভর্তি খাওয়া নেই, চোখজোড়া ঘুম নেই, এমনি অবস্থায় দিনের পর দিন চলেছে। গ্রামের ঘরে-ঘরে পুঞ্জিত দুঃখের আশাহারা দুর্ভাবনায় সহ্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে সে পেঁাছেছে। এই তো তার মাদাম ডেনিসের আতিথ্য গ্রহণের নিতান্ত উপযুক্ত ক্ষণ। পরিচ্ছন্ন গরম শয্যা, পথ্যের, আহার্যের সমারোহ। সবার ওপরে ভগ্নীসমা মাদাম ডেনিসের নিঃস্বার্থ সেবার অঞ্জলি। এদিকে পা-দুটো তার ভেঙে আসছে, রুটি-ঘরের লাল মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল বুঝি তার শরীর। আর কি দেরি করার, দ্বিধা করার সময় আছে ?

কিন্তু ঈশ্বর, এ কী পরীক্ষা! এই মুহূর্তের এই বিষম পরীক্ষায় সে যদি হারে, তাহলে ব্যর্থ হবে তার এতদিনের ব্রত। আজ যেখানে চারদিকে চরম হাহাকার, সে কি পলায়নের প্রথম সুযোগটি হাতে আসতেই পিছু হটবে ? পালাবে নিরাপত্তার পক্ষপুটে ?

ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বললে সে,—ভগবান আপনার এই মহত্ত্ব চোখ মেলে দেখছেন, মাদাম ডেনিস। এর সুফল তিনিই আপনাকে দেবেন। আপনি কিন্তু আমাকে প্রলোভন দেখাবেন না, আমার কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হতে বলবেন না। খড় যদি কয়েক আঁটি থাকে তো দয়া করে দিন, নইলে মাটিতে শুয়েই আমাকে রাত কাটাতে হবে। কিন্তু দোহাই,—এর বেশি আমাকে কিছু দিতে চাইবেন না।

ঘরের এক কোণে খড় বিছিয়ে গায়ে পাতলা একটা চাদর জড়িয়ে সে পড়ে রইল। শীতে সর্বাঙ্গ বেঁকে গেল,—একফোঁটা ঘুম এল না সারা রাতে। সকালে যখন উঠল তখন বুকে ব্যথা আর কাশি, লাল চোখদুটো কোটরের মধ্যে আরো অনেকটা ঢোকানো। জ্বর আরো বেড়েছে, অসংযত চলৎশক্তি। একটুকরো কয়লা নেই উনুনের ধারে,—শ্রমিক-শিশুদের বঞ্চিত করে নিজের ঘরে কয়লার গুঁড়ো সে একমুঠোও আনে না। কোনো রকমে খানিকটা শুকনো রুটি চিবিয়ে নিয়ে ভিনসেণ্ট বার হোলো দিনের কাজে।

১০

ক্লান্ত পদক্ষেপে বিদায় নিল মার্চ মাসটা,—এল এপ্রিল। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হোলো। হাড়-কাঁপানো হাওয়া বিরাম নিল, সূর্যের তাপ বাড়ল, গলতে শুরু করল তুষার। বরফ-গলা মাঠের কালো চেহারা ফুটে উঠতে লাগল,

ডাকতে লাগল পাখি, বনে বনে এলডোর গাছে গাছে ধরল পুষ্পমঞ্জরী। ঘরে ঘরে জ্বরের প্রতাপ প্রশমিত হোলো, মেয়েরা আবার জমায়েত হতে লাগল মার্কাসের কয়লা-পাহাড়ের কিনারে কিনারে। উনুনে উনুনে গনগনে আগুন, আবার শিশুদের স্বভাবসুলভ চাপল্য—জীবনে নব স্পন্দন।

ভিনসেণ্ট আবার তার উপাসনা-গৃহের দ্বার খুলল। প্রথম উপাসনার দিন সারা গ্রাম ভেঙে পড়ল। ক্লিষ্ট মুখে হাসির ছাপ ফুটেছে, আবার কিছুটা মাথা তুলেছে লোকগুলো। উপাসনা-গৃহের স্বয়ং-নিযুক্ত কর্মকর্তা ডিক্রুক আগুনে কয়লা-কুচো ঠেলছে আর হাসি-ঠাট্টা জুড়েছে এর-ওর সঙ্গে।

বেদীতে দাঁড়িয়ে ভিনসেণ্ট প্রাণখোলা গলায় ঘোষণা করলে,—আবার সুদিন এসেছে। এতদিন ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করছিলেন, সেই দুঃখের পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি, দুঃখ এখন অপগত হয়েছে। আবার মাঠে-বাটে শস্য পাকবে, সারা দিনের শ্রমের পর কৃষাণ প্রসন্ন মনে ঘরে ফিরবে। গলেছে তুষার, এল প্রকৃতির উষ্ণ পরশ। শিশুরা খেলবে ফুলের বনে—নাচবে পাখির গানে। এস ভাই, মাথা উঁচু করো, চোখ তুলে তাকাও ঈশ্বরের দিকে—তাঁর আশীর্বাদ তোমাদের জন্যেও আছে। দুঃখরাতের পরে নব প্রভাত তাঁরই প্রসাদ, বঞ্চিতকে কৃতার্থ তিনিই করেন। তাঁকে নমস্কার করো, তাঁকে ধন্যবাদ জানাও।

কয়েকদিন পরের কথা। মার্কাস খনির পেছন দিকের পাহাড়ে ভিনসেণ্ট কয়েকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে কয়লাগুঁড়ো কুড়োচ্ছিল,—হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে ক্রেন-ঘর থেকে লোকজন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বার হয়ে আসছে, দৌড়োদৌড়ি করছে ইতস্তত।

ভিনসেণ্ট চেঁচিয়ে উঠল,—কী হোলো। এখনো তো তিনটে বাজেনি! ছুটির আগে ওরা অমনি করে উঠে আসছে কেন?

একজন বড়ো-গোছের ছেলে বললে,—নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে! খাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ভেঙেছে!

হোঁচট খেতে খেতে গড়াতে গড়াতে প্রাণপণে তারা নামতে লাগল পাহাড় থেকে। সমতল মাটিতে পেঁছিতে না পেঁছিতেই দেখে, গ্রাম থেকে স্ত্রীলোক আর শিশুরা দৌড়ে দৌড়ে আসছে খনির দিকে।

গেটের কাছে পেঁছিতেই ভিনসেণ্ট শুনল উত্তেজিত কলরব—সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়েছে! ঐ নতুন খাদটা! সব গেছে! সবাই আটকা পড়েছে ওটার মধ্যে!

হাঁপাতে হাঁপাতে সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল জ্যাকেস ভার্নি। ভিনসেণ্ট তার হাত চেপে ধরে বললে,—কী হয়েছে, কী হয়েছে ভার্নি?

—ডিক্রুক! ডিক্রুকের সেই খাদটা! মনে আছে সেই নীল ঝাপসা আলো? ঠিক জানতাম এমনি একদিন হবে!

—ক-জন,—ক-জন ওখানে আছে?

—ছ-টা খাটাল, প্রত্যেকটাতে পাঁচজন করে অন্তত।

—কিছুতেই ওদের বাঁচানো যায় না ভার্নি?

—বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আমি নামছি। এখুনি আর কজন ভলান্টিয়ার আমি জোগাড় করে নিচ্ছি।

—আমি যাব তোমাদের সঙ্গে, ভার্নি!

—না। অভিজ্ঞ লোক আমার চাই। আপনাকে নিয়ে কোন কাজ হবে না। লিফ্‌টের দিকে ভার্নি ছুটল।

গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো ছোট্ট গাড়িটা, সামনে একটা সাদা ঘোড়া। ওই সাদা ঘোড়ার গাড়ি কতোবার মৃত মানুষ আর মুমূর্ষু শ্রমিকদের এখান থেকে বহন করে নিয়ে গেছে শোকার্তদের ঘরে ঘরে। গাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে মেয়ে-পুরুষের ভিড়। হতাশ বিষণ্ন তাদের চোখে ফ্যালফেলে দৃষ্টি,—কোনো মেয়ে হঠাৎ-হঠাৎ ককিয়ে উঠছে বুকচাপা আর্তনাদে। শিশুরা ফুঁপিয়ে কাঁদছে মায়েদের পোশাক চেপে ধরে—ফোরম্যানরা ছুটোছুটি করছে, চিৎকার করে হুকুম দিচ্ছে নানা রকম।

হঠাৎ গোলমাল থামল। ছোট্ট একটি দল ক্রেন-ঘর থেকে বার হয়ে নিঃশব্দে সামনে এগিয়ে আসতে লাগল। কম্বলে মুড়ে কি যেন তারা বহন করে আনছে। কয়েকটি মুহূর্তের মুখর স্তব্ধতা। তার পরেই সবাই ভেঙে পড়ল সমস্বরে:

—কারা ওরা, কারা গো? বেঁচে আছে? বল না গো, কী নাম? দেখাও, দেখাও ওদের মুখ! আমার স্বামী—আমার স্বামী নাকি? ওগো, আমার দুটি বাচ্চা যে ছিল ঐ খাটালটাতেই! তাদের কি কিছু হোলো?

বাহকদের একজন বললে,—খাটালের বাইরে যারা কয়লা সরাচ্ছিল, তাদের তিনজনকে তুলতে পেরেছি। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আগুনে, কেমন আছে জানি না।

—দেখাও, দেখাও ওদের মুখ। আমার ছেলে,—সে নাকি? আমার মেয়ে, সে তো গাড়ি ঠেলত ওখানে,—তাকে তুলেছ নাকি? দেরি কোরো না, শুধু মুখগুলো দেখাও!

দুটি মুখ কিশোরীর, একটি বছর-দশেকের একটি ছেলের। কালি-মাখা, ফোস্কা-পড়া। যাদের ছেলেমেয়ে তারা ওদের ওপর লুটিয়ে পড়ে দুঃখ আর আনন্দের অবিমিশ্র আঘাতে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। দেহগুলো গাড়িটার মধ্যে তুলে দিয়ে সেটা চালাতে শুরু করল গাড়োয়ান। পিছনে ছুটল তাদের আত্মীয় স্বজন। সঙ্গে সঙ্গে ভিনসেন্টও।

হঠাৎ একবার সে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালো। জ্বলন্ত আকাশ,—মাইনের ওপারে চক্রবাল ঘিরে কালো কালো পাহাড়ের ভ্রূকুটি।

এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনার চরম প্রকাশ এই সর্বনাশা দুর্ঘটনা।

ভিনসেণ্টের শুষ্ক কণ্ঠ থেকে বার হয়ে এল কটি কথা,—কালো পিরামিডের রাজ্য, কালো মিশর! ঈশ্বর, তোমার প্রিয়, তোমার মনোনীত মানুষের দল—আবার তারা এই মিশরে বন্দী! এ তুমি কী করেছ ভগবান!

শিশু তিনটির মৃতপ্রায় অবস্থা। শরীরের কাপড়ে-ঢাকা অংশটুকু বাদে সমস্ত চামড়া আর চুল ঝলসে পুড়ে গেছে। পাশে দাঁড়িয়ে মাথা চাপড়াচ্ছে মায়েরা। প্রথম শিশুটির গা থেকে পোড়া ন্যাকড়ার টুকরোগুলো ছাড়াতে ছাড়াতে ভিনসেণ্ট বললে,—তেল,—তেল আনো শিগগির খানিকটা!

ঘরে তেল ছিল। পোড়ার ওপর তেল লাগাতে লাগাতে ভিনসেণ্ট আবার চেঁচিয়ে ডাকল,—ব্যাণ্ডেজ চাই এখন!

বিস্ফারিত আর্ত চোখে তাকিয়ে রইল মা। ধমক দিয়ে উঠল ভিনসেণ্ট,—হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কী? মরবে নাকি তোমার ছেলে? ব্যাণ্ডেজ কই?

—ব্যাণ্ডেজ? সাদা কাপড়ের টুকরো? কোথায় পাব? সারা শীতকাল ধরে একটু বাড়তি কাপড় কারো নেই।

গোঙাতে লাগল শিশু। ভিনসেণ্ট গা থেকে কোট শার্ট আর গেঞ্জি খুলে ফেললে। কোটটা আবার গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অন্য জামাগুলো টুকরো টুকরো করে তার ফালি দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাচ্চাটিকে জড়ালো। তারপর তেলের পাত্র নিয়ে ছুটে গেল দ্বিতীয় শিশুটির দিকে। তৃতীয় শিশুটিকে তেল মাখানোর পর ব্যাণ্ডেজ আর নেই। ভিনসেণ্ট প্যাণ্টটা আর তার ভিতরের গরম আণ্ডারওয়ারটা খুলল। প্যাণ্টটা পরে নিয়ে আণ্ডারওয়ারটা ছিঁড়ে তা দিয়ে শিশুটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়িয়ে বাঁধল।

খালি গায়ের ওপর কোটটা চেপে ধরে আবার ভিনসেণ্ট দৌড়ল খনির দিকে। দূর থেকেই কানে আসতে লাগল স্বামীহারা সন্তানহারার বিলাপ-ধ্বনি।

গেটের কাছে মাইনাররা দাঁড়িয়ে আছে। একদল রক্ষাকারী পিট-এ নেমেছে। তারা উঠলে তবে আর-একদল নামতে পারবে। বেশি লোক একসঙ্গে নামবার উপায় নেই। ভিনসেণ্ট একজন সহকারী ফোরম্যানকে জিজ্ঞাসা করল,—কী মনে হয়? বাঁচানো যাবে?

—এতক্ষণে একজনও আর বেঁচে নেই, পৌঁছতেই পারবে না ওদের কাছে। যারা মরেছে তাদের তো কবরই হয়ে গেছে। সব তো পাথর চাপা—

—তবে?

—সপ্তাহ যাবে, মাস যাবে,—দেহগুলো যদি খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে আনতে পারে! আগেও তো দেখেছি—তখনো এমনিই হয়েছে।

—তাহলে ভাই, আর কোনো আশা নেই?

—না। গুণে দেখেছি আমরা। মেয়ে-পুরুষ মিলে সাতান্ন জন।

—সবাই মরেছে?

—হ্যাঁ, সাতান্নটা প্রাণ,—এক নিঃশ্বাসে বরবাদ।

তবু চেষ্টার শেষ নেই। সারা রাত আর সারা দিন ধরে শ্রমিকেরা নামছে, চেষ্টা করছে, উঠছে,—আবার নামছে নতুন দল। ক্রেন-ঘর ঘিরে আশাহীন অপেক্ষায় বসে আছে স্ত্রীলোক আর শিশুর দল। পুরুষেরা প্রবোধ দিচ্ছে, শোক যাদের প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করেনি সেসব মেয়েরা ঘর থেকে কফি বানিয়ে এনে পরিবেশন করছে,—কিন্তু ওরা বুক বাঁধবে কোন্ ভরসায়, জলটুকু মুখে ছোঁয়াবে কোন্ প্রাণে? চোখের জল শুকিয়ে যায়, প্রতীক্ষার শেষ হয় না।

শ্রমিকরা একটা কম্বলে জড়িয়ে তুলে আনল ভার্নি'কে। সেই যে প্রথম সে নেমেছিল, আর ওঠেনি। এবার উঠল অচৈতন্য অবস্থায়। কেশেছিল,—ঝলকে ঝলকে মুখ থেকে লাল রক্ত ঠিকরে পড়েছিল খনির অন্ধ গুহায়। পরের দিন মারা গেল ভার্নি'।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ভিনসেণ্ট ডিক্রুকের স্ত্রী আর বাচ্চাদের জোর করে সরিয়ে আনল খনির কাছ থেকে,—নিয়ে গেল তাদের ঘরে। বারোদিন ধরে অবিশ্রান্তভাবে শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবকরা খনির অন্ধকারে খুঁজে বেড়ালো সহকর্মীদের মৃতদেহ। কয়লা তোলা বন্ধ, বন্ধ রুজিরোজগার। সারা গ্রাম জুড়ে অনশনের ছায়া। মাদাম ডেনিস তাঁর সব সঞ্চয় দিয়ে রুটি বানিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। সে সঞ্চয়ও ফুরোলো। চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে রইল মালিকরা। তেরো দিনের দিন হুকুম হোলো,—মড়া তোলবার খেলা বন্ধ করো,—কাজে লাগো এবার, অনেক হয়েছে।

যেতেই হবে। সারা গ্রাম দুর্ভিক্ষের করাল হাঁয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু করার নেই, নেই কোনো উপায়।

ধর্মঘট করল শ্রমিকেরা।

ভিনসেণ্টের এপ্রিল মাসের বেতন এল—পঞ্চাশটি ফ্র্যাংক। সদরে গিয়ে পুরো পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্কের খাবার কিনে পিঠে বেঁধে গ্রামে এনে সে তা বিলিয়ে দিল ঘরে ঘরে। দিন-দুয়েক চলল তাতে। তারপর গ্রামবাসীরা বার হোলো বনে জঙ্গলে। মেয়েরা কুড়োয় বুনো ফল, ঘাস, পাতা। পুরুষরা ওৎ পেতে বসে শিকার করে নেউল, বেজি, ব্যাঙ, কুকুর-বেড়াল। ক্ষুধা—পেটের মধ্যকার তীব্র যন্ত্রণাকে বন্ধ করার জন্যে মুখে যা-কিছু পোরা যায়—তাই। অশক্ত কম্পিত দেহে জ্বালাভরা চোখে দিনের পর দিন সমর্থ শ্রমিক পুরুষগুলো মাটিতে উঁচু হয়ে বসে দেখতে লাগল—তাদের চোখের সামনে তাদের নারী আর সন্তানরা অনাহারে কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। ভিনসেণ্ট সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠালো ব্রুসেল্সে। কোনো উত্তর এল না।

—সবাই যাবে একে-একে, ওরা বলল ভিনসেণ্টকে,—ওই যে সাতান্নজন আগে গেছে,—ওদের আত্মার জন্যে একদিন প্রার্থনা কর। নির্দিষ্ট দিনে সূর্য ডোবার পরে শ-খানেক লোক জমায়েত হোলো ভিনসেণ্টের কুঠরিতে। দুর্ঘটনার

পর থেকে শক্ত খাবার এ পর্যন্ত ভিনসেন্টের পেটে কতোটুকু গেছে কেউ জানে না। গত ক'দিন ধরে কয়েক চুমুক কফি ছাড়া আর কিছুই সে খায়নি। জ্বরে পুড়ছে সারা গা, কাঁপছে হাত পা। কোটরে ঢোকা অগ্নিবর্ষী চোখ, তুবড়ে যাওয়া গাল, নোংরা মুখ-ভর্তি খোঁচা-খোঁচা লাল দাড়ি। পোশাক নেই, সারা গায়ে তার চট জড়ানো। মেঝের ওপর ছেঁড়া খড়ের গাদায় তার আশ্রয়।

তার চারদিক ঘিরে নিঃশব্দে দাঁড়ালো একশোটি নিরন্ন বুভুক্ষু প্রেতমূর্তি—ভুষি-মাখানো লণ্ঠন বস্তা-ঝোলানো ফাটা তক্তার দেয়ালে দেয়ালে ছড়ালো কৃষ্ণ-গম্ভীর কতো প্রেতচ্ছায়া।

কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে কোনো রকমে মাথা উঁচু করে বসে ভিনসেন্ট অন্ত্যেষ্টি-প্রার্থনা শুরু করল শুকনো ভাঙা গলায়। শীর্ণ শ্রমিকরা রুক্ষ ক্লান্ত চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইল,—তাদের চোখ খুঁজতে লাগল ঈশ্বরকে। কোথায়, কোথায় ঈশ্বর?

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল অচেনা কণ্ঠস্বর, বিরক্তিভরা চড়া মেজাজের গলা। দরজাটা খুলে কে একটি শিশু বললে,—এই যে আপনারা আসুন, মশিয়ে ভিনসেণ্ট এখানে।

চুপ করল ভিনসেণ্ট। শ্রোতারা সবাই তাকালো দরজার দিকে। ভেতরে ঢুকলেন দুজন সুবেশধারী ভদ্রলোক। তাঁদের চোখে আতংক আর বিভ্রান্তি।

ভিনসেণ্ট উঠতে পারল না। ঐভাবে বসে বসেই সে বললে,—আসুন রেভারেণ্ড ডি জঙ, আসুন রেভারেণ্ড ভ্যান ডেন ব্রিংক। মার্কাস খনিতে সাতান্ন জন লোক মরেছে, তাদের নামে আজকের এই প্রার্থনা-সভা। সকলের মনে বড়ো শোকতাপ। আপনারা এদের কাছে দুটো সান্তবনার কথা বলে যান।

খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার পর ধর্মযাজকেরা মুখ খুললেন। ভুঁড়ির ওপর সজোরে একবার হাত চাপড়ে ডি জঙ চিৎকার করে উঠলেন,—কী জঘন্য! কী বীভৎস!

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠলেন ভ্যান ডেন ব্রিংক,—মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকার জঙ্গলে এসেছি আমরা!

—ধর্মের নামে কী সর্বনাশ উম্মাদটা করছে দেখছেন?

—যিশুর পথে ওদের ফিরিয়ে আনতে কতো বছর যে লাগবে কে জানে!

দুহাত ভাঁজ করে ভুঁড়ির ওপর চেপে ডি জঙ হেঁকে উঠলেন,—আমি তখনই বারণ করেছিলাম এ লোকটাকে চাকরি দেবেন না।

—আমিই কি চেয়েছিলাম নাকি! পীটারসেনের জন্যেই তো। এখন দেখছি লোকটা বদ্ধ পাগল!

—পাগল? চিরকালের পাগল! প্রথম থেকেই আমি ধরতে পেরেছিলাম!

ধর্মযাজকেরা বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় কথা বলছিলেন,—একটি কথাও শ্রমিকরা বুঝছিল না। ভিনসেণ্ট শুনছিল, কিন্তু তার অসুস্থ মস্তিষ্ক যেন

ঠিকমত ধরতে পারছিল না এদের কথোপকথনের মানে।

ডি জঙ ভিড় ঠেলে ভিনসেণ্টের কাছে এগিয়ে এলেন, রুদ্ধ হিংস্র গলায় তাকে বললেন,—হটিয়ে দাও এসব নোংরা কুকুরগুলোকে এখান থেকে।

—কিন্তু...কিন্তু প্রার্থনা তো এখনো শেষ হয়নি।

—চুলোয় যাক তোমার প্রার্থনা। ভাগাও এদের।

শ্রমিকরা আস্তে আস্তে চলে গেল। দুজন ধর্মযাজক দাঁড়ালেন ভিনসেণ্টের সামনাসামনি।

—এর মানে কী? এই গর্তের মধ্যে এ তোমার কী রকম প্রার্থনা-সভা? কোন্ ভুতুড়ে ধর্ম তুমি প্রচার করছ এখানে বসে? তুমি না খ্রীস্টান ধর্মযাজক, এই তোমার রুচি? এই তোমার ব্যবহার? সামান্য লজ্জাও কি তোমার নেই, কিছুমাত্র সম্ভ্রমবোধও নেই? লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমাদের। ধর্মকে তুমি রসাতলে পাঠাতে চাও এখানে বসে বসে?

ছেঁড়া চটের বসন পরে খড়ের গাদায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ভিনসেণ্ট। তার জ্বরাক্রান্ত রক্তমূর্তির দিকে তাকিয়ে ধর্মযাজকেরা তাঁদের শেষ কথা এবার বললেন,—আমাদের ভাগ্য ভালো যে তোমাকে পাকা চাকরি আমরা দিইনি। তোমার সমস্ত ব্যবহার জঘন্য, ঘৃণ্য! তোমার চাকরি এখানে এই মুহূর্তে খতম হোলো। নতুন লোক আমরা তোমার বদলে পাঠাচ্ছি। তুমি পাগল কি না জানি না, তবে এটুকু জানি যে খ্রীস্টধর্মের তুমি চরম শত্রু।

বেশ কিছুটা স্তব্ধতার পরে আবার প্রশ্ন হোলো,—তোমার স্বপক্ষে কোনো কথা তুমি বলতে চাও?

একটি শব্দও জোগালো না ভিনসেণ্টের মুখে। শুধু একবার তার মনে এল তার চাকরি পাওয়ার প্রথম দিনটির কথা।

শেষ পর্যন্ত ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক বললেন,—লোকটার আর কোনো আশা নেই। চলুন, আর থেকে কী হবে এখানে! ওয়াম্স্ শহরে যদি একটা ভালো হোটেল না মেলে তো সেই আবার মন্সেই পেঁছিতে হবে আজ রাত্রে।

১১

পরের দিন সকালে কয়েকজন প্রবীণ শ্রমিক ভিনসেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

তারা বললে,—মশিয়ে, জ্যাকেস ভার্নি মারা যাবার পর বুদ্ধি পরামর্শ দেবার মতো আপনি ছাড়া আর কেউ আমাদের নেই। আপনিই বলুন আমরা কী করব। না খেতে পেয়ে এমনি তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে আমরা কেউই চাই না। আপনি একবার ওঁদের সঙ্গে দেখা করুন, ওঁদের বুঝিয়ে বলুন, আমাদের সাথীদের দেহগুলো অন্তত আমাদের যেন তুলতে দেয়। তারপর আপনি যা বলেন তাই আমরা করব। মরতে বলেন মরব, কাজে যোগ দিতে বলেন দেব।

ভিনসেণ্ট স্বীকার করল, দেখা করতে গেল 'ওঁদের' সঙ্গে,—খনি-মালিকদের দপ্তরে। শোক-কাতর ম্যানেজারের মুখচ্ছবি, দরদভরা কণ্ঠ। তাঁর কথা হোলো,—আমি ম্লান মশিয়ে' ভিনসেণ্ট, আমরা খুঁড়ে খুঁড়ে মৃতদেহ শেষ পর্যন্ত তুলতে দিইনি বলে শ্রমিকদের সেটা খুবই লেগেছে। কিন্তু তাতে লাভটা কী হোতো বলুন? কোম্পানি ঠিক করেছে ঐসব নিচের খাটালগুলো বন্ধই করে দেবে—ওগুলোয় কাজ করা লোকসান। তবু হয়তো ওগুলোকে আবার মাসখানেক ধরে খুঁড়ে খুঁড়ে মড়াগুলোকে উদ্ধার করা যেত। তারপর এক কবর থেকে আর এক কবরে তাদের ঠাঁই হোতো, তার বেশি তো কিছু নয়?

ভিনসেণ্ট বললে,—যারা মরেছে তাদের কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের জন্যে কিছু করুন! খনির মধ্যে তাদের নিরাপত্তার জন্যে এখন থেকে অন্তত উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি?

—নিশ্চয়ই উচিত, ম্যানেজার বললেন,—তবে কিনা, যদি সাধ্যে কুলোয়। কিন্তু তা যদি না কুলোয়, তাহলে দিনের পর দিন মৃত্যুকে সামনে রেখেই তাদের খনির মধ্যে কাজ করে যেতে হবে। আপনি তো ব্যাবসার দিকটার নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু জানেন না। কোম্পানির এমনি অবস্থা যে, নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্যে একটি পয়সা খরচ করবার উপায় নেই। আসল ব্যাপারটা কী জানেন,—অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চারদিক জুড়ে এমনি মজে এসেছে যে শ্রমিকদের জন্যে দু'পয়সা বেশি খরচ করার ক্ষমতা কোথাও কারো নেই। এমনি পরিস্থিতি, যে আমরা প্রায় ডুবতে বসেছি। আপনি বরং ওদের এই কথাটা বুঝিয়ে বলবেন যে, আর দু-এক সপ্তাহ কয়লা তোলা এরা যদি বন্ধ রাখে, তাহলে এমনিতেই খনিটা একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। তখন যে বেচারাদের কী হবে ভগবানই জানেন!

পরাজিত ভিনসেণ্ট ফিরে এল গ্রামে।—ভগবানই জানেন?—সত্যি? না। না, তিনিও হয়তো জানেন না।

পরাস্ত সে। শ্রমিকদের কোনো কাজে আর সে আসবে না। এই নির্দেশ তাকে দিতে হবে—ফিরে যাও তোমাদের কাজে, দিনের পর দিন পাতালের কারাগারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটো,—অর্ধাহারে অর্ধমৃত জীবন—দিন গোণো কবে মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে, প্রতীক্ষা করো কবে আসবে অপঘাত-মৃত্যুর মুক্তি। কোনো সাহায্যই সে করতে পারল না,—ভগবান পর্যন্ত তাদের ওপর বিরূপ। এদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে সে এসেছিল, কিন্তু কথা তার ফুরিয়েছে। মালিকরা এদের শত্রু,—একথা বললে সব কথা বলা হবে না। এদের শত্রু এদের ভাগ্যবিধাতা।

—ফিরে যাও কাজে, ফিরে যাও অভিশপ্ত জীবন্মৃত্যুর করাল ছায়ায়। কোনো উপায় নেই। কোনো পথ নেই। এতোদিনে যা কিছু করতে চেয়েছি—সব প্রমাণ হয়েছে অর্থহীন। হৃদয় নিংড়ে নিংড়ে যতো প্রার্থনা করেছি,

বোবা আকাশে তা মিলিয়ে গেছে, বধির ভগবানের কানে তা পেঁছিয় নি। ধর্মপ্রচারণী সমিতি যে তাকে বরখাস্ত করেছে—এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। কোন্ সুখে আর সে প্রার্থনা করত এই বঞ্চিত সর্বহারাদের হয়ে?

ব্যর্থতার এই চরম মুহূর্তে হঠাৎ ভিনসেণ্ট উপলব্ধি করল একটি সত্য,—যা অনেকদিন থেকেই তার মনে ভেসে ভেসে উঠেছিল। মিথ্যে কথা—ভগবান আর তাঁর প্রসাদ, তাঁর প্রতি বিশ্বাস আর আত্মনিবেদন,—এ শুধু স্তোক বাক্য, হতাশার নীরন্ধ্র রাত্রি-অন্ধকারে নিরুপায় একলা মানুষের সুলভ আত্মপ্রবঞ্চনা। তার বেশি কিছু নয়। কেননা ভগবান নেই, শুধু ভাগ্য আছে। ভাগ্য থেকে নিস্তার নেই মানুষের।

১২

ধর্মঘট বন্ধ করে শ্রমিকরা ফিরে গেল খনিতে। কাজ ফুরোলো ভিনসেণ্টের। থিয়োডোরাস ভ্যান গক্ ধর্মপ্রচারণী সমিতির কাছ থেকে ছেলের কীর্তির খবর পেলেন। লিখলেন,—খুব হয়েছে, ইটেনে ফিরে এস। গির্জার দরজা বন্ধ করে শ্রমিক-বস্তির ঘর ছেড়ে ভিনসেণ্ট আশ্রয় নিল ডেনিসদের বাড়িতে।

আবার দেউলিয়া জীবন,—হিসেবে লাভের ঘরে শূন্য। অর্থ নেই, কর্ম নেই, নেই স্বাস্থ্য, নেই আদর্শ-উদ্দীপনা। কোনো পথ, কোন আশা, কোনো লক্ষ্য নেই সামনে। যতদূরে তাকাও, শুধু শূন্যতা। ছাব্বিশ বছর বয়স,—ভাগ্যে শুধু ব্যর্থতার বোঝা। পাতলা হয়ে এল মাথার চুল, মুখভর্তি জট-পাকানো লাল দাড়ি, সুপুষ্ট ঠোঁটদুটির বদলে খালি তীক্ষ্ন শীর্ণ একটি রেখা, চোখদুটি যেন কালো উনুনের দুটি গর্তে জ্বলন্ত দু-টুকরো অঙ্গার।

মাদাম ডেনিস দিলেন একটুকরো সাবান আর এক-গামলা জল। শীর্ণ জিরজিরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সে পরিষ্কার করল। দাড়ি কামালো সযত্নে, ফুটে উঠল হাড়-বার-করা বুভুক্ষু মুখমণ্ডলটা। অনেকদিন পরে সে চুল আঁচড়ালো। মাদামের কাছ থেকে তাঁর স্বামীর পোশাক ধার করে পরে নিল। তাঁর রান্নাঘরে বসে পেট ভরে খেল অনেকদিন পরে। ভোজ্য বস্তুর পরিচয় সে ভুলে গিয়েছিল যেদিন খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে প্রায় সেদিন থেকেই।

দিন কাটে। শ্রমিকদের সঙ্গে সে কথা বলে না আর, যায় না তাদের ঘরে। তারাও তাকে এড়িয়েই চলে এখন। তারাও মনে মনে বুঝেছে যে কাজ তার ফুরিয়েছে। এই নির্বাক বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে সে দূরে সরে যায়। বরিনেজের দৈনন্দিন জীবন আবর্তিত হয় আপন অন্ধ বৃত্তে।

বাড়ি থেকে মাঝে-মাঝে চিঠিপত্র আসে। কিছুটা পড়ে, কিছুটা পড়ে না। একটি চিঠিতে খবর এল, কে ভস্-এর স্বামীটি মারা গেছে। খবরটি এমন কিছু সাড়া জাগালো না মনে।

দিন কাটে। ভিনসেণ্ট শুধু খায়, ঘুমোয়, আর একা-একা ঘুরে ঘুরে

বেড়ায় আচ্ছন্নের মতো। শরীরটা একটু সারে, জোর বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাপ বাড়ে গ্রীষ্মের। কয়লা খনির মাঠ আর পাহাড় আর চুল্লি সারাদিন রোদ পোহায়। ভিনসেণ্ট নিঃসঙ্গ হেঁটে হেঁটে বেড়ায় উদ্দেশ্যবিহীন,—ক্লান্তি যখন আসে, হয় কোথাও বসে বিশ্রাম করে, না হয় ঘরে ফিরে গিয়ে গা এলিয়ে দেয়।

হাতের টাকা ফুরিয়ে এল। সাহায্য করল ছোট ভাই থিয়ো। সঙ্গে চিঠিতে লিখল,—বরিনেজে বসে বসে সে যেন জীবনটাকে নষ্ট না করে, এই টাকা দিয়ে আবার নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। টাকাগুলো সে তুলে দিল মাদাম ডেনিসের হাতে।

কেন সে পড়ে আছে বরিনেজে? আর কোথাও যাবার নেই বলে। কেন সে নিষ্ক্রিয়? করবার কিছু নেই বলে। ঈশ্বরকে সে হারিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছে নিজেকে। থিয়ো পর্যন্ত চিঠি লেখা বন্ধ করল। দাদার ওপর আর তার আস্থা নেই। দুঃখ করে কী হবে? নিজেরই ওপর যে তার আস্থা নেই। পৃথিবীর পথে পথে সে ঘুরছে উদ্দেশ্যহারা ব্যর্থ প্রেতের মতো। কোথায় জীবনের মন্ত্র? কোথায় পন্থা-সন্ধান?

আরো কয়েক সপ্তাহ কাটল। আস্তে আস্তে ভিনসেণ্ট ফিরে যাচ্ছে পুরোনো একটি নেশায়,—বই পড়ার নেশা। একদা বই পড়া তার সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ছিল। নিজের জীবনের দিকে এখনো সে তাকাতে পারছে না, তবে বুঝি কৌতূহল জেগেছে অপরের জীবন সম্বন্ধে,—অপরের আনন্দ বেদনা, সাফল্য অসাফল্যের কাহিনীর প্রতি—পুস্তকের মাধ্যমে।

আজকাল সারাদিন সে মাঠেই কাটায়, গাছের ছায়ায় বসে শুয়ে বই পড়ে। বাড়িতে থাকলে হয় রান্নাঘরের এক কোণে একটা ঝোলা চেয়ারে বসে, নাহয় নিজের বিছানায় শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার যায় সাহিত্য-পাঠে। তারই মতো শত-শত সাধারণ লোক, যারা জীবন-যুদ্ধে কিছুটা বা জিতেছে আর অনেকটাই হেরেছে—তাদেরই কাহিনী সে পড়ে। এই পড়ার মধ্য দিয়েই নিজের সম্বন্ধেও তার ধারণাটা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আমি ব্যর্থ, আমি নিরুপায়, জীবন আমার বৃথা,—হতাশার এই ঘন অন্ধকারটা কাটতে থাকে, মনে প্রশ্ন জাগে -এবার আমি কী করব, কী নিয়ে জীবন কাটাব, চলব আবার কোন্ পথে? অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে মন জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরের সন্ধান করে।

বাড়ি থেকে কটা চিঠি আসে বাবার। অর্থহীন আলস্যে সে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে,—এই দায়িত্বজ্ঞানহীন অসামাজিক জীবনযাত্রা কবে সে শেষ করবে, কবে সে একটা কিছু করবার চেষ্টাটুকু অন্তত আবার শুরু করবে?

কবে—তা সে কি নিজেই জানে?

অবশেষে একদিন ভিনসেণ্টের পড়ার নেশা একেবারে ছুটে গেল—হাত দিয়ে একটা বই স্পর্শ করার প্রবৃত্তি পর্যন্ত আর রইল না। ঈশ্বরে বিশ্বাসটুকু পর্যন্ত

যেদিন সে হারিয়েছিল, সেদিন চৈতন্য থেকে লুপ্ত হয়েছিল সমস্ত অনুভূতি। দেহটা ছিল কায়ক্লেশে চলমান,—জড় অন্তর। তারপর এই ক-সপ্তাহ ধরে একটানা সাহিত্যপাঠে আবার ফিরে পেয়েছে অনুভূতির জোয়ার,—ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে মনের দু-কূল। কিন্তু কোথায় এ স্রোতের শেষ? এ বন্যা তো শুধু হতাশার আর যন্ত্রণার। মনে হচ্ছে হয়ত এখনো তার মধ্যে কিছুটা ভালো আছে, কিছুটা সম্ভাবনা আছে,—সত্যিই সে মূঢ় মূর্খ হতভাগা নয়,—হয়ত পৃথিবীতে কিছু সে করবে, কিছু রইবে তার অবদান। কিন্তু এই অনুভূতি তো নিষ্ফলা। এ শুধু হতাশের আত্মস্তুতি—প্রকৃত সান্ত্বনা এতে কোথায়? কেননা, কী যে করবে তা সে জানে না—এটুকু শুধু জানে, এ পর্যন্ত যা কিছু করেছে তা সব মিশেছে ধুলোয়—যে পথে চলেছে, পৌঁছেছে ব্যর্থতায়। তৃষ্ণার্ত সে, এসে দাঁড়িয়েছে শুষ্ক তীরে,—কোথায় জীবনস্রোত-সন্ধান?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্তর নেই। ভাবনার পর ভাবনা, নিরসন নেই। এমনি উদ্দেশ্যহীনতায় দিন কাটে, কাটে মাস। আবার পাতাঝরা শীত ঋতু আসে। কখনো বাবা টাকা পাঠান কয়েকটা,—কখনো বা গোপনে সাহায্য করে ছোট ভাই থিয়ো। যখন যা পায়, গৃহকর্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। আশ্রয়টা আছে, আহারও যা-হয় কিছু জোটে।

নভেম্বর মাসে একদিন সকাল বেলা ভিনসেন্ট বাড়ি থেকে বার হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটতে হাঁটতে মার্কাস খনির দেয়ালের ধারে মরচে-ধরা বরবাদ একটা লোহার চাকার ওপরে বসল। বসে রইল চুপ করে। শূন্য মন, শূন্য হাত। গেট থেকে বার হয়ে এল বুড়ো একজন শ্রমিক। হেঁট মাথাটার ওপর চোখ-ঢাকা টুপি, দুহাত ছেঁড়া পকেটে, জরা ক্লান্তি আর জীবনভোর দারিদ্র্যে ঝুঁকে পড়া দুই কাঁধ, দুর্বল পায়ে স্খলিত গতি। ভিনসেন্টের মনে হোলো কী একটা নাম-না-জানা আকর্ষণে ঐ পথচারী মূর্তিটি যেন তাকে টানছে। খেয়ালবশে পকেটে হাত পুরে সে বার করল ছোট্ট একটা পেন্সিল আর একটা খাম। খামের ওপিঠের সাদা কাগজের ওপর পেন্সিলের শিস বুলিয়ে তাড়াতাড়ি সে এঁকে ফেলল শূন্য মাঠের ওপর দিয়ে অপসৃয়মাণ ঐ লোকটার ছবি।

খাম থেকে বার হোলো বাবার চিঠি। চিঠির কাগজটারও একটা পিঠ সাদা। আর-একটি লোক বার হোলো খনির দরজা দিয়ে। লোকটি তরুণ, সে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ দরজার কাছে। ভিনসেন্ট আঁকল তাকেও,—তার তরুণ বলিষ্ঠ দেহের ভিন্ন রকমের ভঙ্গিটা কাগজে পেন্সিলে আয়ত্ত করে নেবার সময়টুকু সে অপব্যয় করলে না।

১৩

ডেনিসদের বাড়িতে ফিরেই ভিনসেন্ট জোগাড় করল কয়েকটা সাদা কাগজ আর মোটা একটা পেন্সিল। সাদামাটা স্কেচদুটোকে টেবিলে রেখে সেগুলোর

অনুসরণে সে বড়ো করে আঁকতে শুরু করল। আড়ষ্ট তার হাত,—মাথার মধ্যে যে রেখাটি আসে, অপটু অবাধ্য আঙুল কাগজের বুকে তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। বারে বারে মোছে আর আঁকে।

অন্ধকার যে কখন ঘনিয়ে এসেছে টেরই পায়নি। মাদাম ডেনিস দরজায় টোকা দিলেন,--মশিয়ে ভিনসেণ্ট, খাবার দেওয়া হয়েছে। আসুন।

—খাবার! এখুনি? এত দেরি হয়ে গেছে নাকি?

কোনো রকমে সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা গলাধঃকরণ করে ভিনসেণ্ট আবার ঘরে ফিরে এসে দরজায় খিল দিল। দেয়ালে পিন ফুটিয়ে স্কেচদুটোকে এঁটে দূরে থেকে সেগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগল। মনে কেমন একটা উৎসাহ, চোখে কিসের যেন দীপ্তি। মনে মনে বললে,—জঘন্য! যাচ্ছেতাই এঁকেছি! আচ্ছা দেখা যাক, কাল বোধহয় আর-একটু ভালো হবে ছবিদুটো।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছবিদুটোর দিকে সে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেরোসিনের আলোটা জ্বলছে ঠিক ছবিদুটোর তলায়। দেয়ালে আরো অনেকগুলো ছবির প্রিণ্ট টাঙানো। গির্জেবাড়ি থেকে সেগুলো খুলে এনে আবার এ ঘরের দেয়ালে টাঙিয়েছিল,—কিন্তু চোখ মেলে এগুলোকে দেখেনি একদিনের জন্যেও। কতোদিন পরে আবার ছবির দিকে চোখ পড়েছে। ছবি! এতদিন সে ছবি ভুলে ছিল কী করে? আজ হঠাৎ মন-কেমন করছে—রেখার জন্যে, রঙের জন্যে। রেমব্রাঁ, মিলেট, দেলাক্রোয়া, মারিস—এদের জীবনের নাড়ি-নক্ষত্র সে একদা জানত,—কতো নেশা ছিল ছবি দেখার, বুঝতে চেষ্টা করার, ছবির প্রিণ্ট সংগ্রহ করার! সে শখ তার ঘুচল কী করে? আবার কি সে রেখা-পাগল হবে না, হবে না রঙ-মাতাল?

পরদিন শেষ রাতের অন্ধকারে উঠে সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে বসে রইল মার্কাসের গেটের ধারে সেই ভাঙা চাকাটার ওপর। সঙ্গে পেন্সিল ও কয়েকটা কাগজ। প্রত্যুষের আধো-অন্ধকারে কয়লা-কুলিরা খনির মধ্যে ঢুকতে লাগল। ভিনসেণ্ট ত্বরিত হাতে কাগজের ওপর বুলোতে লাগল পেন্সিলের রেখা। চলমান যাত্রীদল, তারা দাঁড়িয়ে নেই,—তারা নির্বিশেষ। সব যখন চলে গেল, ততক্ষণে ভিনসেণ্ট তার কাগজে সংগ্রহ করেছে পাঁচটি মনুষ্যমূর্তির আভাস। তাদের মুখ নেই,—তারা শুধু সারা বরিনেজের শ্রমিক-জীবনের ছায়া-নিদর্শন। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল ভিনসেণ্ট। এই ছবি তো তার আয়ত্তের মধ্যেই! এই পঞ্চমূর্তি,—এদের তো সে চেনে, এদের ভাবভঙ্গি, চিন্তা ভাবনা, আশা নিরাশা —সব কিছু তো সে জানে! তবু রেখায় কেন এরা ধরা দেয় না তার কাছে? এড়িয়ে থাকবে আর কতোদিন?

দেহ-গঠন সম্বন্ধে ভিনসেণ্টের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, সামঞ্জস্যহীন কিম্ভূত অবয়ব, অপটু হাতের রেখাগুলি এমনি বীভৎস যে তা দেখে হাসি আসাও শক্ত। তবু এইটুকুই সে বোঝে যে শুধু মানুষ সে আঁকছে না,—আঁকছে

বরিনেজের কয়লা-খনির মানুষ। আঁকে, আবার মুছে ফেলে—আবার আঁকে। নিতান্ত সহজ একটা ছবিকে কপি করে অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে। মেঘলা আকাশের গায়ে একলা একটি গাছ—এই হোলো ছবিটির বিষয়বস্তু। কিছুতেই ঠিকমতো কপি করতে পারে না। বুঝতে শেখেনি যে এতো সহজ বলেই শক্ত,—স্রষ্টা যতো কৃপণ, তার অনুকারীর বিপদও ততোটা। কপি করা ছেড়ে আবার শুরু করে নিজে থেকে আঁকতে।

সারা সকাল কাটল। ফুরিয়ে গেল কাগজ। পকেট হাতড়িয়ে দেখল দুটি ফ্র্যাংক অ ছে। পথে বার হোলো ভিনসেণ্ট। ওয়াম্‌সে না হোক মন্‌সে অন্তত কিছু ভালো কাগজ আর শুকনো ভুষি কালি পাওয়া যাবে। অন্তত দশ মাইলের হাঁটা পথ। ভাবনা কী তাতে? গ্রামের রাস্তায় শ্রমিক-বস্তির কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। অনেক দিনের চেনা মুখ মনে পড়ে। খুশি মনে সম্ভাষণ জানায়। মাইল-পাঁচেক হাঁটার পর ছোট একটা শহর। সেখানে একটি রুটির দোকানের জানলায় মিষ্টি একটি মুখ চোখে পড়ে। মেয়েটিকে ভালো করে দেখবার জন্যে দোকানটিতে ঢোকে;—শস্তা একটা বান্‌ রুটি কেনে।

মন্‌সে এক ছবিওয়ালার দোকান থেকে সে একটা হলদে কাগজের মোটা প্যাড, মোটা একটা পেনসিল আর কিছুটা ভুষি কালি কিনল। দোকানটির এক কোণে একতাড়া ছবির প্রিণ্ট। ছবিগুলো সে দেখতে লাগল এক-একটি করে। দোকানদারকে বললে,—শুধু দেখব কিন্তু। কেনবার পয়সা নেই।

দোকানীও তার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল। উত্তরে বললে,—বাঃ, দেখুন যতো খুশি। আর শুধু আজই কেন, যেদিন খুশি আসবেন, যতো খুশি ছবি দেখে যাবেন।

দশ মাইল ফিরতি পথ। নিজের গ্রামে পেঁছিতে পেঁছিতে বেলা গেল। কালো কালো পিরামিড-ঘেরা চক্রবালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে,—আকাশের মেঘে রক্তরাঙা পাড় বসানো। টিলার মাথায় মাথায় পড়ন্ত রশ্মির আলো, ছায়া-ঘেরা শান্ত সবুজ মাঠ কোথাও। ক্লান্তি সর্বশরীরে, কিন্তু কেমন যেন আনন্দ জেগেছে মনে,—কিসের জন্যে, তা সে জানে না।

পরদিন সকালে উঠেই ভিনসেণ্ট কাগজ পেন্সিল নিয়ে গেল মার্কাস খনি ছাড়িয়ে কয়লা-পাহাড়ের ধারে। কোমর বেঁকিয়ে ঘাড় কুঁজো করে মেয়েরা কয়লা-কুচি কুড়োচ্ছে,—সারাদিন ধরে ভিনসেণ্ট তাদের আঁকল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মাদাম ডেনিসকে সে বললে,—বসুন আর-একটু, চেয়ার ছেড়ে উঠবেন না। দেখুন না, কেমন একটা মজা দেখাই।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে কাগজ পেন্সিল এনে সে মাদাম ডেনিসের ছবি আঁকতে শুরু করল। হোলো একটা কিম্ভূত মূর্তি। মাদাম বললেন,—বাঃ, ঠিক

আমারই ছবি হয়েছে তো।

মাথা নেড়ে ভিনসেণ্ট বললে,—না, ঠিক হয়নি। তবে, হবে, ক-দিন সবুর করলেই দেখতে পাবেন।

এখন থেকে আবার সে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে যেতে আরম্ভ করল—তবে, —আর বাইবেল হাতে নয়, কাগজ-ক্রেয়ন হাতে। শ্রমিকরা তাকে পুরোনো বন্ধুর সমাদর দিতে লাগল আবার। ঘরের মেঝেতে বাচ্চারা খেলা করে, বৌ-ঝিরা কাজ করে উনুনের ধারে, দিনশেষে সারা পরিবার রান্নাঘরে খেতে বসে —ভিনসেণ্ট ওদের ছবি আঁকে। কালো চিমনি, কালো মাঠ আর কালো লাট্টু পাহাড়—দূরের ধানক্ষেতে লাঙল-চষা চাষী—এদেরও ছবি আঁকে সে। যেদিন আবহাওয়া পথে বার হওয়ায় বাধ সাধে, সেদিন ঘরে বসে হয়ত প্রিণ্ট থেকে কপি করে, না হয় নিজেরই এলোমেলো স্কেচগুলোকে ভালো করে রূপ দিতে বসে। রাত্রে ঘুমের আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে,—একটা-দুটো ছবি সে বেশ ভালোই এঁকেছে। পরদিন সকালবেলা সেই ছবি আবার যখন দেখে, তখন উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। নিজের কাজ দেখে নিজেরই লজ্জা করে। টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে ছবিগুলো—আবার আঁকতে বার হয়।

ব্যর্থতার যন্ত্রণা বন্য একটা জন্তুর মতো—তাকে সে বুকের খাঁচায় বন্দী করে রাখে। দুঃখের কথা সে ভাবে না,—ভুলে থাকতে চায়, তাইতেই সে সুখী। বাপের ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটছে,—এর লজ্জাটাকেও ভুলে গিয়ে শুধু ডুবে থাকতে চায় ছবি আঁকার মধ্যে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার দেয়ালের সবকটা ছবি বারে বারে কপি করে কেবল। থিয়ো তাকে এক বছরের ওপর চিঠি দেয় নি, তবু অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে সে ভাইকে লিখল মিলেটের ছবির একটা অ্যালবাম তাকে পাঠাবার জন্যে।

ক্রমে ভিনসেণ্টের মনে বাসনা জাগল অপর একজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। সে মনে মনে বোঝে যে তার ছবিগুলো কিম্ভূত—কিন্তু কোথায় তার ভুল কোথায় তার ঠিক, তার যাচাই হওয়া তো চাই। নিরপেক্ষ সমালোচক ছাড়া বলবে কী করে? হঠাৎ একদিন মনে পড়ল রেভারেন্ড পীটারসেনের কথা। তখন বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্ণ। তাড়াতাড়ি স্কেচের তাড়া থেকে খুঁজে খুঁজে বার করল নিজের আঁকা তিনটি ছবি। একটি একজন শ্রমিকের, দ্বিতীয়টিতে একটি কুলি-বৌ ঝুঁকে পড়ে উনুন ধরাচ্ছে রান্নাঘরে, আর তৃতীয়টিতে কালো পিরামিডের গায়ে দাঁড়িয়ে একটি বৃদ্ধা কয়লা-দানা কুড়োচ্ছে। ছবি তিনটে গুছিয়ে নিয়ে সে ব্রুসেলস্ যাত্রা করল।

পকেটে মাত্র তিনটি ফ্র্যাঙ্ক সম্বল, ট্রেন ভাড়ার কথা ওঠেই না। হাঁটা-পথ প্রায় পঞ্চাশ মাইল। তৃতীয় দিন বিকেলে সে পৌঁছল। এ দুদিন সে প্রায়

দিন রাত হেঁটেছে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম করেছে রাস্তার ধারে গা এলিয়ে দিয়ে। পায়ের পুরোনো জুতোটা হাঁ হয়ে যাবার ফলে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত আঙুলগুলো, গায়ের কোটে চাবড়া কাদা, মাথায় ঝাঁকড়া চুলভর্তি ধুলো আর ঝুল। পাংশু মুখ, কোটরগত চোখ। তবু প্রাণে খুশির জোয়ার। শিল্পী সে,—চলেছে আর-এক শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করতে।

পীটারসেনের মেয়েটি দরজা খুলেই আগন্তুকের চেহারা দেখে আঁৎকে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদ করে দৌড় দিল বাড়ির ভিতরে।

রেভারেণ্ড পীটারসেন দরজার সামনে এসে কয়েক মুহূর্ত ভালো করে দেখে ভিনসেণ্টকে চিনতে পারলেন। হাসিমুখে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,—আরে, ভিনসেণ্ট নাকি? এসো, এসো বাবা! কতোদিন পরে! বড়ো খুশি হলাম তোমাকে দেখে।

তাড়াতাড়ি ভিনসেণ্টকে পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে নিচু একটা চেয়ারে বসালেন পীটারসেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিনসেণ্টের সহ্যের বাঁধ বুঝি ভেঙে গেল। সারা দেহ মন ভেঙে নামল দুদিনের শুকনো রুটি চিবিয়ে অবিরাম পায়ে হাঁটার প্রতিক্রিয়া।

পীটারসেন দেরি না করে প্রস্তাব করলেন,—একটু পরিষ্কার হয়ে নিয়ে তারপর শুয়ে পড়ো এখন,—পরে সব হবে। কী বলো?

নরম চেয়ারে বসে পড়ে পিঠের শিরদাঁড়াটা আর যেন সোজা হতে চায় না। নিশ্বাসও যেন আটকে আসছে। ভিনসেণ্ট বললে—যা বলেন তাই। এতটা যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এতক্ষণ কিন্তু বুঝতেই পারিনি!

পরদিন ঘুম থেকে উঠে পেটভর্তি খাওয়ার পর ভিনসেণ্ট মুখ খুলল। দেয়ালের স্কেচগুলোকে লক্ষ করে বললে,—অনেক কাজ করে ফেলেছেন, না? এসব তো নতুন!

একমুখ হেসে পীটারসেন বললেন,—হ্যাঁ, ধর্মপ্রচারের কাজের চেয়ে ছবি আঁকার কাজটাই আজকাল ভালো লাগছে বেশি।

ভিনসেণ্ট পাল্টা প্রশ্ন করলে,—কিন্তু বিবেকের দংশন? এতোটা সময় যে নষ্ট করেন—

হো-হো করে হেসে উঠলেন পীটারসেন,—রুবেন্সের সেই গল্পটা তোমার জানা আছে? রুবেন্স্ তখন স্পেনে-হল্যাণ্ডের রাজদূত। প্রত্যেকদিন বিকেলে তাঁর প্রাসাদের বাগানে তিনি ছবি আঁকেন। স্পেনের রাজসভার একজন হোমরা-চোমরা একদিন ঠাট্টা করে বললেন, কূটনীতিবিশারদের আবার ছবি আঁকার খেয়াল দেখছি যে! রুবেন্স্ উত্তর দিলেন, আজ্ঞে না, আপনি যা দেখেন তা হচ্ছে ছবি-আঁকিয়ের মাঝে-মাঝে কূটনীতিজ্ঞ হবার খেয়াল।

ভিনসেণ্ট সলজ্জভাবে প্যাকেটটা খুলল। বললে,—আজকাল আমিও কিছু-কিছু স্কেচ করছি। তিনটি স্কেচ আমি সঙ্গে এনেছি। আপনি একটু দেখে

দেবেন ?"

নতুন শিল্পীর উম্মাদনায় খুঁত ধরা বড়ো বিড়ম্বনার কাজ। ছবি তিনটি পীটারসেন সযত্নে ঈজেলের ওপর রাখলেন। তারপর দূর থেকে দেখতে লাগলেন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে। গলা শুকিয়ে এল ভিনসেণ্টের।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পীটারসেন বললেন,—প্রথমেই আমার মনে হচ্ছে যে তুমি তোমার মডেলের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছবি আঁকো। কেমন, তাই না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অধিকাংশ ছবিই আমাকে আঁকতে হয় শ্রমিকদের ছোট ছোট খুপরির মধ্যে।

—ঠিক, সেইজন্যেই দেখছি তোমার আঁকায় পার্সপেক্টিভের অভাব। এমন একটা জায়গা ঠিক করতে পার না যেখানে তোমার মডেলের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকতে পারবে ?

—হয়তো পারব। কয়েকটা ফাঁকা কেবিন আছে বেশ বড়ো বড়ো। শস্তায় ভাড়া পেতে পারি। সেই হবে আমার স্টুডিয়ো।

—বাঃ, চমৎকার হবে তাহলে।

চুপ করে আরো কিছুক্ষণ ছবিগুলি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন,—তুমি কি কখনো ড্রয়িং শিখেছ ? আঁকবার আগে কি কাগজের সঙ্গে বিষয়বস্তুকে মিলিয়ে নেবার জন্যে কাগজে মাপজোক করে নাও ?

লজ্জায় পাণ্ডুর হয়ে ভিনসেণ্ট উত্তর দিল,—দেখুন এসব আমি কিছুই জানি নে। আমার ধারণা, কাগজ পেন্সিল নিয়ে শুরু করলেই আঁকতে পারা যায়।

—তা কী করে সম্ভব ভিনসেণ্ট ? ড্রয়িংয়ের প্রাথমিক নীতি আর পদ্ধতি-গুলো তো আগে আয়ত্ত করা চাই ! তবেই-না আস্তে-আস্তে আঁকাটা সঠিক হবে। এই দ্যাখো, ড্রইংয়ে তুমি ভুল করেছ কোথায়—

পেন্সিল আর রুলকাট নিয়ে পীটারসেন স্ত্রীলোকের ছবিটার মুখ ও দেহ ঘিরে চতুর্ভুজ আঁকলেন। শরীর ও মুখের মধ্যে যে কোনো আয়তনিক সামঞ্জস্য নেই তা তিনি ভিনসেণ্টকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর শরীরের অনুপাতে নতুন করে মাটিতে আঁকতে লাগলেন। বোঝাতে বোঝাতে আর আঁকতে আঁকতে একঘণ্টা কাটল। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে ছবিটা ভালো করে দেখে বললেন,—দ্যাখো দিকিনি ? এবার মনে হচ্ছে দেহের ওপর মাথাটা ঠিক বসেছে।

ঘরের অপর দিকে গিয়ে পীটারসেনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভিনসেণ্ট ছবিটা দেখতে লাগল। সত্যিই ছবিটা দাঁড়িয়েছে ভালো, মাথার সঙ্গে অন্যান্য অবয়বের চমৎকার সামঞ্জস্য, কোনো ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু ভিনসেণ্টের মনে হোলো,—বরিনেজের সেই কয়লা-কুড়ানি মেয়েটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, এ যেন যে-কোনো একটি সুষ্ঠুভাবে আঁকা হেঁট হয়ে দাঁড়ানো সারা পৃথিবীর যেখানকার হোক যেকোনো একটি মেয়ে, আর কিছু নয়।

ভিনসেণ্ট কোনো কথা বলল না, ঈজেলের সামনে গিয়ে এ ছবিটির পাশে তার দ্বিতীয় ছবিটি রাখল, যেটিতে শ্রমিক-বধূ উনুন ধরাচ্ছে। তারপর ফিরে এসে দাঁড়ালো পীটারসেনের পাশে।

পীটারসেন অনেকক্ষণ ধরে পাশাপাশি দুটো ছবি দেখলেন। পরে বললেন,—এবার বুঝতে পেরেছি গোলমালটা হয়েছে কোথায়। তুমি ভাবছ যে আগেকার ছবিটা আমি সংস্কার করে দিয়েছি, সুন্দর করে দিয়েছি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছবির যা চরিত্র তাকে নষ্ট করেছি, তাই না? হ্যাঁ, হয়তো মিথ্যে নয়। আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, তোমার এই দ্বিতীয় ছবিটা কেন আমাকে টানছে। সত্যি বলতে, জঘন্য তোমার ড্রয়িং, মুখটা যে এঁকেছ তা তো মুখ বলেই মনে হয় না। কিন্তু তবু তোমার স্কেচটার মধ্যে কী যেন একটা আছে যাকে অনুকরণ করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কী সেটা বল তো?

—কী করে বলব বলুন? আমি তো যা দেখেছি তাই আঁকবার চেষ্টা করেছি।

পীটারসেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। ঈজেল থেকে প্রথম ছবিটি সরিয়ে নিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে ফেললেন। দ্বিতীয় ছবিটাই শুধু রইল চোখের সামনে। বললেন,—ছিঁড়লাম বলে কিছু মনে কোরো না। ছবিটা তো আমি নষ্ট করেই ফেলেছি।

আবার অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বিড়-বিড় করার পর পীটারসেন বললেন,—ভিনসেণ্ট, সত্যি বলব এমন কুৎসিত ড্রয়িং আমি কখনো দেখিনি। আর্ট স্কুলের নতুন-ভর্তি ছেলেও এ ড্রয়িং দেখে হাসবে, মাস্টার এটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়বে। কিন্তু তবু কেন জানি নে মেয়েটা আমাকে টানছে। চোখ ফেরাতে পারছি নে, ও যেন আমার অনেক দিনের চেনা।

আস্তে আস্তে ভিনসেণ্ট বললে,—ওকে আপনি দেখেছেন রেভারেণ্ড; বিস্মৃতির পার থেকে ও আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কোথায় দেখেছি বলো তো?

—হয়তো—বরিনেজে।

চমকে ভিনসেণ্টের দিকে তাকালেন পীটারসেন। তারপর বললেন,—ঠিক বলেছ, দেখেছি ওকে। ওর মুখ নেই, কিন্তু মূর্তি আছে। ও বিশেষ কোনো মেয়ে নয়। তোমার বরিনেজের সবকটি শ্রমিক বধূর ও প্রতিভূ। ওকে তুমি খুঁজে পেয়েছ, প্রকাশ করেছ, এর দাম হাজারটা নির্ভুল ড্রয়িংয়ের চেয়ে বেশি। ও বিশেষ কোনো মেয়ে নয়। নামহীনা চিরন্তনী। ওর গুরুত্ব এতক্ষণে আমার প্রাণে সোজাসুজি এসে বাজছে।

ভিনসেণ্টের বুক দুরুদুরু করতে লাগল। পীটারসেনের প্রশংসা,—

পীটারসেন অভিজ্ঞ শিল্পী,—সত্যিই তার ছবিটার কোনো দাম আছে তাহলে !

পিটারসেন আবার বললেন,—ছবিটা আমাকে দেবে নাকি ভিনসেণ্ট ? আমি বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব। মেয়েটার সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করছে যে !

১৪

ছবির বই এল থিয়োর কাছ থেকে, কিন্তু এক লাইনও চিঠি নয়। প্রবল উৎসাহে ভিনসেণ্ট ছবিগুলো কপি করা শুরু করলে। এছাড়া পীটারসেনের নির্দেশ-মতো সে একটা ফাঁকা কুটির ভাড়া নিয়ে ডেনিসদের বাড়ি ছেড়ে সেখানে উঠে গেল। এই তার স্টুডিয়ো আর আস্তানা একসঙ্গে। দেয়ালের একধারে মডেলকে দাঁড় করিয়ে অন্যদিকের দেয়ালের কাছে দাঁড়ালে মাঝে যথেষ্ট জায়গা থাকে। এই দূরত্বটুকুর জন্যে দৃশ্যমান বস্তুকে সঠিক আকারে দেখা যায়। শ্রমিকদের বৌ-ঝিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তাকে ছবি আঁকায় সাহায্য করে। রবিবার দিন শ্রমিকরা ভিড় করে আসে, ভিনসেণ্ট দ্রুতগতিতে একের পর এক স্কেচ করতে থাকে। আঁকার সময় জোড়া-জোড়া কৌতূহলী চোখ পেছনে ভিড় জমায়।

দিনের পর দিন শেষ রাত্রে আড়াইটের সময় সে মার্কাসের গেটের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করে। আধো-অন্ধকারে কাঁটাবেড়ার পাশ দিয়ে সরু পথ ধরে মেয়ে-পুরুষ শ্রমিক খনির হাঁয়ের মধ্যে ঢোকে। সে বড়-বড় ড্রয়িং করে এই-সব আগন্তুক শ্রমিকদের,—খনির বাড়ি, ক্রেন, কালো পাহাড় প্রভৃতি সে ফুটিয়ে তোলে ছবির পেছনদিকে আকাশের গায়ে। একটা বড়ো ড্রয়িং খুব যত্ন করে এঁকে সে থিয়োর কাছে পাঠিয়ে দিলে।

জীবনের পুরোনো ব্যর্থতার বেদনা সে আস্তে আস্তে ভোলে। নতুন নেশা আবার প্রাণে খুশির জোয়ার তোলে। শিল্পের নেশা, সৃষ্টির নেশা। পরমুখাপেক্ষী জীবনে কতোদিন পকেটে পয়সা থাকে না, মাদাম ডেনিসের কাছ থেকে ধার করা শুকনো রুটি চিবিয়ে কাটাতে হয়, কিন্তু দুঃখ নেই তাতে। পেটে ক্ষুধা থাকলেই বা কী ? মন যে দিনে দিনে সুধায় ভবে উঠছে।

দু-মাস কাটল আরো। প্রত্যুষ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আঁকে নিজের মতো করে, আর রাত্রিবেলা আলো জেলে বসে কপি করে। এরপর আবার তার প্রাণে জেগে উঠল অন্য একজন শিল্পীর সঙ্গে দেখা করার আর তার সঙ্গে আলোচনার বাসনা। কেননা এঁকে তো সে চলেইছে, কিন্তু এগোচ্ছে কি না এও ঠিক যে বুঝতে পারছে না। যদি শিক্ষকের মতো শিক্ষক একজন পেত তার সে জুতো পালিশ করত, ঘর ঝাঁট দিয়ে দিত দিনে দশবার এই শিক্ষার বিনিময়ে।

ছেলেবেলা থেকে ভিনসেণ্ট শিল্পী হিসেবে জুলি ব্রিটনকে শ্রদ্ধা করে এসেছে। তিনি থাকেন যে শহরে তা বরিনেজ থেকে একশো মাইলের বেশি দূরে। ভিনসেণ্ট যাত্রা করল তাঁর কাছে। কিছুটা পথ ট্রেনে যাবার মতো

ভাড়া ছিল—তারপর পাঁচ দিন সে দিনে হাঁটল, রাত্রে আশ্রয় নিল কোনো-না-কোনো চাষীর খামারে খড়ের গাদায়। শেষ পর্যন্ত যখন এল কুরিয়ার্স শহরে বৃক্ষছায়ায় ঘেরা জুলি ব্রিটনের লাল টুকটুকে বিরাট বাড়ির সামনে, হঠাৎ যেন তার সর্বশক্তি লোপ পেল, আতঙ্কে কেঁপে উঠল বুক। অপরিচিত সে, অত বড় শিল্পীর স্টুডিয়োর দরজায় করাঘাত করার ভরসা সে পেল না। রেভারেণ্ড পীটারসেনের দেওয়া বুটজুতোটা ছিঁড়ে এসেছে, কপর্দকশূন্য পকেট, সে আবার শুরু করল প্রত্যাবর্তন। বরিনেজে নিজের কুটিরে শেষ পর্যন্ত যখন সে আবার পৌঁছল, তখন জ্বরে তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, থর-থর করে কাঁপছে হাত পা। কোনো চিঠি আসেনি, কোনো টাকা আসেনি বাড়ি থেকে। মলিন বিছানায় সে লুটিয়ে পড়ল। শ্রমিকদের স্ত্রীরা পালা করে তার সেবা করতে লাগল, নিজেদের স্বামী-সন্তানের মুখের খাবার থেকে যা পারে বাঁচিয়ে এনে তাকে খাওয়াতে লাগল।

শরীর যতো ভেঙেই পড়ুক মাথাটা খারাপ হয়নি। বুঝতে পারছে, এমনি করে আর দিন চলবে না। ফিরে যেতেই হবে। কোথায় যাবে! ইটেনে যাবে বাবা মার কাছে? প্যারিসে, থিয়োর সান্নিধ্যে? আমস্টার্ডামে, কাকার আশ্রয়ে? করবে কী? চাকরি, দোকানদারি, কেরানিগিরি, ইস্কুলমাস্টারি—এদের মধ্যে কোনটা আবার বেছে নেবে?

দুর্বল মস্তিষ্কে ভাবনাস্রোত ভেসে চলে। কূল মেলে না কোনো। এমনি দিনে হঠাৎ একদা তার জীর্ণ ঘরের দরজা ঠেলে কে একজন ঢুকল।

তার ভাই থিয়ো।

১৫

ক-বছরে থিয়ো বদলেছে অনেক। মুখে চোখে ফুটে উঠেছে সাফল্যের ছাপ। বয়স তার মাত্র তেইশ, এরই মধ্যে প্যারিসে ভালো ছবি-বিক্রেতা হিসেবে সে নাম কিনেছে,—আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে তার খাতির খুব। পোশাকে, আচরণে, কথাবার্তায় সে পুরোদস্তুর কেতাদুরস্ত। গায়ে তার হালফ্যাশনের কালো কোট, চকচকে কালো সাটিনের ল্যাপেলওয়ালা,—তার নিচে উঁচু কলারের শার্ট, মস্ত ফাঁস বাঁধা সাদা রঙের টাই। ভ্যান গক্ পরিবারের আর সকলের মতো চওড়া কপাল তারও। এদিকে ব্রাউন রঙের পাতলা ঢেউখেলানো চুল, নরম নরম চোখ, ছিপছিপে মেয়েলি চেহারা।

দরজা ঠেলে ঢুকেই থিয়ো থমকে দাঁড়ালো, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সে প্যারিস ছেড়েছে,—সেখানে তার বাড়িতে আসবাবে সাজসজ্জায় সৌখিন স্বাচ্ছন্দ্যের সমারোহ। এখানে এই ভাঙা ঘরের মেঝেতে মলিন নোংরা একটা তোশকের ওপর ছেঁড়া একটা কম্বলে বুক পর্যন্ত ঢেকে বিশীর্ণ প্রেতদেহ নিয়ে শুয়ে আছে তারই ভাই ভিনসেণ্ট। ফাটা

তক্তার দেয়াল, ঘরের কোণে আসবাব বলতে মাত্র এবড়োথেবড়ো একটা টেবিল আর ভাঙা একটা চেয়ার।

শীর্ণকণ্ঠে ভিনসেণ্ট বললে,—এসো থিয়ো, কী খবর?

থিয়ো তাড়াতাড়ি এগিয়ে বিছানার ধারে ঝুঁকে পড়ে বললে,—ব্যাপার কী ভিনসেণ্ট? তোমার চেহারা এ কী হয়েছে?

—কিছু না। মাঝে একটু অসুখে পড়েছিলাম, এখন ভালো আছি।

—কিন্তু এই—এই গর্ত? এরই মধ্যে তুমি থাকো নাকি?

—কেন, খারাপ নাকি? এই তো আমার ঘর, এই তো আমার স্টুডিয়ো।

—ও ভিনসেণ্ট। ভাইয়ের কপালে থিয়ো ডান হাতটা রাখল। উদ্গত অশ্রুবাষ্পে তার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বার হোলো না।

আস্তে আস্তে ভিনসেণ্ট বললে একটু পরে,—ঠিক তুমি এসে পড়লে থিয়ো, তাই না। ভারি ভালো লাগছে আমার।

—আচ্ছা এবার বলো তো ভিনসেণ্ট তোমার কী হয়েছে? শরীরটা এতটা ভাঙল কেমন করে?

ভিনসেণ্ট তার কুরিয়ার্স যাত্রার কাহিনী শোনালে।

থিয়ো বললে,—বুঝেছি এবার। আসলে তোমার অসুখ দুর্বলতা। ওখান থেকে ফিরে এসে অবধি পেট ভরে খেয়েছ একদিনও? দেখাশুনো কে করছে তোমার?

—লোকের অভাব নেই। শ্রমিক-বৌরা খুব যত্ন করে আমার সেবা শুশ্রূষা করছে বৈকি!

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু পথ্য? খাবার-দাবার কিছু তো দেখছি নে ঘরে।

—ওরাই রোজ এনে দেয় কিছু কিছু। যেটুকু পারে,—একটু রুটি, কফি, কখনো একটু পনির। তাতেই চলে যায়।

—কিন্তু ভিনসেণ্ট, রুটি আর কফি খেয়ে তোমার শরীর সারবে কী করে? মাংস, ডিম, মাখন—এসব কিনতে পারো না?

—কেন পারব না? তবে কিনা, দাম দিতে হয় যে! এসব ভালো ভালো খাবার,—দাম তো কম নয়! ঠিক কি না বলো?

আবার যেন গলা বুজে এল থিয়োর। বিছানার ধারে বসে ভাইয়ের হাতটা চেপে সে বললে,—মাপ করো আমাকে ভাই, মাপ করো আমাকে! তোমার এমনি অবস্থা আমি ধারণাই করতে পারিনি!

—ছিঃ, ভিনসেণ্ট বললে,—কী আবার অবস্থা আমার, দুদিন পরেই তো আবার চাঙা হয়ে উঠব। নাও এবার তোমার খবর সব বলো। প্যারিস কেমন লাগছে? ইটেনে গিয়েছিলে নাকি সম্প্রতি?

চকিতে চোখ মুছে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো থিয়ো, বললে,—চুপ করে শুয়ে থাকো আমি যতক্ষণ না আসি। নোড়ো না একদম।

আধঘণ্টাটাক পরে থিয়ো ফিরে এল। সঙ্গে দুটো ছেলে, তাদের হাতে নানান জিনিসপত্র। শহরে গিয়েছিল, সেখান থেকে কিনে এনেছে বিছানাপত্র, পোশাক, বাটি, গেলাস, ডিশ, আর খাবার দাবার।

গা থেকে কোটটা খুলে সে জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার উনুনটা কী করে ধরাও বলো তো?

ভিনসেণ্ট বললে,—গোড়ায় খানিকটা কাঠকুটোয় আগুন ধরিয়ে তারপর ঐ যে কয়লা রয়েছে,—চাপিয়ে দাও।

—কয়লা? গুঁড়োগুলোর দিকে তাকিয়ে থিয়ো বললে,—একে তোমরা কয়লা বলো নাকি?

—হ্যাঁ, ঐ আমাদের কয়লা। থাক থাক, তুমি পারবে না। দাঁড়াও আমি উঠছি।

—খবরদার! চুপটি করে শুয়ে থাকো বিছানায়। নড়বে তো মার দেব।

ভাইয়ের ধমক শুনে হাসি এল ভিনসেণ্টের, অনেক দিন পরে প্রাণে খুশির আমেজ। চুপ করে শুয়ে শুয়ে সে দেখতে লাগল। উনুনটা ধরালো থিয়ো। নতুন কেনা একটা বাটিতে সে সেদ্ধ করল একজোড়া ডিম, একটা বাটিতে রাঁধল কিছুটা সবজি, আর-একটা বাটিতে ফুটোলো দুধ। তারপর উনুনের ওপর টোস্টার চাপিয়ে কয়েক খণ্ড রুটি কেটে নিয়ে তাদের পিঠে লাগালো মাখনের প্রলেপ।

পথ্য রান্না শেষ করে থিয়ো টেবিলের ওপর সাদা তোয়ালে পেতে তার ওপর খাবার-দাবার সাজালো। টেবিলটা বিছানার কাছে টেনে এনে বললে,—নাও, মাথা তোলো, খাইয়ে দিই।

—কী ছেলেমানুষি করছ? আমি নিজে খেতে পারি নে?

—আবার অবাধ্য হচ্ছ? ভয় নেই বুঝি? যা বলছি লক্ষ্মী ছেলের মতো করো। কথাটি নয়।

থিয়ো আস্তে আস্তে খাইয়ে দিতে লাগল ভিনসেণ্টকে। কতোদিন পরে সত্যিকারের খাদ্যের স্বাদ সে মুখে পাচ্ছে! কতোদিন পরে পাচ্ছে স্নেহ-মমতার করুণ স্পর্শ! খাওয়া শেষ হতে আরামের দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার এলিয়ে পড়ল বালিসে। বললে,—আঃ! সত্যি, খাবার খেতে চমৎকার! ভুলেই গিয়েছিলাম কেমন লাগে!

কপট বিরক্তিতে গলা চড়িয়ে উত্তরে বললে থিয়ো,—থাক থাক, খুব হয়েছে,—ভোলাচ্ছি তোমাকে এবার থেকে!

—এবার বলো থিয়ো সব খবর। কেমন আছ তোমরা সবাই? গুপিল কেমন চলছে? কতো দিন যে আমি দুনিয়া-ছাড়া হয়ে আছি!

—কথা পরে হবে ভিনসেণ্ট। এখন তুমি ঘুমোও। নাও, ওই ওষুধটা খাও, তাহলেই ঘুম আসবে। তারপর সব কথা শুনো।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভিনসেন্ট ঘুমোলো অকাতরে। চোখ খুলে দ্যাখে, জানলার ধারে চেয়ারটার ওপর বসে থিয়ো তার আঁকা স্কেচগুলো দেখছে। নিঃশব্দে শুয়ে রইল সে কতক্ষণ,—সুস্থ লাগছে শরীর, ভারি তৃপ্তি, শান্তি লাগছে প্রাণে।

তার দিকে চোখ পড়তে মুচকি হেসে থিয়ো বললে,—ঘুম ভাঙল তাহলে! কেমন লাগছে এখন?

ভিনসেন্ট বললে,—ছবিগুলো দেখছিলে? কেমন লাগল? হচ্ছে কিছু?

—ও কথা পরে হবে। ঘুম যখন তোমার ভাঙল তখন আমারও মাংস চড়াবার সময় হোলো। আলুগুলো আগেই ছাড়িয়ে রেখেছি—ও হ্যাঁ, তোমারও কাজ আছে, দাঁড়াও বলছি—

উনুনের ওপর থেকে এক-গামলা গরম জল নামিয়ে সে বিছানার ধারে আনল, বললে,—তোমার দাড়ি কামানোর ক্ষুর কোথায়?

ভিনসেন্টের কোনো আপত্তি থিয়ো শুনল না, নিজের হাতে তার দাড়ি কামিয়ে, মাথা মুখ ঘাড় ধুয়ে দিল। ফরসা শার্ট চড়ালো তার গায়ে, মাথার চুলগুলো আঁচড়ে দিল সুন্দর করে। বললে,—হ্যাঁ, এইবার ঠিক ভ্যান গগের মতোই দেখাচ্ছে।

—তা তো দেখাচ্ছে। কিন্তু ওদিকে মাংস তোমার পুড়ে গেল কি না দ্যাখো!

খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুই ভাই বিছানার ধারে বসল। প্যারিস থেকে আনা টাটকা সুগন্ধি তামাক থিয়ো ভরে দিল ভিনসেন্টের পাইপে।

সায়াহ্নের অন্ধকারে সেই ভাঙা ঘরের জীর্ণ শয্যায় বসে বসে থিয়ো দেখতে লাগল তার ভাইকে। মনে পড়তে লাগল ব্র্যাবান্টে তাদের ছেলেবেলাকার দিনগুলি। সেদিনকার শৈশব-জীবনে তার চোখে সবচেয়ে বড়ো সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার এই বড়ো ভাই ভিনসেন্ট,—বাবার চেয়েও বড়ো, মার চেয়েও প্রিয়। ছেলেবেলাকার তার সমস্ত সুখ-স্মৃতি এই দাদাকে ঘিরেই। এই দাদাকে সে প্যারিসে বসে গত ক-বছর ধরে ভুলে বসেছিল,—এ ভুল জীবনে কখনো আর তার হবে না! ভিনসেন্টকেই যদি ভোলে, তবে তো জীবন তার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দাদা আর ভাই,—এই যুগল জীবনের সম্পূর্ণতাতে ছেদ কখনো যেন না আসে। আজ সে বুঝতে পারছে, তাকে না পেলে তার দাদার যেমন চলে না,—দাদার বিহনে সেও তেমনি রিক্ত, বঞ্চিত। যতোদিন দুজনে পাশাপাশি ছিল, জীবন ছিল সুসম্বন্ধ। বাল্য থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল দুজনে,—একই মূল্যবোধের সন্ধানে ও আবিষ্কারে চলেছিল পাশাপাশি। আজ সে একলা,—একলা খাটছে, একলা সফল হচ্ছে, পয়সা করছে একলা। কিন্তু জীবনের ফাঁক তাতে ভরে না।

আবার সে ভিনসেন্টকে ফিরিয়ে আনবে নিজের কাছে, একান্ত আপনার করে। দাদা তার ঠিক যেন শিশু,—কিছু বোঝে না, কিছু পারে না নিজের

জন্যে করতে,—তাইতো এমনি হাল হয়েছে। দাদাকে আবার সে খাড়া করবেই—দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরবে।

বললে,—ভিনসেণ্ট, ঠিক দুটো দিন তোমাকে আমি সময় দেব সুস্থ হবার জন্যে। তারপর তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব ইটেনে।

ভিনসেণ্ট নিঃশব্দে পাইপ টানতে লাগল কিছুক্ষণ ধরে। সময় এসে গেছে,—আর এড়ানো চলবে না, মীমাংসা করতেই হবে। কিন্তু কেমন করে সে বোঝাবে ভাইকে? শুধু কথা দিয়ে? ভাই কি হৃদয় দিয়ে বুঝবে তার হৃদয়ের কথা?

একটু পরে শান্ত গলায় সে বললে,—থিয়ো, আবার বাড়িতে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও কেন? সারা পরিবারের কাছে আমি একটা অসহ্য আর সন্দেহজনক মানুষ,—আমার ওপর ওদের কারো আস্থা নেই। তাই ওদের কাছ থেকে আমি দূরে সরে আছি। দূরে সরে থাকাই আমার ভালো,—যতটা দূরে হয়,—একেবারে না-থাকার প্রান্তে।

আবার সে বললে,—আছি কী নিয়ে জানো? আত্মবিশ্বাস নিয়ে,—সেটা কিন্তু ঘোচেনি। স্বীকার করি, মন আমার বড়ো চঞ্চল। ধৈর্য নেই, স্থৈর্য নেই—যেখানে চুপ করে অপেক্ষা করাটাই বুদ্ধির কাজ, সেখানে আমি অস্থির হয়ে উঠি,—দৌড়ঝাঁপ করে যা খুশি একটা কিছু করে বসি। তা সত্ত্বেও, আর যে যাই আমাকে ভাবুক, আমি কিন্তু মনে করিনে যে জীবন আমার বরবাদ হয়ে গেছে, আমার আর কিছুই করবার নেই। জীবনের সার্থকতার পথ আমিও খুঁজি বৈকি, অপরের চোখে সে সার্থকতার দাম নগণ্য হোক না কেন। জিজ্ঞাসা করবে, আমি কী করি আজকাল? বই পড়ি আর ছবি দেখি,—কতো শেখবার আছে, শেখবার চেষ্টা করি। এরও দাম আছে। নেই কি?

—আছে বৈকি ভিনসেণ্ট। কিন্তু তোমার এ বয়সে বই পড়া আর ছবি দেখা,—কাজ নয়, অবসর বিনোদন। জীবন-যুদ্ধের আওতায় এ কাজ পড়ে না। ধরো পাঁচ বছর ধরে তুমি বেকার হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছ। কোথায় উঠবে, না নেমেই চলেছ দিনের পর দিন। এটা কি ভালো?

হাতে খানিকটা তামাক নিয়ে তালুতে পাকিয়ে পাইপে ভরলো ভিনসেণ্ট। তারপর পাইপটা জ্বালাতে ভুলে গিয়ে বললে,—কখনো দু-পয়সা রোজগার করেছি, আর কখনো বা পরের কাছে হাত পেতে মুষ্টিভিক্ষা নিয়েছি। দারিদ্র্যকে কে বিশ্বাস করে, দারিদ্র্য যার নিত্যসঙ্গী? কিন্তু তুমি অন্তত বিশ্বাস করো ভাই, নেমে আমি একেবারে যাইনি। হয়তো আমার কাজের পথ ভাগ্য এতদিনে আমাকে চিনিয়েছে, সেই পথেই এবার আমি যাব।

—বিশ্বাস করতে আমার আপত্তি নেই ভিনসেণ্ট, যদি তোমার মনের কথাটা ঠিক করে আমাকে বোঝাতে পারো।

পাইপটা ধরালো ভিনসেণ্ট। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল,—মনে পড়ে রাইসউইকের জাঁতাকলের পেছনদিককার রাস্তায় যখন আমরা

বেড়াতাম ; তখন কতো মনের কথা আমাদের হোতো। বোঝবার কোনো অসুবিধে হোতো না তখন।

—কিন্তু ভিনসেণ্ট, তার পর থেকে তুমি অনেক বদলে গেছ যে।

—ঠিক তা নয়। তখন আমার জীবন অনেক সহজ ছিল এখনকার চেয়ে, এইটুকু মাত্র পরিবর্তন। আমার দৃষ্টিভঙ্গী আর মনোভাব তখন যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে, একটুও বদলায়নি। বিশ্বাস করো থিয়ো, আমি অবিশ্বাসী নই, আমি ছন্নছাড়া নই। আপাতদৃষ্টিতে এই যে আমার ব্যর্থ জীবন, এ চরিতার্থ হবেই। কী করে হবে, তাই আমার একান্ত চিন্তা।

থিয়ো উঠে গিয়ে কেরোসিনের আলোটা জবালল। গ্লাসে খানিকটা গরম দুধ ঢেলে ভিনসেণ্টের সামনে ধরল। বললে,—নাও, খেয়ে ফেল এটুকু। হাঁপিয়ে পড়েছ কথা বলতে বলতে।

এক চুমুকে দুধটা শেষ করল ভিনসেণ্ট। মুখটা মোছবার অবসর না নিয়ে আবার সে বলে চলল,—ভেবে দ্যাখো থিয়ো, অন্তরের গভীরে পথ খোঁজার এই যে চিন্তা, বাইরে তার কতোটুকু আভাস ফুটে ওঠে ? অন্তর্যাতনা যেখানে অগ্নিশিখার মতো জবলছে, সেখানে অন্য লোকের চোখে হয়তো পড়ছে কিছুটা ধোঁয়া আর কিছুটা কালি। কিন্তু তাই বলে অন্তরের সেই শিখাকে নিবিয়ে দেব,—না, নিঃস্ব একাকিত্বের মধ্যেও চেষ্টা করব তাকে অনির্বাণ রাখতে ?

থিয়ো বিছানার ধারে এসে আবার বসল। বললে,—হঠাৎ আমার চোখের সামনে কী একটা দৃশ্য ফুটে উঠল জানো ?

—কী দৃশ্য ভাই ?

—রাইসউইকের সেই জাঁতাকলটা....

—ভারি চমৎকার কলটা ছিল, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—আর আমাদের ছেলেবেলা ? সেটাও খুব চমৎকার ছিল না ?

—হ্যাঁ, আমার ছেলেবেলার দিনগুলো তুমিই ভরে রেখেছিলে ভিনসেণ্ট। তখনকার স্মৃতি সবই তো তোমাকে জড়িয়ে—

কেরোসিন-লণ্ঠনের মৃদু আলো। কাঠের ঘরের কোণে কোণে আবছায়া অন্ধকার। ভিনসেণ্টের চোখে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থিয়ো বললে,— তোমার সম্বন্ধে যতো কথা উঠেছে ভিনসেণ্ট, তা আর-সব আত্মীয়-স্বজনদের কথা, আমার কথা নয়। আমি এখানে এসেছিলাম এই ভেবে যে, দেখি তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোনো চাকরিতে লাগিয়ে দিতে পারি কি না।

—আমার সম্বন্ধে যারা যা ভাববে তারা তা ভাববেই। কিন্তু তুমি যে আমার মতো হওনি,—কর্মী হয়েছ কৃতী হয়েছ, সকলে তোমার সুখ্যাতি করছে,—এতেই আমার আনন্দ। তবু শেষ পর্যন্ত বলব, আমার ওপর তুমি অন্তত একটু আস্থা রেখো থিয়ো।

থিয়ো বললে,—ছেলেবেলা থেকে তুমি আমার আদর্শ ছিলে, তোমার হাত ধরে আমি বেড়িয়েছি,—সে যেমন জীবনে কখনো ভুলব না, তেমনি তোমার ওপর আস্থাও কখনো আমার যাবে না।

অকপট আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে ভিনসেণ্ট উত্তর দিলে,—অনেক দাম তুমি দিলে থিয়ো। ধন্যবাদ তোমাকে, ধন্যবাদ।

হঠাৎ যেন সব ভাবোন্মত্ততা ঝেড়ে ফেলল থিয়ো।

—শোনো ভিনসেণ্ট। এবার কাজের কথায় আসা যাক। তোমার এত কথার ফাঁকে ফাঁকে আসল ব্যাপার আমার যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তুমি নির্দিষ্ট কোনো একটা কাজ করতে চাও,—যে কাজে তুমি তৃপ্তি পাবে, যে কাজের সাধনায় তুমি মুক্তি পাবে। কী সে সাধনা? তুমি জানো, আমার মাইনে গত দেড় বছরে আবার বেড়েছে। টাকা নিয়ে আমি কী করব জানিনে। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। অস্বচ্ছলতার কথা তুমি ভাবতে পাবে না, অভাবে তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। কী তুমি চাও বলো। আমি তোমাকে সাহায্য করছি। আমি দেব মূলধন, তুমি দেবে কাজ। তোমার কাজের দামটা আমি এখন দেব, সময় যখন আসবে আমার লাভ আমি ঠিক পুষিয়ে নেব। মতি স্থির করে বলো,—সারা জীবনের মতো এ ব্যবসায় আমার সঙ্গে তুমি লাগতে চাও?

জানলার ধারে ভিনসেণ্টের গোছা-গোছা স্কেচগুলো। বিকেলবেলা থিয়ো ওগুলো দেখছিল। ওগুলোর দিকে তাকালো ভিনসেণ্ট। মন দুলছে কেমন একটা অবিশ্বাস্য সম্ভাবনার আশা-নিরাশার দোলায়, বিস্ময়ে বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে চোখ। সত্যি? এ কি সত্যি হবে? ঘুচবে দুর্ভাবনা, সাধনার পথ হবে নিত্য-নিষ্কণ্টক?

অস্ফুট গলায় সে বললে,—এই কথাই আমি তোমাকে এতক্ষণ বলতে চাই-ছিলাম, কিন্তু পেরে উঠছিলাম না থিয়ো।

ভিনসেণ্টের দৃষ্টি অনুসরণ করে ছবিগুলোর দিকে থিয়োও তাকালো। বললে,—আমি কিন্তু অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।

উত্তেজনার আনন্দ-আবেগে থর্-থর্ করে কাঁপতে লাগল ভিনসেণ্ট। অন্ধ নিদ্রার তমসা থেকে সে যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে, চোখ মেলেছে নব জীবনের সূর্যোদয়ে।

—বুঝতে পেরেছিলে? আমি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না,—তবু তুমি বুঝতে পেরেছিলে থিয়ো? শোনো থিয়ো, এতদিন পরে সত্যিই আমি আমার কাজ খুঁজে পেয়েছি,—আমার সারা জীবনের সাধনা। ছবি আমাকে চিরকাল ভয়ংকর আকর্ষণ করেছে, কিন্তু নিজের হাতে কাগজ পেন্সিল ধরবার সাহসটুকু হয়নি। ভয় করত, ছবি আঁকার খেয়াল হয়তো আমার আসল কাজে ক্ষতি করবে। অন্ধ ছিলাম এতদিন,—ভুলেও বুঝিনি কী আমার আসল

কাজ। এটা করেছি ওটা করেছি, আসল কাজের প্রকৃত প্রেরণাটাকে নিজের হাতে চেপে রেখে দিয়েছি। তাই আজ এই সাতাশ বছর বয়সেও আমার কিছু হোলো না।

—কী এসে যায় ভিনসেণ্ট? স্বাস্থ্য যদি আবার ফিরে পাও, মনের দৃঢ়তা নিয়ে যদি এগোতে পার তাহলে অন্য নতুন শিক্ষার্থীর চাইতে হাজার গুণ ফল তুমি পাবে। সাতাশ বছর? হুঁ। সারা জীবন তো তোমার সামনে।

—হ্যাঁ, অন্তত আরো দশটা বছর হাতে আমার আছে। দশ বছরে কি কিছুই করে উঠতে পারব না?

—আলবৎ পারবে। প্রাণপণে লেগে যাও। আর, যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে থাকো। প্যারিস বলো, ব্রুসেল্স্ বলো, আমস্টার্ডাম, হেগ বলো—যেখানে তুমি যাবে আমাকে জানিয়ো—মাসে মাসে আমি তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেব। যতো বছরই তোমার লাগুক, আমি বলছি ভিনসেণ্ট, তুমি পারবেই।

—থিয়ো থিয়ো, মাসের পর মাস কী জঘন্য তিক্ততার মধ্যে আমার কেটেছে! বুকের মধ্যে খুঁড়ে খুঁড়ে চলেছি, খুঁজে চলেছি আত্মার অন্ধকারে কী আমার পথ, কী নিয়ে আমার সারা জীবন কাটবে! তারপর কী ভয়ংকর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি। আর আমি ভয় পাব না, আর আমি পিছু হঠব না। জীবনের এতগুলো নিষ্ফলা বছরের বিনিময়ে এই চরম সত্যটাকে আজ আমি আঁকড়ে ধরেছি: আমি শিল্পী হবই, শিল্পসাধনাই আমার ললাট-লিখন। এইজন্যেই অন্য যেকোনো কাজ আমি করতে গিয়েছি, হার হয়েছে আমার। থিয়ো, থিয়ো, এতদিনের বন্দিত্ব আমার ঘুচেছে, বন্ধ দ্বার তুমিই খুলে দিলে।

থিয়ো বললে,—আর কোনো কিছুতেই কখনো আমাদের দূরে রাখতে পারবে না ভাই। আবার আমরা এক হয়েছি, তাই না?

—হ্যাঁ থিয়ো, সারা জীবনের জন্যে।

—নাও, তুমি এখন কদিন বিশ্রাম করে একটু সুস্থ হয়ে ওঠো। তারপর যেখানে গিয়ে তুমি থাকতে চাও আমি তোমাকে রেখে আসব।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল ভিনসেণ্ট,—কদিনের বিশ্রাম! কিসের জন্যে? কী হয়েছে আমার? আজই রাত নটায় ব্রুসেল্সের ট্রেন আছে একটা।

উদ্দাম আগ্রহে সে জামা কাপড় পরতে শুরু করল। থিয়ো বললে,—কী সর্বনাশ, তুমি পাগল হলে নাকি? আজ রাত্রে তুমি ট্রেনে যাবে কী করে? তোমার যে অসুখ!

—অসুখ? সে হোলো পুরোনো ইতিহাস! এই মুহূর্তে আমার যতোটা সুস্থ লাগছে, এত সুস্থ জীবনে কখনো লাগেনি। চটপট সব গুছিয়ে নাও থিয়ো! হ্যাঁ, ব্যাস, শুধু সাদা নতুন চাদরগুলো ব্যাগে ভরে নাও। দশ মিনিটের মধ্যে স্টেশনে যেতে হবে, মনে থাকে যেন। দেরি নেই।

———

॥ ইটেন ॥

১

থিয়ো আর ভিনসেণ্ট একদিন একসঙ্গে কাটালো ব্রুসেল্‌সে, তারপর থিয়ো গেল তার কর্মস্থান প্যারিসে আর ভিনসেণ্ট গেল বাবা-মার কাছে ইটেনে।

ভিনসেণ্টের বরিনেজের জীবনযাত্রা বাবা-মা দুজনের কেউই পছন্দ করেননি। নিতান্ত নিজের সন্তান যদি না হোতো আর আত্মজকে অবহেলা করা যদি অধর্ম না হোতো, তাহলে থিয়োডোরাস এমনি ছেলের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতেন না। আনা কর্নেলিয়ার বিরাগের কারণ অন্য। যে জীবন এতোদিন ছেলে যাপন করেছে তাতে সে সফল হোক বা নাই হোক সুখী তো হয়নি, দুঃখই পেয়েছে—মা হয়ে এ কি সহ্য করা যায়!

ভিনসেণ্ট দেখল বাবার মাথার চুল আরো সাদা হয়ে গেছে, ডান চোখের পাতাটা আরো ঝুলে পড়েছে চোখের ওপর। শরীরটা তাঁর অনেক শুকিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে যেন চুপসে গেছে আগেকার ব্যক্তিত্ব। মার চেহারায় কিন্তু আগের চেয়ে অনেক শক্তির পরিচয়, অনেক বেশি আকর্ষণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীর আরো যেন ভরে উঠেছে, আরো বিকশিত হয়েছে মধুর মাতৃত্ব। মুখের রেখায় আর ওষ্ঠের হাসিতে ক্ষমার কারুণ্য, চোখের মৃদু কোমল দৃষ্টিতে সহজ আনন্দ আর সৌন্দর্যের নিত্য অভিনন্দন।

প্রথম কদিন কাটল আদর যত্নে, ভোজনে আর অলস বিশ্রামে। কাজের মধ্যে গ্রামের কিনারে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো সকালে সন্ধ্যায়। বরিনেজের দুঃস্বপ্ন ঘুচে গেল চোখ থেকে, শরীরও সেরে উঠল তাড়াতাড়ি। ইতিমধ্যে ঘনিয়ে এল বর্ষাঋতু।

একদিন ভোরবেলা আনা কর্নেলিয়া রান্নাঘরে এসে দেখেন ভিনসেণ্ট উনুনটা জেলেছে, আগুনের গরম তাতের কাছে পা রেখে কোলের ওপর একটা পেন্সিল-স্কেচ নিয়ে বসে আছে। স্কেচটা আসলে একটা সুপরিচিত ছবির কপি।

—এ কী ভিনসেণ্ট, এত সকাল-সকাল উঠেছিস যে!

—বাঃ, কী যে বলো মা! সকাল কই? এবার থেকে কাজ করব যে!

—কাজ! ওমা, উনুন জ্বালাবার জন্যে তোর দরকার আবার কিসের?

—ও কাজ নয় মা, ড্রয়িং করার কথা বলছিলাম।

স্কেচটা উঁকি দিয়ে দেখলেন আনা কর্নেলিয়া। খেলাচ্ছলে ছবির বই কপি করার শিশুর প্রচেষ্টা যেন।

—তুই কি ছবি আঁকতে শিখছিস নাকি ভিনসেণ্ট?

—ঠিক বলেছ।

ভিনসেণ্ট মাকে মনের কথা খুলে বললে। থিয়ো যে তাকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছে সে কথাও বললে। খুশি হলেন আনা কর্নেলিয়া। তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এসে বললেন,—তোমার মামা অ্যাণ্টন মভ একজন শিল্পী,—ছবি-আঁকিয়ে বলে খুব নাম, টাকাও করেছে খুব। সেদিন এই চিঠিখানা ওর শাশুড়ির কাছ থেকে পেয়েছি, লিখেছেন গুপিলুসে মিনহার টারস্টিগ নাকি ওর এক-একখানা ছবি পাঁচ শো ছশো গিল্ডারে বিক্রি করেন।

—ঠিকই। মভ আধুনিক নামকরা শিল্পীদের একজন বটে।

—আচ্ছা ভিনসেণ্ট, এমনি একখানা ছবি আঁকতে কদিন লাগে?

—সেটা ছবির ওপর নির্ভর করে মা। কোনো ছবি কয়েকদিনেই হয়, কোনো ছবি শেষ করতে বছরের পর বছর কেটে যায়।

—বছরের পর বছর! একখানা ছবি!

একটু ভেবে আনা কর্নেলিয়া বললেন,—আচ্ছা, একটা লোককে দেখে দেখে ঠিক তার চেহারা এই কাগজে আঁকতে পারিস?

—তা ঠিক বলতে পারি নে। তবে দাঁড়াও, আমার আঁকা কয়েকটা স্কেচ তোমাকে এনে দেখাই।

স্কেচের তাড়াগুলো হাতে করে রান্নাঘরে ফিরে এসে দেখে, মা তাঁর কাজ শুরু করেছেন। সারা ঘর জুড়ে চমৎকার খোশবাই।

মা বললেন,—হ্যাঁ রে, সেই যে পনিরের পিঠে তুই ভালোবাসতিস, মনে পড়ে? আজ তোকে তাই খাওয়াব।

ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি ডান হাত বাড়িয়ে মার কাঁধটা জড়িয়ে ধরল, শুধু বলতে পারল,—মাগো!

ছলছল করে উঠল মার চোখ, কেমন একটু বিচিত্র হাসি ঠোঁটের কোণে। ভিনসেণ্ট তাঁর প্রথম সন্তান। তার ব্যর্থতা সবচেয়ে বড়ো দুঃখ তাঁর। বললেন, —সাতরাজ্যি ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত মার কাছে এসে থাকতে কেমন লাগে রে?

—খুব ভালো মা, খুব ভালো!

বারিনেজবাসীদের ছবিগুলো আনা কর্নেলিয়া মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। একটু পরে বললেন,—কিন্তু এদের মুখগুলো ঠিক করে আঁকিসনি কেন?

—ওদের মুখ নেই। মানে, মুখ আমি আঁকতে চাইনি। ওদের চেহারা-গুলোই আমি আঁকতে চেয়েছিলাম।

—কিন্তু মুখ আঁকতে তুই পারিস তো? এখানে এইইটেনে কতো বড়ো-বড়ো ঘরের মেয়ে আছে যারা নিজেদের ছবি আঁকাবার জন্যে পাগল। এ কাজ যদি পারিস তাহলে কাজের ভাবনা কী তোর?

—আরে দাঁড়াও। ওসব হবে, হবে। আগে ড্রয়িংয়ের হাতটা পাকা হোক। মনের মতো পোর্ট্রেট আঁকা কি একদিনের কথা?

ব্রেকফাস্টের টেবিলে আনা কর্নেলিয়া স্বামীর কাছে কথাটা পাড়লেন। গম্ভীর গলায় শুধোলেন থিয়োডোরাস,—ছবি তো আঁকবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ কী এতে? এ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে?

ভিনসেণ্ট বললে,—প্রথমটা হয়তো পারব না। তবে, ড্রয়িংটা যখন শুদ্ধ হবে তখন নিশ্চয়ই আর আটকাবে না। লণ্ডনে প্যারিসে যারা শুধু ড্রয়িংই করে, তারাও দিনে দশ পনেরো ফ্রাংক রোজগার করে। মাসিকপত্রের ছবি যারা আঁকে তারাও তো কম উপায় করে না।

থিয়োডোরাস অসুখী হলেন না। অর্থহীন অলস জীবনের চেয়ে ছেলের যাহোক ধরাবাঁধা একটা কিছু যে করবার মন হয়েছে, এ তবু মন্দের ভালো।

তিনি বললেন,—বেশ, ছবি আঁকো তুমি। তবে আশা করি এ কাজে লেগে থাকবে ঠিকমত। আবার কোনো নতুন খেয়ালে মত না বদলাও, সেই আমার ভাবনা।

ভিনসেণ্ট উত্তর দিলে,—আমার কাজ আমি খুঁজে পেয়েছি বাবা। আর আমি কাজ বদলাব না।

বর্ষাকাল কাটল, এল উষ্ণ মধুর ঋতু। ভিনসেণ্ট ছবি আঁকার জিনিসপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে প্রতিদিন ধাওয়া করতে লাগল পল্লী অঞ্চলে। প্রান্তরের ধারে বসে ছবি আঁকতে তার খুব ভালো লাগে, কখনো সে জলাভূমির ধারে ঈজেল খাড়া করে আঁকে শামুক আর পদ্মফুলের ঝাঁক। ছোট শহর ইটেন, প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। প্রতিবেশীরা তার খবর কানাঘুষোয় জেনেছে,—তার এলোমেলো পোশাক আর এলোমেলো জীবন, তার রঙ-তুলি তারা সন্দেহের চোখে দেখে, কাছে ঘেঁষে না বড়ো।

কদিন থেকেই ভিনসেণ্ট পাইন বনের ধারে ছবি আঁকছে। অনেকগুলো গাছ কাটা হচ্ছে, খালের লম্বা একটা পাইন গাছ সে খুব বড়ো করে আঁকছে দিনের পর দিন। একজন শ্রমিক রোজ তার পেছনে এসে দাঁড়ায়, চোখ পাকিয়ে তার ছবি আঁকা দেখে আর ঠাট্টার হাসি হাসে। রোজই হাসির আওয়াজটা বেড়েই চলে।

একদিন ভিনসেণ্ট খুব ভদ্রভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করল,—আমি যে পাইন গাছটা আঁকবার চেষ্টা করছি,—এতে হাসবার কী আছে বলো তো?

হো-হো করে উঠল লোকটা,—হাসব না? আরে না হেসে উপায় আছে নাকি! আপনি যে বদ্ধ পাগল!

এক মুহূর্ত ভেবে নিল ভিনসেণ্ট, তারপর বললে,—ধরো আমি যদি একটা গাছ পুঁততাম, তাহলে কি আমাকে পাগল বলতে?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা, বললে,—তা কেন? না পুঁতলে গাছ গজাবে কী করে?

আর যদি গাছের গোড়ায় জল দিয়ে দিয়ে গাছটাকে বড়ো করে তুলতাম?

—খাসা কাজই করতেন,—নইলে গাছটা বড়ো হোতো কী করে ?

—তারপর গাছে যখন ফল ধরত, সেই ফল পেড়ে যদি খেতাম, সেটাও কি পাগলামি হোতো ?

—আলবৎ নয়। আপনার গাছের ফল আপনি পাড়বেন না তো কি ?

—তারপর ধরো গাছটাকে যদি একদিন কাটতাম, তার মধ্যে কি পাগলামি খুঁজে পেতে ?

—কে বললে ? গাছ তো কাটতেই হত, নইলে কাঠ মিলবে কোথা থেকে ?

—তাহলে বলছ,—গাছ পোঁতা, গাছ বড়ো করা, গাছের ফল পাড়া আর গাছ কাটা—এসব কাজের একটাও পাগলামি নয়, আর গাছটার একটা ছবি আঁকাই পাগলামি, কেমন ?

কেমন একটু ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আবার হাসতে লাগল লোকটা। বললে,—এই যে দিনের পর দিন মাঠের মধ্যে হাঁ করে বসে থাকেন,—এইটেই পাগলামি। আপনি যে পাগল, তা সারা গ্রামে সবাই জানে।

সন্ধেবেলা বসবার ঘরে বড়ো টেবিলের ধারে ধারে সমস্ত পরিবার একত্র হয়। কেউ সেলাই করে, কেউ চিঠি লেখে, কেউ পড়ে। ভিনসেণ্টও সকলের সঙ্গে বসে। সবচেয়ে ছোট ভাইটি—কর তার নাম—সে খুব শান্ত, গম্ভীর, কথাই বলে না। বোনদের মধ্যে আনার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সে শ্বশুরবাড়ি। মেজ বোন এলিজাবেথের তার ওপর এমনি উগ্র বিতৃষ্ণা যে সে যে ঘরে ফিরে এসেছে এটুকু মেনে নেয়াই যেন তার অসাধ্য। ছোট বোন উইলেমিন তবু তাকে ভালবাসে মন্দ নয়। এ বোনকে দাঁড় করিয়ে তার ছবিও সে আঁকে মাঝে-মাঝে। টেবিলের একধারে বসে ভিনসেণ্ট একমনে ছবি আঁকে। অভ্যাস করে ড্রয়িং, বা দিনের আঁকা স্কেচগুলো কপি করে নিবিষ্টভাবে। টেবিলের ঠিক মাঝখানে সকলের মাথার ওপর ছাদ থেকে মস্ত একটা তেলের আলো ঝোলে। থিয়োডোরাস দেখেন ছেলে একই জিনিস বারে বারে আঁকছে ; পেন্সিল বুলোচ্ছে তো বুলোচ্ছেই, মুছছে তো মুছছেই,—আর শেষ পর্যন্ত কুচি কুচি করে কাগজটা ছিঁড়ছে। একদিন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভিনসেণ্টের ব্যর্থ প্রচেষ্টার দিকে তাকিয়ে তিনি শুধোলেন,—আচ্ছা, আঁকা কি তোমার কিছুতেই ঠিকমত আসে না ? ভুলই কেবল হয় ?

ভিনসেণ্ট বললে,—ঠিক বলেছেন।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি ভুল করছ না তো ?

—ভুলই তো করে চলেছি কেবল। কোন্ ভুলের কথা আপনি বলছেন ?

আড়ষ্ট গলায় পাদ্রি বললেন,—আমার সন্দেহ হচ্ছিল তুমি আবার লাইনটাই ভুল নাওনি তো ? সত্যি-সত্যিই শিল্পী হবার মতো প্রতিভা যদি তোমার মধ্যে থাকত তাহলে আমার তো মনে হয় প্রথম বারেই তোমার ড্রয়িং

নির্ভুল হোতো।

ভিনসেণ্টের সামনে তখন গ্রাম্য চাষার একটা ছবি,—লোকটা মুখ নিচু করে ক্ষেত থেকে আলু তুলছে। লোকটার ডান হাতটা কিছুতেই ঠিকভাবে আঁকা হচ্ছে না। ভিনসেণ্ট কাজ করতে করতে উত্তর দিল,—হয়তো ঠিক বাবা, হয়তো সহজভাবে কাগজে ছবি ফুটিয়ে তোলবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আমার নেই। তবে কী জানেন, প্রকৃতি সহজে শিল্পীর কাছে ধরা দেয় না, বাধা দেয়, এড়াতে চায়। আমি যদি প্রাণপণ খাটতে পারি, এ বাধা আমি জয় করবই। ভুলকে আমি ভয় করিনে, এতে বরং আমার রোখ আরো বাড়ে।

থিয়োডোরাস বললেন,—তোমার কথা আমি বুঝিনে। খারাপ থেকে কি ভালো হয় কিছু? যা ভালো তা গোড়া থেকেই ভালো। শিল্প যদি ভালো হয় সে ভালোর উন্মেষ গোড়া থেকেই হবে। গোড়ার থেকেই যে শুধু খারাপ আঁকে, সে আসলে শিল্পীই নয়। শিল্পী হবার তার যোগ্যতা নেই। সময় নষ্ট না করে তার আর কিছু করা উচিত।

ভিনসেণ্ট ছবির ওপর থেকে চোখ না তুলে প্রশ্ন করলে,—কিন্তু সে লোক যদি খারাপ ছবি এঁকেই তার সারা জীবনের আনন্দের খোরাক পায় তাহলে?

থিয়োডোরাস নির্বাক হয়ে গেলেন। যুক্তি দিয়ে এমনি বেয়াড়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

কৃষাণের হাতটাকে আধখামচাভাবে আলুর বস্তার ওপর ঝুলিয়ে রেখে মুখ তুলে ভিনসেণ্ট এবার বললে,—আসলে, বাবা, প্রকৃত যে শিল্পী তার সঙ্গে প্রকৃতির শেষ পর্যন্ত কোনো বিরোধ থাকে না। বছরের পর বছর কাটে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, অসীম ধৈর্যে, শেষকালে প্রকৃতি হার মানে, শান্ত শিষ্ট হয়ে শিল্পীর হাতের মুঠোয় ধরা দেয়। তাই আজ যে শিল্পসৃষ্টি নিতান্ত খারাপ, একদিন আসে যখন তা সুন্দর হয়, তার মূল্য আর মর্যাদা নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে।

—কিন্তু যা খারাপ তা যদি কোনদিন ভালো না হয়। ওই যে তুমি দিনের পর দিন ধরে ঐ বুড়োটাকে আঁকছ, ওর হাত এখনো সোজা হোলো না। বছরের পর বছর চেষ্টা করলেও ওর হাত যদি অমনি বাঁকাই থাকে? মানে, সোজা কথায়, হাজার ড্রয়িং করেও ড্রয়িং যদি কোনদিনই ঠিক না হয়?

—হতে পারে বাবা, কিন্তু সেই দুর্ভাবনা ভেবে শিল্পী কখনো ডরায় না।

—বেশ তো, তা তো বুঝলাম। কিন্তু এত চেষ্টার শেষে তার দামটা সে কী পায়?

—দাম? দাম কিসের?

—বাঃ! ধরো, টাকা-কড়ি, সম্মান। কিছুই যদি না জোটে শেষ পর্যন্ত?

ভিনসেণ্ট মুখ তুলে বাবার মুখের দিকে স্পষ্ট চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। কী একটা অদ্ভুত প্রাণীকে সে যেন দেখছে। তারপর বললে,—আমার ধারণা ছিল শিল্পের ভালোমন্দ নিয়েই বুঝি আমরা আলোচনা করছি।

২

দিনরাত্রি ভিনসেণ্ট কাজ করে চলল। ফাঁকি নেই কোনো। যতক্ষণ পারে আঁকে। যখন আর পারে না, বই পড়ে। তাও যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখনি কেবল ঘুমোয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি কেবল চিন্তা,—থিয়োর গলগ্রহ হয়ে থাকার অবস্থা থেকে কবে সে মুক্তি পাবে। থিয়ো তাকে শুধু যে টাকা পাঠায় তা নয়, ছবি আঁকার কাগজ, পেন্সিল, রং, কালি, কলম, তুলি, জন্তু-জানোয়ার ও মনুষ্য-কঙ্কালের ছবি, শিল্পীদের ছবির প্রিণ্ট—সব পাঠায়। চিঠিতে লেখে,—কিছু ভেবো না, কাজ করে যাও ; সত্যিকার শিল্পী হওয়া চাই,—সাদা-মাটা ছবি-আঁকিয়ে নয়।

মনুষ্য-মূর্তির ড্রয়িং-এ যতো বেশি সে পরিশ্রম করে, পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু আঁকার ব্যাপারে ততোই সে লাভবান হয়। তাই যখন সে একলা একটা গাছ আঁকে, তখন সে শুধু নির্জীব একটা গাছই চোখে দেখে না, গাছের একটা জীবন্ত রূপের কল্পনা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে রেখায়-রেখায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে তার খুব ভালো লাগে, কিন্তু তার চেয়ে দশগুণ ভালো লাগে মানুষ আঁকতে, যে মানুষের সঙ্গে মাটির যোগ শ্রমের যোগ, জীবনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। গাভার্নি, ডমিয়ার, ডোরে প্রভৃতি শিল্পীদের যেখানে সার্থকতা, সাধারণ কৃষাণ শ্রমিকের ছবিতে সেই চমৎকার বাস্তববোধের আভাস তার কাঁচা হাতের ড্রয়িং-এও কখনো কখনো চকিতে ফুটে ওঠে।

বই পড়া নিয়ে বাবার সঙ্গে তার তর্কবিতর্ক হোলো একদিন। থিয়োডোরাস বলেন,—ছবি আঁকবে তো আঁকো। একগাদা বাজে ফরাসী বই পড়ে সময় নষ্ট করা কেন ?

ভিনসেণ্ট উত্তরে বললে,—ছবি তো শুধু কাগজে দেহবিদ্যা মক্সো করা নয়। মানুষের মাথা যখন আঁকতে হবে, জানতে হবে ঐ মাথার ভেতর কী আছে। শুধু আঁকতে পারলেই শিল্পী হওয়া যায় না,—শিল্পীর চাই জীবনবোধ, সাহিত্য তার প্রধান সহায়ক।

আবার গ্রীষ্মকাল এল। অগ্নিক্ষরা দ্বিপ্রহর, মাঠে মাঠে ছবি এঁকে বেড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠল। ছোট বোনকে মডেল করে কয়েকটা ছবি আঁকল, বারে বারে বার্গের অনুসরণে ড্রয়িং অভ্যাস করতে লাগল। গ্রামীন নরনারীর কয়েকটা স্কেচ নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে তাদের আঁকতে লাগল ঘরে বসে। মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ—এমন মানুষকে রেখায় প্রকাশ করতে সে ব্যাকুল—মেয়ে পুরুষ, যারা মাঠে কাজ করে, মাটি খোঁড়ে, লাঙল দেয়, বীজ ছড়ায়, শস্য কাটে, এরাই তার শিল্পসাধনার প্রধান উপজীব্য। শহরের লোকরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, কিন্তু মাঠের কৃষাণরা তাকে বিশ্বাস করে। সেও চেষ্টা করে তাদের বুঝতে, তাদের জীবনকে সমস্ত চেতনা দিয়ে

উপলব্ধি করতে।

প্রকৃতিকেও সে আগের মতো ডরায় না, প্রাণবন্ত করে আঁকতে চায় উইলো গাছের একটি ঝাঁকড়া ডাল বা ফুটন্ত একটি আপেল-মঞ্জরী।

মাটির মানুষ তাই যখন সে আঁকে, কেমন যেন তার সৃষ্টিতে মাটি আর মানুষ একাকার হয়ে যায়। কেন এমনি হয় তা সে যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করে না, তবে মনে মনে অনুভব করে,—এ ঠিকই হচ্ছে। মাটি আর কৃষাণ, সে মনে মনে বলে,– দুইয়ের মধ্যে পাকাপাকি একটা সীমারেখা থাকবে কী করে? মাটি তারা উভয়েই, একে মিশছে প্রতি মুহূর্তে অপরের সঙ্গে, মিলে-মিশে রয়েছে অচ্ছেদ্য বাস্তব বন্ধনে।

মা ভাবেন,—একলা একলা ছেলেটা ঘোরে, বিয়ে দিতে হবে ওর এবার। একদিন বললেন,—কাল দুটো নাগাদ বাড়ি থাকিস, আমার একটু দরকার আছে।

ভিনসেন্ট শুধোয়,—আমাকে আবার তোমার কী দরকার মা?

—আমার সঙ্গে একটা চা-পার্টিতে তোকে যেতে হবে।

স্তম্ভিত ভিনসেন্ট। বলে,—বলো কী, এমনি করে নষ্ট করার এখন কি আমার সময়?

—নষ্ট কেন হবে তোর সময় এতে? তোর ছবি আঁকার কতো খোরাক পাবি। জানিস, ইটেনের সেরা সেরা সব মেয়েরা এই পার্টিতে আসছে।

ভিনসেন্ট তো পালাতে পারলে বাঁচে। অনেক কষ্টে ঢোক গিলে বললে,—কিন্তু মা, তোমার ঐ চা-পার্টিতে যেসব মেয়ে যাবে, তাদের আমি আঁকব কী করে? তাদের যে কারুর কোনো চরিত্র নেই।

—চরিত্র নেই? বলিস কী? শহরের বড়ো বড়ো ঘরের সব মেয়ে। কারো নামে ঘুণাক্ষরেও কেউ আধখানা কথা রটাক দিকি!

হেসে উঠল ভিনসেন্ট,—আমি সেকথা বলিনি মা। আসল কথা হচ্ছে, ওরা সব একেবারে এক রকমের। একই ছাঁচের সহজ সাড়ম্বর জীবন, তাই ওদের কারো মুখে বিচিত্র চরিত্রের কোনো ছাপ নেই।

মা শুধোলেন,—তাহলে তুই কি মাঠের চাষা-ভুষো এঁকেই দিন কাটাবি?

—ঠিক বলেছ মা, তাই।

—কিন্তু কী লাভ হবে তাতে? ওরা কি তোকে দেবে এক আধলাও! জানিস, এসব বড়ঘরের মেয়েরা কতো দাম দিয়ে তাদের ছবি আঁকিয়ে নেয়!

ভিনসেন্ট বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল মাকে, ডান হাত দিয়ে তুলে ধরল তাঁর চিবুক। এত স্বচ্ছ নীল মার চোখ,—তবু মা কেন বোঝে না?

আস্তে আস্তে সে বললে,—মাগো, কেন বিশ্বাস রাখো না আমার ওপর? আর কটা দিন সময় দাও আমাকে। নিজের কাজ আমাকে করতে দাও নিজের মতো করে। একদিন দেখো তোমার এই ছেলের কতো নাম হবে, তোমার হাতে

কতো টাকা সে এনে দেবে।

ভিনসেণ্ট যেমন বোঝাতে ব্যাকুল, তেমনি ব্যাকুল আনা কর্নেলিয়া তাঁর এই ছেলেকে বুঝতে। তাড়াতাড়ি ছেলের রুক্ষ লাল দাড়িতে তিনি ওষ্ঠ স্পর্শ করলেন। তাঁর প্রথম সন্তানটি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তারপর এ ছেলে যখন পেট থেকে নেমেই চিৎকার ছেড়েছিল, তখন তাঁর আনন্দ আর স্বস্তির আর সীমা ছিল না। প্রথম সন্তানের জন্যে শোক আর পরবর্তী সন্তানদের নিরাপদ-জন্মের স্বস্তি,—দ্বিতীয় গর্ভের সন্তান ভিনসেণ্টের প্রতি ভালোবাসায় ছিল ঐ দ্বিবিধ অনুভূতির গঙ্গা-যমুনা।

স্নেহসিক্ত গলায় তিনি বললেন,—না রে, তুই আমার বড়ো ভালো ছেলে ভিনসেণ্ট। যা তুই ভালো বুঝিস, তাই কর।

তাই আবার মাঠেই গেল ভিনসেণ্ট। ন্যুব্জদেহ কৃষাণ-কৃষাণীদেরই আঁকতে লাগল সে।

গ্রীষ্মের শেষে আবার তার মনে এল চঞ্চলতা। নিজের চেষ্টায় যতোটা অনুশীলন সম্ভব, তার অনেক হয়েছে। অন্য আর কোনো শিল্পীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে, কতোটা তার চরিতার্থতা তা যাচাই করবার জন্যে মন তৃষিত হয়ে উঠেছে। তা যদি না হয় তাহলে আর সে বাড়বে না, শিক্ষায় ছেদ পড়বে এইখানেই।

থিয়ো আমন্ত্রণ করল প্যারিসে আসতে, কিন্তু পা সে বাড়ালো না। এখনই প্যারিসে যাওয়া তার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। কী সে জানে, কতোটুকু সে শিখেছে? তার চাইতে হেগ শহর ভালো। কয়েক ঘণ্টার মাত্র পথ, সেখানকার গুপিল কোম্পানির ম্যানেজার মিনহার টারস্টিগের কাছ থেকে সাহায্য পাবে। এ ছাড়া নাম-করা শিল্পী মভ তো তার আত্মীয়। হেগ-এ গিয়ে কিছুদিন শিক্ষানবিশি করাই বোধহয় এখন ভালো। থিয়োর উপদেশ সে চাইল। থিয়ো উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে রেল-ভাড়ার টাকা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিল তাকে।

মিনহার হারমান টারস্টিগ হেগ স্কুল অব্ পেণ্টিং-এর প্রতিষ্ঠাতা ও হল্যাণ্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্প-ব্যবসায়ী। ছবি কেনার ব্যাপারে তাঁর উপদেশ নেবার জন্যে হল্যাণ্ডের সমস্ত অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে আসে। ছবির ব্যাপারে মিনহার টারস্টিগের মতামতের ওপরে আর কথা নেই।

ভিনসেণ্টের কাকা ভিনসেণ্ট ভ্যান গকের পর মিনহার টারস্টিগ যখন গুপিল কোম্পানির ম্যানেজার হয়ে এলেন তখন উদীয়মান ডাচ্ শিল্পীরা সব এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছেন। অ্যাণ্টন মভ আর জোসেফ আছেন আমস্টার্ডামে, জেকব আর উইলেম মারিস আছেন মফঃস্বলে, আর জোসেফ ইসরেলস্, জোহানেস বসবুম আর ব্লমার্স ঘুরে বেড়াচ্ছেন এ-শহর থেকে ও শহরে। টারস্টিগ এঁদের প্রত্যেককে চিঠি লিখলেন এই বলে: আপনারা সবাই কেন হেগ-এ এসে জমায়েত হচ্ছেন না? তবেই তো এই শহর আবার ডাচ্ শিল্পের কেন্দ্র হয়ে

উঠবে। আমরা সবাই যদি এখানে একত্র হই, সবাই সবাইকে সাহায্য করতে পারি, আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদের জাতীয় শিল্পকে আবার বিশ্বখ্যাতির চূড়াতে বসাতে পারি,— যে খ্যাতি ছিল ফ্রান্স হ্যাল্‌স্‌-এর যুগে, রেমব্রার যুগে।

শিল্পীরা যে এই আহ্বানে যুগপৎ সাড়া দিলেন তা নয়, তবে ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীই হেগ-এ এসে বসবাস শুরু করলেন। তখন তাঁদের ছবির একটিমাত্র ক্রেতাও ছিল না। বাজারে তাঁদের ছবি কাটে এই লোভে টারস্টিগ তাঁদের হেগ-এ আনেননি,—তিনি তাঁদের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রতিভার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তিনি এসব শিল্পীর ছবির প্রথম ক্রেতা,—তারপর বছর-ছয়েকের মধ্যে দ্বিতীয় ক্রেতা অনেকেরই আর জোটেনি।

বছরের পর বছর ধরে তিনি এইসব তরুণ অখ্যাত শিল্পীদের ছবি কিনে দোকানের পেছনের ঘরের দেয়ালের কোণে উল্টো করে দাঁড় করিয়ে রাখতে লাগলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত শিল্পবোদ্ধা ও শিল্পরসিক। নবীন শিল্পীদের সাহায্য করা, প্রেরণা দেওয়া ছিল তাঁর ব্রত। এরা যাতে দারিদ্র্য আর হতাশায় হারিয়ে না যায়,—সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ লক্ষ্য। ছবি কেনা, ছবির সমালোচনা করা, শিল্পীতে শিল্পীতে সমন্বয় ঘটানো, নূতন ছবির বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ পদ্ধতির আভাস দেওয়া,—একদিকে এই যেমন ছিল তাঁর কাজ, অন্যদিকে ছিল চিত্রবিলাসী ও ক্রেতার মনের পরিবর্তন আনা, আধুনিক ডাচ্‌ চিত্রকলার প্রতি দেশবাসীর আগ্রহকে উজ্জীবিত করা।

ভিনসেণ্ট যে সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল,—এতদিনে, তখনি সবে তাঁর চেষ্টা সার্থক হয়েছে। মভ, নিউহাইস, ইস্‌রেলস্‌ জেকব ও উইলেম মারিস যাকিছু আঁকেন,—গুপিল কোম্পানি চড়া দামে তা বিক্রী করে। সার্থক ও জন-প্রিয় শিল্পী বলে প্রত্যেকের নাম।

মিনহার টারস্টিগ সুপুরুষ। সুঠাম তাঁর মুখশ্রী, মস্ত চওড়া কপাল, পেছনের দিকে উল্টিয়ে আঁচড়ানো ঘন বাদামি চুল, সুন্দর করে ছাঁটা সারা মুখ-জোড়া দাড়ি,—হল্যাণ্ডের হ্রদের ওপরকার আকাশ যেমন, তেমনি স্বচ্ছ নীল তাঁর চোখ। পরনে তাঁর মসৃণ কালো ভেলভেটের জ্যাকেট আর স্ট্রাইপ দেওয়া দীর্ঘ কালো ট্রাউজার্স, ধবধবে সাদা উঁচু কলারের সামনে সুদৃশ্য কালো বো-টাই।

টারস্টিগের মনে ভিনসেণ্টের প্রতি অনেকদিন থেকেই একটা দরদ ছিল। গুপিল কোম্পানিতে কাজ করতে হেগ থেকে লণ্ডনে যখন সে বদলি হয়, তখন হেগ-এর ম্যানেজার টারস্টিগ লণ্ডনের ম্যানেজারের কাছে ভিনসেণ্টের নামে খুব ভালো প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। বরিনেজে যখন ভিনসেণ্টের মনে প্রথম ছবি আঁকার প্রেরণা জাগে, সে তাঁকেও চিঠি লেখে ও তিনি তাকে কপি করার জন্যে কয়েকটি দামি ছবির বই পাঠিয়ে দেন।

হেগ শহরের সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় গুপিল কোম্পানির দোকান। ঠিকানা—২০নং প্লাটস্‌। স্টেশনে নেমেই ভিনসেণ্ট সোজা চলল সেখানে। এই

গুপিল কোম্পানির দরজা থেকে সে শেষ বার হয়ে এসেছিল আট বৎসর আগে। ভাগ্য তাকে কী উপঢৌকন দিয়েছে এই আট বৎসরে? শুধু বেদনার বন্যা-স্রোত।

আট বছর আগে সকলে তাকে ভালোবাসত। ভিনসেণ্ট কাকার সে ছিল প্রিয়তম ভাইপো। সবাই জানত কাকার পর কাকার পদ তো সে নেবেই, কাকার উত্তরাধিকারীও সে-ই হবে। এতদিনে সে-ই তো হোতো ইউরোপের কতোগুলো নামকরা আর্ট গ্যালারির মালিক,—কী বিরাট হোতো তার মান সম্মান, প্রতি-পত্তি!

—কিন্তু তার বদলে?

মনে মনে এ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে রাস্তা পার হয়ে ঢুকে পড়ল গুপিল কোম্পানির দরজায়। অপূর্ব চারদিকের সাজসজ্জা,—রাজপুরী যেন। ভুলেই সে গিয়েছিল যে তার পরনে শ্রমিকের মোটা কালো পোশাক, পায়ে চাষীর মোটা বুটজুতো। প্রথম গ্যালারিটি লম্বা,—লাল ভেলভেট আর সিল্ক-মোড়া দেয়াল। তারপর তিনধাপ সিঁড়ি উঠে প্রধান সালোঁ, সেটার ছাদ পর্যন্ত কাঁচ দিয়ে মোড়া। সেটা পার হয়ে আরো কয়েক ধাপ উঠে দ্বিতীয় সালোঁটা, জাত শিল্পরসিকদের এটি তীর্থস্থল। বিরাট চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলা, সেখানে মিনহার টারস্টিগের অফিস আর কোয়ার্টার্স। সিঁড়ির দেয়াল জুড়ে অসংখ্য ছবি।

সমস্ত গ্যালারি জুড়ে সংস্কৃতির প্রদর্শনী, ঐশ্বর্যের সমারোহ। কর্মচারীদের সাজপোশাক যেমন ফিটফাট, ব্যবহারও তেমনি ধোপদুরস্ত। ছবির ফ্রেমগুলির কী দাম, পর্দাপুল্লির কী বাহার! মেঝেতে মোটা কার্পেট, প্রত্যেকটি আসবাবে অভিজাত রুচির পরিচয়। হঠৎ ভিনসেণ্টের মনে হোলো—তার শিল্প-প্রচেষ্টার নায়ক নায়িকা কারা? কয়লাখনির মজুর আর মজুরনী, শূন্য মাঠের কৃষাণ আর কৃষাণী। সর্বরিক্ত দারিদ্র্য যাদের দেহের প্রতিটি রেখায়, অঙ্গের প্রতিটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভূষণে। এই শিল্পপ্রাসাদে এসে কোনো ক্রেতা কি ঐ হতভাগ্য বঞ্চিত মানুষদের ছবি কখনো কিনতে চাইবে? অসম্ভব। ফিরেও তাকাবে না,—বড়জোর চোখে পড়লে নাক সিঁটকোবে।

মভের আঁকা মোটাসোটা ধবধবে সাদা একটা ভেড়ার ছবির দিকে খানিকক্ষণ সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। কর্মচারীরা একবার তার রুক্ষ মলিন বেশবাসের দিকে তাকিয়েই বুঝে নিল তার কদর। কেউ এগিয়ে এল না সামনে।

টারস্টিগ সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। ভিনসেণ্ট তাঁকে দেখতে পায়নি। তাঁর চোখ কিন্তু সোজা পড়ল ভিনসেণ্টের ওপরে। কদম-ছাঁট চুল, খোঁচা-খোঁচা লাল দাড়ি, গায়ে গলাবন্ধ শ্রমিকের কোট আর পায়ে চাষীদের বুটজুতো, বগলে একটা বোঁচকা। এই তাঁর পুরোনো কর্মচারী, সময়কালে মালিক হবার

সম্ভাবনাও একদা যার ছিল। চারদিকের বিত্তগর্বিত পারিপাট্যের মাঝখানে বিশ্রী রকমের বেমানান।

নরম মোটা কার্পেটের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে টারস্টিগ বললেন,—তারপর ভিনসেণ্ট, কী খবর? কেমন দেখছ ছবিগুলো?

চমকে উঠল ভিনসেণ্ট।

—চমৎকার, ভারি চমৎকার! আপনার কাছেই এসেছি। কেমন আছেন মিনহার টারস্টিগ? বাবা মা আপনাকে তাঁদের নমস্কার জানিয়েছেন।

আট বছরের অদর্শন মাঝখানে। করমর্দন হোলো দুজনের।

ভিনসেণ্ট বললে,—আপনাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে মিনহার। আগের চাইতে অনেক ভালো হয়েছে চেহারা।

—ধন্যবাদ ভিনসেণ্ট। চেহারাটা ঠিক আছে কেন জানো? বেঁচে থাকাটা আমার ভালোই লাগে। মানে, মনে হয় বেঁচে আছি বলেই বুড়িয়ে যাচ্ছিনে। তোমার খবর কী? চলো, আমার অফিসে চলো আগে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হোঁচোট খেতে লাগল ভিনসেণ্ট। দেয়াল থেকে সে চোখ সরাতে পারে না। কতোদিন পরে আবার সে এসেছে শিল্পকলার জগতে—সেখানে চারদিকে সত্যিকারের ছবি—একটা নয়, অসংখ্য।

ঘরে ঢুকে টারস্টিগ বললেন,—বোসো ভিনসেণ্ট।

ভিনসেণ্ট হাঁ করে তাকিয়ে ছিল সামনের দেয়ালে উইসেনব্রাকের আঁকা একটা ছবির দিকে। এ শিল্পীর কোনো কাজ সে আগে দেখেনি। টারস্টিগের কথা শুনে চমকে উঠে সে ধপ্ করে সামনের চেয়ারটাতে বসে পড়ল। হাত থেকে মেঝেতে খসে পড়ল বাণ্ডিলটা। ব্রস্তভাবে সেটা তুলে নিয়ে বললে,—আপনি যে আমার ছবির বইগুলো পাঠিয়েছিলেন, তার জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি মিনহার। বইগুলো ফেরৎ দিতে এসেছি।

বাণ্ডিলের মধ্যে বই আছে, আবার ফরসা একটা শার্ট আর মোটা একজোড়া মোজাও আছে। বইগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে কথাটা শেষ করল,—এগুলো বড় উপকারে লেগেছিল, অনেক ড্রয়িং করেছি এদের সাহায্যে।

—দেখাও আমাকে, টারস্টিগ বললেন,—দেখি তুমি কেমন ড্রয়িং করতে শিখেছ।

বাণ্ডিলের মধ্য থেকে ভিনসেণ্ট বার করলে তার ড্রয়িংয়ের তাড়া। কপিগুলো তিনভাগে ভাগ করা। প্রথম দলে আছে বরিনেজে বসে সে যেসব কপি করেছিল সেগুলো। প্রথমেই সেগুলো সে দেখালো। টারস্টিগের মুখে নীরব কাঠিন্য। দ্বিতীয় গোছার কপিগুলো ইটেনে পৌঁছবার পর করা। সেগুলো দেখে টারস্টিগ দু-একবার হুঁ বললেন মাত্র। তৃতীয় দলের কপিগুলো তার হেগ-এ আসবার কয়েকদিন আগেকার কাজ। এগুলো

দেখতে দেখতে কয়েকটা মন্তব্য করলেন টারস্টিগ। টুকরো টুকরো কয়েকটি আশ্বাসবাক্য।

সব ড্রয়িংগুলো দেখানোর পর ভিনসেণ্ট স্তব্ধ আগ্রহে স্থির হয়ে বসল, টারস্টিগ কী অভিমত দেন তা কান পেতে শোনবার জন্যে।

টেবিলের ওপর দীন দুটি হাত প্রসারিত করে আঙুলের সঙ্গে আঙুল মেলাতে মেলাতে টারস্টিগ বললেন,—হ্যাঁ, কিছুটা উন্নতি তুমি করেছ ভিনসেণ্ট, যদিও খুব বেশি নয়। তোমার প্রথম কপিগুলো দেখে আমি খুব হতাশ হয়েছিলাম, তবে শেষ পর্যন্ত দেখে এটুকু আমার ধারণা হয়েছে যে তুমি পরিশ্রম করছ খুব—তাই না?

—শুধুমাত্র পরিশ্রম? আশা নেই, সম্ভাবনার কোনো ইঙ্গিত নেই? ভিনসেণ্টের গলায় আকুল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন না করে সে পারল না।

—এত তাড়াতাড়ি সে বিষয়ে কোনো মত দেওয়া যায় না ভিনসেণ্ট।

—আমার নিজের আঁকাও কয়েকটা ছবি আছে। দয়া করে দেখবেন?

—বেশ তো দেখাও।

শ্রমিক ও কৃষাণদের কয়েকটি স্কেচ বার করে ভিনসেণ্ট ধরল। চুপ করে রইলেন টারস্টিগ। একটু হুঁ শব্দও এবার করলেন না। ভয়াবহ স্তব্ধতা, সাংঘাতিক অর্থপূর্ণ স্তব্ধতা। এর মানে—কিছু না, কিছু না। ভিনসেণ্টের বুক কাঁপতে লাগল, মনে হোলো যেন তার অসুখ করেছে হঠাৎ।

নিঃশব্দে ছবিগুলো দেখে টারস্টিগ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে, যেখানে স্বচ্ছ হ্রদে রাজহাঁসদের মেলা। ভিনসেণ্টের মনে হোলো সে নিজে যদি কথা না বলে তাহলে এ নিস্তব্ধতা বুঝি কখনো ভাঙবে না।

—কোনো উন্নতির পরিচয় দেখতে পাচ্ছেন মিনহার ছবিগুলোর মধ্যে? এই তো বরিনেজে আঁকা ছবিগুলো, আর এগুলো আঁকা ব্র্যাবাণ্টে। পরেরগুলো কি একটুও ভালো হয়নি!

জানলা থেকে চোখ ফেরালেন টারস্টিগ। সোজা চাইলেন ভিনসেণ্টের দিকে।

—হ্যাঁ, এগুলো একটু ভালো বলতে হবে। তবে আসলে আঁকার হাতই তোমার ভালো নয়। ঠিক যে কী সেটা তা ধরতে পারছি নে, তবে তোমার আঁকায় কোথায় যেন একটা সাংঘাতিক ভুল আছে, একেবারে মৌলিক ভুল। নিজের থেকে ছবি আঁকবার ক্ষমতা এখনো তোমার বিন্দুমাত্রও হয়নি ভিনসেণ্ট। এখনো বেশ কিছুদিন তুমি কপি করে যাও।

—ছবি আঁকা শেখবার জন্যে আমি হেগ-এই এসে থাকব ভাবছিলাম মিনহার। আপনি কী উপদেশ দেন?

ভিনসেণ্টকে টারস্টিগ ভালোই চেনেন। তার কোনো দায়িত্ব নিতে তিনি নারাজ। উত্তরে বললেন,—হ্যাঁ, হেগ চমৎকার শহর, তা আর বলতে!

ছবির গ্যালারি আছে কয়েকটা, অল্পবয়সী আঁকিয়েরও অভাব নেই। তবে হেগ কিম্বা অ্যান্টোয়ার্প, প্যারিস কিম্বা ব্রুসেলস্, কোন্ শহর যে কার চাইতে বেশি ভালো, তা আমি বলতে পারব না।

ভিনসেন্ট বিদায় নিল, পরিপূর্ণ হতাশা নিয়ে নয়। টারস্টিগ হচ্ছেন ছবির শ্রেষ্ঠ সমঝদার, তিনি ছবি দেখেছেন তার। ছিঁড়ে তো ফেলেননি, বলেননি তো চোখ পাকিয়ে,—ছেড়ে দাও এ-কম্ম। পরিশ্রম তো করতেই হবে, সাধনার এই তো শুরু। ভাবনা কিসের?

পরদিন সে গেল অ্যান্টন মভের বাড়ি। মভের স্বাশুড়ি আর কর্নেলিয়ার বোন। ভিনসেন্ট পেল আত্মীয়তার আহ্বান!

বিরাটকায় ব্যক্তি মভ,—মস্ত কাঁধ, চওড়া বুক, দেহে অমিত শক্তি। মস্ত বড়ো মাথা, চওড়া কপাল, হঠাৎ-খাড়া-হওয়া খাঁড়ার মতো নাক, ভাসা ভাসা দুটি চোখ। তামাটে রঙের ঘন দাড়িতে গোলগাল গাল আর চিবুক ঢাকা। ছবি আঁকায় মভের ক্লান্তি আসে না। ক্লান্তি এলে আরো আঁকেন, আঁকতে আঁকতে ক্লান্তি ঘোচে।

মভ বললেন,—আমার স্ত্রী এখন বাড়িতে নেই। চলো একেবারে স্টুডিয়োতে গিয়ে বসি।

ভিনসেন্টও তো তাই চায়। বাড়ির পেছনে বাগান। বাগানের ধারে মভের স্টুডিয়ো। ঘরোয়া কোলাহল থেকে দূরে।

মস্ত স্টুডিয়ো, সারা ঘর জুড়ে দামি তামাক আর পুরোনো পাইপের মধুর গন্ধ। দেয়ালে দেয়ালে অনেক ছবির রঙিন উষ্ণতা। এক কোণে একটি কাঠ খোদাইয়ের কাজ-করা টেবিল, সামনে মেঝেতে কার্পেট পাতা। উভয় দিকের দেয়াল জুড়ে জানলা। সামনে ঈজেলের ওপর ছবি। চারিদিকে বই আর ছবি আঁকার সরঞ্জামের সমারোহ। জিনিসপত্রের এত ভিড়ের মধ্যেও সুন্দর একটি গোছালো ভাব।

গত কদিন ধরে মভ তাঁর সব শিল্পীবন্ধুদের এড়িয়ে চলছিলেন। গোধূলি অন্ধকারের প্রাকৃতিক দৃশ্য তিনি আঁকছিলেন। ছবিটা তাঁকে একেবারে পাগল করে রেখেছিল। ভিনসেন্টকে পেয়ে সংহত আগ্রহ কথার স্রোতে ফেটে পড়ল।

মাদাম মভ ফিরলেন। জোর করে সকলের সঙ্গে ভিনসেন্টকে খাবার টেবিলে বসালেন। সুন্দর খাবার ঘরটি, ফায়ার-প্লেসের কবোষ্ণ উত্তাপ, লোভনীয় খাদ্য ও পানীয়। স্বামীস্ত্রীর চমৎকার জীবন—শিশুগুলির কী মিষ্টি ব্যবহার! মনটা কেমন করে উঠল ভিনসেন্টের। এমনি একটি সার্থক মধুর সংসার তার জীবনে সে কি পাবে কখনো?

খাওয়া-দাওয়ার পর মভের সঙ্গে স্টুডিয়োতে গেল। কপিগুলি বার করল ভিনসেন্ট মভের তীক্ষ্ন দৃষ্টির সামনে।

মভ দেখে বললেন,—মন্দ হয়নি, কিন্তু এ করে কী লাভ ?

—লাভ ? তার মানে ?

—নিশ্চয়ই। স্কুলের ছেলের মতো তুমি তো খালি কপি করেই চলেছ, আর প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি করছে অন্য লোক,—তাই না ?

আমতা আমতা করে ভিনসেণ্ট বললে,—আমার তো ধারণা প্রথমটা নকল না করলে শেখা যায় না।

—ভুল, ভুল, একদম বাজে কথা। সৃষ্টিই যদি করতে চাও, নকলনবিশি করলে চলবে না, সোজাসুজি জীবনের মধ্যে ঢুকে পড়ো। নিজের আঁকা কোনো স্কেচ নেই ?

টারস্টিগের অভিমতের কথা ভেবে বড়ো লজ্জায় বড়ো সন্তর্পণে ভিনসেণ্ট বললে,—হ্যাঁ, নিজেও আমি কিছু কিছু এঁকেছি, বোরেন শ্রমিক আর ব্র্যাবাণ্টের চাষীদের ছবি। কিন্তু ভালো হয়নি সেগুলো।

—না হোক। তবু নিজের আঁকা তো ? সঙ্গে থাকে তো দেখাও।

মভের শিক্ষার্থী হবার আগ্রহ নিয়ে ভিনসেণ্ট হেগ-এ এসেছে। এবার আসল অগ্নিপরীক্ষা। কম্পিত হাতে সে তার অকিঞ্চিৎকর স্কেচগুলো তুলে দিল মভের হাতে।

একটার পর একটা ছবি মভ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। মাঝে মাঝে চোখ পাকিয়ে তাকান, কোনো ছবিটা ঈজেলের ওপর বসিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করেন। কখনো নিমীলিত চোখে ভাবেন আর বাঁ হাতের আঙুলগুলো চালিয়ে নিজের মাথার ঘন চুলগুলোকে উস্কোখুস্কো করেন। দু-একটা ছবির ওপর নিজের হাতে পেন্সিলের রেখাও টানেন কয়েকটা।

শেষ পর্যন্ত বলেন,—এই তো ঠিক হচ্ছে,—রাস্তা পেয়ে গেছ তুমি। স্কেচগুলো তোমার বড় নোংরা, কিন্তু আসল কথা,—এগুলো সত্যি। এগুলোর মধ্যে শক্তি আছে দৃঢ়তা আছে, যার দেখা সহজে মেলে না। কপি-বই সব ফেলে দাও ভিনসেণ্ট, সোজাসুজি রঙের বাক্স কেনো একটা। যতো তাড়াতাড়ি রঙকে ধরবে, ততো তাড়াতাড়ি তোমার উন্নতি হবে। হ্যাঁ, ড্রয়িং তোমার ভালো নয়, কাঁচা হাত,—তা, আঁকতে আঁকতেই ড্রয়িং ভালো হবে।

ভিনসেণ্ট সুযোগটা হারালো না। পরম বিনীতভাবে বললে,—আমি স্থির করেছি হেগ-এ এসেই থাকব ভাই মভ। আপনি কি আমাকে দয়া করে একটু একটু সাহায্য করবেন ? আমার মতো নতুন শিক্ষার্থী গুরুর নির্দেশ ছাড়া কাজ করবে কেমন করে ? আপনিই আমার গুরু হবেন।

কুঁকড়ে গেলেন মভ। তাঁর হাতে অনেক অসমাপ্ত ছবি। স্টুডিয়োর বাইরে যেটুকু সময় পান সেটুকু স্ত্রী আর সন্তানদের সঙ্গে কাটাবার তাঁর তৃষ্ণা।

বললেন,—আমার কিন্তু সময় একদম থাকে না ভিনসেণ্ট, আমি তোমার খুব সামান্য কাজেই আসব। শিল্পী বড়ো আত্মকেন্দ্রিক, নিজের কাজের

মোহে সে বড়ো স্বার্থপর।

ভিনসেণ্ট বললে,—আমি বেশি কিছু চাইনে। শুধু মাঝে মাঝে আপনার এখানে কাজ করব। আজ বিকেলে আপনার নিজের ছবির কথা যেমন বলেছিলেন, তেমনি আলোচনা থেকেই আমার অনেক শিক্ষা হবে। আর আপনি কেমন করে ছবি শুরু করেন, শুরু থেকে শেষ করেন, চুপ করে তাই দেখব। নিতান্ত যখন বিশ্রাম, তখন হয়তো আমার ড্রয়িং-এর ভুলগুলো আপনি সংশোধন করে দেবেন। আপনার বোঝা আমি হব না,—দেখবেন।

মভ অনেকক্ষণ ভাবলেন। নিজের স্টুডিয়োতে শিক্ষানবিশ তিনি কখনো রাখেননি। তাছাড়া একলা নাহলে তিনি কাজ করতে পারেন না। নিজের ছবি নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করা খুব বেশি যে তিনি পছন্দ করেন তাও নয়। তা ছাড়া নবীন শিষ্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে অবশেষে সম্মান হারানোর তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। তবে কিনা ভিনসেণ্ট তাঁর আত্মীয়। তাছাড়া গুপিল কোম্পানি তাঁর সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। ছেলেটার কাঁচা হাতের নোংরা কাজের মধ্যে কোথায় যেন একটা বন্য উন্দামতা আছে, এও তাঁকে টেনেছে।

স্বীকৃত হলেন শেষ পর্যন্ত। বললেন,—আমি খুব একটা আশা তোমাকে দিচ্ছিনে। তবে, দেখাই যাক কতোদূর কী হয়। আমি ক-মাসের জন্যে বাইরে যাব। শীত বাড়লেই তুমি চলে এসো।

ট্রেনে সারা পথ ভিনসেণ্টের বুকে আনন্দগুঞ্জন বাজতে লাগল—গুরু পেয়েছি, গুরু পেয়েছি! আর আমাকে আটকায় কে?

ইটেনে পৌঁছে দেখল বাড়িতে কে ভস এসেছে।

৬

সদ্য-স্বামীহারা বিধবা কে ভস। শোকের বিষণ্ণ ছায়ামূর্তি। প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরনিবাসিনীরও যেন মৃত্যু ঘটেছে। কোথায় সেই উদ্দীপ্ত উচ্ছলতা! মুখে তপস্বিনীর কারুণ্য, নীল চোখদুটির অতলে পুঞ্জিত বেদনার কৃষ্ণ মেঘচ্ছায়া। বিশীর্ণ দেহ, নিষ্প্রভ কান্তি। তবে, রূপহীনা নয়, রূপের শান্ত সমাহিত নব প্রকাশ,—যে রূপ বৈরাগিনীর, তপস্বিনীর।

সোজাসুজি নাম ধরে ভিনসেণ্ট তাকে সম্ভাষণ করল,—তাহলে এতো দিন পরে তুমি আমাদের এখানে এলে, কে।

—ধন্যবাদ ভিনসেণ্ট,—তেমনি নাম ধরে কে উত্তর দিল।

—তোমার ছেলে জ্যান, তাকে আনোনি?

—হ্যাঁ। বাগানে খেলছে।

—এই প্রথম ব্র্যাবাণ্টে এলে, তাই না? দেখো, কতো দেখবার জিনিস

আছে,—গ্রামে, মাঠে, বনে। অনেক দূর পর্যন্ত তোমাকে আমি রোজ বেড়িয়ে আনব।

—ভালোই লাগবে, ভিনসেণ্ট।

আগ্রহহীন, মৃদু কণ্ঠ। ভিনসেণ্ট লক্ষ করল তার গলার স্বরে নতুন গভীরতা, কেমন যেন মন্থর ঝঙ্কার। একদা তার বড়ো দুঃখের দিনে বড়ো সহৃদয় ব্যবহার সে পেয়েছিল এই কে মেয়েটির কাছে। তার বিনিময়ে সে কি এখন সহানুভূতির কথা শোনাবে? থাক। যে শোক নিত্য জাগ্রত আছে, তাকে আবার জাগাবার চেষ্টা করে লাভ কী?

কে-ও বুঝল। স্বামীর স্মৃতি তার কাছে পুণ্যস্মৃতি, অন্তরের গোপন ধন। তা নিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করতে তারও ভালো লাগে না। ভিনসেণ্ট নিঃশব্দে শুধু তার হাতদুটি নিজের হাতে টেনে নিল, নীরব, কৃতজ্ঞ-করুণ চোখ তুলে কে শুধু একবার তাকালো তার দিকে। সেই কম্পিত হাতের স্পর্শে, সেই বেদনাকৃষ্ণ আঁখির দৃষ্টিতে ভিনসেণ্ট বুঝল, যে মেয়ে একদা সুখে শুধু হাসিখুশি ছিল, দুঃখের অগ্নিস্পর্শ তাকে রূপান্তরিত করেছে মহীয়সী নারীতে।

নিচু গলায় সে বললে,—তোমার এখানে ভালোই লাগবে, কে। আমি সারাদিন বাইরে ছবি এঁকে কাটাই। তোমাকে আর জ্যানকে আমার সঙ্গে আমি নিয়ে যাব।

—কিন্তু তোমার পথে তো আমরা বাধাই হব ভিনসেণ্ট।

—বাঃ, কে বললে? উল্টে খুব ভালো লাগবে আমার। কতো মজার মজার জিনিস তোমাদের দেখাব।

—তাহলে তোমার সঙ্গে যেতে আমার আপত্তি নেই।

—জ্যানেরও ভালো হবে দেখো। শক্ত হবে ওর শরীর।

এবার ভিনসেণ্টের হাতে কে-র আঙুলের মৃদু কম্পিত স্পর্শ।

—বেশ তো,—এবার আমাদের সত্যিকারের বন্ধুত্ব জমবে, কী বলো?

বাগানে গেল ভিনসেণ্ট। গাছের ছায়ায় কে-র জন্যে একটা বেঞ্চি পেতে তার পাশে জ্যানের জন্যে একটা মাটির খেলাঘর তৈরি করতে বসল। হেগ থেকে যে মস্ত সম্ভাবনার খবর সে এনেছে, সে খবর সবাইকে জানাবার কথাও সে ভুলে গেল।

রাত্রে খাবার টেবিলে কথাটা সে ভাঙল যে মভ তাকে ছাত্র হিসেবে নিতে রাজি হয়েছেন। কে সামনে বসে, তাই নিজের সাফল্যের কথাটা একটু বাড়িয়েই বললে। সবচাইতে খুশি হলেন মা।

পরের দিন সকালবেলা ভিনসেণ্ট কে আর জ্যান যাত্রা করল লাইসবেকের উদ্দেশ্যে। সেখানে ছবি আঁকবে সে,—কিন্তু ব্যাপারটা যেন—বনভোজনে চলেছে তারা। মা প্যাকেটে করে দিলেন তিনজনের মতো দুপুরবেলাকার

যাবার। পথে গির্জের ধারে অ্যাকাসিয়া গাছের ডালে ম্যাগপাই পাখির বাসা। উৎসুক জ্যানের কাছে ভিনসেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিল পাখির একটা ডিম সে পেড়ে এনে দেবে তাকে। আঁকাবাঁকা এবড়ো-খেবড়ো পথে তারা পার হোলো পাইনবন। তারপর সোনালি আর সাদা বালিভরা প্রান্তর। নির্জন প্রান্তরের এক জায়গায় পড়ে আছে ভাঙা একটা লাঙল আর একটা হাতগাড়ি। গাড়িটার ওপর জ্যানকে বসিয়ে ঈজেলটা নামিয়ে ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি তাকে স্কেচ করে নিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কে। ওর নিস্তব্ধতা ভাঙতে চাইল না ভিনসেণ্ট। সে যখন আঁকছে, চুপ করে পাশে রয়েছে একটি মেয়ে,—এই নবলব্ধ আশ্চর্য অনুভূতি সেও নিঃশব্দে উপভোগ করতে লাগল।

আবার চলল তারা। গ্রামের পথ, দুপাশে কৃষাণ-কুটির। ক্রমে এসে পেঁছিল রুজেনডালের রাস্তায়। এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল কে।

—জানো ভিনসেণ্ট, সে বললে,—আমস্টার্ডামে তোমার সম্বন্ধে একটা কথা আমি ভাবতাম,—আজ ঈজেলের সামনে তোমাকে আঁকতে দেখে সেই কথাটাই আমার মনে পড়ে গেল।

—কী কথা, কে? শুধোলে ভিনসেণ্ট।

—শুনলে দুঃখ পাবে না, বলো?

—মোটেই না, বলো তুমি।

—তাহলে সত্যি কথাই বলি। তুমি যে পাদ্রি হবে শেষ পর্যন্ত, তা আমি কিছুতেই ভাবতে পারতাম না। কেমন যেন মনে হোতো তুমি খালি সময় নষ্ট করছ।

—বলোনি কেন তখন আমাকে?

—বলবার অধিকার ছিল মনে করিনি।

মাথার কালো টুপির শাসনে কয়েকটি অবাধ্য অলক গুঁজে দিল কে। রাস্তাটা সরু হয়ে এসেছে। একবার হোঁচট খেয়ে সে টলে পড়ল ভিনসেণ্টের গায়ে। ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি তার বাহুমূলে হাত দিয়ে চেপে ধরে তাকে সামলালো,—তারপর হাত সরিয়ে নিতে মনে রইল না।

কে আবার বললে,—তাছাড়া যে কথাটা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছ, তখন আমি সেটা বললেই কি কোনো লাভ হোতো? তবুও তুমি যে একজন সংকীর্ণমনা পাদ্রি হবে তা আমার ভাবতেই খারাপ লাগত।

ভিনসেণ্ট বললে,—আশ্চর্য! তুমি নিজে যে ধর্মযাজকের মেয়ে!

—এ আমার ভস-এর কাছ থেকে শিক্ষা। অনেক শিক্ষাই আমি ওর কাছ থেকে পেয়েছি।

হাতটা সরিয়ে নিল ভিনসেণ্ট। হঠাৎ ভস-এর নাম যেন ছায়ার মতো নামল দুজনের মাঝখানে।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর তারা লাইসবেকে পেঁছিল। ভিনসেণ্ট ঈজেলটা

ঠিক করে দাঁড় করালো। পিছনের একটা ছোট টুলে বসে কে বইয়ের পাতা খুলল। বালিতে খেলা করতে লাগল জ্যান। স্কেচ করতে শুরু করল ভিনসেণ্ট। মনে তার নতুন উম্মাদনা, পেন্সিলের প্রতি রেখায় নতুন বলিষ্ঠতা। হয়তো মভের আশ্বাস, হয়তো কে-র উপস্থিতি এর কারণ। ক্ষিপ্রগতিতে স্কেচের পর স্কেচ সে করে চলল। একটি কথা বলে কে তাকে বিরক্ত করল না, সেও কে-র দিকে মুখ ফিরিয়ে সময় নষ্ট করল না একটুও। আজকের কাজ তার ভালো হওয়া চাইই চাই, দিনের শেষে কে-র প্রশংসাবাণী তাকে আদায় করতেই হবে।

দুপুরবেলা তারা আশ্রয় নিল ছায়াঘেরা একটি ওক-কুঞ্জে। শীতল ছায়ায় বসে কে খাবারের সামগ্রীগুলি সাজালো। অদূরের জলাভূমি হতে অসংখ্য পদ্মের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে মিশেছে মাথার ওপরকার ওক পল্লবের মৃদু সুরভি। একদিকে বসল কে আর জ্যান, অপর দিকে তাদের মুখোমুখি ভিনসেণ্ট। পাত্র সাজিয়ে খাবার গুছিয়ে দিতে লাগল কে। খাবার টেবিলের ধারে মভ আর তার পরিবারের সেই শান্ত তৃপ্ত পরিবেশটির কথা মনে পড়ল ভিনসেণ্টের।

কে-র দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হোলো,—এমন সুন্দর আর কাউকে সে কখনো বুঝি দেখেনি। হাতে গড়া রুটিতে মাখানো সুস্বাদু ঘন পনির,—সবই মার হাতের তৈরি,—তবু ভিনসেণ্টের গলা দিয়ে যেন নামে না। নতুন, অভূত-পূর্ব একটা ক্ষুধা মনের মধ্যে জেগে উঠেছে—কে-র শীর্ণ গম্ভীর মুখ, বেদনা-কৃষ্ণ গভীর চোখ আর পাণ্ডুর ওষ্ঠদুটি চুম্বকের মতো তার দৃষ্টিকে টেনে রেখেছে।

খাওয়ার পর মার কোলে মাথা রেখে জ্যান ঘুমিয়ে পড়ল। ছেলের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে চোখ নিচু করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল কে। ভিনসেণ্ট বুঝল, শুধু ছেলের মুখই দেখছে না কে, সেই মুখের আদলে খুঁজছে ভস-কে,—মৃত্যুপারের দয়িতকে।

সারা বিকেলবেলাটা সে স্কেচ করল। অনেকবার জ্যান এসে বসল তার কোলে। ছেলেটা তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। হাজার প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে অস্থির করেছে, কালিঝুলি মাখিয়ে নষ্ট করেছে অনেকগুলো কাগজ। বিরক্ত বোধ করেনি ভিনসেণ্ট, ভাল লেগেছে নিষ্পাপ সরল এই জীবন্ত শিশুটির চঞ্চল স্পর্শ।

সন্ধ্যাগমে আবার যাত্রা গৃহমুখে। পথে ছোট ছোট জলায় পড়ন্ত সূর্যের রঙিন লীলা,—যেন প্রজাপতির বর্ণবৈচিত্র্য। চক্রবালের রক্তিমে আসন্ন রাত্রি-ছায়ার কারুণ্য। প্রান্তর-জোড়া ক্রমবৈরাগ্যের অভিব্যক্তি। সেদিনের আঁকা স্কেচ-গুলি ভিনসেণ্ট কে-কে দেখালো। কে-র মনে হোলো ওগুলো শিশু-সুলভ অপটু আর স্থূল কাজ। তবু জ্যানকে যে ভালোবেসেছে, তার দুঃখকে যে উপলব্ধি করেছে অন্তরে,—সে লোক ভালো।

—কেমন লাগল, কে?

—ভালো, খুব ভালো।

—সত্যি?

সহানুভূতির ছোট্ট কটি কথায় ভিনসেন্টের মনের বন্ধ অর্গল খুলে গেল। কে তাকে বুঝবে, কে বুঝবে তার আশা-আশঙ্কার কথা! পৃথিবীতে আর কেউ নয়। বাড়িতে সে মুখ বুজে থাকে, মভ আর টারস্টিগের কাছে কথা বলতে হয় দীন বিনীত ভাবে, থিয়ো থাকে বিদেশে। বন্ধু নেই একটিও, হৃদয়ের একটি বাতায়নও যার কাছে খোলা যায়।

এতক্ষণ পরে মুখ খুলল সে। কথা বলতে লাগল ঝড়ের মতো। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল জোর কদমে। তার হাঁটার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত হোলো কে-র পক্ষে। কোথায় গেল শহুরে ভদ্রতার পালিশ। আড়ষ্ট ভাষা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা কি সহজ? তাই তো আবার হাত-ঝাঁকুনি কাঁধ-ঝাঁকুনির মুদ্রাদোষগুলো বিকটভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। কে অবাক হয়ে গেল,—কেন এমনি ছটফট করছে, বকবক করছে অমার্জিত অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মতো? নারী বুঝল না যে লোকটা আসলে তার সামনে রাখছে শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রমের আন্তরিক অঞ্জলি।

প্রকাশহীনতার বেদনার যতো অনুভূতি তার মনে জমা হয়েছিল সব সে ঢেলে দিতে চাইল এক নিশ্বাসে। কী তার আশা, কী তার আকাঙ্ক্ষা, কেমন শিল্পী সে হতে চায়, জীবনের কোন্ সত্যের বাস্তব রূপটিকে সে প্রকাশ করতে চায় তার কাজে, তার ছবিতে? স্বপ্ন সে দেখে, কিন্তু স্বপ্নবিলাসী সে নয়। দুঃখের পরিচয় সে পেয়েছে, তাই তার স্বপ্ন দুঃখপারের সার্থকতার স্বপ্ন। কে ভেবেই পেল না তার অতো উত্তেজিত হয়ে ওঠার কারণটা কী। বাধা সে দিল না, কিন্তু কানেও নিল না অধিকাংশ কথা। স্মৃতি নিয়ে সে আছে, অতীতে নিমজ্জিত তার মন। ভবিষ্যৎ নিয়ে এত উত্তেজনার, এত আশার কথা তার কানে বেসুরো বাজে, কুঁকড়ে দেয় তার মনকে। কথার মাঝখানে একটা নাম শুনে হঠাৎ একবার কে বলে উঠল,—

—রিউহাইস? আমস্টার্ডামে এই নামে একজন শিল্পী থাকত, তার কথা বলছ?

—হ্যাঁ, তার কথাই তো। সে এখন হেগ-এ আছে। তুমি জানতে তাকে?

—ভস-এর বন্ধু ছিল সে। ভস প্রায়ই তাকে বাড়িতে নিয়ে আসত।

ভস, কেবল ভস! লোকটা মরেছে, এক বছরের বেশি সে নেই। তবু তার প্রেত আজও কেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে কে-কে! কেন ভুলতে পারে না কে। সে তো এখন অতীত, ভিনসেন্টের জীবনে উরসুলা যেমন অতীত। তবু ভস অতীত নয়, তবু সে উপস্থিত। হঠাৎ ভিনসেন্টের ধারণা হোলো, আমস্টার্ডামে লোকটাকে যতোবার সে দেখেছিল, একবারও তাকে তার ভালো লাগেনি।

শরৎ ঘনিয়ে এল। তামাটে হলুদ রঙ ধরল পাইন বনে। প্রতিদিন কে

আর জ্যান ভিনসেণ্টের সঙ্গে বার হয়। কে-র গালে লেগেছে রঙ, পায়ের চলায় এসেছে সুস্পষ্ট দৃঢ়তা। সঙ্গে সে নেয় সেলাই-বাস্কেট। ভিনসেণ্ট আঁকে সারাদিন, তার আঙুলও অলস থাকে না। কথাবার্তাতেও আবার প্রাণের আবেগ লেগেছে—ছেলেবেলাকার গল্প, আমস্টার্ডামের জীবনের গল্প। কে-র চোখে মাঝে মাঝে কৌতুকের ঝিলিক লাগে।

কে-র সবকিছু ভালো লাগে ভিনসেণ্টের। দীর্ঘ রুক্ষ কালো পোশাকে ঢাকা ওর শীর্ণ তনু, সোনালি-চুল-ঢাকা পথে বার হবার কালো টুপিটি, কাছাকাছি যখন আসে তখন ওর মৃদু মধুর দেহ-সুরভি। চোখে চোখ পড়া কখনো, কখনো বা ক্ষণিক চকিত স্পর্শ। ওর গলার ভাঙা ভাঙা স্বর ভিনসেণ্টের নিদ্রিত শ্রবণে গানের মতো বাজে, স্বপ্নে ভিনসেণ্টের তৃষিত ওষ্ঠ তৃপ্তি খোঁজে ওর অঙ্গপ্রান্তের মরীচিকায়।

অধুনা সে উপলব্ধি করছে—বঞ্চিত, অসম্পূর্ণ তার জীবন। এমনি অসম্পূর্ণতায় বছরের পর বছর তার কেটেছে, অন্তরে ভালোবাসার স্নেহমমতার যে স্রোতস্বিনী ছিল তা শুকিয়ে গেছে দিনে দিনে,—বুকজোড়া তার শুষ্ক মরু। এতদিনে তার স্বপ্নমানসী বুঝি রূপ ধরে দেখা দিল। তাই এত ভালো লাগে কে-র উপস্থিতি,—উপস্থিতিটুকু যেন কোমল আলিঙ্গনের মতো। তার সঙ্গে যখন সে মাঠে যায়, নূতন প্রেরণা সে পায় ছবি আঁকায়; যেদিন যায় না সেদিন প্রতিটি লাইন আঁকা যেন গুরুতর পরিশ্রমের মতো লাগে। সন্ধেবেলা বসবার ঘরে টেবিলের ধারে বসে স্কেচগুলো কপি করে,—কাজের আর তার দৃষ্টির মাঝখানে সর্বদা ভাসে কে-র মুখখানি। টেবিলের ওধারে বসে থাকে কে, নিঃশব্দে কোলের ওপর হাত দুখানি রেখে। হলদে মৃদু আলোর পারে আরো অন্ধকারে সে মুখ ঢাকা। চোখ তুলে ভিনসেণ্ট দু-একবার চায়, ওর চোখে চোখ পড়ে;—কে-র রক্তিম ওষ্ঠে ফুটে ওঠে মৃদু হাসির ধূসর কারুণ্য। মাঝে মাঝে কে যেন হঠাৎ মারে বুকের মধ্যে,—মনে হয় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরবে সে ওকে, শীতল ওষ্ঠপুটের অমৃত পান করবে সকলের সামনে, কাউকে গ্রাহ্য না করে সার্থক করবে তার অন্তরতৃষা।

শুধু যে কে-র রূপে সে মজেছে তা নয়, কে-র দেহমন সব কিছুর কাছে সে আত্মসমর্পিত। উরসুলাকে হারাবার পর থেকে ভুলে ছিল এতোদিন তার চরম একাকিত্বের বেদনা। সারা জীবনে কোনো মেয়ে তার কানে একটি ভালোবাসার কথা বলেনি, আঙুলের সামান্যতম স্পর্শে সিঞ্চন করেনি সামান্যতম আদর। একটিমাত্র চুম্বনের সে চির কাঙাল। এ তো জীবন নয়, এ জীবন-মৃত্যু, প্রেমহারা এ জীবনযাত্রা। উরসুলাকে যখন ভালোবেসেছিল, তখন সবে তার বয়ঃসন্ধি কাল,—তখন সে শুধু দিতেই চেয়েছিল, সেই দানটুকু গ্রহণ করেনি উরসুলা। এখন এ তার পরিণত মনের প্রেম, এ প্রেম দিতে চায়, নিতেও চায়। সে ভাবে,—কে যদি উত্তপ্ত আশ্লেষে তার এই নবজাত প্রেমতৃষা

না মেটায়, তাহলে বাঁচবে সে কী নিয়ে আর? কে-র প্রীতি পরিণত ভালোবাসাই তাকে যে আবার সম্পূর্ণ মানুষের বাসনা-কামনার অধিকারী করেছে।

জ্যানকেও সে ভালোবাসে, জ্যান যে কে-রই অংশ। কিন্তু ঘৃণা করে সে ভসকে, সারা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে ঐ মৃত লোকটার প্রেতচ্ছায়াকে, যা এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার প্রেমাস্পদার মন। কে ভালোবেসেছিল, ক্ষতি নেই; দুঃখশোক পেয়েছে, ভালোই তো। তা, সেও তো একদা ভালোবেসেছিল উরসুলাকে, যে ভালোবাসার ব্যর্থতায় কম জ্বলেনি সে। দুঃখের দাহনে দুজনেরই অভিজ্ঞতা,—সেই দাহনে পবিত্রতর হোক ওদের যুগল প্রেম।

আশঙ্কা নেই তার। ঐ প্রেতকে সে ভয় করে না। জয় সে করবেই। অগ্নিক্ষরা ভালোবাসায় সে পুড়িয়ে দেবে কে-র মনের সমস্ত স্মৃতির জড়তা।

শীঘ্রই সে হেগ-এ যাচ্ছে মভের কাছে ছবি আঁকা শিখতে। কে-ও তার সঙ্গে যাবে। দুজনে নতুন জীবন শুরু করবে—স্বামী স্ত্রী। ঠিকই তো! সংসারী সে হবে না নাকি? কে-র ছেলে মেয়ে হবে,—কে-র আর তার। অনেক দিন বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরেছে, আর না। অনেক অর্থহীন রুক্ষতা জমেছে তার চরিত্রে, এবার সে-সব ঘুচবে, আসবে মাধুর্য, আসবে সম্পূর্ণতা। প্রেম ছাড়া তা অসম্ভব। জীবনের সব মাধুর্যের মূলে প্রেম। এই প্রেমকে সে জয় করবেই।

ভালোই হয়েছে যে উরসুলা তাকে ভালোবাসেনি। যদি সে প্রত্যাখ্যান না করত, সর্বনাশ হোতো তাহলে। ছেলেবেলাকার শস্তা মোহ—তাকেই সে ভেবেছিল ভালোবাসা। ঝুটো কাঁচ দেখে মানিক ভেবে তার মন মজেছিল। প্রেমের প্রকৃত পরিচয় জীবনে সে আর তাহলে পেত না, ভালোবাসতে পারত না কে-কে। ঐ একটা নিতান্ত সাধারণ আর চটুল আর মূর্খ মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন তার ঘর করতে হোতো। অমনি একটা মেয়ের জন্যেই কতো দুঃখ না একদিন সে পেয়েছে। ভাবতে এখন হাসি আসে, আজ মনে হয়, একটি ঘণ্টা কে-র কাছে থাকার বিনিময়ে উরসুলার সারা জীবনের সঙ্গ সে বিলিয়ে দিতে পারে। দুঃখ সে পেয়েছে বটে,—ক্ষতি কী তাতে? শেষ পর্যন্ত কে-কে তো পেল। ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিনও ঘুচল। পথ খুঁজে শেষ পর্যন্ত সে পেল—পেল সৃষ্টির দিশা, প্রেমের পরিণতি।

প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় নিজেকে এখনো সংযত করে রেখেছে ভিনসেণ্ট; সহস্র বার,—কে-কে যখন সে কাছে পায়, মনে হয় সে বলে,—কে, রাগ কোরো না, মনের কথা তোমাকে বলি। মন চায় বাহুর বন্ধনে তোমাকে বাঁধতে, চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিতে তোমার মুখ। মন চায় তুমি আমাকে বিয়ে করো,

ঘরনী হও আমার। এ চাওয়া কি দুরাশা ?

কথাটা সে কিছুতেই গুছিয়ে পাড়তে পারে না। কে তাকে কোনো সুযোগ দেয় না। উচ্ছ্বাস-ভরা সব কথাকেই সযত্নে সে এড়িয়ে চলে। কী করে সে বলবে ? এদিকে হেগ-এ যাবার সময় তার ঘনিয়ে আসছে, দেরি করা চলে না। কিন্তু সহসা আকাশ থেকে প্রেম-প্রলাপকে সে নামিয়ে আনে কেমন করে ?

একদিন তারা চলেছে ব্রেডার পথে। সকালবেলাটা ভিনসেণ্ট কয়েকটি কৃষাণের স্কেচ করেছে। দুপুরবেলা একটি নদীর ধারে এলম্ গাছের ছায়ায় তারা বিশ্রাম করল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে জ্যান। ভিনসেণ্ট নিচু হয়ে কে-কে কয়েকটা স্কেচ দেখাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হোলো কে-র নরম একটি কাঁধ তার বুকের একটা অংশ স্পর্শ করে তার সারা দেহে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল। সংযমের এতদিনের বাঁধ মুহূর্তে ভেঙে গেল তার। হাত থেকে কাগজগুলো খসে পড়ল,—চকিতে সে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল কে-কে। কর্কশ, পুরুষ আলিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের নিরুদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল ভাষার বন্যায় নিজেকে উজাড় করে দিল এক মুহূর্তে।

—মাপ করো, মাপ করো কে। আমি বলব, আমাকে বলতেই হবে! আমি তোমাকে ভালোবাসি, কে,—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, নিজের চেয়েও ভালোবাসি। প্রথম যেদিন আমস্টার্ডামে তোমাকে দেখি সেইদিনটি থেকেই তোমাকে ভালোবাসি! তোমাকে আমি ছাড়ব না,—কিছুতেই তুমি এড়াতে পারবে না আমাকে! কে, বলো আমাকে একটু তুমি ভালোবাসো ? আমরা এখান থেকে চলে যাব, হেগ-এ গিয়ে থাকব। সুখী হব আমরা। আমাকে তুমি ভালোবাসো, তাই না লক্ষ্মীটি! বলো তুমি, আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো ?

নিজেকে ছাড়াবার জন্যে কোন চেষ্টা করল না কে। বিস্ফারিত তার চোখ, আতঙ্কে আর বিতৃষ্ণায় মুখটা যেন তার বেঁকে গিয়েছে। ভিনসেণ্টের সব কথা তার কানে পৌঁছোয়নি, কিন্তু কথার মানেটা সে বুঝেছে। আর্ত একটা চিৎকারকে রোধ করার জন্যে এক হাতে সে মুখটা ঢাকল, তারপর তীক্ষ্ন রুদ্ধশ্বাসে হিস্-হিস্ করে উঠল তার কণ্ঠ—

—না, না, কখনো না!

এক ঝট্‌কায় ভিনসেণ্টের আলিঙ্গন থেকে সে মুক্ত করে নিল নিজেকে। তারপর ঘুমন্ত শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে দৌড় দিল মাঠের মধ্য দিয়ে।

ভিনসেণ্ট অনুসরণ করতেই গতি বাড়িয়ে দিল কে। ভিনসেণ্ট স্তম্ভিত হয়ে গেল,—কী হোলো ? এরকম হোলো কেন ? চিৎকার করে সে ডাকল —দাঁড়াও কে, দাঁড়াও! দৌড়িয়ো না এমনি করে!

তার গলার আওয়াজে কে আরো ভয় পেল। আরো জোরে সে দৌড়তে লাগল,—প্রাণপণে। পাগলের মতো লাফাতে লাফাতে ভিনসেন্ট ছুটতে লাগল তার পেছনে। হোঁচট খেয়ে একবার ঘাসের ওপর পড়ে গেল কে। কোল থেকে মাটিতে পড়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল জ্যান।

সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কে-র দুহাত চেপে ধরল ভিনসেন্ট। পাগলের মতো বলতে লাগল,—আমি তোমাকে ভালোবাসি—এ কথা শুনে তুমি এমনি করে পালাচ্ছ কেন কে? পালাবার কী আছে? আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে না হলে আমার চলবে না! তুমিও তো আমাকে ভালোবাসো! তবে? কতো যে তোমাকে চাই তা তো জানো! তবে? অতীতকে ভুলে যাও কে,—তুমি আর আমি, নতুন জীবন হবে আমাদের!

আতঙ্কের ভাবটা কেটে গেছে কে-র চোখ থেকে। তার বদলে তিক্ত, তীব্র ঘৃণা। হাতদুটো ছিনিয়ে নিল মুহূর্তে। জ্যানের ঘুম একেবারে ভেঙে গেছে। ভিনসেন্টের উন্মত্ত চাহনি আর উন্মত্ত চিৎকারে ভয় হয়েছে তার। মার গলা জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা।

ভিনসেন্ট সোজা হয়ে দাঁড়ালো তাদের সামনে। অন্তরের সমস্ত ব্যাকুলতা যেন একটিমাত্র কাতর প্রশ্নে সে ছড়িয়ে দিল নিঃশব্দ প্রান্তরের আকাশে আকাশে—বলো, বলো কে! চুপ করে থেকো না,—বলো,—এইটুকু, এতোটুকু ভালোবাসো আমাকে!

—না, না, কখনো না!

জ্যানকে বুকে নিয়ে আবার দৌড়তে লাগল কে। মাঠ থেকে রাস্তায় পড়েও সে তেমনি দৌড়তে লাগল। পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ভিনসেন্ট। তারপর কতোবার চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকল, কে পেছন ফিরে তাকালো না একবারও।

রাস্তা দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে দৃষ্টির বাইরে অন্তর্হিত হয়ে গেল কে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল ভিনসেন্ট কতক্ষণ,—তারপর আস্তে আস্তে ফিরে গেল প্রান্তরের মাঝখানে। কানে কেবলই বাজছে চরম নিষ্ঠুর সেই কটি কথা—না, না, কখনো না! মাটিতে এলোমেলো ছড়ানো স্কেচগুলো আর অন্যান্য সরঞ্জাম সব কুড়িয়ে নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

সারা বাড়ি ভরা চাপা বিদ্যুৎ-উত্তেজনা। কে-র ঘরের দরজার খিল বন্ধ। বসবার ঘরে গম্ভীর থমথমে মুখ নিয়ে বসে আছেন বাবা, পাশে মা; চোখে তাঁর ত্রস্ত চিন্তিত দৃষ্টি।

তাকে দেখেই আর্তনাদ করে উঠলেন মা,—ভিনসেন্ট, তুই এ কাজ করলি কী করে?

ভিনসেন্ট বললে,—কী কাজ করেছি?

—অমনি করে তুই কে-কে অপমান করেছিস।

আস্তে আস্তে পিঠ থেকে ঈজেলটা নামালো ভিনসেণ্ট। কী উত্তর সে দেবে সে নিজেই জানে না। কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতার পর প্রশ্ন করল,—কী শুনেছ তোমরা কে-র মুখ থেকে?

নিরুদ্ধ রাগে বাবার মুখে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। গলার বোতামটা খুলে দিয়ে দুহাতে টেবিলের ধারটা আঁকড়ে ধরে চাপা-গলায় তিনি বললেন,—কে বলেছে যে তুমি তাকে মাঠের মধ্যে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলে আর চিৎকার করে পাগলের মতো প্রলাপ বকছিলে—

শান্ত গলায় ভিনসেণ্ট বললে,—তাকে আমি বলেছিলাম আমি তাকে ভালো-বাসি। এ কথায় কাউকে অপমান করা হয় বলে আমি জানিনে।

—এইমাত্র? শুধু এই কথা তুমি তাকে বলেছিলে?

—না, আরো বলেছিলাম। বলেছিলাম আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

—বিয়ে! ওকে?

—আশ্চর্য হবার কী আছে তাতে?

মা কেঁদে উঠলেন আবার,—ভিনসেণ্ট, এমন কথা তুই ভাবলি বা কী করে!

—কেন মা? আমি যদি ওকে ভালোবাসি—

—ভিনসেণ্ট, জলদগম্ভীর গলায় ধমকে উঠলেন বাবা,—কে তোমার আপন মাসতুতো বোন হয়, সে কথা একবারও তোমার খেয়াল হয় নি? ছি!

—কেন, কী হয়েছে তাতে?

—কী হয়েছে? বোনকে বিয়ে করতে চাও? একেবারে ইতর, অমানুষ হয়েছ তুমি?

—কী বাজে কথা বলছেন বাবা? এ যুগে আপনার পক্ষে এমনি ধারণা সাজে না। এ কি বাইবেল আওড়াচ্ছেন নাকি?

—থামো তুমি, বক-বক কোরো না। আমার বংশের সম্মান আছে, তোমার সে জ্ঞান না থাক। আমার বংশে এমনি অনাচার আমি হতে দেব না।

মা বললেন,—তুই আমার কথা শোন্ ভিনসেণ্ট। তুই যদি ওকে ভালোই বাসিস, তবু আরো কদিন অপেক্ষা করতে পারলিনে কেন? বছরও ঘোরেনি ও বিধবা হয়েছে। স্বামীর শোক ওর বুকে দগদগে ঘায়ের মতো জ্বলছে। তোর সবুর সইল না? আর বিয়েই যদি করিস বউকে খাওয়াবার সংস্থানই বা কোথায় তোর?

বাপ বললেন আবার দাঁতে দাঁত চেপে,—তোমার ব্যবহার যেমন অশোভন, তেমনি মন তোমার নোংরা! এতোদিন তোমাকে পুরোপুরি আমি চিনতে পারিনি!

দপ্ করে জ্বলে উঠল ভিনসেণ্ট—আপনি ভুল করছেন বাবা। কে-র প্রতি আমার যে ভালোবাসা তা মহৎ, তা পবিত্র। আপনি তা বুঝুন আর না বুঝুন, অন্তত সংযত হয়ে কথা বলবেন।

নিজের ঘরে চলে গেল ভিনসেণ্ট। বসে পড়ল বিছানার ধারে। মাথার মধ্যে ঝিম-ঝিম করছে, সবকিছু যেন লাগছে ধাঁধার মতো। এ কেমন হোলো? কেন হোলো? ভালোবাসা কি পাপ? ভালোবাসা প্রকাশ করা কি অন্যায়? তবু কেন কে তাকে অমনিভাবে এড়িয়ে ছুটে পালালো? সে তো কোনো ক্ষতি করতে চায়নি তার? একটুও কি সে ভালোবাসে না তাকে প্রতিদানে?

ক্রূর প্রতিধ্বনি কানে বাজল,—না, না, কখনো না!

সারারাত কাটল অসহ্য যন্ত্রণায়। বিনিদ্র চোখের সামনে বিকেলবেলার ঐ অসহ্য অকল্পনীয় দৃশ্যটা শতবার ভেসে ভেসে ওঠে,—সহস্রবার কানে বাজে ঐ নিষ্ঠুর ধিক্কারবাণী,—না, না, কখনো না!

সকালবেলা ঘর থেকে বার হোলো অনেক বেলা করে। রান্নাঘরে মা। মিষ্টি গলায় বললেন,—হ্যাঁরে, এত দেরি? রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো ভালো?

ভিনসেণ্ট শুধোলে,—কে কোথায়?

—তোর বাবা তাকে পৌঁছে দিতে গেছেন ব্রেডা স্টেশনে।

—কেন?

—কে রইল না। বাড়ি ফিরে যাবে।

—আমস্টার্ডামে?

—হ্যাঁ।

—ও। তা বেশ। আমার কথা কিছু বলেনি?

—না।

—একটি কথাও না? কালকের কথার উল্লেখ করেনি একবারও?

—না, শুধু বললে বাবা মা-র কাছে ফিরে যাবে। তুই খেতে বোস ভিনসেণ্ট। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। ওর কথা আর ভাবিস নে।

—ট্রেন কটায় ছাড়ে মা?

—দশটা কুড়িতে।

ভিনসেণ্ট হাত-ঘড়ি দেখল। বললে,—হ্যাঁ, ছাড়বার আর দেরি নেই। আর কিছু করার নেই এখন আমার,—সময় চলে গেছে।

৭

দিনান্তবেলায় ট্রেন এসে পৌঁছল আমস্টার্ডামের সেণ্ট্রাল স্টেশনে। কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে হন-হন করে চলল ভিনসেণ্ট। আবার সে গৃহত্যাগ করেছে, হয়ত এই শেষবারের মতো। আবার ভেসে যাবে কোথায় জানে না। তার আগে একটি মাত্র আশা। একবার দেখা করে যাবে কে-র সঙ্গে।

সন্ধ্যা-অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে শহরের পথে পথে। দোকানপাট আপিস দপ্তর বন্ধ হচ্ছে। গৃহাভিমুখী কেরানির ভিড়।

রেভারেণ্ড স্ট্রিকারের বাড়ির সামনে একটু থমকে দাঁড়ালো ভিনসেণ্ট।

তারপর পাথরের ধাপ-কটা উঠে দরজার ঘণ্টাটা বাজালো। মুহূর্ত পরে দরজা খুলল। পরিচারিকাটি তাকে দেখে চিনতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ালো দরজার ফাঁকটা আগলে।

ভিনসেণ্ট জিজ্ঞাসা করলে,—রেভারেণ্ড স্ট্রিকার বাড়ি আছেন?

পরিচারিকা জানত কী বলতে হবে এক্ষেত্রে। বললে,—না, বাড়ি নেই।

বাড়ির ভেতর থেকে পরিচিত দুটি কণ্ঠস্বর কানে এল ভিনসেণ্টের। ধমক দিয়ে উঠল,—সরে যাও সামনে থেকে! ভেতরে যেতে দাও আমাকে!

এক ধাক্কায় পরিচারিকাটিকে সরিয়ে ভিনসেণ্ট ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। মেয়েটি ভয়ে চেঁচাতে লাগল,—আরে, দাঁড়ান দাঁড়ান! চলেছেন কোথায় আপনি? বাড়ির সবাই খেতে বসেছেন যে!

সোজা হলঘর পার হয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল ভিনসেণ্ট। মুহূর্তে চোখে পড়ল, কালো-পোশাক-পরা একটি পরিচিত মূর্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে। রেভারেণ্ড স্ট্রিকার, তাঁর স্ত্রী উইলহেমিনা-মাসি ও তাঁদের দুটি ছোট ছেলে মেয়ে খাবার টেবিলে। একটি চেয়ার ফাঁকা। সেটির সামনেও টেবিলের ওপর খাবারের পাত্র।

পরিচারিকা অনুযোগ করে উঠল,—বললাম সবুর করুন, তা এঁর তর সইল না। একেবারে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এ-ঘরে এসে ঢুকলেন।

টেবিলের দুধারে রুপোর দুটি বাতিদান, তাতে লম্বা লম্বা দুটি জ্বলন্ত মোমবাতি। তার নরম হলদে আলোয় দেয়ালে ক্যালভিনের প্রতিকৃতিটি অস্পষ্ট প্রতিভাত। টেবিলে রুপোর বাসনপত্রের কিনারাগুলি চিকচিক করছে বাতির মৃদু ছটায়।

মেসোমশাই বললেন,—ব্যাপার কী ভিনসেণ্ট? সামান্য ভব্যতাবোধও দেখছি তুমি খুইয়েছ। কী চাও তুমি?

স্পষ্ট স্বরে ভিনসেণ্ট ঘোষণা করলে,—কে-র সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

—সে এখানে নেই। বন্ধুর বাড়ি গেছে।

—মিথ্যে কথা। এইমাত্র সে এখানে ছিল। ঐ চেয়ারে,—ঐ তার খাবারের পাত্র।

রেভারেণ্ড স্ট্রিকার স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন,—ছেলেমেয়েদের এ-ঘর থেকে নিয়ে যাও।

ঘর খালি হতে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি। বললেন,—অনেক যন্ত্রণা তুমি দিচ্ছ ভিনসেণ্ট। শুধু আমাকে নয়, তোমার আমার পরিবারের সকলকে। এতটা বয়েস হোলো তোমার,—কিছু করলে না, চাষার মতো আচার ব্যবহার নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করলে। তোমার জন্যে আমরা করিনি কী? একটু কৃতজ্ঞতাবোধও নেই তোমার? এতটা অশান্তি তুমি ঘটাচ্ছ কোন্ লজ্জায়? আমার মেয়েকে নাকি তুমি ভালোবাসো। এত বড়

সাহস তোমার! ধৃষ্টতার একটা সীমা আছে!

ভিনসেণ্ট উত্তর দিল না ওসব কথার। শুধু বললে,—কে-র সঙ্গে একবার দেখা করতে দিন আংকল স্ট্রিকার। ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।

—কোনো কথা তোমার নেই আমার মেয়ের সঙ্গে! ও তোমার মুখ-দর্শন করতে চায় না।

—বিশ্বাস করিনে। কে আপনাকে তাই বলেছে?

—আলবৎ বলেছে। জ্বলে উঠলেন স্ট্রিকার,—আমি মিথ্যে কথা বলছি?

—জানিনে সত্যি কি মিথ্যে। সত্যি হয় তো হোক, তবু আমি নিজে ওর মুখ থেকে একথা শুনে যেতে চাই।

অটল রইলেন স্ট্রিকার।

ক্লান্ত, হতাশভাবে ভিনসেণ্ট কে-র পরিত্যক্ত চেয়ারটাতে বসে পড়ল। অনুনয় করে বললে,—আপনারা ধর্মযাজক, লোহার বর্ম দিয়ে আপনাদের হৃদয় ঢাকা সে আমি জানি। তবু বিশ্বাস করুন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি কে-কে ভালোবাসি। ঈশ্বর আমার সাক্ষী, এ ভালোবাসা আমার প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু-যন্ত্রণা! এক লহমার জন্য ওকে আমি ভুলতে পারিনে! আপনি দয়া করুন আমাকে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জীবন আমার ব্যর্থ হবে না। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে খুব বেশিদিন আমার লাগবে না। আপনার মেয়ের যোগ্য আমি হবই। কিন্তু ওকে বোঝাবার, ওর ভালোবাসাকে জয় করবার সুযোগটুকু আমাকে দিন। আপনিও তো একদিন ভালোবেসেছেন,—আমার এই দুঃসহ যন্ত্রণা আপনি কি বুঝবেন না, আপনার বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও কি আমি পাব না?

রেভারেণ্ড স্ট্রিকার একটু ভাবলেন। তারপর চট্ করে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন কথাটার। গলায় তিক্ততার আভাস এনে বললেন,—যন্ত্রণা? যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি নেই তোমার? মানুষ নও তুমি? দুর্বল, কাপুরুষ কোথাকার! ব্যর্থ প্রেমের মিনমিনে কান্না ছাড়া আর কিছু করার নেই তোমার?

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ভিনসেণ্ট। সমস্ত বুক তার পাথর হয়ে উঠল কাঠিন্যে। স্ট্রিকারের মুখোমুখি সে দাঁড়ালো। দুজনের মাঝখানে লম্বা দুটি মোমবাতি জ্বলছে। বাতিদুটোর আড়ালে না থাকলে সে হয়ত মেরেই বসত স্ট্রিকারকে। আঘাত লেগেছে তার মনুষ্যত্বে, তার পুরুষত্বে—চরম আঘাত। আলোকবিন্দুদুটির ওপর দিয়ে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ জ্বলন্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে।

এমনিভাবে কতক্ষণ কাটল কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ ভিনসেণ্ট তার বাঁ হাতটা তুলে ধরল মোমবাতির ওপর। ভৌতিক নিস্তব্ধতা ভেঙে কর্কশ গলায় বললে,—যতোটুকু সময় এই বাতির আগুনে আমি হাতটা রাখতে পারি, ততোটুকু সময় আপনার মেয়ের সঙ্গে আপনি আমায় কথা বলতে দিন। এর বেশি আমি কিছু চাইনে।

হাতটা উল্টে নিয়ে সে ধরলে বাতির শিখার ওপর। ঘরের আলো কমে গেল তৎক্ষণাৎ। কালো হয়ে উঠল চামড়াটা। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই চামড়াটা পুড়ে লাল দগদগে মাংস বার হয়ে এল। হাতটা সরালো না ভিনসেন্ট। একটু কাঁপল না পর্যন্ত। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রেভারেন্ডের চোখের দিকে। আরো কাটল কয়েক মুহূর্ত। পোড়া মাংসের উগ্র গন্ধে ঘর ভরে গেল। হাতের চামড়া খসে খসে পড়তে লাগল টেবিলের ওপর। আতংক-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ধর্মযাজক। সারা অঙ্গে যেন তাঁর পক্ষাঘাত। নড়তে পারছেন না। ভিনসেন্টের চোখের বজ্র-কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর সমস্ত চৈতন্য যেন বন্দী হয়ে আছে। পোড়া মাংসগুলো দলা পাকিয়ে যাচ্ছে, তবু হাতটা কেঁপে উঠছে না এক লহমার জন্যেও। পলকবিহীন চোখ।

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন রেভারেন্ড স্ট্রিকার। গলায় যত জোর আছে সব জোর সংহত করে চিৎকার করে উঠলেন একবার,—তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন টেবিলের ওপর। এক ঝটকায় দুটো বাতি একসঙ্গে টেবিল থেকে সরিয়ে নিভিয়ে ফেললেন।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। টেবিলে ভর করে দুজনে মুখোমুখি। কেউ কাউকে দেখছে না, অথচ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে দুজোড়া চোখ। আবার আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন ধর্মযাজক,—পাগল, পাগল কোথাকার! বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে! শুনে যাও,—কে তোমাকে সারা মন দিয়ে ঘৃণা করে। এই আমার শেষ কথা শুনে চলে যাও এখান থেকে—জীবনে আর কখনো ছায়া মাড়িয়ো না এ বাড়ির।

অন্ধকার পথ বেয়ে ভিনসেন্ট চলতে লাগল। কতো অলি গলি পার হয়ে শেষে পেঁছিল শহরের প্রান্তসীমায়। মরা খালটার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই নাকে এল বন্ধ ঘোলাটে জলের ভ্যাপসা গন্ধ। রাস্তার গ্যাসের আলোর একটি পলাতক শিখা এসে পড়েছে ঠিক তার বাঁ হাতটার ওপর—গভীর লাল ক্ষত সারা তালুর পেছন দিক জুড়ে। উপলব্ধির কোন্ গোপন শাসনে আগুনে সে বাঁ হাতটা বাড়িয়েছিল,—ডান হাত নয়, যে হাত দিয়ে সে কাজ করে। কতো ছোট ছোট শাখা খাল সে পার হোলো,—নাকে আসতে লাগল কোন্ বিস্ময়-সমুদ্রের সুরভি। শেষ পর্যন্ত সে পেঁছিল মেণ্ডিস ডি কস্টার বাড়ির কাছে। একটা খালের ধারে মাটিতে সে বসে পড়ল। ঢিল একটা ছুঁড়ল খালের মধ্যে। ঢিলটা ডুবে গেল, কিন্তু খালে জল আছে কি না আছে তার শব্দটুকুও কানে এল না।

ফুরিয়ে গেছে কে তার জীবন থেকে। স্পর্শটুকু তার নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল হৃদয়ের চক্রবাল থেকে।—না না, কখনো না—এই তার অন্তরের কথা, এই সত্য। ব্যর্থ প্রেমের বিদীর্ণ বিশুষ্ক কাণ্ডে এই তিনটি কথা যেন বঞ্চনার রক্ত-পলাশ। না, না, কখনো না,—কখনো দেখা পাবে না তার, কখনো শুনবে না তার কণ্ঠ, কখনো মিলবে না তার মৃদুতম স্পর্শ। যন্ত্রণার অগ্নিদাহনে শুধু

একখানা হাত নয়,—সারা হৃদয়কে পোড়ালেও ফিরে পাবে না মুহূর্তের সার্থক প্রেম।

হৃদয়প্লাবী দুঃখের জোয়ার ভেঙে পড়তে চাইল কণ্ঠের তটে। সশব্দ কান্নাকে রোধ করবার জন্যে পোড়া বাঁ হাতখানা সে চেপে ধরল মুখের ওপর। হাতে কোনো যন্ত্রণা নেই, ওষ্ঠে শুধু অঙ্গারের স্বাদ,—ব্যর্থ বাসনার রিক্ত, তিক্ত অঙ্গার।

॥ হেগ ॥

ভিনসেণ্ট যে সত্যি-সত্যিই হেগ-এ আসবে এ বিশ্বাস মভের ছিল না, তাঁর স্ত্রী জেট-এরও না। তাঁদের ধারণা ছিল জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে হঠাৎ আর্টিস্ট হবার খেয়াল সব মানুষেরই একবার হয়।

মভ বললেন,—বাঃ ভিনসেণ্ট, সত্যিই তুমি হেগ-এ এসে গেলে দেখছি! তাহলে ছবি-আঁকিয়ে না হয়ে তুমি আর ছাড়বে না। বেশ, বেশ! থাকবার জায়গা ঠিক হয়েছে?

ভিনসেণ্ট বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশ বড়ো ঘর একটা পেয়েছি,—একেবারে শহরের ধারে, মাঠের কাছে। রিন্ স্টেশনের ঠিক পেছনে।

—বাঃ তাহলে তো এখান থেকে খুব কাছাকাছিই হোলো। তারপর, টাকা-কড়ির অবস্থা কেমন?

—খুব বেশি হাতে নেই। তবে, একটা টেবিল আর খান-দুই চেয়ার কিনতে পেরেছি।

জেট জিজ্ঞাসা করলেন,—আর চৌকি বিছানা?

ভিনসেণ্ট হেসে বললে,—না, ওসব এখনো জোটাতে পারিনি। মেঝেতেই শুচ্ছি, মুড়ি দেবার একটা কম্বল আছে।

মভ স্ত্রীকে ইসারা করলেন। জেট পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলেন টাকা-পয়সার একটা ব্যাগ। মভ একটা একশো গিল্ডারের নোট বার করে বললেন,—নাও, এ টাকাটা তোমাকে ধার দিলাম। সময়ে শোধ দিয়ো। বিছানাপত্র এখুনি কিনে নাও। রাত্রে ভালো করে না ঘুমোলে দিনে কাজ করবে কী করে? ঘর-ভাড়া দিয়েছ? দাওনি তো? ওটাও মিটিয়ে ফেল এই টাকা থেকে। ঘরটায় আলো কেমন?

—আলো প্রচুর, তবে একটিমাত্র জানলা দক্ষিণ দিকে।

—এই নাও! তাহলে সারাদিন আকাশে সূর্য ঘুরবে আর দশ মিনিট অন্তর তোমার মডেলের গায়ের আলো পালটাবে। ও হবে না। জানলায় বেশ ভালো কয়েকটা পর্দা না ঝোলালে চলবে না।

—কিন্তু দাদা, আপনার কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য আমি চাইনে। আপনি যে আমাকে শেখাবেন বলেছেন এই যথেষ্ট।

—বাজে কথা রাখো। সাহায্য আবার করছে কে তোমাকে? ধার দিচ্ছি, আবার আদায় করে নেব। দরকার তো সকলেরই আসে, তাতে আবার অতো

কিন্তু করবার কী আছে ?

—বেশ, নিচ্ছি তাহলে, আশাভরা কণ্ঠে ভিনসেন্ট বললে,—যেই আমার দু-একখানা ছবি বিক্রি হবে অমনি শোধ দিয়ে দেব।

—নিশ্চয়, বিক্রি হবে বৈকি। টারস্টিগ এ বিষয়ে নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করবে। তবে, রঙ নিয়ে শুরু করো,—জলরঙ, তেলরঙ। বাজারে পেন্সিল-স্কেচের কোনো দাম নেই।

মস্ত বড়ো চেহারার হলে কী হয়, মভ আসলে নার্ভাস প্রকৃতির লোক,—মানসিক চঞ্চলতা তাঁকে কাজ করায়। কোনো কিছু একবার মাথায় এলে সবুর সয় না আর। ভিনসেন্টকে স্টুডিয়োর মাঝখানে টেনে নিয়ে এসে তিনি বললেন,—এই নাও,—এই রয়েছে রঙের বাক্স, আর এই তুলি, প্যালেট, প্যালেট-ছুরি আর তার্পিন। দেখি, কেমন প্যালেট হাতে নিয়ে ঈজেলের সামনে দাঁড়াতে পারো।

চিত্রাংকনের প্রাথমিক কটি কৌশল তিনি ভিনসেন্টকে শেখাতে লাগলেন ; ভিনসেন্টও সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিতে লাগল।

—বাঃ, মভ বললেন,—তোমাকে আমি যা ভেবেছিলাম তা তো দেখছি তুমি নও! বেশ বুদ্ধি আছে তোমার। রোজ সকালে এখানে তুমি আসবে, রঙের কাজ শিখবে। এ-ছাড়া শিল্পীদের একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। আলাপ পরিচয় হবে, মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা মডেল নিয়ে কাজ করতে পারবে। মানুষের চেহারা আঁকায় হাত যদি একবার পাকা হয়, তাহলে তো অর্ধেক রাজ্যই জয় হয়ে গেল।

ভিনসেন্ট বিছানা কিনল, জানলার পর্দা কিনল, মিটিয়ে দিল ঘরের ভাড়া। ব্র্যাবান্টের ছবিগুলো সে দেয়ালে দেয়ালে টাঙালো। সে জানে ওগুলো ভুলে ভর্তি, বাজারে ওগুলো একটিও কখনো বিকোবে না। তবুও সে ফেলে দিতে পারবে না। কাঁচা হাতের স্কেচগুলোর মধ্যে কোথায় যেন প্রাণের স্পন্দন আছে, আছে প্রকৃতির সঙ্গে সহজ সহযোগ। ডি বকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে ঐ ছবিগুলোর সম্বন্ধে তার সচেতনতা আরো বেড়ে উঠেছে।

খাসা লোক ডি বক। চমৎকার আচার ব্যবহার, পকেটে পয়সার অভাব কখনো নেই। বিদ্যাশিক্ষা তার ইংল্যান্ডে। তার সঙ্গে ভিনসেন্টের আলাপ গুপিলের গ্যালারিতে। সর্ববিষয়ে ডি বক একেবারে ভিনসেন্টের উল্টো। জীবনকে সে নিতান্ত খোশমেজাজে নিয়েছে,—কোনো চাঞ্চল্য নেই, কোনো উত্তেজনা নেই,—বেঁচে থাকা যেন মাপের গেলাসে করে দৈনন্দিন উপভোগের পানীয়কে পান করা।

ভিনসেন্টকে সে নিমন্ত্রণ করল,—আসুন না আমার ওখানে! চা খাওয়া যাবে একসঙ্গে। আমার নতুন কয়েকখানা ছবিও দেখাব। টারস্টিগ আমার কয়েকখানা ছবি বিক্রি করেছেন সম্প্রতি, সেই থেকে আমার তুলিতে যেন নতুন

উত্তেজনার ছোঁয়াচ লেগেছে।

—বেশ তো, চলুন এখুনি।

হেগ শহরের সবচেয়ে অভিজাত অঞ্চল উইলেমস্পার্ক পল্লীতে ডি বকের স্টুডিয়ো। ছায়া-ছায়া রঙের ভেলভেট-মোড়া সারা দেয়াল, ঘরের কোণে কোণে উঁচু-গদিওয়ালা সোফা আর কুশন। ধূমপানের সরঞ্জাম সাজানো ছোট-ছোট টেবিল, সুদৃশ্য বুককেস, মাটিতে পূর্বদেশীয় কার্পেট। নিজের স্টুডিয়োর কথা মনে হতেই ভিনসেণ্ট ক্ষণিকের জন্যে যেন লজ্জায় কুঁকড়ে গেল।

রাশিয়ান সামোভারের নিচে গ্যাসের স্টোভ জেলে চায়ের জল গরম শুরু করল ডি বক, পরিচারিকাকে দোকানে পাঠালো কেক কিনে আনতে। তারপর আলমারির মধ্য থেকে একটা ছবি বার করে ঈজেলে রেখে বললে,— এইটে আমার সবচেয়ে নতুন ছবি। ও, দাঁড়ান দাঁড়ান, দেখবার আগে একটা চুরুট ধরিয়ে নিন। বলা যায় না, সিগারের সুখটানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার চোখে ছবিটা উৎরোবে ভালো।

ডি বকের গলায় সর্বদা একটা হালকা খুশির সুর। টারস্টিগ তার কয়েকখানা ছবি কেনার পর থেকে তার আত্মবিশ্বাস একেবারে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ভিনসেণ্ট ছবিটার তারিফ করবেই। লম্বা একটা রাশিয়ান সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে ভিনসেণ্টের মুখভাব সে লক্ষ করতে লাগল ঠিক যেন পরীক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে।

ডি বকের দামি চুরুটের নীলাভ ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে ভিনসেণ্ট তীক্ষ্ন চোখে ছবিটা দেখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ দেখেও সে মনে মনে ভেবে ঠিক করতে পারল না কী সমালোচনা সে করবে। ছবিটা একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য; ভালোও বটে, আবার ভালোও নয়। ডি বকের নিজের প্রকৃতিটা যেন পুরোপুরি তার শিল্পের মধ্যে প্রকাশিত—দিব্যি ফিটফাট ছিমছাম সৌন্দর্য, ব্যস এই পর্যন্ত। এক মিনিটে ছবিটা দেখা শেষ হলেও ভদ্রতা করে বেশ কিছুক্ষণ সে ওটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে,—প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনার হাতে চমৎকার আসে,—ঠিক মিষ্টি সৌন্দর্যটি কী করে ফুটিয়ে তুলতে হয় তা আপনি বেশ বোঝেন।

খুশিতে গলে গিয়ে ডি বক বললে,—ধন্যবাদ। আরে, এই নিন চা খান।

চায়ের বাটিটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল ভিনসেণ্ট—ভয়ে ভয়ে, পাছে দামি কার্পেটের ওপর চলকিয়ে পড়ে। সামোভার থেকে এক পেয়ালা চা ডি বক ঢেলে নিল নিজের জন্যে। ভিনসেণ্ট ভাবতে লাগল, বেশ আঁকে, সুন্দর আঁকে ডি বক—বেশ চমৎকার ভদ্রলোক, তার ওপর নতুন বন্ধু তার। তবু সমালোচনার ভাষা একেবারে সংযত করা দুঃসাধ্য।

—ছবিটা সম্বন্ধে একটা ব্যাপারে আমার কিছুটা অবশ্য ধাঁধা লাগছে—

ডি বক ট্রে-টা বাড়িয়ে দিল সামনে,—ধরুন, কেক খান।

ভিনসেন্ট বললে,—থাক। এক হাতে চায়ের পেয়ালা আর এক হাতে কেক একসঙ্গে সামলানো তার পক্ষে অসম্ভব।

হাল্‌কা স্বরে ডি বক বললে,—তাহলে বলুন, ছবিটা কোথায় আপনার খারাপ লাগছে?

—আপনার ঐ মূর্তিগুলো। ওগুলো যেন সত্যি বলে মনে হচ্ছে না।

নরম সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে গলায় খুব একটা আন্তরিকতার আভাস এনে ডি বক উত্তর দিল,—আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? অনেক দিন আমি ভেবেছি মানুষের চেহারাটা ভালো করে রপ্ত করব। কিন্তু কিছুতেই তা আমার হয় না। কদিন হয়তো মডেল নিয়ে খুব খানিকটা খাটি,—তার পরেই আবার প্রাকৃতিক দৃশ্য মন টেনে নেয়। আর দেখুন, প্রাকৃতিক দৃশ্যই হচ্ছে আমার শিল্পের মূল উপজীব্য, মানুষের চেহারা ঠিক হোলো বা না হোলো বড়ো বয়েই গেল। ঠিক না?

—তবু ধরুন, দৃশ্যের মূলে তো মানুষ, দৃশ্য তো মানুষেরই পটভূমি। সে যাই হোক, আপনি নামকরা শিল্পী, আর আমি তো কালকের শিক্ষানবিশ। তবু একটু যদি সমালোচনা করি রাগ করবেন না?

—বাঃ, রাগ করব কেন? করুন না সমালোচনা।

—আপনার কাজ খুব সুন্দর, কিন্তু যেন বড়ো বেশি সুন্দর। তাতে যেন আন্তরিক উন্মাদনার কিছুটা অভাব মনে হয়।

মুচকি হেসে কুণ্ঠিত চোখে ডি বক শুধোলে,—উন্মাদনা? প্যাশন? প্যাশন তো অনেক রকম, কোন্‌টার কথা আপনি বলছেন?

সে যা বলতে চায়, তা ডি বককে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব হোলো তার পক্ষে।

নাই বা থাক ডি বকের মতো আসবাবের আড়ম্বর,—তবু স্টুডিয়ো তো আছে ভিনসেন্টের। রিক্ততাই তার ভূষণ। বিছানাটাকে সে ঠেলে দিল এক কোণে। লুকিয়ে ফেলল রান্নার সরঞ্জামগুলো। উন্মুক্ত মেঝে, খাঁটি স্টুডিয়ো,—আয়েস করে বসবার ঘর নয়। থিয়োর কাছ থেকে টাকা এখনো আসে নি, তবে, মভের ঋণের কয়েকটা ফ্র্যাংক অবশিষ্ট আছে। এই অর্থ দিয়ে কদিন সে মডেল ভাড়া করল। কদিন পরে মভ এলেন দেখা করতে তার স্টুডিয়োতে।

দেখে শুনে খুশিই হলেন মভ। উৎসাহ দিলেন খুব। বললেন,—বাঃ! মডেল নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছ দেখছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কদিন তাই করছি। তবে, বড়ো খরচ।

—তা হোক। প্রথমটা খরচ, কিন্তু পরে লাভ। কেন, হাতে কিছু আর নেই?

—ধন্যবাদ, মভ ভাই। ও কিছু না, চালিয়ে নিতে পারব ঠিক।

মভের কাছে আর হাত পাততে সে চায় না, তিনি যে শেখাচ্ছেন এই

অনেক। কটা ফ্র্যাঙ্ক এখনো পকেটে আছে। দুদিনের খাবার কেনার পক্ষে যথেষ্ট।

ঘণ্টাখানেক মভ রইলেন। কী করে রঙের ওপর রঙ লাগাতে হয়, কী করে ওয়াশ দিতে হয়—শেখালেন হাতে কলমে। ভিনসেণ্টের অপটু হাতে সব নোংরা হয়ে যেতে লাগল। মভ আশ্বাস দিলেন,—নতুন নতুন অমনি হয়, লজ্জা কী তাতে? ঠিকমতো তুলি ধরতে পারা কি একদিনের কাজ?

তার ব্র্যাবাণ্টের স্কেচগুলো আবার ভালো করে মভ দেখলেন। বললেন,—সত্যি তোমার স্কেচের হাত ভালো। এক বছর ধরে পেন্সিল-স্কেচ করা যে অভ্যেস করেছ, এটা বৃথা হয়নি। এইবার মন দিয়ে রঙের কাজ শেখো আর-একটি বছর। তার পরেই টারস্টিগকে ছবি বিক্রি করতে পারবে, এ আমি বলে দিচ্ছি।

মস্ত বড়ো আশ্বাস। বুক ভরে গেল ভিনসেণ্টের। কিন্তু দুদিন পরেই কান্না শুরু করল জঠর। পকেটে একটি ফুটো পয়সা নেই। প্রতি মাসের প্রথমে একশো ফ্র্যাংক করে পাঠাবে কথা দিয়েছে থিয়ো। কিন্তু মাসপয়লার পরে কদিন পার হয়ে গেল, এখনো সে-টাকার দেখা নেই। থিয়ো কি প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল? সাফল্যের মুখে এসে দাঁড়িয়ে এবার চিরদিনের মতো সর্বনাশ হবে যে তার তাহলে! পকেটে একটা ডাকটিকিট ছিল,—থিয়োকে করুণ করে ভিক্ষার চিঠি সে লিখল।

তিন দিন একবিন্দু খাদ্য পেটে পড়েনি। সকাল বেলা মভের কাছে গিয়ে রঙ-ছবির তালিম নেয়, বাকি দিনটা কাটে পথের ভিড়ে বা স্টেশনের থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুমে বসে দাঁড়িয়ে পেন্সিল-স্কেচ করে। মুখ খুলতে পারে না মভের কাছে। বৌদি জেট যদি বলেন একসঙ্গে বসে মধ্যাহ্ন-ভোজনটা সেরে নিতে, তাতেও সে রাজি হতে পারে না।

পেটের মধ্যে অবিরাম একটা জ্বালা কিন্-কিন্ করছে। এ জ্বালা তার অচেনা নয়। মনে পড়ে বরিনেজের কথা। মাথার ভিতরটা কেমন ফাঁকা লাগে। ভাবে, এমনি ক্ষিদে নিয়েই কি তার সারা জীবন কাটবে? দুবেলা দুমুঠো আহার আর নিজের কাজ নিয়ে এক কোণে পড়ে থাকার শান্তি,—এইটুকু সামান্য চাহিদা থেকেও কি সে বঞ্চিত থাকবে চিরদিন?

চতুর্থ দিন মান সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়ে সে গেল টারস্টিগের কাছে। হেগ-এর তামাম শিল্পীগোষ্ঠীর তিনি পৃষ্ঠপোষক। তার কাছে সাহায্য মিলবে নিশ্চয়ই।

শুনল,—টারস্টিগ নেই, আগামী কাল হয়তো ফিরবেন প্যারিস থেকে।

ক্ষিদের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে সারা গায়ে নেমে এল জ্বরের জ্বালা। হাত থেকে পেন্সিল খসে পড়ল, ঘরে ফিরে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। পরদিন কোনো রকমে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আবার টলতে টলতে চলল গুপিল গ্যালারির

অভিমুখে। টারস্টিগ ফিরেছেন, ধার দিলেন পঁচিশটি ফ্র্যাংক। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা করে বললেন,—একটু সময় পেলেই যাব একদিন তোমার স্টুডিয়ো দেখতে ভিনসেণ্ট।

কম্পিত পদক্ষেপ, দুর্বল দেহ। বুভুক্ষু শুধু উদর নয়, সারা অন্তর। যাবার সময় একটিমাত্র কামনা ছিল, টাকা চাই। কটা টাকা যদি হাতের মুঠোয় আসে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার আবার ফিরে চলেছে শ্লথ গতিতে, সত্যিই কটা টাকা হাতের মুঠোয়। ভাবনা কী, খাবে সে পেট পুরে। তবু এত খারাপ লাগছে, এত বিষণ্ণ লাগছে—মনে হচ্ছে এমনি নিঃসঙ্গ একাকিত্বের বোঝা টেনে বুঝি আর চলতে পারে না।

আকণ্ঠ খেলো ভিনসেণ্ট। টান টান হয়ে উঠেছে পেটের চামড়াগুলো। তবু টন্ টন্ করছে বুকের ভেতরটা। শস্তা তামাক কিছুটা কিনে ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পাইপটা ধরালো। একলা ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল স্মরণপ্রান্তবর্তিনী কে-র তীক্ষ্ন তীব্র শেষ কটি কথা—না, না, কখনো না। বেদনার চাপে যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল।

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দক্ষিণের জানলাটা খুলে বাইরে মাথাটা বাড়িয়ে দিল ভিনসেণ্ট। জানুয়ারি মাসের তুষারকিরীটিনী হিম রাত্রি। জানলাটা আবার বন্ধ করে কোট আর টুপিটা হাতে টেনে নিয়ে দরজা খুলে সে দৌড়ল রাস্তায়,—রিন্ স্টেশনের সামনা-সামনি শস্তা মদের একটা ভাটিখানা আছে সে জানে, সেই পথে।

২

ভাটিখানার দোরগোড়ায় একটা ঝোলানো তেলের আলো। আর একটা আলো একেবারে পেছন দিকে ঠিক মদ পরিবেশনের বার টেবিলটার ওপরে। ঘরটার সারা মধ্যভাগ জুড়ে আবছা অন্ধকার। দেয়ালের ধারে ধারে বেঞ্চি, তাদের সামনে নানারকমের দাগ-ধরা পাথর-বসানো টেবিল। দেয়ালগুলো রং-চটা, নোনা ধরা, ফাটা সিমেন্টের মেঝে। এখানে লোকে ফুর্তি করতে আসে না, আসে আশ্রয় খুঁজতে।

একটা টেবিলের ধারে বসে ভিনসেণ্ট ক্লান্তভাবে দেয়ালে পিঠ এলিয়ে দিল। সত্যিই তো, পকেটে যখন টাকা আছে খাবার কেনবার, মডেল ভাড়া করবার, ছবি আঁকার নিয়মিত কাজ করবার যখন রয়েছে সংস্থান, তখন সে নিশ্চিন্ত। তবু এমনি করে ওঠে কেন মন? বেদনা একাকিত্বের। কেউ নেই যার কাছে গিয়ে দু-মিনিট বন্ধু বলে বসতে পারে, সোজাসুজি প্রাণখোলা দুটি কথা বলতে পারে। মভ তার শিক্ষক, টারস্টিগ মস্ত ব্যবসায়ী, ডি বক মস্ত পয়সাওয়ালা। এরা তার বন্ধু নয়। এক গ্লাস মদ পেটে পড়লে হয়তো মনের ফাঁকাটা ভরবে। ঘরে ফিরে গিয়ে কাজ নিয়ে বসতে পারবে শান্ত মনে।

সামনে গ্লাসভর্তি রক্তিম সুরা। আস্তে আস্তে সে পান করতে লাগল। ভিড় নেই। সামনাসামনি অপর দিকের দেয়ালের কাছে একটি শ্রমিক। বারের কাছে একজোড়া মধ্যবয়সী নোংরা-পোশাক-পরা স্বামী স্ত্রী। তার পাশের টেবিলে একলা একটি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ তার নজরেই পড়েনি।

স্ত্রীলোকটির সামনে এসে দাঁড়ালো ওয়েটার, কর্কশ তার গলা,—মদ চাই আর?

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিলে,—একটি পয়সাও আর নেই।

ভিনসেন্ট মুখ বাড়ালো মেয়েটির দিকে, বললে,—কিছু মনে কোরো না, খাবে আমার সঙ্গে এক গ্লাস?

—আপত্তি কিসের?

কাছাকাছি বসল এসে। ওয়েটার সামনে মদের গ্লাস রেখে ভিনসেন্টের কাছ থেকে দাম নিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি বললে,—ধন্যবাদ।

ভিনসেন্টের চোখ এবার ভালো করে পড়ল ওর ওপর। অল্পবয়সী নয়, সুন্দর নয়,—জীবনে অনেক-ঘা-খাওয়া বিবর্ণ মেয়ে। ঋজু দেহটিতে সৃষ্টিকর্তার নৈপুণ্যের আভাস এখনো আছে। আঙুলের ডগাগুলি মোটা-মোটা, অনেক-কাজ-করা হাতের আঙুল। আবছা আলোয় ভিনসেন্টের মনে হোলো ও যেন সার্দিন বা জ্যান স্টিনের আঁকা কোনো নারী। মোটা খাড়া নাক, ঠোঁটের ওপরে অস্পষ্ট রোমরেখা। চোখদুটির উদাস তবু করুণ দৃষ্টির পেছনে কিসের যেন দৃপ্ত ইশারা।

ভিনসেন্ট বললে,—ধন্যবাদ তোমাকে। সঙ্গ দিলে, এইজন্যে।

—আমার নাম ক্রিস্টিন, মেয়েটি বললে সোজাসুজি,—তোমার?

—ভিনসেন্ট।

—এই শহরেই থাকো?

—হ্যাঁ।

—কী করো?

—ছবি আঁকা কাজ আমার।

—হায় হায়! তাহলে তো বড়ো দুঃখের জীবন তোমার।

একটু অপ্রতিভ হয়ে ভিনসেন্ট উত্তর দিল,—হ্যাঁ, তা সময়ে সময়ে দুঃখ-কষ্টে পড়তে হয় বৈকি!

—আমার কাজ কাপড় কাচা। তা অবশ্য গতরে যখন পোষায়। বড় খাটুনি, সব সময় আর পেরে উঠি নে।

—তখন কী করো?

—রাস্তায় বার হই। নইলে চলবে কী করে?

—কেন? কাপড় কাচা কি খুব শক্ত কাজ?

—দিনের মধ্যে বারো ঘণ্টা খাটতে হয়। আর মজুরি যা মেলে'তা আর বলার নয়। এমনি সারাদিন খাটার পরও বাচ্চাদের খাওয়াবার মতো পয়সা কতোদিন জোটে না, তখন আবার রাস্তায় ছুটতে হয় পুরুষ খুঁজতে।

—তোমার ছেলেপুলে কটি ক্রিস্টিন ?

—পাঁচটা, আবার একটা পেটে এসেছে।

—স্বামী নেই ? মারা গেছে ?

—স্বামী! আমার বাচ্চাদের বাপেদের খবর আমিই জানি নাকি ?

ভিনসেণ্ট সমবেদনার স্বরে বললে,—ভারি বিপদের কথা তো ক্রিস্টিন!

মৃদু কাঁধ-ঝাঁকুনি দিল ক্রিস্টিন—হায় রে ভগবান, পাপ নিয়ে কারবার করি, পেটে কোন্‌দিন পোড়া পাপ বাসা বাঁধবে, সে ভয় করলে চলবে কেন ?

—ওদের একজনেরও বাপকে তুমি চেন না ?

— প্রথম যেটা পেটে এসেছিল তার বাপটা কে তা বুঝতে পেরেছিলাম। তার পরের কুকুরবাচ্চাগুলোর একটারও না।

—আর এখন তোমার পেটে যেটা ?

—কী করে বলব ? খুব শরীরটা খারাপ হয়েছিল তখন। খাটুনি সইত না একদম। মানুষও তখন নিতে হয়েছিল অগুন্তি। আর, বাচ্চার বাপ কে তা আমাদের চিনলেই বা কী, আর না চিনলেই বা কী ?

—আর-এক গ্লাস মদ খাবে নাকি ক্রিস্টিন ?

—খাব। এবার জিন খাই, কী বল ? তা তোমাকে দেখেও তো খুব একটা শাঁসালো বলে মনে হচ্ছে না! ছবি তোমার বিক্রি হয় তো ?

—হয় না ক্রিস্টিন। এই তো সবে শিখতে শুরু করেছি।

—অ্যাঁ! শিখছ সবে ? এই বয়সে ?

—বয়েস খুব বেশি নয় আমার,—তিরিশ।

—ও, দেখে মনে হয়েছিল যেন চল্লিশ। তা, তোমার চলে কী করে ?

—আমার ছোট ভাই আমাকে কিছু টাকা পাঠায়, তাতেই চলে।

— মরণ! এই চাইতে ধোপানিগিরিও ভালো!

—তা, তুমি থাকো কোথায় ক্রিস্টিন ?

—আমার মার কাছে সবাই আমরা একসঙ্গে থাকি।

—তুমি যে রাস্তায় বার হও তা তোমার মা জানে ?

হাসল ক্রিস্টিন। কঠোর নিস্পন্দ হাসি। বললে,—জানে না ? সে ই তো আমায় এই পথে পাঠায়। তারও তো সারা জীবনের পেশা ছিল এই-ই। এই করেই তো আমি জন্মেছি, আমার ভাই জন্মেছে।

—তোমার ভাই কী করে ?

—সে একটা মেয়েমানুষ পুষেছে বাড়িতে। তার জন্যে বাবু জোগাড় করে।

—আর ঐ বাড়িতেই তোমার ছেলেমেয়েরা থাকে। এ তো ভালো নয়—

—ভালো না হলেই বা কী করা বলো? ওরাও বড়ো হয়ে এই কর্মই করবে।

—নাঃ, বেঁচে থাকাটাই যাচ্ছেতাই,—তাই না ক্রিশ্চিন?

—এ নিয়ে আর ডুকরে কেঁদে ফল কী বলো?—ওকি? সারা হাতটা জুড়ে এত বড়ো একটা ঘা হোলো কী করে তোমার?

—হাতটা পুড়েছিল।

—ইস্! খুব লেগেছিল? এখনো খুব যন্ত্রণা, না?

ঘায়ের চারপাশে ক্রিশ্চিন একটু হাত বোলাতেই ভিনসেন্ট হাতটা টেনে নিল। বললে,—এখন আর বেশি ব্যথা নেই। তাছাড়া ইচ্ছে করেই আমি পুড়িয়েছিলাম।

একটু চুপ করে ক্রিশ্চিন বললে আবার,—তা একলা এসে বসেছ এখানে,—তোমার বন্ধু-টন্ধু কেউ নেই?

—না। এক ভাই আছে, সেও থাকে প্যারিসে।

—মাঝে-মাঝে একলা খুব মন কেমন করে, না?

—ঠিক বলেছ ক্রিশ্চিন, ভারি খারাপ লাগে।

—আমি জানি। এই দ্যাখো না, বাড়ি-ভর্তি আমার লোক। মা, ভাই, পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে। তাছাড়া উটকো হাজার মানুষ নিয়ে আমার কারবার। কিন্তু একলা হওয়া তাতে ঘোচে না। ভিড় মানে তো আর লোক নয়। লোক হচ্ছে যে লোককে পছন্দ হয়, সেই লোকটি।

—পছন্দসই একটি লোকও তোমার জোটেনি ক্রিশ্চিন?

—জুটেছিল। সেই প্রথম লোকটি। বয়েস তখন আমার ষোলো। বড়ো ঘরের ছেলে, ইচ্ছে থাকলেও বিয়ে করতে পারল না আমাকে। তা সত্যি কথা বলব, বাচ্চার সব খরচপত্র দিত। বরাত আমার, ক-বছর না যেতেই মরে গেল। তার পর থেকে গতর না খাটালে একটা ফুটো পয়সা দেবার মানুষও আর রইল না।

—বয়স তোমার কতো হোলো ক্রিশ্চিন?

—বত্রিশ। পোয়াতি হবার আর বয়েস নেই। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছে এটা বিয়োতেই আমি মরব।

—তা কেন হবে? এত ভয় কিসের? প্রসবের সময় ডাক্তারি ব্যবস্থা যদি ভালো থাকে তাহলে কোনো গণ্ডগোল হবে না।

—সে আমার ভাগ্যে জুটবে কোত্থেকে বলো! আমি তো যাব বিনিপয়সার হাসপাতালে, খালাস করাবে বিনে পয়সায়।

—আচ্ছা, এ জন্যে কিছুটা টাকাকড়িও কি তুমি জোগাড় করতে পারো না?

—তা হয়তো পারি। ধরো, এখন থেকে বাকি তিনমাস রোজ বাইরে বার হয়ে যদি মুঠো-মুঠো মানুষ ধরে আনতে পারি, তাহলে হয়তো দুটো পয়সা জমে। কিন্তু তা করতে গেলে আগে-ভাগেই আমি মরব।

দুজনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ভিনসেণ্ট প্রশ্ন করল,—এখান থেকে বেরিয়ে তুমি কোথায় যাবে এখন ?

ক্রিস্টিন বললে,—সারাদিন বারো ঘণ্টা কাপড় কেচে কেচে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম, তাই এখানে ঢুকেছিলাম এক গেলাস ঢেলে নিতে। দেড় ফ্র্যাংক মজুরি, তাও শনিবার পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখেছিল। এদিকে দুটো ফ্র্যাংক অন্তত জোগাড় না হলে কাল খাবার জুটবে না। ভেবেছিলাম একটু জিরিয়ে নিয়ে বাবু পাকড়াতে বার হব।

—আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবে ক্রিস্টিন ? আমিও বড়ো একলা, কোথাও যাবার নেই আমার।

—বাঃ, কী বলো গো ! আমার তো ঝামেলা মিটেই গেল তাহলে। তাছাড়া লোকও তুমি খুব ভালো—

—তোমাকেও আমার খুব ভালো লেগেছে ক্রিস্টিন। ঐ যে তুমি আমার পোড়া হাতটা ধরে দুটো সমবেদনার কথা বললে, এমনি কথা কোনো মেয়ে জীবনে আমাকে বলেনি।

—সে কী কথা ? লোক তুমি তো খারাপ নও, ব্যবহারও এতো ভালো, তবু ?

—বরাত, ক্রিস্টিন ! ভালোবাসা আমার বরাতে নেই।

—তা যদি বলো হয়তো তাই। উঠবে এখন ? আমায় আর-এক গ্লাস খাওয়াবে না ?

উঠে দাঁড়ালো ভিনসেণ্ট। বললে,—দ্যাখো ক্রিস্টিন,—এখান থেকে দুজনে যাবার আগে মাতাল হয়ে নেবার কোনো দরকার নেই, তোমারও না, আমারও না। তার চাইতে বরং এই যা আমার আছে পকেটে রাখো। এর বেশি তোমাকে দেবার মতো নেই এই দুঃখ।

—না, ক্রিস্টিন প্রতিবাদ করল,—আমি টাকা চাইনে তোমার কাছে। দেখে তো মনে হচ্ছে আমার চেয়ে তোমার দরকার কম নয়। টাকা লাগবে না, এমনি তুমি চলো। তুমি যাবার পর আর-একটা লোক আমি ঠিক জোগাড় করে নেব।

—তার দরকার নেই। টাকা তুমি নাও ক্রিস্টিন। আজই আমি একজনের কাছ থেকে পঁচিশ ফ্র্যাংক ধার পেয়েছি। আমার অসুবিধে হবে না।

—বেশ, চলো তাহলে এখান থেকে।

অন্ধকার গলির রাস্তায় দুজনে চলল পুরোনো দুই বন্ধুর মতো গল্প করতে করতে। নিজের জীবনের কাহিনী শোনাতে লাগল ক্রিস্টিন—তার কথায় কোনো অনুযোগ নেই, সহানুভূতি আকর্ষণের কোনো বিকৃত প্রচেষ্টা নেই।

ভিনসেণ্ট জিজ্ঞাসা করল,—তুমি কখনো মডেলের কাজ করেছ ?

—করেছি কয়েকবার, যখন বয়েস কম ছিল।

—বেশ তো, তোমাকে তাহলে আমার কাজেই লাগবে। বেশি আমি তোমাকে

দিতে পারব না। বড়োজোর দৈনিক এক ফ্র্যাংক এখন। ছবি বিক্রি শুরু করার পর দু-ফ্র্যাংক করে দেব। কাপড় কাচার চাইতে সে তোমার অনেক ভালো হবে।

পৌঁছল ক্রিস্টিনের বাড়িতে। ক্রিস্টিন বললে,—ভাবনা নেই, কেউ তোমাকে দেখবে না। রাস্তার ওপরের ঘরটাই আমার।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতে ভিনসেণ্ট দেখল, সে একলা নেই। অপরিচিত সব, অচেনা শয্যা, কিন্তু প্রত্যুষের ঝাপসা আলোয় শয্যাপাশে আর একজনের ঘুমন্ত দেহ, আর-একটি জীবন্ত মানুষের। মন্দ নয়, একাকিত্বের গুরুভার বেদনাটা ঘুচেছে, জীবনটাকে মনে হচ্ছে অনেকটা বন্ধুর মতো।

প্রশান্তির মতো ভোরবেলাটা।

৩

সকালবেলাকার ডাকে এল থিয়োর চিঠি, সঙ্গে একশোটি ফ্র্যাংক। টাকা পাঠাতে দেরি হোলো বলে থিয়ো দুঃখ প্রকাশ করেছে। দৌড়ে রাস্তায় বার হয়ে সে একটি বুড়িকে ধরল—মডেল হবে? বুড়ি রাজি হোলো তখনি।

ঘরে এনে বুড়িকে বসালো এক কোণে—চিমনি আর উনুনের পাশে, এক-ধারে রাখল জলের কেটলিটা। বুড়ির চেহারাটার মধ্যে প্রাণ আছে, আছে জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই সে চায়। রঙ-তুলি সাজিয়ে নিয়ে সে কাজ শুরু করল। এতদিন স্কেচ হোতো শক্ত-শক্ত,—হঠাৎ মনে হোলো আঙুলে যেন সাবলীলতা খেলা শুরু করেছে, রেখাগুলি যেন তরঙ্গের মতো বাধাহীন। রঙ চড়াতেও কেমন মধুর লাগছে, বিশেষ করে বুড়ির পেছনদিককার আবছা অন্ধকার চোয়ালের কোণটা। মনে-মনে ধন্যবাদ দিল ক্রিস্টিনকে। যা সে দিয়েছে কাল রাত্রে, তার দাম হয় না। জীবনজোড়া প্রেমের বঞ্চনা মনে জড়ো করে রেখেছে পুঞ্জীভূত বেদনা,—কিন্তু যৌনতৃপ্তির অভাব তার দেহের প্রত্যেক গ্রন্থিকে যেন শুকিয়ে এনেছিল, শুকিয়ে এনেছিল তার শিল্পের আবেগকে, অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে হত্যা করে চলেছিল তাকে।

দরজায় করাঘাত। ঢুকলেন মিনহার টারস্টিগ। ট্রাউজার্সের ইস্ত্রিতে বেদনা-কর ঋজুতা, পালিশ-করা জুতো আরশির মতো। চমৎকার দাড়ির ছাঁট, চমৎকার চুলের কেয়ারি। বকের পালকের মতো শাদা শার্ট-কলার।

ভিনসেণ্টের স্টুডিয়ো হয়েছে আর সে সত্যি খুব পরিশ্রম করছে—এ দেখে টারস্টিগ আন্তরিক খুশি হলেন। নতুন নতুন শিল্পীরা নাম করুক—এ তাঁর খেয়াল, আবার এই তাঁর পেশা। কিন্তু নাম তো অমনি হয় না, খাটতে হয়, কষ্ট করতে হয়। সাধনা করতে হয় সুনির্দিষ্ট পথে। সাফল্য সোজা কথা নয়। প্রতিভা তো হচ্ছে ফাঁকির রাস্তা, আসল রাস্তা সাধনার। গুপিলের উঠতি শিল্পীরা টারস্টিগকে ভালো করেই চেনে। তা ছাড়া টারস্টিগ বনেদি লোক, —সামাজিক জীবনে ভব্যতার একচুল নড়চড় তাঁর সয় না। যে শিল্পীর

এই বনেদি ভব্যতাবোধ নেই, সে শিল্পী মাস্টারপীস আঁকলেও গ্রুপিলে তার স্থান নেই।

বললেন,—দ্যাখো ভিনসেন্ট, তোমার কাজের মধ্যে এসে তোমাকে অবাক করে দিলাম তো? আমার শিল্পীদের সঙ্গে এমনিভাবে দেখা করতেই আমি চাই।

ভিনসেন্ট বললে,—আমি যে কতো কৃতার্থ তা আমি মুখে প্রকাশ করতে পারছিনে মিনহার টারস্টিগ!

—কিছু না, কিছু না। আমি কদিন থেকেই ভাবছিলাম তোমার স্টুডিয়ো দেখতে আসব।

মলিন শয্যা, শস্তা দুটো চেয়ার টেবিল, এক কোণে উনুন। দেখবার মধ্যে শুধু ঈজেলটা।

লজ্জিত গলায় ভিনসেন্ট বললে,—কী যে বলেন! কী আর দেখবার আছে বলুন?

—ঘাবড়িয়ো না। খাটো প্রাণপণ। মভ আমাকে বলেছে সে তোমাকে জলরঙের কাজ শেখাচ্ছে। এই তো, বেশ তো এগিয়েছ। জলরঙের কাজের দাম আছে। কাজ ভালো হোক, এখানে আমি তোমার ছবি বেচব,—প্যারিসে তোমার ভাই বেচবে।

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেল ভিনসেন্ট। টারস্টিগ আবার বললেন,—ভালো কথা, থিয়ো তোমাকে মাসে একশো ফ্র্যাঙ্ক করে পাঠায়। প্যারিসে গিয়ে আমি দেখে এসেছি, থিয়োর এতে বেশ টানাটানিই হয়। অতএব ভেবে দেখ, এ তো বেশি দিন চলবে না! নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে তোমাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—আমি তো একটুও ফাঁকি দিই নে মিনহার।

—বেশ তো। এই তো চাই। মভের সঙ্গে লেগে থাকো। তোমার ছবি বিক্রি হতে শুরু করলেই ভালো ঘর নেবে, ভালো জামা কাপড় করাবে, সমাজে মেলামেশা আরম্ভ করবে। ওটাও দরকার। আর পরে যখন অয়েল পেন্টিং করবে, পোর্ট্রেট আঁকবে, তখন কতো কাজে লাগবে দেখো। আচ্ছা আজ চলি। সালোঁর ছবিটা মভের কতদূর এগোলো একবার দেখে আসতে হবে।

বিকেলবেলা গোলাপি খামের মধ্যে গোলাপি কাগজে এল ডি বকের চিঠি:

প্রিয় ভ্যান গক্,

কাল সকালে একজন মডেল নিয়ে তোমার স্টুডিয়োতে যাব। একসঙ্গে স্কেচ করা যাবে।

ডি বি।

মডেলটি যুবতী,—অপূর্ব সুন্দরী। দক্ষিণাও অল্প নয়। নিজের পয়সায়

তাকে ভাড়া করার ক্ষমতা ভিনসেন্টের পক্ষে কবে হোতো কে জানে। ভারি খুশি হোলো এ সুযোগে। উনুনে গনগনে আগুন। তার উত্তপ্ত আওতায় দাঁড়িয়ে মডেলটি পোশাক খুলতে লাগল। একেবারে পেশাদার ছাড়া এমন মডেল পাওয়া যায় না যারা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর পেশাদার মানেই যুবতী। এটা ভিনসেন্টের ভারি অপছন্দের ব্যাপার। সে আঁকতে চায় বুড়ো-বুড়ির দেহ, যে দেহে জীবনের স্থূল সূক্ষ্ম নানাপ্রকার স্পর্শচিহ্ন আছে, আছে চরিত্রের প্রকাশ।

মডেলটি বললে,—আমি তৈরি, ভঙ্গীটা ঠিক করে দিন।

ভিনসেণ্ট শুধোলে,—বসে না দাঁড়িয়ে, ডি বক?

—প্রথমটা দাঁড়িয়েই হোক। আমি যে নতুন ল্যাণ্ডস্কেপটা আঁকছি তাতে কয়েকটা দাঁড়ানো মূর্তি আছে।

ঘণ্টাখানেক দুজনে স্কেচ করার পর মডেলটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

ভিনসেণ্ট বললে,—ওর বসা অবস্থাটা স্কেচ করি এখন, কী বলো? রেখাগুলো অনেকটা নরমও হবে তাহলে।

যে যার ড্রয়িং-বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুপুর অবধি আঁকল, প্রায় নিঃশব্দেই। তারপর ডি বক তার ঝোলা থেকে লাঞ্চ বার করলে। উনুনের ধারে বসে তিন জনে খাওয়া দাওয়া সারল। খেতে খেতে দেখতে লাগল সকালবেলাকার কাজ।

মেয়েটির মুখের আদল ডি বক তার স্কেচে চমৎকার তুলেছে, কিন্তু বাকি চেহারাটার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। যে-কোনো সুগঠিত সুন্দর নারীদেহ।

ভিনসেন্টের স্কেচ দেখে ডি বক বলে উঠল,—ওকি? মুখটা গেল কোথায়? তার বদলে এটা কী এঁকেছ। এই বুঝি তোমার ছবিতে প্যাশন ইনজেকশন করার নমুনা?

ভিনসেণ্ট বললে,—কী মুস্কিল। আমরা কি পোর্ট্রেট আঁকছিলাম নাকি? দেহটা স্কেচ করাই তো ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

—বাঃ, জীবনে এই প্রথম শুনলাম যে দেহ আছে, তার মুখ নেই।

—বটে? আচ্ছা দ্যাখো তো পেটটা কেমন এঁকেছ তুমি?

—কেন, পেটের আবার হোলো কি?

—দেখে মনে হচ্ছে পেটটা যেন হাওয়া-ভরা বেলুন। ওর মধ্যে যে নাড়ি-ভুঁড়ি আছে তার আভাস কই?

—অ্যাঁ! বেচারি মেয়েটি যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখন ওর পেট ফুটো হয়ে নাড়িভুঁড়ি বাইরে ঝুলছিল নাকি? চোখে পড়েনি তো?

এসব কথা শুনেও মডেলটির মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। তার ধারণা, সব শিল্পীরই মাথায় অল্প-বিস্তর ছিট থাকে। নিঃশব্দে সে খেয়ে চলেছে।

—আমার আঁকা পেটটা দ্যাখো, ভিনসেণ্ট বুঝিয়ে বললে,—ভেতরে নাড়ি-

ভুঁড়ি আছে, তার গোলক-ধাঁধার মধ্য দিয়ে সারা জীবনে কতো মণ খাবার পথ খুঁজে খুঁজে চলেছে—দ্যাখো, তার আভাস ঠিক ফুটেছে কি না?

—আরে, ছবি আঁকার সঙ্গে তোমার ঐ অদেখা গোলক-ধাঁধার সম্পর্ক কী? বিচলিত গলায় ডি বক বললে,—মড়া কাটা কি আমার পেশা? আমার আঁকা ছবি যখন লোকে দেখে, তারা দেখে কুয়াশায় ঢাকা আবছায়া সবুজ গাছের মেলা, দেখে মেঘের ওপারে সূর্যাস্তের রঙ। পেট-ভরা মানুষের নাড়িভুঁড়ি তাদের দেখাবার আমার দরকার নেই।

প্রত্যেক দিন ভোরবেলা এক একটা মডেলের খোঁজে ভিনসেণ্ট বার হয়। একদিন সে ধরে আনে এক কামারের ছেলেকে, একদিন আনে পাগলা গারদ-ফেরত এক বুড়িকে, আর একদিন আনে শ্রমিক ব্যারাকের এক থুত্থুড়ি ঠাকুমাকে, সঙ্গে তার নাতি। এসব মডেলদের দক্ষিণা দিতে হয়, তাতে যে খরচ হয় তাতে মাসের শেষে খাবার কেনার পয়সা থাকে না। কিন্তু খাওয়ার জন্যে তো সারা জীবনই পড়ে রয়েছে। হেগ-এই যদি এলাম, গুরু পেলাম মভের মতো,—তখন কি আর খাওয়ার কথা ভেবে কাজে ফাঁকি দেওয়া চলে!

প্রতি সন্ধ্যায় সে মভের স্টুডিয়োতে যায়। ঘর জুড়ে মধুর উত্তাপ, কাজ করতে কী আরাম। মভ যত্নের সঙ্গে শেখান। ছবিতে পরিচ্ছন্ন করে রঙ চড়াতে সে পারে না, নোংরা কাদার মতো মোটা মোটা করে সে রঙের তুলি বোলায়—নিজের কাজ দেখে নিজেই হতাশ হয়ে পড়ে। মভ তাকে প্রবোধ দেন, উৎসাহ দেন।

ভিনসেণ্ট বলে,—বলুন মভ ভাই, কতো দিনে আমার হবে? ছবি এঁকে রোজগার যে আমাকে করতেই হবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মভ বলেন,—হোক না দেরি। সে জন্যে দুঃখ করো কেন? সত্যকে কি সহজে পাওয়া যায়? ছবিতে লোক-ভোলানো সুলভ সৌন্দর্য আয়ত্ত করতে চাও তো সে রাস্তা আছে,—কিন্তু তাতে ঠকবে নিজে, ঠকাবে নিজেকে।

—না মভ ভাই, সৌন্দর্যের ফাঁকিতে আমার কাজ নেই। সত্যকে আমি প্রকাশ করতে চাই—স্পষ্টভাবে, রুক্ষভাবে; মিথ্যা মাধুর্যের প্রলেপ আমি তার ওপর লাগাতে চাই না। কিন্তু তবু দেখুন না, লোকের পছন্দসই করে কয়েকটা রঙিন ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি,—এমনি যদি আঁকি চটপট বিক্রি তো হবার আশা আছে?

—দেখি কী এঁকেছ?

ছবিগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লেন মভ। বললেন,—তোমার রুক্ষ সত্যকেই আঁকড়ে থাকো। ঝুটো মালের পশরা সাজিয়ে বাজারে বার হতে চেয়ো না। আমি বলছি, শেষ পর্যন্ত তুমি ঠকবে না।

সেদিন মভের বাড়িতে ছোটখাটো একটা পার্টি ছিল। নিমন্ত্রিত ছিলেন কয়েকজন শিল্পী। উইসেনব্রাক তাদের অন্যতম। ইনি যেমন ভালো শিল্পী তেমনি কঠোর শিল্প-সমালোচক। বেঁটে-খাটো ছোট মানুষটি, তীক্ষ্ণ মুখ চোখ। যেমনি ক্ষুরধার জিভ, তেমনি ক্ষুরধার প্রতিভা। নির্ভীক সত্যবাদিতা, —সোজা কথায় যাকে বলে দুর্মুখতা,—এই জন্যে টারস্টিগের সঙ্গে বনিবনা হয়নি। গুপিল কোম্পানি তাঁর ছবি বেচে না, কিন্তু যা-ই তিনি আঁকুন না কেন, ক্রেতার অভাব কখনো হয় না! তাঁর তীক্ষ্ণ সত্যভাষণের জন্যে প্রসিদ্ধি তাঁর শিল্পী-প্রসিদ্ধির চাইতে কম নয়—ঘৃণ্যকে ঘৃণা করার ক্ষমতা তাঁর মতো খুব কম লোকেরই আছে। সরাসরি ভিনসেণ্টকে নিয়ে তিনি পড়লেন। বললেন,—ওহে ভ্যান গক্ বংশোদ্ভব, তোমার খুড়োরা ছবি বেচতে যে রকম ওস্তাদ, ছবি আঁকতে তুমি তেমনি ওস্তাদ হচ্ছ তো?

ভিনসেণ্ট সবিনয়ে বললে,—আজ্ঞে না, ছবি আঁকার সবে আমার হাতে-খড়ি।

—বটে? তাহলে তো চমৎকার! আমার মতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখছি! সত্যিকারের শিল্পী যে হতে চায়, জীবনের প্রথম ষাটটা বছর পর্যন্ত তার উপোস করা দরকার,—তাতে হয়তো শেষ জীবনে সত্যিকারের ভালো ছবি দু-একটা সে এঁকে যেতে পারে।

ভিনসেণ্ট বললে,—ধ্যেৎ, বাজে কথা! এই ধরুন না, আপনার তো চল্লিশ পার হয়নি, আপনি কি ভালো আঁকেন না?

নগণ্যের মুখের 'ধ্যেৎ' কথাটি চমক লাগালো উইসেনব্রাকের মনে। সোজাসুজি এমনিভাবে তাঁকে প্রতিবাদ করার সাহসের পরিচয় অনেক দিন তিনি পাননি। বললেন,—বটে! আমার ছবি ভালো, এই যদি তোমার ধারণা হয় তাহলে ছবি আঁকা ছেড়ে দোকানদারি করো। ছবিগুলো আমি বিক্রি করি কেন? কারণ এগুলো আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। বোকা ক্রেতারা ওতেই ভোলে। সত্যিকারের ভালো ছবি যদি আঁকতে পারতাম, তাহলে বেচতাম না, নিজের কাছে রেখে দিতাম। না ভায়া, জেনে রাখো, প্রতিদিন আমি শুধু প্র্যাকটিস করেই চলেছি। ষাট বছর যখন বয়েস হবে তখন আমি সত্যিকারের ছবি আঁকা শুরু করব। তার পর থেকে যা কিছু কাজ আমি করব, তা রেখে দেব নিজের কাছে। ব্যবস্থা করে যাব, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার কবরে সেসব কাজ যেন চাপা পড়ে। নিজের হাতের প্রকৃত ভালো কাজ, ভ্যান গক্, শিল্পী কখনো হাতছাড়া করে না। রদ্দি মালই কেবল সে বাজারে বেচে।

দূর থেকে ডি বক চোখ টিপল ভিনসেণ্টকে। তাই ভিনসেণ্ট এবার বললে —আপনি গোড়াতেই ভুল করেছেন শিল্পী হয়ে। শিল্প-সমালোচক হওয়া উচিত ছিল আপনার।

হো হো করে হেসে উঠলেন উইসেনব্রাক, চেঁচিয়ে বললেন মভকে,—তোমার এই ছাত্রটিকে দেখে যতো বোকা বলে মনে হয়েছিল আসলে কিন্তু এ তা নয়। জিভে তো বেশ ধার আছে!

ভিনসেণ্টের দিকে ফিরে এবার নিষ্ঠুর গলায় তিনি বললেন,—তা, তুমি এই রকম ছেঁড়া ধোকড় পরে সমাজে ঘুরে বেড়াও কোন্ লজ্জায়? ভদ্রলোকের মতো জামা কাপড় কিনতে পারো না?

থিয়োর একটা পুরোনো সুট ভিনসেণ্টের পরনে। দরজি ভিনসেণ্টের গায়ের মাপে সেটাকে অদল বদল করেছে একেবারে যাচ্ছেতাই করে। এই তার দৈনন্দিনের সর্বদা পরবার পোশাক। এ পরে সে ছবিও আঁকে, তার চিহ্নও বর্তমান।

—হল্যাণ্ডের প্রত্যেক লোকটাকে নতুন জামা কাপড় পরাতে পারে, এত টাকা তোমার কাকাদের। তোমাকে বুঝি এক পয়সাও তারা ঠেকায় না?

—কেন ঠেকাবেন বলুন? আপনার মতো তাদেরও যে একই ধারণা—আর্টিস্টদের উপোস করাই উচিত।

—বুঝেছি, মোট কথা তোমার ওপর তোমার কাকাদের কোনো আস্থা নেই। লোকে বলে, ভ্যান গক্‌রা একশো মাইল দূর থেকে আসল আর্টিস্টের গন্ধ পায়। তোমাকে যে তারা পোঁছে না, তার কারণ তুমি হচ্ছ পচা আর্টিস্ট।

দপ্ করে জ্বলে উঠল ভিনসেণ্ট। রাগকে ভদ্রভাবে সংযত করতে সে পারে না। বলে উঠল,—যান যান, জাহান্নমে যান আপনি!

ভিনসেণ্ট দূরে সরে যাচ্ছিল,—উইসেনব্রাক হাত বাড়িয়ে তার বাহুমূল চেপে ধরলেন, হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।—সাবাস! দেখছিলাম কটু কথা কতোটা তুমি সহ্য করতে পারো। পরীক্ষায় পাশ করেছ তুমি। শক্তি আছে তোমার,—ঠিক তুমি পারবে।

৪

কয়েকদিন পরে রাত্রিবেলা ভিনসেণ্টের দ্বারে করাঘাত।

ক্রিস্টিন। কালো টুপি, কালো ঘাঘরা, ঘন সবুজ কাঁচুলি। সারা দিন সে কাপড় কেচেছে। এখন সারা শরীরে সীমাহীন ক্লান্তি। অবসাদে অধরোষ্ঠটা যেন ঝুলে পড়া, গালের ব্রণ-চিহ্নগুলি স্পষ্টতর।

—হ্যালো ভিনসেণ্ট, নিষ্প্রভ কণ্ঠে উত্তাপের আভাস এনে সে বললে,—দেখছিলাম, তুমি কোথায় থাকো খুঁজে পাই কি না।

—এসো এসো। বাড়ি খুঁজে খুঁজে কাছে এসেছে,—আমার জীবনে তুমি সেই প্রথম মেয়ে ক্রিস্টিন। এসো, বোসো চেয়ারে।

আগুনের ধারে ক্রিস্টিন বসে দু-হাত তাতিয়ে নিল। তারপর বললে,—মন্দ নয় তোমার ঘরটা, কিন্তু বড়ো ফাঁকা।

—জানি আমি। কিন্তু একগাদা আসবাবপত্র কিনব, পয়সা কোথায় বল!

—হ্যাঁ,—তা ছাড়া এর বেশি তোমার আর দরকারই বা কী?

ভিনসেন্ট নিমন্ত্রণ করলে,—রাত্রের রান্নাটা শুরু করেছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে খাবে ক্রিস্টিন?

—তুমি আমাকে সিয়েন বলে ডাকো না কেন? সিয়েন আমার ডাক-নাম।

—সিয়েন? বাঃ, বেশ নাম। কিন্তু বললে না তো?

—কী রান্না করছ?

—এই, আলুর তরকারি আর চা।

—তা কেন, আজ দু-ফ্র্যাংক পেয়েছি। একটু মাংস কিনে আনি।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি পয়সা দিচ্ছি।

কয়েক মিনিট পরে মাংস কিনে ফিরল ক্রিস্টিন। বললে,—সরো, আর রান্না দেখাতে হবে না! মেয়েমানুষের কাজ মেয়েমানুষকেই করতে দাও।

ভিনসেন্ট অদূরে চেয়ারে গিয়ে বসল চুপটি করে। উনুনের ধারে কাজ করছে ক্রিস্টিন, আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। নিজের বাড়ি, নিজের ঘর। সেখানে তার খাবার বানাচ্ছে মিষ্টি হাতে একটি মেয়ে। জীবনসঙ্গিনী কে-কে নিয়ে এমনি একটি কবোষ্ণ কোমল পরিবেশের স্বপ্ন সে দেখেছে কতোদিন। শুধু ব্যর্থ স্বপ্নই।

পেছন ফিরে তাকালো ক্রিস্টিন। দেখল চেয়ারটাকে এমন বিপজ্জনকভাবে পেছন দিকে হেলিয়েছে ভিনসেন্ট যে কখন উল্টে পড়ে তার ঠিক নেই। চেঁচিয়ে উঠল,—আরে বোকা, সোজা হয়ে বোসো না! পড়ে গিয়ে ঘাড় ভাঙবে শেষকালে নাকি!

হাসিতে দাঁত বার হয়ে এল ভিনসেন্টের।—আচ্ছা আচ্ছা সিয়েন, ঠিক হয়ে আমি বসছি।

ক্রিস্টিন মুখ ফেরাতেই সে আবার আগের মতো করে চেয়ার হেলিয়ে বসে নিশ্চিন্ত আয়েসে পাইপ টানতে লাগল।

টেবিলে ডিনার সাজালো সিয়েন। মাংস, আলু, রুটি, চা।

—খাবে এসো। বলো দিকিন, আমার মতো রাঁধতে পারো তুমি?

—না সিয়েন। আর, মাছই রাঁধি মাংসই রাঁধি আর যাই রাঁধি, রান্নার পর মুখে দেবার সময় সব সমান।

চা খেতে খেতে গল্প করতে লাগল দুজনে। এমনি গল্প ভিনসেন্ট ডি বক বা মভের সঙ্গে করতে পারে না সহজ সরল কথাবার্তা,—সাবধান হতে হয় না, দরকার হয় না আত্মগোপনের। ভিনসেন্ট যখন কথা বলে তখন ক্রিস্টিন চুপ করে শোনে, অপরকে-চুপ-করিয়ে-দেওয়া আত্মঘোষণার কোনো তাড়া নেই। নিজের দুঃখ-বেদনার কাহিনী যখন ক্রিস্টিন বলে যায়, তখন ভিনসেন্ট নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে কাহিনীকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে, সম-অনুভূতির দু-

একটি বাক্যে স্পষ্ট করে তোলে সেই বঞ্চিত জীবন-চিহ্নকে। কথার মধ্যে কোনো শ্লাঘা নেই, কোনো ভান নেই নীরবতাকে ঘিরে। কোনো বাধা নেই ব্যবধান নেই, নেই বড়োর অভিমান আর ছোটোর দীনতা। দুটি নির্বাধ নগ্ন মানবাত্মার আত্মবিনিময়।

উঠে দাঁড়ালো ভিনসেণ্ট।

—উঠলে কেন, কোথায় চললে ?

—বাসনগুলো—

—বোসো তুমি। ও কাজ তোমার নয়, মেয়েমানুষের।

বেসিনের মধ্যে বাসনপত্রে সাবান মাখাতে লাগল ক্রিস্টিন। সাবানের ফেনার সঙ্গে বহুপরিচিত অভ্যস্ত দুটি কর্মঠ হাত; নীল শিরাগুলি পরিস্ফুট, আঙুলগুলি চঞ্চল। কাগজ পেন্সিল নিয়ে ভিনসেণ্ট হাতদুটি স্কেচ করতে লাগল কিছুক্ষণ।

কাজ শেষ করে হাত মুছে ক্রিস্টিন বললে,—আঃ। বেশ লাগছে এখন। তবে, একটু মদ যদি থাকত।

—এবার আমার বার হবার পালা। বোসো তুমি, আমি নিয়ে আসছি।

গ্লাস-ভর্তি জিন। গরম উনুনের পাশে চেয়ারের ওপর বসে আছে ক্রিস্টিন, হাতদুটি কোলের ওপর চুপ। এমনি পরিচ্ছন্ন আশ্রয়, এমনি নিরুদ্বেগ তৃপ্তি,—আসল নেশা তা এই। ভিনসেণ্ট স্কেচ করছে ভঙ্গিটির।

জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার এবারের কাপড় কাচার কাজ আর কদিন, সিয়েন ?

—কাল শেষ হবে। ভালোই হবে। শরীর আর একটুও বইছে না।

—শরীরটা কি খারাপ লাগছে নাকি আজকাল তোমার ?

—না, সে রকম খারাপ নয়। তবে কিনা পেটের বাচ্চাটা বড়ো হচ্ছে তো! নড়ে চড়ে,—বুঝতে পারি।

—তাহলে আসছে সপ্তাহ থেকে তুমি আমার এখানে পোজ দিতে আসবে তো ?

—কাজটা কী হবে আমার ? এমনি করে বসে থাকা ?

—ব্যস, আর কী। অবিশ্যি দাঁড়াতেও হবে মাঝে-মাঝে। আর, জামা কাপড় খুলে ফেলতে হবে সব।

—বাঃ, ব্যবস্থা তো মন্দ নয়! কাজ করবে তুমি, আর বসে দাঁড়িয়ে মজুরি পাব আমি ?

রাত বেশ ঘনিয়ে এসেছে। জানলার দিকে তাকালো ক্রিস্টিন। বাইরে তুষার পড়ছে। বললে,—বেশ তো এতক্ষণ-কাটল। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে বাড়িতে থাকলেই ভালো ছিল। কতোটা পথ হাঁটতে হবে, সম্বল তো ঐ শালখানা!

—কাল সকালে কি আবার তোমাকে এই পাড়াতেই আসতে হবে নাকি ?

—হ্যাঁ। শেষ রাত্তিরে বলতে গেলে। ছটার সময়।

—তোমার যদি অসুবিধে না হয়, তুমি এখানে থেকে যাও, সিয়েন।

—কিসের অসুবিধে? ভালোই লাগবে আমার। কিন্তু শোবো কোথায়?

—কেন, আমার বিছানাটা কি ছোট? দুজনের জায়গা হবে না? খুব হবে সিয়েন, খুব হবে।

—এই রাত্রে তুমি যে আমাকে থাকতে বললে, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ ভিনসেণ্ট।

—না সিয়েন, এই রাত্রে তুমি যে আমার কাছে রইলে, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

ভোরবেলা উঠে মেয়েটি ভিনসেণ্টের জন্যে কফি বানালো, তারপর বিছানা তুলল, ঘর ঝাঁট দিল। তারপর চলে গেল নিজের কাজে। ও যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা স্টুডিয়োটা হঠাৎ যেন আরো কত ফাঁকা হয়ে গেল।

৫

সেদিন বিকেলবেলা আবার টারস্টিগের আবির্ভাব। বললেন,—নতুন কী আঁকলে, দেখাও।

জল-রঙের কাজগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন টারস্টিগ,—বাঃ, এই তো এগোচ্ছ মন্দ না। কিন্তু সাধনা চাই, সেটা ভুলো না। খাটো ভালো করে, পরিশ্রম না করলে কতোদিন আর পরের ওপর নির্ভর করে থাকবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মিনহার। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যে কতো দরকার তা আমি খুবই বুঝি।

—তাহলে খাটো। এক মিনিট ফাঁকি দিয়ো না। মনে রেখো তোমার ছবি কেনবার জন্যে সবচাইতে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি।

ভিনসেণ্টের এক কাকা কর্নেলিয়াস ভ্যান গক্, আমস্টার্ডামের সবচেয়ে বড়ো ছবির দোকানের মালিক। সে তাঁকে লিখেছিল শিল্প-শিক্ষার জন্যে সে হেগ-এ এসেছে আর স্টুডিয়ো নিয়েছে। কর্নেলিয়াস মাঝে-মাঝে ছবি কিনতে হেগ-এ আসতেন। এক রবিবার বিকেলে তিনি উপস্থিত হলেন ভিনসেণ্টের স্টুডিয়োতে। জীবনে শিল্পীর স্টুডিয়ো তিনি যতো দেখেছেন, অতো বোধহয় হল্যাণ্ডের আর কোনো লোক দেখেনি। মুহূর্তে তিনি চোখ বুলিয়ে নিলেন সবকিছুর ওপর।

নোংরা চেয়ারটা ছেড়ে ভিনসেণ্ট তাঁকে সমাদর করে বসালো। বিনীত আগ্রহে শুধোলো,—এক কাপ চা করে দেব করু কাকা? বাইরে তো বেশ ঠাণ্ডা।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে করু কাকা বললেন,—তাহলে তুমি এবারে ছবি-আঁকিয়ে হবেই, ঠিক তো? ভালোই হোলো, গত ত্রিশ বছর ধরে হাইন, ভিনসেণ্ট আর আমি পরের ছবিই কিনে এসেছি—এবার তোমার ছবি কিনে ঘরের টাকা ঘরেই রাখব। কী বলো?

ভিনসেণ্ট বললে,—সত্যি কাকা, আমার তিন কাকা আর এক ভাই ছবির ব্যবসায় এক-একজন রথী মহারথী। আমার ভাবনা কী?

কর্নেলিয়াস বললেন,—টারস্টিগের কাছে শুনলাম থিয়ো তোমাকে মাসে একশো ফ্র্যাংক করে পাঠায়,—সত্যি নাকি?

ভিনসেণ্ট বললে,—হ্যাঁ, তবে সেটা ধার, কাকা। দাঁড়াতে যখন পারব, সব শোধ দিয়ে দেব আমি।

ও প্রসঙ্গ কর্নেলিয়াস আর বাড়ালেন না, ছবি দেখতে লাগলেন। ছোট-ছোট কয়েকটি দৃশ্যপট তাঁর চোখে বোধহয় লাগল। বললেন,—এমনি স্কেচ আর করেছ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ আমার অবসর সময়ের কাজ। আরো আছে, দেখবেন?

হেগ শহরের টুকরো-টুকরো দৃশ্য। কর্নেলিয়াস বললেন,—এমনি বারোটা দৃশ্য আমাকে এঁকে দিতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব। তবে, আপনি যখন ছবির ব্যবসাদার, দামটা আগে ঠিক হোক!

—বেশ তো, তোমার দাম তুমি বলো।

—এমনি ছোট-ছোট সাইজের স্কেচের জন্যে আড়াই ফ্র্যাংক করে আমি নেব। বেশি চাইছি কি?

মুচকি হাসলেন কর্নেলিয়াস। এ তো নগণ্য! তাতেও এতো দ্বিধা! বললেন,—না, দাম বেশি বলো নি। আর, এ বারোখানা যদি ভালো হয়, তাহলে এমনি আরো বারোখানা আমস্টার্ডামের স্কেচ তোমায় করতে দেব।

লাফিয়ে উঠল ভিনসেণ্ট। ছলছল চোখে বললে,—করু কাকা, এই আমার প্রথম অর্ডার। আমি যে কত কৃতার্থ হলাম, তা মুখে আপনাকে জানাব কেমন করে!

উঠে দাঁড়ালেন কর্নেলিয়াস। বললেন,—কিছু তোমায় বলতে হবে না ভিনসেণ্ট। মনে রেখো আমরা সবাই তোমাকে সাহায্য করতে চাই, সকলে তোমার পেছনে আছি। ভালো ছবি যখন থেকে তুমি আঁকতে পারবে, তোমার সব ছবি আমরা নেব। কোন ভাবনা থাকবে না তোমার।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে নতুন জল-রঙের কাজটা হাতে নিয়ে ভিনসেণ্ট দৌড়ল মভের বাড়ি। দরজা খুললেন জেট। চিন্তান্বিত মুখ। বললেন,—দাঁড়াও ভিনসেণ্ট, আমার মনে হয় আজ তোমার ওঁর স্টুডিয়োতে না যাওয়াই ভালো।

—ব্যাপার কী বৌদি? মভ ভাইএর শরীর খারাপ?

—না, শরীর ঠিকই আছে। তা নয়, মেজাজ ভয়ংকর গরম। হাতের ছবিটা শেষ হয়ে আসছে কিনা!

—তাহলে তো আমার মুখ দেখলেই এখন চটে যাবেন, তাই না?

—হ্যাঁ। আজ তুমি যাও ভিনসেণ্ট, তোমার কথা আমি মনে করিয়ে দেব।

মাথাটা একটু ঠান্ডা হলে নিজেই একদিন তোমার ওখানে যাবেন।

—তাই ভালো। কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না তো বৌদি?

—না, ভুলব না।

বেশ কদিন অপেক্ষা করল ভিনসেণ্ট। মভের দেখা নেই। এর মধ্যে টারস্টিগ এলেন,—একবার নয়, দুবার। প্রত্যেকবারই একই রকম কথাবার্তা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ তো এগোচ্ছ ভিনসেণ্ট। তবে, এখনো দেরি আছে। খাটো, আরো খাটো, ওবে না?

—খুব তো খাটছি, মিনহার। ভোর পাঁচটায় উঠি, তখন থেকে কাজ করি রাত এগারোটা পর্যন্ত। মাঝে খাওয়ার জন্যে যেটুকু সময় নষ্ট হয়।

মাথা নাড়লেন টারস্টিগ। ব্যাপারটা যেন তাঁর উপলব্ধির বাইরে। বললেন,—তোমার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে ভিনসেণ্ট। তোমার কাজে প্রথমে যে রুক্ষতা যে অপরিচ্ছন্নতা আমি লক্ষ করেছিলাম সেসব দোষ ঠিক এখনো তেমনি রয়েছে। এতদিন এসব তোমার শুধরে ওঠা উচিত ছিল। ভেতরে ভেতরে যদি শক্তি থাকে তাহলে পরিশ্রমেই তো এসব দোষ কাটে।

ব্যর্থতার আঘাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভিনসেণ্ট।

টারস্টিগ আবার বললেন,—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার ছবি বিক্রি করতে আমি চাই। নইলে নিজের পায়ে তুমি নিজে দাঁড়াবে কী করে? কিন্তু যা করছ তা ছবি হয়ে ওঠা তো চাই, নইলে আমি কিনব কী করে? পরের অনুগ্রহ সম্বল করে কতোদিন তুমি চালাতে চাও বলো?

এত প্রশ্নে কান মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল ভিনসেণ্টের। উত্তর দেবার মতো কোনো কথা তার নেই।

পথে একদিন মভের সঙ্গে দেখা। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দ্রুতগতিতে হেঁটে চলেছেন মভ, কোথায় যাচ্ছেন যেন তার কোনো দিশা নেই। ভিনসেণ্টকে তিনি যেন চিনতেই পারলেন না। ভিনসেণ্ট দৌড়ে সামনে গিয়ে তাঁর পথ আটক করল।

—অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি মভ ভাই।

নিষ্প্রাণ অপরিচিত গলায় মভ বললেন,—বটে? হ্যাঁ, আমি খুব ব্যস্ত আছি কদিন—

ভিনসেণ্ট বললে,—জানি, আপনার নতুন ছবি। কেমন হচ্ছে ছবিটি?

মভ শুধু বললেন,—ওঃ! এলোমেলো ভঙ্গি করলেন একটুখানি।

—আপনার স্টুডিয়োতে একদিন একটুখানির জন্যে আসব? আমার শেখা একেবারেই এগোচ্ছে না।

—না না, এখন না। বললাম না, খুব ব্যস্ত! নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে।

—তাহলে আপনি বেড়াতে বেড়াতে আমার স্টুডিয়োতে একদিন আসবেন,

কেমন? আমার কাজের ওপর দু-একটা কথা যদি আপনি বলেন তবেই আমার অনেক উপকার হবে।

—হবে হবে, দেখি যদি সময় করতে পারি। আচ্ছা, আমি এগোই—

হন-হন করে চলে গেলেন মভ। ভিনসেণ্ট হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

হোলো কী? মভ চটলেন কেন? অন্যায় সে কিছু করেছে?

কয়েকদিন পরে ভিনসেণ্টের বিস্ময়ের অবধি রইল না যখন দেখল, উইসেনব্রাক তার স্টুডিয়োতে উপস্থিত। নতুন-নতুন যারা এ লাইনে আসে, উইসেনব্রাকের একফোঁটা নজরও তাদের ওপর পড়ে না;—আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনো বা পড়েই যায়, তাহলে গালাগালি দিয়ে তিনি ভূত ভাগান। কটুভাষণে তাঁর জুড়ি নেই।

চারদিক তাকিয়ে বিদ্রুপতীক্ষ্ন কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন,—বাঃ এ তো একেবারে রাজপ্রাসাদ দেখছি। হ্যাঁ, শিগগিরই তো এখানে বসে তুমি রাজারানীর ছবি আঁকবে হে!

অপমানে মুখ কালো হয়ে উঠল ভিনসেণ্টের। মুখের ওপর সে বললে,—এসেছেন কেন আমার এখানে? পছন্দ না হয়, সোজা বার হয়ে যেতে পারেন!

মুচকি হাসি হেসে উইসেনব্রাক আবার বাঁকা প্রশ্ন করলেন,—এ ছবি আঁকার খেয়াল তুমি ছেড়ে দাও না কেন ভিনসেণ্ট? এ তো কুকুরের জীবন!

—এ জীবন আপনার পক্ষে তো দিব্যি শাঁসালো হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে। তার কারণ, আমি কৃতকার্য হয়েছি, সফল হয়েছি। কিন্তু তুমি তা সারা জীবনেও হতে পারবে না।

—না পারি, কিন্তু জীবনে আপনার চেয়ে ঢের ভালো ছবি আঁকতে পারব এটাও শুনে রাখুন।

এবার প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন উইসেনব্রাক। বললেন,—অতোটা না পারলেও হেগ-এ যতো শিল্পী আছে তাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে কাছাকাছি যে তুমি পৌঁছতে পারবে তাও আমি বলে দিলাম,—অবশ্য তোমার মেজাজ যেমন, ক্ষমতাও যদি তেমন জবরদস্ত হয়।

জল হয়ে গেল ভিনসেণ্ট। দাঁত বার করে বললে,—তাহলে এতক্ষণ গালাগালি দিচ্ছিলেন কেন? আসুন, বসবেন না?

—না না, বসলে আমি দেখতে পাইনে। এগুলো কী? জলরঙ! এ তোমার চলবে না। তুমি যা বলতে চাও, মিনমিনে জলরঙের তা প্রকাশ করার সাধ্য কই!

জলরঙের দৃশ্যপটগুলো একধারে সরিয়ে উইসেনব্রাক ভিনসেণ্টের পেন্সিল-স্কেচগুলো দেখতে লাগলেন—বরিনেজ, ব্র্যাবাণ্ট আর সম্প্রতি হেগ-এ আঁকা বিচিত্র নরনারীর মেলা যেগুলোতে। চোখদুটো তাঁর জ্বল-জ্বল করতে লাগল। বললেন,—তুমি তো দারুণ ড্রয়িং করো হে। এমনি ড্রয়িং থেকে

আমারই যে আঁকতে ইচ্ছে করছে।

ভিনসেন্ট শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়িয়েছিল দুর্দ্ধর্ষ একটা আঘাতের জন্যে প্রস্তুত হয়ে। তার বদলে এমনি অকপট ভালো-লাগার এমনি মৃদু পিঠ-চাপড়ানি! কেঁপে উঠল তার পাদুটো। ধপ্ করে সে বসে পড়ল। অস্ফুট স্বরে বলল,—কিন্তু সবাই যে বলে আপনার জিভ নিষ্ঠুর তরোয়াল, উইসেনব্রাক!

—ঠিকই বলে। তোমার স্কেচগুলো যদি সত্যি ভালো না হোতো তাহলে আমি বলতাম না।

—কিন্তু, কিন্তু টারস্টিগ তো এইগুলোর জনোই আমাকে ধমকেছেন। বলেছেন এগুলোর মধ্যে কোনো লালিত্য নেই, কর্কশ বুনো ড্রয়িং।

—বাজে কথা। যেটা বলেছে দোষ সেইটেই তো গুণ! বন্যতার মধ্যেই তোমার শক্তি লুকিয়ে আছে ভিনসেন্ট।

—আমি এই কাজই এখন বেশ কিছুদিন করে যেতে চাই। কিন্তু টারস্টিগ জোর দেন ওয়াটার কলারের ওপর।

—হুঁ, যাতে চটপট বাজারে কাটে, তাই না? দ্যাখো ভায়া, তোমার চোখে বিশ্বজগৎ যদি কালি কি পেন্সিলের রেখাতেই ধরা দেয়, ঠিক তেমনি করেই তাকে ধরবে। আর, যা সবচেয়ে বড়ো কথা,—কারো উপদেশে কান দেবে না,—আমারও না। যে পথ নিজে ভালো বোঝো, সেই পথেই এগোবে।

—বেশ, তাই করব।

—মভ একদিন বলছিল তুমি হচ্ছ জন্ম-আঁকিয়ে। তাই নিয়ে টারস্টিগের সঙ্গে তার তর্ক। আমি সেদিন ছিলাম, তবে, চুপচাপ ছিলাম। তোমার কাজ যখন দেখলাম, এবার থেকে মভের দিকে আমি।

—অ্যাঁ, সত্যি বলেছেন, মভ বলেছেন আমি জন্ম-আঁকিয়ে?

—থাক, থাক, ও কথায় অতোটা না ফুললেও চলবে। মরবার কাল পর্যন্ত যদি আঁকিয়ে থাকতে পারো, তবেই বুঝব কিছুটা করলে।

—তাহলে মভ আজকাল আমার ওপর এতটা বিরূপ কেন? কথাই বলেন না, চিনতেই পারেন না যেন!

—সকলের প্রতিই মভের ব্যবহার আজকাল অমনি। 'শেভেনিনজেন' ছবিটা শেষ করছে কিনা! বড়ো ছবির শেষের দিকে এলে ওর মেজাজ অমনি হয়। আবার দেখো ঠিক হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে যদি কোন দরকার হয়, আমার কাছে আসতে পারো।

একটু ভেবে ভিনসেন্ট বলল,—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, উইসেনব্রাক?

—বলো।

—মভই কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

—কিন্তু কেন?

—তোমার কাজ সম্বন্ধে আমার কী মত তা সে জানতে চায়।

—কিন্তু কী দরকার তাঁর? তাঁর নিজেরই যদি ধারণা যে আমি—

—তা আমি জানিনে। তবে, আমার মনে হয় টারস্টিগের কথায় তার মনে এ নিয়ে কিছুটা ধাঁধা লেগেছিল।

৬

টারস্টিগ আশা হারিয়েছেন তার ওপর, মভের ব্যবহারে সুদূর নির্লিপ্ত। হতাশ মনের দৈন্য পূরণের জন্যে তবু আছে ক্রিস্টিন, মেটায় সহজ সাথীত্বের বেদনা। রোজ ভোরে সে আসে, সঙ্গে আনে সেলাইয়ের ঝুড়ি। ভিনসেন্টের হাত কাজ করে, সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে তার হাতদুটিও। কণ্ঠ তার কোমল নয়, ভাষা লালিত্যবিহীন; তবু সে মৃদুস্বরে কথা বলে,—যখন বোঝে ভিনসেন্টের ছবি আঁকার একাগ্রতা, চুপ করতে ভোলে না। জানলার ধারে গরম উনুনের পাশে চুপ করে বসে থাকতেই আসলে খুব ভালো লাগে মেয়েটার, নীরবে আসন্ন সন্তানের জন্য কাঁথা পোশাক সেলাই করে। মডেল হিসেবে তার কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নেই, তবু আড়ষ্টতা পরিহার করতে, ভিনসেন্টকে খুশি করতে সে মন থেকেই চায়। নতুন একটা কাজ নিজের থেকেই নিয়েছে। বাড়ি যাবার আগে ভিনসেন্টের জন্য দুপুরের রান্নাটাও করে যায়।

—কেন কষ্ট করে আবার এসব করছ সিয়েন,—ভিনসেন্ট বলে।

—কষ্ট কিসের? রান্নাটা তোমার চাইতে ভালোই পারি, তাই করছি।

—তাহলে শেষ করেই চলে যেয়ো না। খাবেও আমার সঙ্গেই, কেমন?

—বেশ তো। মা না-হয় ঘরে বাচ্চাদের দেখবে-খন। থাকতে তো আমার ভালোই লাগে।

ভিনসেন্ট এক ফ্র্যাংক করে দেয় রোজ। নিয়মিত এতটা খরচ তার ক্ষমতার বাইরে, তবু ক্রিস্টিনের এই সঙ্গটুকু পেয়েই তো সে আছে। তা ছাড়া মেয়েটাকে যে এই অবস্থায় দৈনন্দিন কাপড় কাচার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে, সেই ভালোলাগাটাও তো কম কথা নয়! দুপুর গড়িয়ে যায় বিকেলে। যদি তাকে বাইরে যেতে হয়, ক্রিস্টিন অপেক্ষা করে। ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে তাকে বসিয়ে স্কেচ করে ভিনসেন্ট, গভীর রাতে ফিরে যাবার পরিশ্রমটা ক্রিস্টিন আর এখন সইতে চায় না। ভালো লাগে ভোরে যখন কফির গন্ধে ঘুম ভাঙে, তন্দ্রালু চোখ আটকে যায় অদূরে উনুনের ধারে চেনাশুনো একটি নারীর অস্পষ্ট দেহরেখায়।

কোনো-কোনো রাত্রে ক্রিস্টিন অকারণেই তার ঘরে থেকে যায়। বলে,—ইচ্ছে করছে আজ রাত্রে এখানেই শুয়ে থাকি ভিনসেন্ট,—শোবো?

—নিশ্চয়ই, সিয়েন। এ আর জিজ্ঞেস করছ কেন? জানো তো, যতো তুমি

আমার কাছে থাকো ততোই আমার ভালো লাগে।

নিজের থেকে কোনো কাজ করতে কোনোদিন ভিনসেণ্ট ক্রিস্টিনকে বলেনি, তবু সে ক্রমে অনেক কাজ হাতে নেয়। ভিনসেণ্টের জামাকাপড় কাচে, সেলাই ফোড়াই করে, দোকান বাজার আনে। সাংসারিকতায় পটু সে নয় মোটেও। তার পরিবেশ আর জীবনযাত্রা, নিয়মানুবর্তিতা ও পরিচ্ছন্নতার স্বাভাবিক বৃত্তি তার মন থেকে ঝাঁটিয়ে দিয়েছে অনেক দিন। কুঁড়েমি তার মজ্জাগত, হঠাৎ-খেয়ালের দমকে আর প্রয়োজনের তাগিদে কাজ করাই তার স্বভাব। যাকে পছন্দ করে এমনি একটি মানুষের হয়ে ঘরকন্না করছে সে জীবনে প্রথম—এতে জেগেছে ভালো-লাগার নতুন অনুভূতি। ভিনসেণ্ট বাধা দেয় না। নোংরা আর নিত্য-ক্লান্তিভরা জীবনযাত্রা যে ঘুচেছে, এই ভালো। গলার স্বরের রুক্ষতা যে কমছে, কর্কশ ইতর কথাগুলো যে একে-একে ভুলছে, এইতো অনেক। তবু মেজাজ এখনো শুধরোয় নি; হঠাৎ-হঠাৎ কারণে অকারণে যদি রেগে ওঠে, নিজেকে সংযত করতে পারে না; গলার নীল নীল শির ফুলিয়ে চেঁচায়, মুখে এমনি ঘৃণ্য অশ্লীল কথার খৈ ফোটে যা ভিনসেণ্ট জীবনে কখনো শোনে নি।

এমনি তুমুল কাণ্ডের সময়ে ভিনসেণ্ট চুপ করে থাকে, ঝড়ের প্রকোপটা কমবার জন্যে অপেক্ষা করে। এমনি চুপ করে থাকার পালা ক্রিস্টিনেরও আসে। ড্রয়িং-এ যখন সব ভুল হয় বা যথা ভিনসেণ্টের নির্দেশ সব মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাবার ফলে ক্রিস্টিন ভুল 'পোজ' করে, তখন এক-এক সময় তেতে আগুন হয়ে ওঠে ভিনসেণ্ট,—দেয়াল ফেটে পড়ে তার বকুনির চিৎকারে। নীরবে তখন সব বকুনি হজম করে ক্রিস্টিন। রক্ষা এই যে, দুজনে একসঙ্গে কখনো ফাটে না।

স্কেচের পর স্কেচ করে ক্রিস্টিনের দেহের প্রতিটি রেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পর ভিনসেণ্ট স্থির করল, এবার সত্যিকারের একটা স্টাডি সে আঁকবে। উনুনের পাশে একটা চৌকো কাঠের ওপর নগ্ন ক্রিস্টিনকে সে বসালো। কাঠের ব্লকটার জায়গায় সে আঁকল গাছের গুঁড়ি,—আশে-পাশে একটু সবুজের আভাস,—ছবির পটভূমি রইল প্রকৃতি। তারপর সে আঁকল ক্রিস্টিনের মূর্তি—জীর্ণা বিশীর্ণা নারী, দু-হাঁটুর দুটি গোল হাড় আঁকড়ানো শিরাসর্বস্ব প্রেত আঙুলগুলি, দীর্ঘ দুটি ক্ষীণ বাহুর আড়ালে বেথাবিড়ম্বিত মুখ ঢাকা; বিরল কেশের কটি গুচ্ছ লুটিয়ে আছে পিঠের নিঃসঙ্গ শিরদাঁড়ায়, লম্বমান দুটি স্তনের বিনষ্ট বৃন্ত ঝুলে আছে পঞ্জরাস্থি ছাড়িয়ে; নিষ্প্রাণ দুটি পায়ের পাতা অশক্ত আচ্ছন্নতায় কোনো রকমে মাটি ছুঁয়ে আছে। এই নারী—জীবনের শেষ রসবিন্দুটুকু পর্যন্ত যার নিংড়োনো। এই তার ছবি—যে ছবির নাম ভিনসেণ্ট দিল—বঞ্চনা।

এক সপ্তাহ লাগল ছবিটা শেষ হতে। ইতিমধ্যে সব টাকা ফুরিয়ে গেল।

মার্চের পয়লা তারিখ আসতে এখনো দশদিন বাকি। ঘরে আর দু-তিন দিনের মতো কালো রুটি অবশ্য আছে। কিন্তু বাকি খরচের পয়সা নেই একটিও।

ভিনসেণ্ট বললে,—সিয়েন, ভয় হচ্ছে মাস-কাবারের আগে বুঝি আর তোমার আসা চলবে না।

—কেন, কী হোলো?

—আর আমার টাকা নেই।

—মানে, আমাকে দেবার জন্যে?

—হ্যাঁ।

—তা না থাক, এমনিতেই আমি আসব। আমার আর তো কাজ নেই!

—কিন্তু টাকা তো তোমার চাই সিয়েন। সারাদিন এখানে থাকলে কাপড় কাচতেও পারবে না, চলবে কী করে তোমার?

—থাক, সে আমি দেখব—তোমাকে তা ভাবতে হবে না।

তিনদিন পরে রুটি ফুরোলো। ভিনসেণ্ট ক্রিস্টিনকে এই বলে বিদায় দিল যে সে আমস্টার্ডামে কাকার কাছে যাচ্ছে, ফিরে এসে দেখা করবে। তিন দিন স্টুডিয়ো থেকে সে বার হোলো না। শুধু জল খেয়ে আর পুরোনো ড্রয়িং কপি করে কাটালো। তৃতীয় দিন বিকেলে সে ডি বকের স্টুডিয়োতে চলল, এই আশায় যে, সেখানে চা কেক মিলতে পারে।

ডি বক মুখের কথায় আপ্যায়িত করল, কিন্তু চায়ের প্রসঙ্গ উঠল না।

মভ এখন তার সঙ্গে দেখা করবেন না সুনিশ্চিত, জেট-বৌদির কাছে হাত পাতা অসম্ভব। আর মভের কাছে তার সম্বন্ধে টারস্টিগ যে মন্তব্য করেছেন বলে সে শুনেছে, এর পর মরে গেলেও টারস্টিগের কাছে সাহায্যের জন্যে সে যাবে না। ঘরে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে এল অনাহারের পুরোনো বন্ধু—জ্বর। স্বপ্নে জাগরণে বিছানায় শুয়ে পড়ে রইল সে—ঘুরে ফিরে একটি চিন্তা—বরাতক্রমে থিয়োর টাকাটা যদি দুদিন আগে এসে যায়!

পাঁচ দিনের দিন বিকেলে নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল ক্রিস্টিন। ভিনসেণ্ট তখন ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত লোকটির মুখ ক্রিস্টিন ভালো করে দেখল—কপালে গভীর বলিরেখা, নোংরা লালচে দাড়ির নিচে নীরক্ত পাংশু গাল, ফাটা শুকনো ঠোঁটদুটো। আস্তে কপালে হাত রেখে দেখল, গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। খুঁজে দেখল শেলফের ওপর—এক কণা রুটি কি এতটুকু কফি কোথাও নেই। আবার নিঃশব্দে সে বার হয়ে গেল।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে ভিনসেণ্ট দেখছে ইটেনে মা-র রান্নাঘরটা থেকে আসছে রান্নার উষ্ণ মধুর সুরভি। হঠাৎ ঘুম ভাঙল, দেখল উনুনে কি যেন চড়িয়েছে ক্রিস্টিন।

ক্ষীণ, শুষ্ক কণ্ঠে সে ডাকল,—সিয়েন!

বিছানার কাছে এল ক্রিস্টিন, শীতল একটি হাত রাখল তার উত্তপ্ত গালের

ওপর। কাছাকাছি মুখ এনে বললে,—এমনি দেমাক আর কখনো কোরো না, আর কখনো এমনি করে আমার কাছে চেপে রেখো না নিজেকে। আমরা গরিব, কিন্তু দোষ কী তাতে? তোমার যখন টানাটানি, আমার কাছ থেকেও তা লুকিয়ে রাখবে? কেন? আমার দরকারে কে দেখে? তুমি না?

—সিয়েন। অস্ফুট স্বরে আবার বললে ভিনসেণ্ট।

—নাও, আর কথা বলতে হবে না। চুপ করে শুয়ে থাকো। তোমার দশা দেখে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। কটা আলু আর সীম জোগাড় করে এনেছি। সেদ্ধও হয়ে এসেছে।

ডিশের ওপর চটকানো সেদ্ধ আলু আর সেদ্ধ সীম নিয়ে বিছানার ধারে বসে ভিনসেণ্টকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে লাগল ক্রিস্টিন। বললে,—শেষের দিকে তোমার এমনি টান পড়বে যদি জানতে তো রোজ-রোজ আমাকে টাকা দিতে কেন? কদিন একটি দানা দাঁতে কাটোনি বলো তো? এমনিধারা কি ভালো?

এমনি সহানুভূতির আঘাতে শক্তি হারালো ভিনসেণ্টের মন। পরদিন কাঙাল হয়ে সে চলল টারস্টিগের উদ্দেশে। কাদা-মাখা জুতোর একপাটির শুকতলা খসে পড়েছে, তালি-দেওয়া নোংরা প্যাণ্ট। থিয়োর কোটটা গায়ে কয়েক সাইজ ছোট। ময়লা কলারের একধার দিয়ে ঝুলছে বিবর্ণ টাই,—মাথায় কিম্ভুত একটা টুপি। পথের ধারে একটা আর্শিতে চেহারাটার ছায়া পড়ল, স্পষ্ট স্বচ্ছ চোখে দেখল আর্শির ঐ লোকটাকে। কে ওটা? নোংরা ছেঁড়া ধোকড়-পরা রাস্তার একটা বাউণ্ডুলে, কেউ যার নেই, কেউ যাকে পোঁছে না,—আশাহীন, আশ্রয়হীন বরবাদ একটা ঝুটো মানুষ!

টারস্টিগ বললেন,—বাঃ বাঃ, আজ তো দোকানে তুমি আমার প্রথম খদ্দের, ভিনসেণ্ট। বলো কী করতে পারি তোমার জন্যে।

ভিনসেণ্ট জানালো তার দুরবস্থার কথা।

টারস্টিগ প্রশ্ন করলেন,—কেন, তোমার মাসোহারার টাকা গেল কোথায়?

—খরচ হয়ে গেছে।

—বুঝে যদি খরচ না করো তাতে আমি উৎসাহ দেব আশা কোরো না। তিরিশ দিনে মাস, সেই হিসেবে খরচটাকে বেঁধে ফেলা এমন কিছু শক্ত হিসেব নয়।

—বাজে খরচ আমি করিনি মিনহার। প্রায় সব টাকাই দিতে হয়েছে মডেলের জন্যে।

—বটে? তাহলে মডেলের দরকার কী? মডেল বাদ দিলে অনেক শস্তায় কাজ করতে পারবে।

—মডেল যদি না পাই তো মানুষের চেহারা আঁকব কী করে?

—দরকার নেই মানুষ আঁকার। গরু ভেড়া আঁকো। ওদের পেছনে পয়সা

লাগে না।

—গরু ভেড়া আমি আঁকতে পারি নে মিনহার। ও আমার মেজাজে আসে না।

—মানুষের চেহারা কাঠ-পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করাটাই যদি খালি তোমার মেজাজে আসে, অমন মেজাজকে বাতিল করো। তোমার ঐসব স্কেচ কখনো বিক্রি হবে না। আমি তোমাকে বলেছিলাম খালি জলরঙের দৃশ্য আঁকবে, আর কিছু নয়—মনে আছে? আমি বুঝি কেন তুমি ড্রয়িং করো। আসলে তুমি ফাঁকি দিতে চাও। জলরঙের কাজ শিখতে গেলে যে সাধনা যে পরিশ্রমটা দরকার, সেটাকে এড়াতে চাও তুমি। এই তো?

চুপ করে রইল ভিনসেণ্ট। কী উত্তর সে দেবে এ কথার?

টারস্টিগ বলে চললেন,—ডি বকের মডেল দরকার হয় না। কিন্তু ছবি সে আঁকে। প্রত্যেকটা ছবি তার চমৎকার, বিক্রিও হয় তেমনি। কী করে সে এমনি পারে? আর এতদিনেও শিক্ষানবিশি তোমার ঘুচল না, শুরুতে যেমন কুৎসিত ছিল, এখনো তেমনি কুৎসিতই রয়ে গেল তোমার হাত। সহজ সত্যি কথাটা যদি শুনতে চাও,—তুমি আর্টিস্ট নও, এ রাস্তা তোমার জন্যে নয়।

পাঁচ দিনের উপবাসক্লিষ্ট দেহ ভেঙে পড়ে বুঝি। ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ভিনসেণ্ট। তার গলার স্বর বুঝি ক্ষুধার্ত জঠরের মধ্যে পথ হারিয়েছে। একটু পরে করুণ আর্ত স্বর বার হোলো,—এ কথা কেন বলছেন, মিনহার?

—তার কারণ, আমি মনে করি, তোমার প্রতি, তোমাদের ভ্যান গক পরিবারের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। শিল্পী চিনতে আমার ভুল হয় না—সে শিল্পী তুমি নও। অল্প বয়সে যদি শুরু করতে, তবু হোতো কিছু হয়তো। কিন্তু এ বয়সে আর হয় না। এখনো যদি বাঁচতে চাও অন্য পথে যাও। পরান্নভোজী হয়ে আর সময় কাটিয়ো না।

—কিন্তু মভ যে বলেছেন আমার হবে!

—হ্যাঁ, তার কারণ মভ তোমার আত্মীয়। সে তোমাকে আঘাত দিতে চায়নি। কিন্তু আমি তোমার বন্ধু। আমার কথায় আজ আঘাত পাচ্ছ,—কিন্তু অন্য পথে অন্য কাজে জীবনে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে পার,—এ আঘাতের জন্যে সেদিন তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে।

—মিনহার টারস্টিগ, ভাঙা গলায় ভিনসেণ্ট বললে,—আপনার কথা সত্যি, আমি আর্টিস্ট নয়। এ পথ আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু এখন আমাকে বাঁচান। গত পাঁচদিন ধরে একটুকরো রুটি কেনবার একটা পয়সা আমার পকেটে নেই। নিজের উপোসের জন্যে ভাবিনে, আমার মডেল একজন অসুস্থ স্ত্রীলোক, তার কাছে আমার ধার পড়ে আছে। দশটা গিল্ডার অন্তত আমাকে ধার দিন। থিয়োর কাছ থেকে টাকা এলেই আপনাকে শোধ দিয়ে যাব।

টারস্টিগ গম্ভীরভাবে দামি কোটের পাশ-পকেট থেকে ব্যাগ বার করে দশ গিল্ডারের একটা নোট বাড়িয়ে দিলেন।

ভিনসেণ্ট চেয়ার থেকে উঠে কম্পিত হাত বাড়িয়ে বললে,—ধন্যবাদ মিনহার, ধন্যবাদ! অশেষ আপনার দয়া।

ময়লা একটা ন্যাতা দিয়ে ঘর মুছছিল ক্রিস্টিন। চুলগুলো মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা, ব্রণকলঙ্কিত মুখভর্তি ঘাম। মুখ তুলে বললে,—টাকা পেয়েছ?

—হ্যাঁ, দশ ফ্র্যাংক,—বললে ভিনসেণ্ট।

—দ্যাখো, বড়ো লোক বন্ধু থাকার কতো সুবিধে।

মনে স্বস্তি, তাই ক্রিস্টিনের গলায় ঠাট্টার সুর।

—এই নাও, ছ-ফ্র্যাংক তোমার পাওনা ছিল, হাতে রেখে দাও আগে।

ক্রিস্টিন উঠে দাঁড়ালো। ময়লা অ্যাপ্রনে মুখটা মুছে নিল একবার। বললে,—উঁহু, একটি পয়সাও এখন আমাকে দেবে না। আগে ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা আসুক, তারপর। বাকি চার ফ্র্যাংকে তোমার চলবে কী করে?

—আমি ঠিক চালিয়ে নেব সিয়েন। তোমার তো দরকার।

—দরকার তোমারও। শোনো বলি। ভাইয়ের কাছ থেকে যতোদিন না খবর পাও ততোদিন আমি এখানেই থাকব। এ টাকায় তুমিও খাবে, আমিও খাব। হোলো তো?

—কিন্তু সিয়েন, তোমার মডেল হওয়ার দাম আমি তো দিতে পারব না।

—শোনো। অনেক তুমি দিয়েছ, দেবেও অনেক। খেতে দেবে, শুতে দেবে,—রোজগারের জন্যে পথে বার হতে হবে না,—তার দাম কি কম?

দু-বাহু বাড়িয়ে ভিনসেণ্ট কাছে টেনে নিল ক্রিস্টিনকে। পাতলা খড়খড়ে চুলের গুচ্ছগুলো ঘামে ভেজা কপাল থেকে সরিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল তার। রুদ্ধ কণ্ঠে বললে,—বেঁচে থাকো তুমি সিয়েন, বেঁচে থাকো! তোমাকে দেখে আবার যেন বিশ্বাস হচ্ছে যে ভগবান আছেন।

৭

সপ্তাহখানেক পরে ভিনসেণ্ট মভের সঙ্গে দেখা করতে গেল। দরজা খুলতেই সামনে মভ। বিরস কণ্ঠে বললেন,—কী দরকার তোমার? এখন আমার সময় নেই।

ভিনসেণ্ট বললে,—কয়েকটা ওয়াটার কলার করেছি। আপনি যদি একটু দেখে দেন সেইজন্যে। থাক এখন, আমি পরে আসব।

—সময় অসময়ের জ্ঞান তো তোমার নেই! যাক, এসেই যখন পড়েছ চলো।

স্টুডিয়োতে ঢুকে দেখল উইসেনব্রাককে। মভের হাতের কাজ শেষ হয়েছে, এখন সময় বিশ্রামের, মানসিক স্বস্তির। বন্ধুর সামনে ভিনসেণ্টকে

ঠাট্টা করলে মনটা চাঙা হবে মন্দ না।

ভিনসেন্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে মভ উইসেনব্রাককে বললেন,—দ্যাখো দ্যাখো, লোকটার চেহারা দ্যাখো!

চোখ মুখ পাকিয়ে, চেহারার একটা বিকৃত কুৎসিত ভঙ্গি করে উইসেন-ব্রাকের কাছে কয়েক পা এগিয়ে আধ-বোজা চোখে তাকিয়ে তোতলার মতো কয়েকটি কথা বললেন মভ। তারপর বললেন,—দ্যাখো, ঠিক একে নকল করতে পেরেছি কি না?

হো হো করে হেসে উঠলেন উইসেনব্রাক। মভ বললেন,—ওহে, এবার তোমার নোংরা দাড়িটা একটু চুলকোও তো দেখি?

স্তম্ভিত হয়ে গেল ভিনসেন্ট। এমনি দুরন্ত অপমান সে মভের কাছে আশা করে নি। এক কোণে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে উইসেনব্রাক বিদায় নিলেন। এতক্ষণে তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মভ বললেন,—কী, ঠায় দাঁড়িয়ে আছ? এখনো বিদেয় হও নি?

মভ যেমন মুখভঙ্গি করেছিলেন ঠিক তেমনি ছাপ সত্যিই ভিনসেন্টের মুখে। ব্যাকুল কণ্ঠে সে বললে,—কী হয়েছে মভ ভাই? কী করেছি আমি? আপনি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন কেন আমার সঙ্গে?

ক্লান্ত দেহে মভ নরম একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

—দিন দিন তুমি যা হচ্ছ, মভ বললেন,—তা আমি মোটেই সমর্থন করতে পারছি নে ভিনসেন্ট। এতদিনে এক পয়সা রোজগার করবার তোমার ক্ষমতা হোলো না, আর তার বদলে এর-তার কাছে তুমি ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছ আর সারা ভ্যান গক বংশের নাম ডোবাচ্ছ।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভিনসেন্ট বললে,—টারস্টিগের কাছে শুনেছেন, তাই না? বুঝলাম, আর আপনি আমাকে শেখাবেন না।

—না।

—বেশ। এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে তাহলে লাভ নেই। অনেক দয়া আপনি আমায় করেছেন। কৃতজ্ঞতা মুখে প্রকাশ করার নয়। আমার কোনো দুঃখ নেই। আচ্ছা চলি তাহলে মভ ভাই।

—না যেয়ো না, দাঁড়াও।

অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন মভ। তারপর বললেন,—রাগ কোরো না ভিনসেন্ট। বড় ক্লান্ত আমি, শরীরটাও ভালো নেই। দাও, দেখি কী কী ছবি তুমি এঁকেছ।

—কিন্তু, এখন থাক না। পরে না-হয়—

—না না, নিয়ে যখন এসেছ, দাও দেখি।

ক্লান্ত রক্তচক্ষু মেলে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন মভ। তারপর বললেন,—ভুল, তোমার ড্রয়িং আগাগোড়া সব ভুল। এতদিন যে কেন আমার চোখে

পড়েনি তাই আশ্চর্য।

—কিন্তু আপনিই যে একদিন বলেছিলেন—

—ভুল করেছিলাম আমিও। যা অপটুত্ব তাকে ভেবেছিলাম শক্তির আভাস। আসলে কিছুই তোমার এতদিনে হয় নি। শিখতেই যদি চাও, গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। ঐ ফার্নেসের পাশে গোটাকতক প্লাস্টারের ছাঁচ আছে। যাও, ঐগুলো দেখে ড্রয়িং করতে শেখো গে।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ছাঁচগুলোর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে মাটিতে বসে পড়ল ভিনসেন্ট। হাতের সামনে একটা পায়ের ছাঁচ। পকেট থেকে পেন্সিল আর ড্রয়িং কাগজ বার করে হাতে নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ছাঁচটার দিকে। কাগজে একটি লাইনও সরলো না। শুধু অপমান নয়, শাণিত অস্ত্রের মতো বুকে বিঁধে গেছে হতাশার তীব্র যন্ত্রণা। পিছন ফিরে দেখল মভ সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়লেন বুঝি।

কয়েক ঘণ্টা কাটল। একমনে পর-পর সাতখানা ড্রয়িং করল ভিনসেন্ট ঐ প্লাস্টারের পা-টার। নাসিকাধ্বনি বন্ধ হোলো। ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মভ, ভিনসেন্টের কাছে এসে বললেন,—দেখি দেখি, কতোদূর কী করলে?

পর-পর ড্রয়িংগুলোর ওপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে চিৎকার করে উঠলেন মভ,—না, না, না!

টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন হাতের কাগজগুলো,—সেই ছেলেমি, সেই জড়তা, সেই কর্কশতা! ঠিক সেই প্রথম দিনের মতো। চোখের সামনে ছাঁচটা রয়েছে, ঠিক ওটা যেমন তেমনি আঁকতে পারো না? একটা জিনিস আসলে যেমন দেখতে, ঠিক সেই জিনিসটা ড্রয়িং করা কি কখনো তোমার ধাতে আসবে না? কাগজের ওপর পেন্সিলের একটা লাইন,—তার একটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষা আছে—তেমনি একটা লাইন টানারও ক্ষমতা তোমার নেই?

পেছনের দরজা দিয়ে নীরবে বার হয়ে বাগান ছাড়িয়ে রান্নাঘরে গেল ভিনসেন্ট। সেখানে কিছুটা খেয়ে আবার ফিরে এল স্টুডিয়োতে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আলো জ্বলছে। এক কোণে বসে আবার সে ঐ প্লাস্টারের পা-টা আঁকতে লাগল।

রাত শেষ হয়ে গেল। মভ এসে স্কেচগুলো দেখলেন। বললেন,—বৃথা, বৃথা। কিছু হয়নি! ড্রয়িংএর নিতান্ত মৌলিক ভুল যেগুলো, সেগুলো প্রত্যেকটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে তোমার কাজে। খুব হয়েছে। এবার ছাঁচটাকে হাতে নিয়ে বাড়ি যাও। যেদিন একটা পা অন্তত ঠিক করে আঁকতে পারবে, সেদিন আবার আমার এখানে এসো। তার আগে নয়।

ছাঁচটাকে সজোরে দেয়ালে ছুঁড়ে মারল ভিনসেন্ট, ভেঙে গেল টুকরো

টুকরো হয়ে। রুদ্ধ গর্জন করে উঠল,—ছাঁচ? মরা ছাঁচ দেখে আবার আঁকব আমি? যেদিন পৃথিবীতে জীবন্ত হাত আর পা একটাও থাকবে না,—সেদিন, তার আগে নয়!

ছুটে বার হয়ে গেল সে মভের স্টুডিয়ো থেকে।

দুপুর বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে, ক্রিস্টিন এসেছে তার বড় ছেলে হার্মানকে সঙ্গে নিয়ে। রোগা রক্তহীন চেহারা ছেলেটার, ত্রস্ত ভয়ার্ত চোখ। লেখাপড়া শেখে নি, অচেনা লোকের কাছে এগোতে সাহস করে না। ভিনসেন্ট একটুকরো কাগজে একটা গরু এঁকে তাকে দিল, আর তার হাতে দিল একটা পেন্সিল। ভাব হয়ে গেল ছেলেটার সঙ্গে। ক্রিস্টিন বার করল কিছুটা রুটি আর পনির। খেল সবাই মিলে।

হঠাৎ কে আর তার ছেলে জ্যানকে মনে পড়ল ভিনসেন্টের। কি যেন আটকে এল গলার মধ্যে।

ক্রিস্টিনের শরীর ভালো নেই। পেটের মধ্যে কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা, এমন আগে কোনোবার আর হয় নি। বললে,—আমি আজ উঠতে পারছি নে ভিনসেন্ট, তুমি হার্মানকে আঁকো।

সারাদিন সে শুয়ে রইল বিছানায়।

পরদিন ভিনসেন্ট জোর করে ক্রিস্টিনকে টেনে তুলল। নিয়ে চলল লীডেনের সরকারি হাসপাতালে।

ডাক্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ করে পরীক্ষা করলেন, প্রশ্ন করলেন অসংখ্য। পরে বললেন,—বাচ্চা পেটের মধ্যে ঠিক অবস্থায় নেই।

—কী করা যায় ডাক্তার? ভিনসেন্ট প্রশ্ন করল।

—অপারেশন করাতে পারেন। খুব শক্ত কিছু নয়, কেবল ফরসেপ্স্ দিয়ে শিশুকে ঘুরিয়ে ঠিক অবস্থায় এনে দেওয়া। অপারেশনের জন্যে কোনো ফি দিতে হবে না, তবে হাসপাতাল খরচ কিছু লাগবে।

ক্রিস্টিনের দিকে ফিরে ডাক্তার বললেন,—হাতে জমিয়েছ কিছু?

—ঘাড় নেড়ে ক্রিশ্টিন বললে,—একটি পয়সাও না।

—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন ডাক্তার,—ঠিক যা ভেবেছিলাম।

—ভিনসেন্ট শুধোলো,—কত খরচ লাগবে ডাক্তার?

—পঞ্চাশ ফ্র্যাঙ্কের বেশি নয়।

—আর যদি অপারেশনটা না হয়?

—তাহলে প্রসবের সময় যে বিপদ ঘটবে তা সামলানো অসম্ভব।

এক মুহূর্ত ভাবল ভিনসেন্ট। তারপর বললে,—টাকার ব্যবস্থা আমি করব ডাক্তার।

—বেশ, তাহলে শনিবার সকালে নিয়ে আসবেন, আমি নিজে অপারেশন করব। হ্যাঁ, আর একটা কথা। এ মেয়েটির সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক

জানিনে, ডাক্তার হিসেবে আমার জানবার দরকারও নেই। তবে কিনা, আপনার হয়তো দরকার একটা কথা জানবার। প্রসবের পর ও যদি আবার রাস্তায় বার হবার ব্যবসা শুরু করে তাহলে কবরে যেতে ছ-মাসও লাগবে না।

—আপনাকে কথা দিচ্ছি ডাক্তার, ও আর সে জীবনে ফিরে যাবে না।

—বেশ, চমৎকার কথা। তাহলে শনিবার দিন আবার দেখা হবে।

কদিন পরে টারস্টিগ এলেন। বললেন,—হুঁ, এখনো তুমি এসব নিয়েই আছ দেখছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই আমার কাজ। আমি কাজ করছি।

—তুমি আমাকে ডাকে যে দশ ফ্র্যাংক ফেরত পাঠিয়েছিলে, তা আমি পেয়েছি। নিজে গিয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে ঋণটা শোধ করে আসবে, এটুকু আশা আমি করেছিলাম।

অতো দূর রাস্তা, আর আবহাওয়াটাও এতো খারাপ ছিল কদিন, তাই ভাবলাম ডাকেই—

—বাঃ, বাঃ! টাকাটা ধার করতে যখন গিয়েছিলে, তখন কিন্তু রাস্তাটা খুব বেশি মনে হয়নি।

ভিনসেণ্ট চুপ করে রইল। টারস্টিগ আবার বললেন,—তোমার ওপর আমি যে রাগ করি ভিনসেণ্ট, তার কারণ তোমার কোনো সম্ভ্রম নেই, কোনো ভদ্রতাবোধ নেই। এইজন্যেই তোমার ছবি নিতে আমার বিতৃষ্ণা আসে।

এবারে উত্তর দিল ভিনসেণ্ট। বললে,—আমার তো ধারণা ছিল, মিনহার, আপনার ছবি কেনার সঙ্গে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ভালো লাগা বা না লাগার কোনো সম্পর্ক নেই।

—নিশ্চয় নেই। আমার কথার ওরকম ঘুরিয়ে মানে করার চেষ্টা তুমি না করলেও পারো। তোমার কাজের মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও সৌন্দর্য থাকত, তাহলে একটা ছবিও অন্তত আমি নিতাম।

ভিনসেণ্ট বললে,—এ প্রসঙ্গ থাক মিনহার, আমি যে পথে চলেছি সেই পথই আমার ভালো। বিক্রির জন্যে তৃতীয় মানুষের পছন্দসই মাল তৈরি করা আমার না হোক।

টারস্টিগ কোটের একটা বোতাম খুলে চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন,—আমার মধ্যে-মধ্যে সন্দেহ হয়, তোমার ছবি লোকে কিনুক তা তুমি আসলে মনে-মনে চাও না। সত্যিকারের তুমি চাও পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে।

—তা নয় মিনহার। আমার একটা ছবি যদি বিক্রি হয় তাতে আমার চাইতে স্বস্তি কে পাবে? তবে কিনা, তার চাইতে আমি অনেক বেশি খুশি হই যখন উইসেনব্রাকের মতো কোনো শিল্পী আমার ড্রয়িং দেখে প্রশংসা করে।

টারস্টিগ হাতের ছড়িটা দু-হাঁটুর ওপর রেখে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসলেন।

—শোনো ভিনসেন্ট, তোমার বাবা মা আমাকে চিঠি লিখেছেন, অনুরোধ করেছেন তোমাকে যেন আমি সাহায্য করি। তাই আমি এসেছি। তোমার ছবি কিনে তোমাকে কখনই সাহায্য করতে পারব না, সে আমার বিবেকে বাধবে। তার বদলে কয়েকটা নিতান্ত বাস্তব উপদেশ তোমাকে দিচ্ছি। এও তোমার উপকারে আসবে কম নয়। এই যে তুমি ছেঁড়া নোংরা ধোকড় পরে ঘুরে বেড়াও, এভাবে তুমি নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছ। নতুন জামা কাপড় কিছু কেনো। ভদ্রলোকের পোশাক না পরলে তুমি যে ভ্যান গক সে পরিচয়ই বা দেবে কেমন করে? তারপর মেলামেশা। শহরের উঁচু ঘরের লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের কোনো ঝোঁক তোমার নেই। যতো কুলি মজুর, নিচু জাতের লোকের সঙ্গে তোমার মিল। নিতান্ত সব যাচ্ছেতাই জায়গায় যাচ্ছেতাই লোকজনের অড্ডায় তোমাকে দেখা গেছে। এমনি যদি করো তাহলে জীবনে বড়ো হবে কী করে?

টেবিলের কোণ থেকে নেমে ভিনসেন্ট টারস্টিগের সামনাসামনি এসে দাঁড়ালো। এই সুযোগ, সহানুভূতি আর বন্ধুত্ব নতুন করে ফিরে পাবার এই উপযুক্ত ক্ষণ। স্বাভাবিক কর্কশ গলার স্বরকে যতটা সম্ভব নরম করে বললে, —মিনহার, আপনি আমার ভালোই চান—আমাকে সাহায্য করতে, আমার উপকার করতেই চান। আমিও আপনাকে আমার কথা খুলে বলছি। আপনি বলছেন, আমি ভালো কাপড় চোপড় পরিনে কেন? এর নিতান্ত সোজা আর সত্য জবাব হচ্ছে,—পয়সা নেই বলে। এ তো আপনার অজানা নয়। জায়গায় জায়গায় আমি ঘুরে বেড়াই, এ কথা মিথ্যে নয়। কখনো জাহাজ-ঘাটে, কখনো রেল স্টেশনে, পথে বাজারে, গলি-ঘুঁজিতে, শ্রমিকদের সন্ধেবেলাকার অড্ডায়। এমনি ঘুরতে কারুর ভালো লাগে না,—কেবল এক শিল্পীর ছাড়া। অভিজাত চায়ের পার্টি, সুন্দরী মেয়েদের ভিড়,—তার চাইতে বস্তির জটলাও ভালো, যদি শিল্পীর মনের খোরাক সেখানেই মেলে। শিল্পীর কাজ নোংরা কাজ, নোংরা তার পরিবেশ। শিল্প-বিক্রেতার চকমকে পোশাক আর ঝকমকে আচার ব্যবহারে তার কাজ শিল্প-বিক্রেতার চকমকে পোশাক আর ঝকমকে আচার ব্যবহারে তার কাজ কী? মজুর আর মজুরনী,—যারা মাটি কাটে, রাস্তা বানায়, তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন আমার কাটে। আমার কুৎসিত মুখ আর কদর্য পোশাক ঠিক মিলে যায় তাদের সঙ্গে। ওরা শ্রমিক, আমিও শ্রমিক, তাদেরই মতো। এক হয়ে মিশে যেতে পারি ওদের সঙ্গে। দামি পোশাকের কোনো ব্যবধান ওদের আমার মধ্যে থাকে না। তাই তো ওরা আমাকে বিশ্বাস করে, সহজ হয়ে আমার সঙ্গে মেশে। ওদের মধ্য থেকে অজানা আশ্চর্য সৌন্দর্যকে আমি খুঁজে বার করি। সমাজে যারা বরবাদ, তাদের বস্তির দরজা আমার কাছে খোলা, আমার স্টুডিয়োতে তাদের চির-নিমন্ত্রণ। এতে আমি নষ্ট করছি কী করে নিজেকে, মিনহার? আমার যা কাজ তাই তো আমি করছি।

তার জন্যে গরিবদের সঙ্গে গরিব হয়ে মিশলে নিজেকে ছোট করা হয়? না শিখলাম আমি অভিজাত ঘরের আদব-কায়দা, ক্ষতি কী তাতে মিনহার?

গম্ভীর গলায় টারস্টিগ বললেন,—তাহলে তোমার থেকে যারা বড়ো আর তোমার যারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাদের কোনো উপদেশ তুমি শুনবে না? জীবনে বারে বারে তুমি ব্যর্থ হয়েছ, আবার তুমি ব্যর্থ হবে?

—ভুল কথা মিনহার, দেখুন আমার হাতখানা। ড্রয়িংওয়ালার মোটা মোটা আঙুল আমার,—এ আঙুলে শক্তি আছে।

কোটের বোতাম এঁটে উঠে দাঁড়ালেন টারস্টিগ চরম কথাটা বলবার জন্যে। সিল্কের টুপিটা মাথায় চাড়িয়ে বললেন, —বেশ, মভ আর আমি এবার দেখব যাতে থিয়োর কাছ থেকে আর একটি পয়সাও তুমি না পাও। এ নইলে তোমার চৈতন্য হবে না।

কী যেন একটা চুরমার হয়ে ভেঙে গেল ভিনসেণ্টের বুকের মধ্যে। থিয়োর দিক থেকে যদি আক্রমণটা আসে, তাহলে সে হবে চরম আক্রমণ। তাহলে আর কোনো আশা নেই।

দুহাত জোড় করে সে আকুল চিৎকার করে উঠল,—কেন, কেন? আমার এমনি সর্বনাশ আপনারা কেন করবেন? শুধু আপনাদেব সঙ্গে আমার মতে মেলে না বলে? এটা কি উচিত? আমি শপথ করছি, আপনাদের সামনে আর কখনো আমি আসব না। আপনারা ভুলে যান আমাকে, এক কোণে আমাকে নিজের মনে পড়ে থাকতে দিন। থিয়ো! থিয়ো ছাড়া আমার কেউ নেই, ওর দয়াতেই আমি বেঁচে আছি। ওকে আপনারা কেড়ে নেবেন না আমার কাছ থেকে!

—আমরা যা করব, তা তোমার ভালোর জন্যেই করব।

টারস্টিগ চলে গেলেন।

পয়সার ব্যাগটাকে মুঠো করে ধরে ভিনসেণ্ট রাস্তায় দৌড়ল। দৌড়তে দৌড়তে একটা দোকানে পৌঁছে সেখান থেকে প্লাস্টারের একটা পা কিনে আবার ছুটল মভের বাড়ি। জেট দরজা খুলে ভিনসেণ্টকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

—তুমি এখানে?

—মভ ভাই কোথায়?

—অ্যান্টন বাড়ি নেই। তোমার ওপর সে ভয়ানক চটেছে। বলেছে জীবনে তোমার মুখ দেখবে না। এমনি কাণ্ড কেমন করে ঘটল ভিনসেণ্ট?

পায়ের ছাঁচটা সে জেট-এর হাতে তুলে দিল। বললে,—এটা মভকে দেবেন, বলবেন আমি দিয়ে গিয়েছি। আর বলবেন, যা হয়েছে সব আমার দোষ। বড়ো দুঃখিত আমি সেজন্যে।

ফিরে গেল ভিনসেণ্ট। আলো-জ্বলা রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠে প্রান্তরে তখন ধূসর অন্ধকারের জটলা।

৮

ক্রিশ্টিনের অপারেশন ভালোই হোলো, কিন্তু পেছনে রেখে গেল মস্ত সমস্যা। সমস্যাটা টাকার। ভিনসেন্ট কর্নেলিয়াস কাকাকে বারোটা ছবি পাঠিয়ে দিল, কিন্তু দাম তো হাতে হাতে মিলবার নয়। খুশিমত তিনি পাঠাবেন। লীডেন হাসপাতালের ডাক্তারই ক্রিশ্টিনকে প্রসব করাবেন, অতএব হাসপাতালের টাকা আটকে রেখে তাঁকে অখুশি করা অসম্ভব। থিয়োর পাঠানো মাসোহারা থেকে সে-টাকা সে মিটিয়ে দিল। অসুস্থ ক্রিশ্টিনের পুষ্টিকর খাওয়া দাওয়া দরকার, সে খরচও ঐ একই পুঁজি থেকে গেল। অতএব ভিনসেন্টের জীবনে আবার পুরোনো ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। প্রথমে কফি আর কালো রুটি, তারপর শুধু কালো রুটি, তারপর খালি পেটে শুধু জল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর আর ভুল বকা। মাথাটা যখন একটু পরিষ্কার হয়, ভাবে, ভাগ্যিস সে আগে থাকতেই ক্রিশ্টিনের হাতে যতোটা পারে টাকা তুলে দিয়েছিল, নইলে তার সংসারে তারও বুঝি এমনি অবস্থাই হোতো।

এমনি অবস্থায় কোনো রকমে টলতে টলতে সে একদিন উইসেনব্রাকের স্টুডিয়োতে গেল। উইসেনব্রাকের প্রচুর টাকা, কিন্তু জীবনযাত্রায় নিষ্করুণ মিতব্যয়িতা। একটা বাড়ির চারতলার ওপরে তাঁর স্টুডিয়ো। ফাঁকা মস্ত একটা ঘর, কোনো আসবাব নেই, ছবি নেই, বই নেই,—দ্বিতীয় লোকের বসবার জন্যে একটা টুল পর্যন্ত নেই। শুধু আছে ছবি আঁকার জিনিসপত্র,—কারিগরির হাতিয়ার। অপরের স্টুডিয়োতে আড্ডা দিতে যেতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু তাঁর ঘরে কেউ এলেই তাঁর মেজাজ হয়ে ওঠে খাঁচায় পোরা বাঘের মতো।

ভিনসেন্টকে দেখেই একেবারে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠলেন,—আচ্ছা? তুমি, এখানে এসেছ! কী মনে করে?

ভিনসেন্ট তার দুরবস্থার কথা জানালো।

—ভুল, ভুল করেছ তুমি ভায়া, কঠোর হাসি হেসে উইসেনব্রাক বললেন, —একেবারে ভুল লোকের কাছে তুমি এসেছ। একটি পয়সাও তুমি আমার কাছে পাবে না।

—কিন্তু, এই কটা টাকা আপনি কদিনের জন্যে আমাকে ধার দিতে পারেন না?

—আলবাৎ পারি, একশোবার পারি। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার মতো হাতুড়ে আর্টিস্ট যার একখানা ছবি জন্মে বিক্রি হয় না? এখনই আমার

ব্যাংকে এতো টাকা আছে যা আমি তিন জন্মেও খরচ করে উঠতে পারব না।

—তাহলে পঁচিশটা ফ্র্যাংক মাত্র আমাকে ধার দেবেন না কেন! একটুকরো বাসি রুটি কেনবার পয়সা আমার পকেটে নেই।

—চমৎকার! চমৎকার! এই তো আসল দাওয়াই পড়েছে! না হলে তুমি আর্টিস্ট হবে কেমন করে?

খুশিতে দু-হাঁটুতে হাত বোলাতে লাগলেন উইসেনব্রাক।

ভিনসেন্ট দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো। একটি মাত্র টুল, তাতে গৃহকর্তা নিজে বসে। কিছু না-ধরে দাঁড়াবার শক্তি নেই তার। কাতর গলায় বললে,—অনাহারে আমি মরছি, এর মধ্যে আপনি চমৎকারটা কী দেখলেন?

—এ তোমার মস্ত সৌভাগ্য ভিনসেন্ট। তুমি মরবে না, কিন্তু কষ্ট পাবে!

—আমি কষ্ট পাব, তাতে আপনার এত আনন্দ কেন?

পায়ের ওপর পা তুলে টুলের ওপর জমিয়ে বসলেন উইসেনব্রাক। লাল রঙ মাখা একটা তুলি ভিনসেন্টের মুখের দিকে উঁচিয়ে বললেন,—তার কারণ, কষ্ট না পেলে শিল্পী হওয়া যায় না। বেদনার বেদীতেই শিল্পীর প্রতিষ্ঠা। যতো দুঃখ তুমি পাবে ততো কৃতার্থ তুমি বোধ করবে। ভরা পেটের চাইতে খালি পেট ভালো। ভরা বুকের চাইতে ভালো ভাঙা বুক। যে কখনো দুঃখ পায়নি জীবনে, শিশুর অভিজ্ঞতাটুকু যার হয়নি,—সে আবার আঁকবে কী? সুখ তো গরুর জন্যে আর দোকানদারের জন্যে। শিল্পীর হৃদয় দুঃখের পারাবার। যতো কষ্ট পাবে, যতো যন্ত্রণায় ছটফট করবে ততো মনে ভাববে এ ঈশ্বরের আশীর্বাদ

—কিন্তু দারিদ্র্য—সে তো ধ্বংস করে।

—যে দুর্বল তাকে ধ্বংস করে, যে সবল তাকে নয়। শিল্পী হবার পথে পা বাড়িয়ে অনাহারে আর যন্ত্রণায় যে মরে, মরাই তার পক্ষে ভালো। অর্থ-সাহায্য করে তাকে বাঁচানোর সার্থকতা নেই। প্রকৃত যে শিল্পী, তার সর্বশেষ অবদান হৃদয় নিংড়ে দিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত তার ধ্বংস নেই। তার আগে, কি ঈশ্বর কি শয়তান কেউ তাকে মারতে পারে না।

—এসব কথা আমাকে বলা বৃথা, উইসেনব্রাক। বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে আমার জীবন কেটেছে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই—ক্ষুৎপীড়িত জ্বরাক্রান্ত দেহ, বেদনা-ব্যাকুল বিকল মন—এ অভিজ্ঞতা আমার নতুন নয়।

—অভিজ্ঞতার এই তো শুরু ভায়া! বেদনা অসীম, এ সমুদ্রের পারাপার নেই। বাড়ি যাও, কাগজ পেন্সিল নিয়ে বোসো গে। যত ক্ষিদে পাবে, ততো ভাল কাজ বার হবে।

—ঠিক বলেছেন, আর টারস্টিগের হাতে ততো তাড়াতাড়ি আমার ছবির পর ছবি বাতিল হবে।

—প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন উইসেনব্রাক। বললেন,—আলবৎ, বাতিল হবে বৈকি! না হলে চলবে কেন? তোমার ভালোর জন্যেই তো। তাতে যন্ত্রণা আরো বাড়বে,—পরের ছবিটা আরো ভালো হবে। এমনিভাবে বেশ ক-বছর কাটাবার পর শেষ পর্যন্ত একটি ছবি হয়তো আঁকতে পারবে যার স্থান হবে জ্যান স্টিনের ছবির পাশে—

—কিংবা উইসেনব্রাকের,—ভিনসেণ্ট বললে।

—ঠিক বলেছ। কিংবা উইসেনব্রাকের। আর আমি কিনা তোমাকে এখন টাকা ধার দিয়ে তোমার অমরত্বের পথে বাদ সাধব! ক্ষেপেছ?

—অমরত্ব চুলোয় যাক। এই মুহূর্তে আমি ছবি আঁকতে চাই। কিন্তু খালি পেটে তা অসম্ভব।

—বাজে কথা, ভায়া। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত প্রকৃত ভালো যা-কিছু আঁকা হয়েছে, তা ঐ খালি পেটেই হয়েছে। ভর্তি পেটের যা কাজ, সেসব তুচ্ছ।

কথাবার্তা কিছু তরল পর্যায়ে নামিয়ে আনা চাই। ভিনসেণ্ট বললে,—কিন্তু, আপনি কিছু খালি পেটে এঁকেছেন বলে তো শুনিনি।

—এটা আমার প্রতিভা ভায়া, আর অসাধারণ কল্পনাশক্তি। আগুনের মধ্যে হাত না দিয়েও দাহনের যন্ত্রণাকে অনুভব করতে আমি পারি।

—বাজে কথা। ঠকানোর আর লোক পাননি?

—বাজে নয়, বিলকুল সত্যি। আমি যদি জানতাম যে ডি বকের মতো নিষ্প্রাণ দোকানদারি ছবি আমি কেবল আঁকতে পারি, তবে কবে এসব ছেড়ে দূরে অন্য রাস্তায় হাঁটা দিতাম। বেদনার স্মৃতিকে বাদ দিয়ে বেদনার সম্পূর্ণ অনুভূতিকে আমি মুঠোর মধ্যে ধরতে পারি। এইজন্যেই তো আমি এত বড়ো আর্টিস্ট!

—হ্যাঁ, আর এত বড়ো ঠক। যাক, অনেক তো বক্তৃতা দিলেন উইসেনব্রাক, এবার পঁচিশটি ফ্র্যাংক আমাকে ধার দিন।

—পঁচিশটা সেণ্টিমও নয়। শোনো ভিনসেণ্ট, এর মধ্যে কোনো ঠকামি নেই। অকপটেই আমি বলছি, তোমার সম্বন্ধে অনেক উঁচু ধারণা আমার। টাকা ধার দিয়ে তাকে আমি খাটো করতে চাইনে। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে নিজে যদি লড়াই করে যেতে পারো, আমি বলছি একদিন তোমার শিল্প-কাজ অটুট হয়ে উঠবে। মভের ডাস্টবিনে প্লাস্টারের সেই ভাঙা পা-খানা দেখে এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে। যাও, কাজ করোগে। পথে নওরখানা পাবে, সেখান থেকে বিনে পয়সায় একবাটি ঝোল চুমুক দিয়ে খেয়ে নিয়ো।

কয়েক মুহূর্ত উইসেনব্রাকের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ভিনসেণ্ট যাবার জন্যে পিছু ফিরল। দরজায় হাত দিতেই সে ডাক শুনল,—

—যেয়ো না, এক মিনিট দাঁড়াও।

—কী হোলো? মুখ ফিরিয়ে কঠোর গলায় ভিনসেণ্ট বললে,—মনটা

ভিজল নাকি ? প্রতিজ্ঞার পাথরে কি ফাটল ধরল ?

ভিনসেণ্টের কাঁধে হাত রাখলেন উইসেনব্রাক,—শোনো ভ্যান গক। আমি পাথর নই, কিন্তু আমার একটা প্রিন্সিপল আছে। তোমাকে যদি আমি অযোগ্য লোক ভাবতাম, তাহলে হাতে-হাতে পঁচিশটা ফ্র্যাংক ঠেকিয়ে প্রথমেই তোমাকে বিদায় করতাম। কিন্তু তুমি তা নও, সহকর্মী বলেই আমি দিলাম না। কিন্তু তার বদলে এমনই জিনিস দিচ্ছি যা সারা পৃথিবীর সব টাকা দিয়েও কোথাও তুমি পাবে না। কেমন, নিতে রাজি ? এ জিনিস আমি মভ ছাড়া কাউকে কখনো দিতাম না। আচ্ছা বেশ, এদিকে এস। স্কাইলাইটের পর্দাটা সরিয়ে দাও। ব্যস, এইবার ঠিক হয়েছে। এই স্টাডিটা ভালো করে দ্যাখো তো ! এইবার দ্যাখো, কী করে এর থেকে ছবি ফুটিয়ে তুলতে হয়। দেখে যাও ভালো করে,—চোখে নয় শুধু, মনের মধ্যে গেঁথে রাখো। আঃ সরো না ! আলোটাকে আড়াল করে দাঁড়ালে কাজ হবে কী করে ?

ঘণ্টাখানেক পরে ভিনসেণ্ট পথে বার হোলো। মনে তার উচ্ছল পরিপূর্তি। এই এক ঘণ্টায় সে যা শিখেছে, কোনো আর্ট স্কুলে এক বছরের তালিমেও তা শিখতে পারত না। লক্ষ্যহীন সে চলল। অনেকটা দূর যাবার পর হঠাৎ মনে হোলো,—জঠর জোড়া তার বুভুক্ষা, সারা শরীরে জ্বরের তাপ। আর, সারা দুনিয়ায় কোথাও একটি পয়সাও তার জন্যে জমা নেই।

৯

কয়েকদিন পরে সমুদ্রতীরে মভের সঙ্গে দেখা।

—মভ ভাই, ভিনসেণ্ট বললে,—সেদিন আপনার স্টুডিয়োতে আমি যে ব্যবহার করেছি, সেজন্যে আমি মর্মাহত হয়ে আছি। খুবই অন্যায় হয়েছিল আমার। তবু আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না ? আসবেন না একবার আমার ওখানে ?

সরাসরি মভ অস্বীকার করলেন,—না কখনো না ! তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আর।

—কেন মভ ভাই,—আমার ওপর আপনার কোনো আস্থাই আর নেই ?

—না, বিন্দুমাত্রও নেই। তুমি অত্যন্ত ঘৃণ্য চরিত্রের লোক।

চমকে উঠল ভিনসেণ্ট। বললে,—কী অন্যায় ! কী ঘৃণ্য কাজ আমি করেছি আমাকে বলুন। আমি নিজেকে শুধরোতে চেষ্টা করব।

—তাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই। তোমাকে আমি চিনিনে।

মভ মুখ ফেরালেন। পায়ে পায়ে ভিনসেণ্ট সরে গেল তাঁর কাছ থেকে।

খবরটা চাপা থাকবার নয়। ক্রিস্টিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা ছড়ালো। ডি বকই তার প্রধান ঘোষক। একদিন মিষ্টি মুখে চতুর হাসি

শানিয়ে সে ভিনসেন্টের স্টুডিয়োতে এল। ক্রিস্টিন তখন পোজ দিচ্ছে, ড্রয়িং করছে ভিনসেণ্ট।

দামি কালো ওভারকোটটা চেয়ারে ফেলে লম্বা একটা সিগারেট ধরিয়ে সে খোশমেজাজি গলায় প্রশ্ন করল,—হ্যাঁ হে ভিনসেণ্ট, তুমি নাকি একজন রক্ষিতা রেখেছ? টারস্টিগ, মভ, উইসেনব্রাক সবাই এ কথা বলছে, বেদম ক্ষেপে আছে।

ক্রিস্টিনের উপস্থিতির জন্যে সে বললে ইংরেজিতে। ভিনসেণ্টও উত্তর দিল ইংরেজিতেই,—

—ও, তাই নাকি?

—ব্যাপারটা একটু চেপে-চুপে রাখতে হয় ভায়া! তোমার কোনো বুদ্ধি নেই। যাই হোক, জিনিসটি জোটালে কোথা থেকে? কোনো মডেল নাকি? আমি তো সবাইকে চিনি। কোন্‌টি বলো তো?

ভিনসেণ্টের চোখ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ঘুরে গেল ক্রিস্টিনের দিকে। ডি বকের মুখ থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল, লাফিয়ে উঠল সে—

—অ্যাঁ! ঐ নাকি তোমার রক্ষিতা, ঐ, মাগিটা?

শান্ত গলায় ভিনসেণ্ট বললে,—কোনো রক্ষিতা আমি রাখিনি ডি বক। তবে কথা যদি উঠে থাকে, তা হয়তো এই মেয়েটিকে নিয়েই।

কপালে একবার জামার হাতাটা বুলিয়ে তীক্ষ্ন চোখে কিছুক্ষণ ডি বক ক্রিস্টিনকে দেখল। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বললে,—ওটার সঙ্গে তুমি শোও কী করে বলো তো?

—কেন? কেন একথা বললে?

—আরে ভায়া ও যে বাজারের মেয়েমানুষ,—একেবারে সদর রাস্তার ঝুনো মাল। বুঝেছি, টারস্টিগ কি ক্ষেপেছে সাধে? আরে মেয়েমানুষ রাখবে তো অল্পবয়সী, দেখতে শুনতে ভালো এমনি শহরের কোনো মডেলকে রাখলেই তো পারতে। তার কি কোনো অভাব আছে নাকি?

—আমি তোমাকে আগেই বলেছি ডি বক, মেয়েটি আমার রক্ষিতা নয়।

—তাহলে, কী ও তোমার?

—ও আমার স্ত্রী।

—স্ত্রী! তোমার স্ত্রী?

—হ্যাঁ, আমার বাক্‌দত্তা। ওকে আমি বিয়ে করব।

—কী সর্বনাশ! সচকিতে হাঁ-টা বন্ধ হয়ে গেল ডি-বকের। ক্রিস্টিনের দিকে একবার ভয় আর বিতৃষ্ণামিশ্রিত দৃষ্টি হেনে সে ছুটে বার হয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় কোটটা হাতে তুলে নিতেও ভুলে গেল।

ক্রিস্টিন বললে,—তোমরা আমার সম্বন্ধে কী কথা বলছিলে?

ভিনসেণ্ট পরিপূর্ণ চোখে ক্রিস্টিনকে দেখল কয়েক মুহূর্ত, তারপর

বললে,—ডি বককে আমি বলছিলাম সিয়েন, তোমাকে আমি বিয়ে করব।

—বিয়ে করবে? আমাকে? সে কি গো?

—হ্যাঁ সিয়েন। বিয়েই যদি না করব, তাহলে এত কাছে ডাকলাম কেন! গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখ-সুখের অভিজ্ঞতা কেন এড়াব বলো? জানো ক্রিস্টিন, আর-একটি মেয়েকে আমি ভালোবেসেছিলাম। যখন আমি তার বাড়ি গেলাম, তার বাড়ির সবাই আমাকে দূর-দূর করে হাঁকিয়ে দিলে, শোনালে,—সে নাকি আমাকে শুধু ঘৃণাই করে। জ্বলন্ত, জীবন্ত আমার প্রেম—তাকে ফিরিয়ে দিল, মেরে ফেলল ওরা সবাই। কিন্তু মৃত্যুর পরেও পুনর্জন্ম আছে। তুমিই আমার সেই পুনর্জন্ম, সিয়েন!

—কিন্তু আমাকে বিয়ে কী করে করবে তুমি বল? আমার এতগুলো ছেলেপিলে। আর, তোমার ভাই যদি রাগ করে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয়?

—তুমি মা হতে চলেছ ক্রিস্টিন! সে কি যে-সে কথা? তোমার কি যে-সে সম্মান! সেই সম্মানের দাম আমি দেব। হার্মান আর তোমার নবজাত শিশুকে আমার সঙ্গে রাখব। তোমার অন্য ছেলেমেয়েরা তোমার মা-র কাছে থাকবে। আর থিয়ো? হ্যাঁ, সে তো আমার মাথাটাই কাটতে পারে। তবে, সব কথা বুঝিয়ে বললে হয়তো সে আমাকে ত্যাগ করবে না।

ক্রিস্টিনের পায়ের কাছে মাটিতে বসল ভিনসেন্ট। প্রথম যেদিন দেখেছিল তার পর থেকে ওর চেহারা অনেক ভালো হয়েছে। করুণ ওর বাদামি চোখদুটিকে সামান্য একটু আনন্দ-স্পর্শ। সারা দেহে মনে নতুন কেমন এক দীপ্তির ইশারা। প্রথম যখন ওকে দেখে, ও ছিল কর্কশ, ভব্যতাহীন—পথের মেয়ে। এখন কতো ও বদলেছে, কতো মধুর, কত নরম হয়ে গিয়েছে। এখনো ওর মুখভর্তি গুটি-গুটি কলঙ্কের দাগ,—তবু কে বলবে মাধুর্যের স্পর্শ ও মুখে লাগেনি?

—সিয়েন! বলো, সংসার তুমি করবে না আমার সঙ্গে? নেবে না আমার দুঃখকে ভাগাভাগি করে? যতদিন না তুমি হাসপাতালে যাও ততোদিন তোমাকে আমি দেখবই। ফিরে এসে তুমি আমাকে কেমন দেখবে জানিনে। হয়তো তখনো রুটি থাকবে, হয়তো থাকবে না। যাই থাকুক, তুমি, তোমার শিশু আর আমি তাই ভাগ করে নেব। রাজি আছ তো?

ক্রিস্টিন চেয়ার থেকে নেমে কাছে এসে বসল, গলা জড়িয়ে ধরল ভিনসেন্টের। বললে,—তোমার কাছে আমাকে শুধু থাকতে দিয়ো, ভিনসেন্ট। তার বেশি কিছু চাইনে। পোড়া রুটি, কলের জল,—তাই খাব। তাতেই আমার সুখ। তোমার আগে কোনো লোক আমাকে দেখেনি, হাত রাখেনি আমার পিঠে। বিয়ে আমাকে কোরো না। দরকার নেই বিয়েতে। যতোক্ষণ পোজ করতে বলবে, যতো শক্ত কাজ করতে বলবে সব আমি করব। শুধু তোমার কাছে আমাকে থাকতে দিয়ো। এইটুকুতেই হবে। এইটুকু আমার জীবনের মস্ত বড় শান্তি। এত সুখ, এত শান্তি কখনো পাইনি,

কখনো পাব না কোথাও।

—তুমি আমাকে ভালোবাসো, না ক্রিস্টিন?

—হ্যাঁ ভিনসেন্ট, ভালোবাসি।

—ভালো লাগে, ভালোবাসা পেতে ভালো লাগে,—দুনিয়ার যে যতোই না খারাপ বলুক একে!

ভিনসেন্টের বুকে মাথা রেখে সহজ ভাষায় ক্রিস্টিন বললে,—ঝাঁটা মারি তোমার দুনিয়ার মুখে!

মাটিতে বসে রইল দুজনে খুব কাছাকাছি। অন্ধকার নেমে এল, আশ্রয়ের মতো অন্ধকার। উনুনটা জ্বলছে। উত্তাপ আর লালচে আভা আদরের মতো যেন।

স্বপ্ন ভাঙল। ডাক-পিয়ন দিয়ে গেল আমস্টার্ডামের একখানা চিঠি:

ভিনসেন্ট,

তোমার জঘন্য জীবনযাত্রার সংবাদ আমার কানে পেঁৗছেছে। বাকি ছ-খানা ছবির অর্ডার আমি বাতিল করলাম। তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল এখন থেকে আর থাকবে না।

কার্নেলিয়াস ভ্যান গক।

থিয়ো। থিয়োই একমাত্র ভরসা। ছবি শেখাতে ছিলেন মভ, তিনি গেছেন। ছবি বিক্রি করতে ছিলেন টারস্টিগ, তিনি মুখ ফিরিয়েছেন। পরিত্যাগ করুক আত্মীয় স্বজন, ঘৃণাভরে অবহেলা করুক বন্ধুর দল। সাধনা আছে, আর আছে পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া প্রণয়িনী, –ঐ ক্রিস্টিন। কিন্তু থিয়ো না থাকলে তো চলবে না।

ভাইকে সে চিঠি লিখল সব কথা জানিয়ে, সব দুঃখ বুঝিয়ে, আকুল ভিক্ষা নিবেদন করে। তৃষ্ণার্ত বুক নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কবে উত্তর আসে।

উত্তর এল বৈকি ভাইয়ের কাছ থেকে। পছন্দ করিনে, কিন্তু বাধা দেব না। তোমাকে বিশ্বাস করি, তাই তোমার পেছনে আছি। ভয় নেই, দেখা করব শীঘ্র।

দু-মাস পরে লীডেন হাসপাতালে ক্রিস্টিন প্রসব হোলো। বাচ্চাটি সুস্থদেহ, কিন্তু ফরসেপস্ দিয়ে তাকে পৃথিবীর আলোয় টেনে আনতে হোলো। প্রসবের অসহ্য যন্ত্রণা ক্রিস্টিন ভুলে গেল ভিনসেন্টকে দেখে। নীরক্ত বিবর্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে,—শিগগিরই ভালো হয়ে যাব তোমার কাছে। আবার তুমি আমাকে আঁকবে, তাই না?

প্রসূতি আর নবজাতকের শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে দু-চোখ বাষ্পাকুল হয়ে এল ভিনসেন্টের। হোক না ঐ শিশু পিতৃপরিচয়-হারা, ও তো তারই সন্তান,—আর ঐ নারী, ও তো তারই স্ত্রী। বুকের ভেতরটা টন-টন করে উঠল বেদনায় আর আনন্দে। চোখে জল, মুখে হাসি।

লীডেন থেকে ফিরে এসেই বাসাটা সে বদলালো। নতুন বাসাটা একই বাড়িওয়ালার, চার ফ্ল্যাংক মাত্র বেশি ভাড়া। তবে, এটার স্টুডিয়োর পাশেই ছোট্ট একটা বসবার ঘর, তা ছাড়া আরো একটা থাকবার ঘর; রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর আলাদা। দেয়ালে নতুন কাগজ লাগানো। অধীর আগ্রহে ঘর সাজাতে লাগল ভিনসেণ্ট। কদিন পরেই ক্রিস্টিন আসবে। আর লুকোচুরি নয়,—সংসার পাতবে দুজনে।

১০

নতুন বাড়িটা চমৎকার। স্টুডিয়োর দেয়ালটায় বাদামি রঙের কাগজ আঁটা, খটখটে কাঠের মেঝে। দেয়ালে কয়েকটা স্টাডি, দু-কোণে দুটো ঈজেল, মাঝখানে কাজ করবার জন্যে বেশ বড়ো একটা টেবিল। দেয়ালের গায়ে আলমারি,—তাতে ড্রয়িং বোর্ড কাগজ বই তুলি রঙ আর সব শিল্পীর দরকারি জিনিসের টুকিটাকি। বসবার ঘরে একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটা স্টোভ। জানলার ধারে ক্রিস্টিনের বসবার জন্যে বড়ো একটা বেতের চেয়ার আর ছোট্ট একটা দোলনা। দেয়ালের একদিকে রেমব্রাঁর আঁকা ছবি: শিশু ও দুই নারী। অন্য দিকে বড় একটা আয়না।

রান্নাঘরের জিনিসপত্র প্রয়োজনের বেশি একটি নয়, যাতে করে ক্রিস্টিন রান্নার কাজটা দশ মিনিটে সেরে ফেলতে পারে। শোবার ঘরে দুটি বিছানা, একটি নিজেদের জন্যে আর একটি হার্মানের।

হাসপাতাল থেকে আসার দিন ডাক্তার, প্রধান নার্স, পরিচারিকারা সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে ক্রিস্টিনকে বিদায় দিল। এমনি ভদ্র ব্যবহার,—মানুষ মানুষের সঙ্গে যেমনি সহানুভূতি আর সহযোগিতায় স্বাভাবিক ব্যবহার করে,—তা ক্রিস্টিন আগে কখনো পায়নি। অভিভূত হয়ে পড়ল সে। ভিনসেণ্ট মনে মনে বললে,—দ্যাখো, এতদিন পর্যন্ত কেউ ওকে ভালো চোখে দেখেনি। ও নিজে যে ভালো হবে, তার সুযোগ পেয়েছিল কোথায়?

ভিনসেণ্ট আগে কিছু ভাঙেনি,—নতুন বাড়ি দেখে হাঁ হয়ে গেল ক্রিস্টিন। চেয়ার, দোলনা, ছবি, আয়না, ফুলের টব,—একবার এটা ধরে দেখে, একবার ওটার গায়ে হাত বুলোয়। নাচবে কি ছুটবে ভেবে পায় না। ভিনসেণ্টের তাকে সংযত করা দায়।

ক্রিস্টিনের স্বাস্থ্য আস্তে আস্তে ফেরে। ভিনসেণ্ট তাকে কোনো কাজ করতে দেয় না। ঘর গোছানো, কাপড় কাচা, বিছানা পাতা, উনুন ধরানো, ভারি জিনিস তোলা পাড়া—এ সব কাজ ভিনসেণ্ট নিজের হাতে করে। মনে হয় কতোদিনকার তার এই সংসার, ক্রিস্টিন আর বাচ্চারা তার কতোদিনকার আপনার!

শিল্পকর্মে নতুন উৎসাহ, বুকজোড়া নতুন শান্তি। নিজের ঘর, নিজের

সংসার, স্ত্রীর স্পর্শ, ছেলেমেয়ের হাসিকান্না,—এ না থাকলে জীবন? মানুষের নয়, জন্তুর জীবন। এরাই তাকে সাহস দিয়েছে, বল এনেছে প্রাণে। আর থিয়োর মতো ভাই যখন পেছনে আছে, তখন ভয়টা কিসের? সত্যিকারের শিল্পী হবার পথে বাধা কোথায়? থিয়ো লিখেছে চাকরিতে তার উন্নতি হয়েছে, একশোর বদলে দেড়শো করে ফ্র্যাঙ্ক এবার থেকে সে মাসে মাসে পাঠাবে।

বরিনেজে সে প্রাণ দিতে বসেছিল ঈশ্বরের জন্যে। সে ঈশ্বর রূপহীন, রসহীন সে ধর্ম। এবার থেকে নতুন ঈশ্বর, নতুন ধর্মের সন্ধান সে পাচ্ছে, যে ধর্ম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়, রূপের মধ্যে যার প্রকাশ। পথের একটি শ্রমিক চাষী, মাঠের রেখাঙ্কিত বুকে উঁচু নিচু সোনালি বালিয়াড়ির ছন্দ আর আকাশের উদার নীলিমা,—ওরা এত সহজ কিন্তু এত শক্ত! রূপে রেখায় ওরা ধরা দেয়, কিন্তু অধরা ওদের মর্মবাণী। এই মর্মচেতনাকে রঙ আর রেখার কাব্যে ছন্দায়িত করা,—মানুষ আর প্রকৃতির প্রাণস্পন্দনকে একই হাতের মুঠোয় চেপে ধরা—এ কি সোজা? এ কি যে-সে সাধনা?

কিন্তু বাধা আসে, আঘাত আসে। একদিন স্টুডিয়োর সামনে টারস্টিগের সঙ্গে দেখা। বন্ধুর মতো সহজভাবে তিনি কথা বলতে লাগলেন। আশংকায় ভিনসেন্টের মুখ শুকিয়ে উঠল, কিন্তু বাড়িতে না ডেকে উপায় নেই।

বসবার ঘরে ক্রিস্টিন শিশুটিকে বুকে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে। হার্মান খেলা করছে মেঝেতে স্টোভের কাছে। টারস্টিগ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। নির্বাক বিস্ময় বুঝি আর ভাঙেই না!

অনেকক্ষণ পরে বললেন,—ইংরেজি ভাষায়,—এই স্ত্রীলোক আর শিশু,—এরা কারা? এ সবের মানে কী?

—ও ক্রিস্টিন, আমার স্ত্রী। বাচ্চাটি আমাদের।

—মানে, তাহলে তুমি বিয়ে করেছ?

—বিয়ে বলতে যে অনুষ্ঠানটির কথা আপনি চিন্তা করছেন, সেটি অবশ্য এখনো করে উঠতে পারিনি।

—কিন্তু তাহলে তুমি এভাবে একজন অনাত্মীয়া মেয়েছেলে আর তার ছেলেপিলেদের নিয়ে বসবাস করো কী করে?

—সাধারণত পুরুষ মানুষে বিয়েই করে, আর শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিকই হয়ে যায়, তাই না মিনহার?

—কিন্তু বিয়ে তুমি করবে কী করে? তোমার পয়সা কোথায়? তোমার ভাই তো তোমাকে রেখেছে।

—আপনার ভুল ধারণা। থিয়োর হয়ে আমি কাজ করি। তার জন্যে মাইনে আমি পাই তার কাছ থেকে। আর যা কিছু কাজ আমি করি সব তার। এ থেকে তার সব টাকা একদিন উশুল হয়ে আসবে।

—পাগল তুমি, বদ্ধ পাগল। মাথা খারাপ না হলে এমনি কথা কেউ বলে না।

—মানুষের ব্যবহার, মিনহার—গম্ভীর চালে ভিনসেণ্ট বললে,—অনেকটা ঠিক ড্রয়িং-এরই মতো। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে তার নতুন নতুন রূপ খোলে। জিনিসটা একই, তবে কিনা তফাত হচ্ছে একজনের দেখায় আর অন্য একজনের দেখায়।

অসহ্য হয়ে গায়ে বিঁধছে ভিনসেণ্টের ব্যবহার, তার এই ধরনের কথা। টারস্টিগ আর সামলাতে পারলেন না, বলে উঠলেন,—তোমার বাবাকে আমি লিখব ভিনসেণ্ট, সব কথা আমি তাঁকে লিখে জানাবো!

—তা যা ভালো বোঝেন তা তো আপনি করবেনই। তবে কিনা,—ধরুন আপনি খুব গরম-গরম ভাষায় আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা তাঁদের লিখলেন, আর তার পরেই আমি আবার তাঁদের আমাদের বাড়িতে আসতে নেমন্তন্ন করে চিঠি লিখলাম। দুটো ঘটনা একসঙ্গে জুড়িয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কী বলেন?

—তুমি নিজে তাঁদের আসতে লিখবে?

—বাঃ, সে আবার বলতে? তবে কিনা, বাবা এখন ইটেন থেকে নিউনেনে বদলি হওয়ার ব্যাপারে খুব ব্যস্ত, আর এদিকে আমার স্ত্রীরও শরীর খুব খারাপ, তাই যা কদিনের অপেক্ষা।

—তাহলে আমি আর কিছু লিখব না। আমার মনে হয় তুমি নিজের হাতে গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবতে যাচ্ছ। তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমি মনে করেছিলাম আমার কর্তব্য।

—আপনার উদ্দেশ্য যে সাধু তাতে আমার সন্দেহ নেই, মিনহার টারস্টিগ। সেইজন্যে আপনার কথাবার্তায় আমি চটছি নে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ আমার আর প্রীতিকর বলে মনে হচ্ছে না।

কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা মন নিয়ে টারস্টিগ বিদায় নিলেন।

অসার দম্ভের চাতুরী দিয়ে প্রথম আঘাতটাকে ঠেকানো গেল। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতকে নয়। সে আঘাত অপ্রত্যাশিতভাবে এল উইসেনব্রাকের কাছ থেকে। খেয়ালমতো ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি ভিনসেণ্টের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। হাঁক ছেড়ে বললেন,—কী হে, এখনো বেঁচে আছ? বাঃ বাঃ, দিব্যি তোফাই আছ দেখছি, অ্যাঁ? তাহলে সেদিন টাকাটা আমার কাছ থেকে আদায় করতে না পারলেও মরোনি দেখছি!

—না, দেখতেই তো পারছেন, মরিনি।

—ভালোই করেছিলাম তাহলে না দিয়ে?

—বেশ করেছিলেন। এবার একটা কথা বলব? দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে ভিনসেণ্ট বললে,—উচ্ছন্নে যান,—বার হয়ে যান এখান থেকে!

—বাঃ বাঃ, চমৎকার! এই তো চাই! এমনি মেজাজটা যদি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারো, তাহলে কালে আর-একটা উইসেনব্রাক তুমি হবে। এবার আমার একটা কথা শোনো। তোমার বাড়িতে এলাম, আর তোমার ঐ ফার্স্টক্লাস রক্ষিতাটির সঙ্গে আমার একটু আলাপও করিয়ে দিলে না! এ কেমন ভদ্রতা হে?

—আমাকে যা বলবার তা বলুন উইসেনব্রাক, কিন্তু ওর সম্বন্ধে একটি কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন না। ভালো হবে না তাহলে!

মাথা নিচু করে শিশুকে দোল দিচ্ছিল ক্রিস্টিন। বুঝল, তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে আগন্তুক। মুখ তুলে ব্যথিত চোখ মেলে তাকালো। ভিনসেণ্ট দু-পা পিছিয়ে দাঁড়ালো ঐ নারী আর শিশুর সামনে,—সারা দুনিয়ার অপমানের মার থেকে সে ওদের রক্ষা করতে চায়।

উইসেনব্রাক চেয়ে রইলেন তাদের দিকে, তারপর চোখ গেল দোলনার ঠিক ওপরে দেয়ালে রেমব্রাঁর ছবিটার ওপর।

—দি আইডিয়া! চিৎকার করে উঠলেন তিনি,—কী চমৎকার দৃশ্য, ছবির কী অপূর্ব উপকরণ—আহা, পবিত্র পরিবার!

সগর্জনে একটা গালাগাল উচ্চারণ করে তেড়ে গেল ভিনসেণ্ট। উইসেনব্রাক চট্ করে নেমে গেলেন রাস্তায় হাতের মুঠো এড়িয়ে।

ফিরে এল ভিনসেণ্ট মা আর সন্তানের কাছে। চোখ তুলতেই সামনের আরশিতে দেখল নিজেদের। এক লহমার নিষ্করুণ ভয়ঙ্কর স্পষ্টতায় উইসেনব্রাকের চোখ দিয়ে নিজেদের সে দেখল। এক শিশু, এক নারী আর এক পুরুষ,—জারজ, বেশ্যা আর পরান্নভোজী ভিক্ষুক।

কানে এল ক্রিস্টিনের গলা,—ও লোকটা কী আমাদের বলে গেল?

—পবিত্র পরিবার।

—তার মানে?

—ছবি একটা,—মেরি, যিশু আর জোসেফের ছবি।

হু-হু করে জল ছুটে নামল ক্রিস্টিনের দুচোখ বেয়ে। শিশুর কাপড়-চোপড়ের মধ্যে সে মুখ লুকোলো। ভিনসেণ্ট দোলনার ধারে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসল। উত্তরের জানলা দিয়ে প্রদোষান্ধকার যেন পাখা মেলে ঘরে এসে ঢুকছে। কোণে কোণে ছায়া কালো কালো। মাথা তুলে আর-একবার ভিনসেণ্ট তাকালো আরশিটার দিকে। আবার সে তাকিয়ে দেখল দর্পণের ঐ তিনটি মূর্তিকে। এবার সে দেখল নিজের গভীর মর্মচক্ষু মেলে।

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল ক্রিস্টিনের মাথায়। জটা-জটা রুক্ষ চুলে জড়িয়ে গেল আঙুলগুলো।

—কেঁদো না, আর কেঁদো না সিয়েন। মুখ তোলো, চোখের জল মোছো, মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। উইসেনব্রাক মিথ্যে তো বলেনি!

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েস, কিন্তু এরই মধ্যে শিল্প-ব্যবসায়ী হিসেবে বেশ নাম করেছে থিয়ো। গ্যুপিলসের তরুণ কর্মচারীদের মধ্যে তার জুড়ি খুব কম। প্যারিস থেকে প্রায়ই এখানে ওখানে তাকে যেতে হয়। কিন্তু গ্যুপিল কোম্পানি তাদের প্যারিসের ব্যবসাটা ভ্যালাডনকে বিক্রি করে দিয়েছে। নতুন মালিকের ব্যবসার নাম লে মেসিয়ুর্স। থিয়ো তার পুরোনো চাকরিতেই বহাল আছে, কিন্তু কাকাদের যুগে ব্যবসার যে নীতি ছিল, তার বদল হয়েছে অনেক। ছবির এখন কদর নেই, আছে ছবির দামের কদর। যেসব শিল্পী নামজাদা শুধু তাদেরই এখন খাতির। নতুন শিল্পীকে আবিষ্কার করা, তাকে উৎসাহ দেওয়া—এ নীতি বরবাদ। মানে, মনে, পিসারো, সিসলি, রেনোয়াঁ, ডেগাস, সিজান প্রভৃতি নতুন শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিক। তাদের তুলিতে নতুন বাণী, নতুন বলিষ্ঠতা। কিন্তু লে মেসিয়ুর্স'র সিংহদ্বার তাদের জন্যে খোলা নয়। থিয়ো দিনের পর দিন অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছে কর্তাদের। তাঁরা বধির। তাঁদের ধারণা, এসব শিল্পী অশিক্ষিত, উন্মাদ; আর থিয়োর মতে এরাই আসন্ন যুগের পথপ্রদর্শক। কিন্তু থিয়ো তো কর্মচারী মাত্র, তার স্বাধীনতা কোথায়?

হেগ শহরে থিয়ো এল, সোজা গেল ভিনসেণ্টর বাড়ি। ক্রিশ্চিন ওপর তলায় শোবার ঘরে, নিচে স্টুডিয়োতে বসল দুই ভাই। প্রাথমিক সম্ভাষণের পালা শেষ হবার পর থিয়ো সোজাসুজি বললে,—একটা কাজের সুযোগ নিয়ে এখানে আমি এসেছি। জরুরি দরকার কিন্তু আমার তোমার সঙ্গেই। এই যে মেয়েটির কথা লিখেছ তার সঙ্গে কোনো রকম পাকাপাকি সম্পর্ক করা এখন তোমার চলবে না। তার আগে মেয়েটি কেমন জানতে চাই।

ভিনসেণ্টও তেমনি সোজাসুজি উত্তর দিল,—জুণ্ডেয়ার্টের আমাদের বুড়ি নার্স লীন ভারমানকে মনে আছে?

—আছে।

—আমার ক্রিশ্চিনও ঠিক সেইরকম, থিয়ো। নিতান্ত সাধারণ নারী, কিন্তু সেই সাধারণই আমার চোখে মহীয়সী। এমনি সাধারণ মেয়েকে যে ভালো-বেসে ভালোবাসার প্রতিদান পায়,—জীবনের শত দুঃখের কালোতেও তার মনের খুশির আলো নেভে না। এ ভালোবাসার জন্যে আমি খুঁজে মরি নি, এ নিজেই আমার কাছে ধরা দিয়েছে। ক্রিশ্চিন এমনি মেয়ে যে আমার সমস্ত দৈন্য বেদনাকে আমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। তা ছাড়া ও-ই আমার মডেল। কে-র ভালোবাসা পাইনি বলে এখন আর কষ্ট নেই। মনে হয় কে-কে বিয়ে করিনি ভালোই হয়েছে। ক্রিশ্চিন থাকলে শিল্পী হবার পথে বাধা আসবে না, সুবিধে হবে অনেক।

ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারি করার পর একটা জলরঙের ছবি অনেকক্ষণ ধরে থিয়ো দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ বললে,—একটা কথা

আমি বুঝিনে। যে লোক ক-দিন আগে কে-র জন্যে পাগল ছিল, সে আজ এমনি একটা মেয়েকে কী করে ভালোবাসতে পারে।

—এ ভালোবাসায় আমি ঝাঁপিয়ে পড়িনি থিয়ো, এ এসেছে আস্তে আস্তে, নিঃশব্দ পায়ে। কে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই বলে কি প্রাণের সব আলো নিবিয়ে অন্ধকারে আমি বসে থাকব? এই যে স্টুডিয়োতে তুমি পা দিয়েছ প্রথম থিয়ো,—এটা মৃতের কবর নয়, জীবন্তের সংসার। আমি আঁকি: কী আঁকব, কেমন করে আঁকব—যদি জীবনের স্পন্দনকে এড়িয়ে থাকতে চাই চির জীবন? বলতে পারো, খুব নিচু ঘরের মেয়েকে সঙ্গিনী করেছি। কিন্তু তাতে আমি নিজে যে নিচু হয়ে গেছি, ছোট হয়ে গেছি, তা আমি বিশ্বাসই করিনে। সাধারণ মানুষ,—মাটির সঙ্গে নিকট সম্পর্ক যাদের—তারাই আমার শিল্পের উপজীব্য, সত্যিকারের ছবি আছে তাদেরই জীবনে। কেননা তাদের আনন্দ বেদনায় ছলনা নেই। যে নিচুতলার লোক নিয়ে আমার শিল্পের কারবার, সেই নিচুতলার মেয়েকেই তো আমার জীবনের কারবারে চাই!

—এ নিয়ে আমার কোনো তর্ক নেই, ভিনসেণ্টের কথা থামিয়ে বলে উঠল থিয়ো,—কিন্তু তাই বলে একেবারে বিয়ে করতে হবে কেন?

—তার কারণ, ওর আর আমার মধ্যে বিয়ের একটা অঙ্গীকার রয়েছে। ও আমার রক্ষিতা নয়, ও আমার দু-দিনের ভোগে লাগার মেয়েমানুষও নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি, তার চেয়ে অনেক কাছাকাছি।

—কিন্তু আমি তোমাকে চট্ করে বিয়ে করতে বারণই করব।

—নিশ্চয়ই থিয়ো, তোমার কথা মানবো বৈকি। যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়াই, ততোদিন বিয়ে করব কী করে? যেদিন শ-দেড়েক ফ্র্যাংক নিজের ছবি বেচে উপায় করতে পারব, আস্তে আস্তে আমার পেছনে তোমার খরচ করাটা বন্ধ হবে, তখন উঠবে বিয়ের কথা। তার আগে নয়।

—এই হচ্ছে খাঁটি বুদ্ধিমানের কথা।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ভিনসেণ্ট বললে,—ঐ ক্রিস্টিন আসছে! লক্ষ্মীটি থিয়ো, সমালোচকের কঠোর চোখ মেলে ওকে দেখো না। ও স্ত্রী, ও মা,—দেখো সত্যি ও তাই কি না।

স্টুডিয়োর দরজায় এল ক্রিস্টিন। পরনে কালো রঙের পরিচ্ছন্ন একটি পোশাক, চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, গালে সামান্য একটু রঙের আভাস, তাতে ব্রণ-চিহ্নগুলো অনেকটা ঢাকা পড়েছে। কেমন সহজ সাদামাটা ঘরোয়া সৌন্দর্য তাকে ঘিরে। ভিনসেণ্টের ভালোবাসায় তার চেহারায় এসেছে নতুন কমনীয়তা, মনে আত্মবিশ্বাসের নব উন্মেষ। এগিয়ে এসে সে সহজ-ভাবে থিয়োর করমর্দন করল, শান্ত গলায় প্রশ্ন করল চা খাবে কি না, জানালো রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ। তারপর জানলার ধারে বেতের চেয়ারে সে সেলাই নিয়ে

বসল, মাঝে-মাঝে দোলা দিতে লাগল শিশুর দোলনায়। ভিনসেন্ট দেরাজ থেকে টেনে বার করে থিয়োকে দেখাতে লাগল তার আঁকা ছবির পর ছবি, স্কেচের পর স্কেচ। থিয়োর দৃঢ় বিশ্বাস যে একদিন ভিনসেন্টের শিল্পসাধনা সার্থক হবেই। ছবির সমালোচক হিসেবে দৃষ্টিও তার খুব কাঁচা নয়। কিন্তু ভিনসেন্টের সমস্ত কাজ দেখেও সে কোনো একটা সুনির্দিষ্ট ধারণায় পেঁছিতে পারল না। এদিকে ভিনসেন্টের বাসনা,—জলরঙ তো অনেক হোলো, এবার তেলরঙ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে।

সব ছবি দেখার পর থিয়ো বললে,—তেলরঙের কাজই যদি করতে চাও তো দেরি করছ কেন? শুরু করে দাও।

—বুঝতেই যে পারছি নে ড্রয়িং আমার কেমন হচ্ছে। টারস্টিগ আর মভ বলছেন আমি কিছুই জানিনে।

—আর উইসেনব্রাক বলছেন তুমি খুব জানো—এই নিয়ে ধাঁধায় পড়েছ তো? নিজের কাজের বিচার তোমায় নিজেকেই করতে হবে। আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তাহলে ঝুলে পড়ো।

—কিন্তু থিয়ো, খরচটার কথা ভেবেছ? এক-একটা তেলরঙের টিউবের তো সোনার দাম!

থিয়ো বললে,—কাল সকাল দশটায় আমার হোটেলে এসো। তারপর দেখা যাবে। আসল কথা, যতো শিগগির তেলরঙের ক্যানভাস আমাকে পাঠাবে, ততো শিগগিরই তোমার পেছনে অপব্যয়ের টাকা আমি উশুল করতে পারব। সেটা খেয়াল আছে?

রাত্রে খাবার সময় প্রাণ খুলে আলাপ করল থিয়ো আর ক্রিস্টিন। যাবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভিনসেন্টের দিকে ফিরে থিয়ো বললে,—বেশ ভালো, বেশ চমৎকার মেয়ে! আমার ধারণাই ছিল না।

পরদিন সকাল বেলা ভাগেনস্ট্রাটের রাস্তায় দুই ভাইয়ের চেহারার বিচিত্র বৈসাদৃশ্য। ছোট ভাইয়ের কড়া-ইস্ত্রি-করা পোশাক, চকচকে পালিস-করা কালো জুতো, মাথায় স্টাইল করে বসানো কালো সিল্কের টুপি। নধর গালের ওপর চমৎকার করে ছাঁটা দাড়ি, প্রতিটি পদক্ষেপে গম্ভীর আত্মচেতনার ভঙ্গিমা। মূর্তিমান আভিজাত্য। আর বড় ভাইয়ের পায়ে ছেঁড়া বুট, তালি-মারা ট্রাউজার্স আর রঙচটা কোট, মাথায় একটা চাষীর টুপি। মুখ-ভর্তি জটা-জটা লালচে দাড়ির রাশ, আর কদম কদম পা ফেলে চলায় উত্তেজিত আতিশয্য।

থিয়ো ভিনসেন্টকে নিয়ে গুপিলের দোকানে গেল তেলরঙ তুলি বুরুশ আর ক্যানভাস কেনবার জন্যে। টারস্টিগ খাতির করতেন থিয়োকে, বুঝতে চাইতেন ভিনসেন্টকে। তিনি নিজের হাতে ভিনসেন্টের জন্যে জিনিসপত্র দেখে শুনে পছন্দ করে দিলেন।

সমুদ্রতীর ধরে বেড়াতে বেড়াতে থিয়ো আর ভিনসেণ্ট পেঁছুলো শেভে-নিনজেনে। মনুমেণ্টের পাশেই ছোট একটা কাঠের গুমটি, সেখানে একটা লোক বসে আছে। মাছের একটা নৌকো তীরে এসে লাগছে। নৌকোটা কাছাকাছি আসতেই গুমটির লোকটা একটা পতাকা হাতে এসে দাঁড়ালো। হাত উঁচু করে কয়েকবার পতাকাটা নাড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ আর বাচ্চার পাল ভিড় করে এল বালির ওপর। এদের মধ্যে একজন লোক আবার ঘোড়ার পিঠে। নৌকো এসে তীরে লেগেছে। নোঙর বাঁধা হচ্ছে, শিশুরা নাচছে, রুমাল উড়িয়ে চিৎকার করছে মেয়েরা, পুরুষরা মাঝিদের কাঁধে করে তীরে নামাচ্ছে, রশি বেঁধে নৌকোকে তুলছে বালির ওপর, উজাড় করছে মালপত্র।

দুদিক থেকে দীর্ঘ দুই বালিয়াড়ি উত্তর সমুদ্রের মধ্যে যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দুই প্রশস্ত বাহুর মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছে শেভেনিনজেন। মাঝিদের গ্রাম। সোনালী বালুকাতীর। বালির ওপর উল্টোনো নৌকোর পর নৌকো, খুঁটিতে লটকানো জালের পর জাল। নীল রঙের ঘোড়ার গাড়ির বাক্স, লাল তাদের চাকা,—তীর থেকে গ্রামের মধ্যে মাছ চালান করবার জন্যে। তীরের কাছাকাছি সমুদ্রের রঙ ধূসর, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাদা ফেনা—তার ওপারে গাঢ় সবুজ রঙ কখন গিয়ে দিগন্তব্যাপী নীলিমায় আশ্রয় নিয়েছে। সূর্য যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন স্লেট রঙের আকাশে নীলের স্পর্শ লাগে,—তার গায়ে উড়ন্ত সাদা মেঘের বিচিত্র লীলা।

নৌকো থেকে সবাই যখন তীরে নামল, তখন যেন শোভাযাত্রা শুরু হোলো গ্রামের দিকে। দল বেঁধে মার্চ করতে করতে সবাই বালিয়াড়ির একটা উঁচু খাড়াই পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপারে। সকলের সামনে সেই ঘোড়ায়-চড়া লোকটা, উঁচিয়ে-ধরা পতাকাটা নিয়ে।

ভিনসেণ্ট বললে,—রঙ দিয়ে এমনি ছবিকে যদি ক্যানভাসে ধরতে পারতাম!

থিয়ো বললে,—নিজের কাজে নিজের বিশ্বাস যখনই আসবে, তার পর আর এক মুহূর্তও দেরি কোরো না। বড়ো ক্যানভাস ধরো, তেলরঙ লাগাও। আর ছবি পাঠিয়ে যাও প্যারিসে আমার কাছে। বিক্রি করার ভার আমার।

ভিনসেণ্ট বললে,—পাঠাবো থিয়ো, নিশ্চয়ই,—কিন্তু সত্যি, বিক্রি কিন্তু তোমাকে করতেই হবে আমার কাজ।

১১

থিয়ো চলে যাবার পর ভিনসেণ্ট তেলরঙ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করল। তেলরঙে তিনটি ছবি সে আঁকল। প্রথমটি গীর্স্ট ব্রীজের পেছনে উইলো

গাছের সারি, দ্বিতীয়টি একটি মেঠো পথ, তৃতীয়টিতে নীল-পোশাক-পরা একটা লোকের ক্ষেতে আলু কুড়োবার দৃশ্য। নিজের কাজ দেখে নিজেরই বুক ফুলে উঠল। নির্ভুল ড্রয়িং, চমৎকার রঙ চড়ানো—কাঁচা হাতের প্রথম কাজ বলে কেউ ধরতেই পারবে না। আশ্চর্য লাগল নিজেরই, এতটা সাফল্য সে নিজেই কখনো কল্পনা করতে পারেনি আগে!

একদিন সন্ধেবেলা উইসেনব্রাক এলেন,—অনেক কাজ করেছ, চলো আমার সঙ্গে। একটু নাচগান দেখে আসি, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে তোমার।

আড়ষ্ট গলায় ভিনসেণ্ট বললে—ধন্যবাদ। তবে মাফ করবেন, সন্ধেবেলা স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে নেই।

অগের দিন উইসেনব্রাক এদের কী কথা বলে গেছেন তা তাঁর স্মরণেই নেই। তিনি এসে ক্রিস্টিনের হস্তচুম্বন করলেন, তার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, খুশি মনে বাচ্চাটিকে আদর করলেন কয়েকবার।

তারপর বললেন,—কই, তোমার নতুন স্কেচ কয়েকটা দেখাও।

ভিনসেণ্টের মনটাও খুশি হোলো। আগ্রহভরে সে স্কেচের তাড়া বার করল। চারটি স্কেচ পছন্দ করলেন উইসেনব্রাক। বাজারের ছবি একটি, আর একটিতে সুপ কিচেনের সামনে জনতার ভিড়। আর তৃতীয়টি পাগলা গারদের তিনটি লোকের স্টাডি। চতুর্থটি শেভেনিনজেনের সমুদ্র-বেলায় মাছ ধরবার নৌকোর দৃশ্য।

—এগুলো কি বিক্রির জন্যে নাকি? তাহলে এ-কটা আমি কিনতাম।

ভিনসেণ্ট বললে,—এও কি আপনার আর-একটা পুরোনো ঠাট্টা নাকি?

—ছবি নিয়ে আমি কখনো ঠাট্টা করিনে। অপূর্ব হয়েছে স্টাডিগুলো! বলো, কত দাম?

ভিনসেণ্ট ভাবল, আসল ঠাট্টাটা বোধহয় এইবার এলো বলে। ভয়ে-ভয়ে সে বললে,—আপনিই বলুন কতো দেবেন?

—ধরো এক-একটা পাঁচ ফ্র্যাংক করে? সবশুদ্ধ কুড়ি?

দুচোখ বড়ো হয়ে গেল ভিনসেণ্টের,—পাঁচ ফ্র্যাংক করে? এ যে অনেক দাম। আমার কাকা কর্নেলিয়াসের কাছ থেকেই পেয়েছি আড়াই ফ্র্যাংক করে এমনি এক-একটার জন্যে।

—ঠকিয়েছে তোমাকে। সব ব্যবসাদারই ঠকায়। এ এমন নতুন নয়। সেই ছবিই হয়তো একদিন পাঁচ হাজার ফ্র্যাংকে বিক্রি হবে। যাই হোক, রাজি তো?

—উইসেনব্রাক, আপনাকে চেনা দায়! কখনো আপনি নরপিশাচ, কখনো দেবদূত!

—ঐ তো মজা! একই রকম হলে যে বন্ধুবান্ধবের কাছে পুরোনো হয়ে যেতাম।

মনিব্যাগ থেকে কুড়ি ফ্র্যাংক বার করে ভিনসেণ্টের হাতে দিয়ে ছবি-কটা বগলদাবা করলেন উইসেনব্রাক, তারপর বললেন,—নাও, এসো এবার; লক্ষ্মী-ছেলের মতো পথে বার হও তো আমার সঙ্গে!

ক্রিস্টিনের সম্বন্ধে যতোটা সম্ভব সব কথা জানিয়ে ভিনসেণ্ট চিঠি লিখল বাবাকে, সঙ্গে উইসেনব্রাকের দেওয়া কুড়ি ফ্র্যাংক পাঠিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করল হেগ-এ আসতে। এক সপ্তাহ পরে থিয়োডোরাস এলেন।

তাঁর মাথার চুল পেকেছে, চোখের নীল রঙে ধূসরতার ছাপ, চলাফেরায় সে দৃঢ়তা নেই। শেষবার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেই ভিনসেণ্ট বাড়ি ছেড়েছিল, তবে, এক বছরে চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে দু-জনের মধ্যকার তিক্ততা ঘুচেছে, কর্নেলিয়াও মাঝে মাঝে ছেলের জন্যে দু-একটা জামাকাপড় টুকিটাকি জিনিসপত্র ঘরে তৈরি খাবার প্রভৃতি পাঠিয়েছেন। ক্রিস্টিনকে বাবা কী চোখে দেখবেন এ ভয় ভিনসেণ্টের ছিল। আশা ছিল শুধু ক্রিস্টিনের ঐ শিশুটির জন্যে। শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাবা নিশ্চয় ক্রিস্টিনের অতীত জীবনকে ক্ষমা করে নিতে পারবেন।

থিয়োডোরাসের হাতে মস্ত একটা বাণ্ডিল। বাবার হাত থেকে বাণ্ডিলটা নিয়ে ভিনসেণ্ট খুলে দেখল তার মধ্যে একটি মেয়েদের গরম কোট,—ক্রিস্টিনের জন্যে। দেখে আশংকা তার কমল।

ক্রিস্টিন ওপরে যাবার পর স্টুডিয়োতে বসে থিয়োডোরাস ভিনসেণ্টকে বললেন,—একটা কথা তুমি আমাকে চিঠিতে জানাও নি। ছেলেটি কি তোমার?

ভিনসেণ্ট বললে,—না, ক্রিস্টিনের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়, তখনই ও গর্ভবতী ছিল।

—যার সন্তান সে কোথায় তবে?

ক্রিস্টিনের সন্তান ধারণের কারণটা সে স্পষ্ট করে বাবার কাছে বলতে চাইল না। শুধু উত্তর দিল,—সে ওকে পরিত্যাগ করে গেছে।

—কিন্তু তুমি ওকে বিয়ে করবে, তাই তো? এভাবে বসবাস করাটা উচিত নয়।

—নিশ্চয়ই বাবা। যতো শীঘ্র পারি বিয়েটা করে ফেলব। এ নিয়ে থিয়োর সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। ছবি বেচে মাসে দেড়শো ফ্র্যাঙ্কের মতো উপার্জন যেই হবে, তখুনি বিয়ে করে ফেলব।

—হ্যাঁ, তাই ভালো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন থিয়োডোরাস,—তোমার মা আর আমি দুজনেই খুব খুশি হতাম ভিনসেণ্ট, যদি কদিনের জন্যে তুমি আমাদের ওখানে আসতে। নিউনেন তোমার খুব ভালো লাগবে। সারা ব্র্যাবাণ্টে এমনি সুন্দর গ্রাম দুটি নেই। ছোট একটি গির্জে, ঠিক যেন এস্কিমোদের ইগ্লুর

মতো দেখতে—শ-খানেক লোকের মতো। আমার বাড়িটাও চমৎকার, চারিদিকে হথর্নের বেড়া ঘেরা। গির্জের ঠিক পেছনে ফুলে ফুলে ছাওয়া গোরস্থান, পুরোনো সমাধির মাথায় মাথায় কাঠের কতো ক্রস।

—ক্রস? সাদা রঙের?

—হ্যাঁ, আর তার লেখাগুলো কালো,—তাও বৃষ্টিতে ধুয়ে সাদা হয়ে আসছে।

—কিন্তু বাবা, গির্জেটার বেশ উঁচু চুড়ো আছে তো?

—নিশ্চয়ই! প্রাচীন গির্জের প্রাচীন চুড়ো, তবে একেবারে আকাশে গিয়ে ছুঁয়েছে।

জ্বল-জ্বল করছে ভিনসেন্টের চোখ। বললে,—গির্জের ঐ চুড়োটার ছায়া তাহলে নিশ্চয়ই লম্বা হয়ে পড়ে সমাধিক্ষেত্রের ওপর? তাই না? বাঃ, ঠিক অমনি একটি দৃশ্য আমার আঁকতে বড়ো ইচ্ছে!

—বেশ তো। তা ছাড়া গ্রামের ধারেই পাইন বন আর শস্যের ক্ষেত। চলো না তুমি শীঘ্র একবার।

—ঠিক বাবা, আমি যাবই। সমাধিক্ষেত্রের ছোট ছোট ক্রস, গির্জের চুড়ো, মাঠের চাষী—সত্যি, যেখানেই থাকি না কেন, ব্র্যাবান্ট আমাকে সব সময় টানে।

থিয়োডোরাস ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে প্রবোধ দিলেন, ছেলের ব্যাপারে যতোটা কেলেংকারি তিনি ভেবেছিলেন তার কিছুই আসলে নয়। ভিনসেন্টও নতুন উদ্দীপনায় ছবির কাজে লেগে গেল। থিয়ো তাকে বিশ্বাস করেছে, বাবা মা চটেন নি, আর এখানে হেগ-এ আর কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসছে না। নিশ্চিন্তমনে ডুবে গেল সে কাজে।

বাড়ির নিচে একটা কাঠ-গুদাম। সেখানে অনেক শ্রমিক কাজের খোঁজে আসে। যারা কাজ পায় না, গুদামের মালিক তাদের ভিনসেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেন। তারা হয় ভিনসেন্টের মডেল। পকেট থেকে পয়সা যায়, কিন্তু স্কেচের পোর্টফোলিয়ো ভরে ওঠে। দোলনার বাচ্চাটিকেও আঁকে বারে বারে। বাইরে বাইরে ঘুরে দৃশ্য আঁকারও বিরাম নেই। তেলরঙ অভ্যাস হয়ে আসছে,—আপন প্রেরণায় রঙের ওপর রঙ চড়ানোর অন্তর-রহস্য সে আবিষ্কার করছে দিনে দিনে।

দুঃখ তাকে টানে। মানুষই আঁকুক আর প্রকৃতিই আঁকুক, তার মধ্যকার অন্তর্গূঢ় দুঃখটিকে সে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে,—যে দুঃখবোধ ভাবালুতায় ভরা সামান্য দুঃখবোধের অনেক ঊর্ধ্বে। মনে মনে বলে,—আমি যা আঁকব, তা যেন দর্শকের মর্মমূলে গিয়ে পৌঁছয়—অনুভূতির কেন্দ্রে গিয়ে যেন নাড়া দেয়। তেমনি করেই যদি না নাড়া দিতে পারি, তাহলে আর আঁকলাম কী?

ভিনসেণ্ট বোঝে যে দুনিয়ার সকলের চোখে সে একটা পাগল, একটা বাউণ্ডুলে। জীবন তার কিছু না, কিছু না। দুনিয়ায় তারই মতো এমনি যারা সমাজ-ছাড়া একঘরে, এমনি যারা কিছু না,—তাদের মর্মবাণী সে তার শিল্পের মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত করবে, এই তার সাধনা। তাই সে তার শিল্পের উপজীব্য খুঁজে পায় শ্রমিকের নোংরা বস্তিতে, জেলে-বৌয়ের ভাঙা কুটিরের উঠোনে,—পাকা সড়ক ছেড়ে গলি-ঘুঁজিতে,—অপাঙ্‌ক্তেয় অবজ্ঞাত লোক-যাত্রায়। ছবি আঁকাই তার একমাত্র নেশা,—অবসর নেই, অবসর-বিনোদনের অন্য কোনো নেশা নেই। যা নেশা তাই প্রতি-মুহূর্তের পেশা, যা স্বপ্ন তারই মধ্যে সর্ব সম্ভাবনা। তা ছাড়া সময় কই? শিল্পী হওয়া সোজা কথা নয়, শিল্প-সাধনা সর্ববিরতিহরা।

একমাত্র অসুবিধে, তেল-রঙের দাম নিদারুণ। অল্প অল্প করে রঙ লাগাতে সে পারে না, টিউব থেকে টিপে রঙ বার করে মোটা করে ক্যানভাসের ওপর লেপে দেওয়া আর জুইডার জি-র জলে ফ্র্যাংক ঢেলে দেওয়া একই কথা যেন। তা ছাড়া আস্তে আস্তেও সে আঁকতে পারে না। দু-মাসে মভ যতো আঁকেন, একদিনে ততোটা তার আঁকা হয়ে যায়।

তাই ক্যানভাস খরচেরও শেষ নেই। উড়ে যায় টাকা, ঘর ভরে ওঠে ছবিতে। থিয়ো একবারে টাকা পাঠায় না, প্রতি মাসে দশ দিন অন্তর অন্তর তিনবার পঞ্চাশ ফ্র্যাংক করে পাঠায়। যখনই একবার পঞ্চাশ ফ্র্যাংক আসে, দৌড়ে যায় দোকানে, রঙের পর রঙ আর ক্যানভাস কেনে। পাগলের খুশিতে প্রাণটা ভরে ওঠে। পাঁচ-ছ-দিন যেতে না-যেতেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়, বাকি দিন-কটা কায়ক্লেশে টানাটানিতে চলে।

কিন্তু শুধু ছবি এঁকেই তো সব কটা টাকা খরচ করা চলে না! কতো খরচ বাচ্চাটির পেছনে,—তা ছাড়া ক্রিস্টিনের জন্যে নিয়মিত ওষুধ, ভালো খাবার, নতুন পোশাক। হার্মানকে স্কুলে ভর্তি করেছে, তার দায়ও কম নয়। সংসারের জন্যে দৈনন্দিন ব্যয়ের তো সীমা নেই। তিনটি লোক তার পোষ্য; পঞ্চাশটি ফ্র্যাংকের কতো সে সংসারে দেবে, আর কতোটা রাখবে শিল্পলক্ষ্মীর উপচারের জন্যে, তা সে কিছুতেই হিসেব করে উঠতে পারে না।

ক্রিস্টিন বলে,—থিয়োর টাকাটা পেয়েই তুমি রঙের দোকানে ছোটো,—মজুরি মিললেই মজুর যেমন ভাটিখানায় ছোটে ঠিক তেমনি।

শেভেনিনজেনের সমুদ্রতীরটা সত্যি নেশারই মতো। প্রত্যেক দিন সে ভারি ঈজেলটা কাঁধে নিয়ে বালুচর ভাঙতে ভাঙতে সেখানে যায়। প্রহরে প্রহরে আকাশের আর সমুদ্রের রঙ বদলায়, রঙ-মাতাল ভিনসেণ্ট রঙের পর রঙ চড়ায় ছবির পর ছবিতে। শরৎ-শেষে শিল্পীরা সাধারণত স্টুডিয়োতে কাজ করে, বাইরে তখন শীতের আক্রমণ। ভিনসেণ্টের তাতে মন ওঠে না, সমুদ্র-তীরে সে ঈজেল পাতে জেলে-নৌকোর ধারে। আঁকে সে কুয়াসা আর ঝড়-

বৃষ্টিকে তুচ্ছ করে। নোনা জলের ঝাপটা কখনো এসে লাগে তার ছবির কাঁচা রঙে ; বৃষ্টিতে ভিজে, ঠাণ্ডা বাতাসে অসাড় হয়ে আসে আঙুল, উড়ন্ত বালুকণা চোখে ঢুকে করকর করে। বয়ে গেছে তার ! প্রকৃতিকে যে বাঁধতে চায় রেখা আর রঙের বাঁধনে, প্রকৃতির ভ্রূকুটিলীলাকে সে করবে ভয় ? কে তাকে রুখবে—এক মৃত্যু ছাড়া ?

একদিন রাত্রিবেলা একটা নতুন ক্যানভাস সে ক্রিস্টিনকে দেখালো। ক্রিস্টিন আশ্চর্য চোখে বলে উঠল,—কী করে তুমি আঁকো ভিনসেণ্ট ! এ তো ছবি নয়, এ যেন সত্যি দেখছি !

ভিনসেণ্টের খেয়াল রইল না যে সে একজন নিতান্ত অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইছে, মভ বা উইসেনব্রাকের মতো কারো সঙ্গে নয়। বললে,—আমিও বুঝিনে। হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গা ভালো লেগে যায়। সেই-খানে ঈজেলটা খাটাই। চড়াই সাদা একটা ক্যানভাস। মনে মনে বলি,—সাদা থাকলে চলবে না, একটা কিছু হতেই হবে। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করি, তারপর বাড়ি ফিরে আসি অতৃপ্ত মন নিয়ে। লুকিয়ে রেখে দিই ছবিটা। কিছুটা বিশ্রাম করার পর ভয়ে-ভয়ে দেখি,—মনে ভাবি, আসল যা দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখেছি, তার কতটুকু বা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি ? কিন্তু ছবিটা দেখতে দেখতে যা সত্য তার প্রতিবিম্ব চোখে ফোটে, তার প্রতিধ্বনি এসে কানে বাজে। মনে হয় প্রকৃতি যেন আমার কানে কানে তার গোপন অন্তর-বাণী শুনিয়েছে। সেই বাণী হারায় নি, তাকে আমি ঢেকে রাখতে পেরেছি রঙের তুলি বুলিয়ে। সব কথা হয়ত টুকতে পারিনি, কিছুটা বাদ পড়েছে, কোথাও রয়ে গেছে ফাঁক, —কিন্তু যেটুকু ধরেছি তার মধ্যে মিথ্যে নেই কোথাও।—কী হোলো, বুঝতে পারছ কী বলছি ?

ক্রিস্টিন হেসে বললে,—না, একবর্ণও না।

১২

সত্যিই, ভিনসেণ্টের যা কাজ তার কিছুই ক্রিস্টিন বুঝত না। তার ধারণা, ভিনসেন্টের এই শিল্পক্ষুধা নিতান্ত একটা বনেদি খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। এই ক্লান্তিহীন পরিশ্রম, আত্মপ্রকাশের এই প্রতি মুহূর্তের যন্ত্রণা তার ক্ষুদ্র উপলব্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। সাধারণ মানুষের সংসার-সঙ্গিনী হবার উপযুক্ততা তার ছিল, কিন্তু রক্তে যার সংসার-বৈরাগ্য, তার বিবাগী ভাবনাকে সে আশ্রয় দেবে কোন্ ক্ষমতায় ? কথা দিয়ে নিজেকে যখন ভিনসেণ্ট প্রকাশ করতে পারে না তখন সে লেখার আশ্রয় নেয়। কী দেখেছে, কী ভেবেছে, কী এঁকেছে— প্রায় প্রতি রাত্রেই দীর্ঘ চিঠিতে সে থিয়োকে লেখে। অপরের চিত্তপ্রকাশকে সে যখন উপভোগ করতে চায়, তখন সে উপন্যাস পড়ে—ফরাসী ইংরেজি ডাচ্

জার্মান—যে-কোনো ভাষায়। তার জীবনের নিতান্ত সামান্য অংশের সঙ্গেই ক্রিস্টিনের সহযোগ। তার ধ্যান-ধারণা তার শিক্ষা-সংস্কৃতি—এ সবের বোঝা চাপিয়ে ক্রিস্টিনের অশিক্ষিত মনকে সে পীড়িত করতে চায় না। ক্রিস্টিনকে জীবনসঙ্গিনী করবে বলে যে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে,—এ নিয়ে তার কোনো অনুশোচনা নেই।

ভরা শীতকাল এল। ততোদিন কোনো অসুবিধে হয়নি, যতোদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে বাইরেই থাকত রঙ-তুলি নিয়ে। সঙ্গিনী ছিল বিশ্ব-প্রকৃতি। কিন্তু শীতকালে বাইরে শুধু তুষার-ঝড়—সারা দিনে একবারও বাড়ির বাইরে বার হওয়া অসম্ভব। এইবার শুরু হোলো মুস্কিল।

রঙের খরচটা বাঁচল। সারা দিন ঘরে বসে কাজ,—ফিরে গেল ড্রয়িং-এ। কিন্তু মডেলের দর্শনী জোগানো প্রাণান্তকর। যারা রাস্তায় মুষ্টিভিক্ষার বিনিময়ে যে-কোনো শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে লালায়িত, তেমনি লোকও যখন শোনে স্টুডিয়োতে চুপটি করে বসে থাকতে হবে, তখন চড়া দর হাঁকে। শেষ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পাগলা গারদে গিয়ে ড্রয়িং করার অনুমতি চাইল। কর্তৃপক্ষ তাতে নারাজ, বড়জোর যেদিন যেদিন দর্শকরা আসতে পারে, সেই-সেই দিনে আসবার অনুমতি মিলল।

একমাত্র ভরসা ক্রিস্টিন। ভিনসেন্ট আশা করেছিল শরীরটা একটু সারলে ক্রিস্টিন আবার আগের মতো পোজ করে তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু ক্রিস্টিনের তাতে মনে মনে আপত্তি। প্রথম-প্রথম সে দুর্বলতার অজুহাতে ভিনসেন্টের অনুরোধকে এড়িয়ে যেত। আর বেশ ভালো-মতো সুস্থ যখন সে হয়ে উঠল, তখনই বা তার সময় কোথায়?

বলে:—আগে যেমন ছিলাম এখন কি আর তেমনটি আছি ভাবো নাকি? এখন যে সংসারের গিন্নী হয়েছি। চারটে লোকের রান্না করা, বাড়ি পরিষ্কার রাখা, ধোয়া মোছা,—কম হোলো? তার ওপর আবার বুকের দুধ-খাওয়া বাচ্চা। নিশ্বাস ফেলবার সময়টুকু রেখেছ?

ভোর পাঁচটায় উঠল ভিনসেন্ট। অন্ধকার থাকতেই যা-কিছু সংসারের কাজ নিজের হাতে করে নিল যাতে দিনের বেলা ক্রিস্টিন তার জন্যে সময় দিতে পারে। পরিবর্তে ক্রিস্টিন কথা শুনিয়ে দিল,—বয়ে গেছে! আমি এখন আর তোমার মডেল নাকি? আমি এখন বৌ!

—ও রকম কোরো না সিয়েন, অবুঝ হোয়ো না। আমার জন্যে তোমাকে পোজ করতেই হবে। তোমাকে যে আমার কাছে এনেছি, এর একটা উদ্দেশ্য তো তাই-ই।

রাগে আগুন হয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ক্রিস্টিন। গোড়ায়-গোড়ায় যেমন তার বাগ-না-মানা অভদ্র মেজাজ ছিল, হঠাৎ তেমনি মেজাজ প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফেটে পড়ল কর্কশ চিৎকারে,—কী? কী বললে? এইজন্যে আমাকে এনেছ?

এই করে তুমি পয়সা বাঁচাবে? সারাদিন গতর ভেঙে তোমার বাড়িতে দাসী বাঁদির কাজ করব, তাতেও আকিঞ্চেক্ষ তোমার মেটে না? এর ওপর আবার তোমার ড্যাবডেবে চোখের সামনে তিনঘণ্টা ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? আর তা নইলে দূর করে দেবে বাড়ি থেকে?

ভিনসেণ্ট চুপ করে ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর বললে,—এমনিধারা কথা তো তুমি ভুলে গিয়েছিলে সিয়েন, নিশ্চয়ই আবার শিখছ তোমার মার কাছ থেকে।

—শিখছি তো শিখছি! মিথ্যে তো নয় কিছু।

—সিয়েন, আমার কথা শোনো। তোমার মার ওখানে যাওয়া তোমার বন্ধ করতে হবে।

—ইঃ, বললেই হোলো! পেটের মেয়ে আমি, মার ওপর আমার দরদ নেই?

—কিন্তু সিয়েন, তোমার আমার সম্বন্ধের মাঝখানে ওরা যে ফাটল ধরাচ্ছে! ওরা যা ভাবে, ওরা যা চায় তাতে আবার যদি তুমি সায় দাও, তাহলে কোথায় থাকবে আমাদের বিয়ে?

—বটে? কিন্তু ঘরে যখন খাবার থাকে না তখন তুমিই তো সাধো আমাকে মার ওখানে যেতে! নিজে যদি পয়সা কিছু রোজকার করতে পারো, আমাকেও তাহলে আর যেতে হয় না।

শেষ পর্যন্ত ভিনসেণ্ট ক্রিস্টিনকে পোজ করতে রাজি করালো বটে, কিন্তু নিষ্ফল সে স্বীকৃতি। ইচ্ছাতেই হোক অনিচ্ছাতেই হোক, ক্রিস্টিন এমন সব অশুদ্ধ ও বীভৎস ভঙ্গী নিতে লাগল, যে শেষ পর্যন্ত ভিনসেণ্ট হাল ছাড়তে বাধ্য হোলো। ফলে বাইরের মডেলের খরচ বাড়ল, আর বাড়ল ঘরের নিরন্ন দিনের সংখ্যা। ঘরে যখন যথেষ্ট খাবার থাকে না, ক্রিস্টিনকে তার শিশু নিয়ে যেতে হয় তার মার ওখানে। প্রত্যেকবার মার কাছ থেকে ক্রিস্টিন ফিরে আসে, আর ভিনসেণ্ট লক্ষ করে, একটু একটু সে বদলাচ্ছে। সে বোঝে কী সাংঘাতিক অলাতচক্রে সে বাঁধা পড়েছে। যে কটা টাকা সে থিয়োর কাছ থেকে পায়, সবই যদি সে-সংসারে ব্যয় করে তাহলে ক্রিস্টিনকে তার মার প্রভাবে পড়তে হয় না, তার সঙ্গে তার সম্পর্কটা সুস্থ থাকে। কিন্তু তাই যদি সে করে, তাহলে নিজের কাজে ইস্তফা দিতে হয়। আর শিল্পকর্মেই যদি জলাঞ্জলি দিল, তাহলে থিয়োর কাছ থেকে মাসোহারা নেবে কোন্ লজ্জায়?

ক্রিস্টিনকে সে বাঁচিয়েছে, সে কি শেষ পর্যন্ত নিজেকে হত্যা করার জন্যে? রুগ্ণা গর্ভবতী ক্রিস্টিন, হাসপাতালে প্রসূতি ক্রিস্টিন, প্রসবের পর রক্তশূন্য দুর্বল ক্রিস্টিন,—সে ক্রিস্টিন ছিল এক রকম:—সমাজ-পরিত্যক্তা, আশ্রয়-হারা, আশাহারা, মৃত্যুপথযাত্রিণী। মৃদুতম মিষ্ট কথায় সামান্যতম সাহায্যে তার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। যন্ত্রণা তখন তার কানায় কানায়, তা থেকে মুহূর্তের মুক্তির জন্যে যা চাও তাই সে করতে পারত, আত্মশুদ্ধির কঠোরতম

প্রতিজ্ঞা করতে তার আটকায় নি। কিন্তু এখন নতুন রক্ত জেগেছে শিরায়, মাংস লেগেছে দেহে, ঔষধে পথ্যে চিকিৎসায় বিশ্রামে স্বাস্থ্য ফিরেছে,—স্মৃতি মুছে যাচ্ছে,—ঘুচে যাচ্ছে গৃহিণী আর জননী হবার অঙ্গীকার। পুরোনো জীবনের বাসনা আর অভ্যাস ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। চোদ্দ বছর যে পথচারিণী বারবনিতার জীবন যাপন করেছে, এক বছরের পরিবর্তনের মূল্য তার কাছে কতোটুকু ? ভিনসেণ্ট প্রথমটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু ক্রমেই তার চোখ ফুটছে।

থিয়োর কাছ থেকে এক অদ্ভুত চিঠি এল এমনি সময়ে। প্যারিসের রাস্তা থেকে থিয়ো একটি মেয়েকে কুড়িয়ে এনেছে। মেয়েটি সহায়-সম্বল হীনা, রোগজীর্ণা। আত্মহত্যা করতে সে চলেছিল, এমনি অবস্থায় থিয়ো তাকে ফিরিয়ে এনেছে। এক বন্ধু-পরিবারের আশ্রয়ে রেখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা সে করেছে। তারপর ?

ভিনসেণ্টকে সে লিখেছে,—কী করি এখন ? রোগীটিকে মৃত্যুর দ্বার থেকে তো ফিরিয়ে আনলাম, এখন জীবনের মধ্যে নিয়ে আসা ছাড়া কী উপায় ? বিয়ে করব ? এ ছাড়া অন্য পথ কিছু আছে ?

ভিনসেণ্ট সহানুভূতি জানিয়ে থিয়োকে সুদীর্ঘ চিঠি লিখল, কিন্তু কোনো উপদেশ দেওয়া তো সহজ নয় !

এদিকে দিনের পর দিন ক্রিস্টিন অসহ্য হয়ে উঠছে। শুধু রুটি আর কফিতে তার পোষায় না, ভালো খাবার দাবারের জন্যে তার অভিযোগ লেগেই আছে। সঙ্গে জুটেছে নতুন পোশাকের বায়না, সেজন্যে গায়ের পুরোনো পোশাককে নষ্ট করতে, ছিঁড়ে ফেলতে তার দ্বিধা নেই। এদিকে ভিনসেণ্টের জামার একটা বোতাম সেলাই করতেও তার হাত ওঠে না। ভিনসেণ্ট কেন মডেলের পেছনে পয়সা ওড়ায়, কেন সব টাকাটা সংসারে ঢালে না,—এই তার নিত্য নাকি-কান্না। তার মা তাকে সর্বদা ভয় দেখাচ্ছে,—দুদিন পরেই হয় ভিনসেণ্ট তোকে তাড়াবে, না হয় তোকে ফেলে নিজেই অন্য কোথাও পালাবে। পরামর্শ দেয়,—বিয়ে করা বৌই যখন নয়, তখন এমনি ঠুনকো সম্পর্কটা থাকলেই বা কী গেলেই বা কী ?

ভিনসেণ্ট ভাবল,—সে-ই তো পূর্বসূরী। তারই পথে তো থিয়ো পা বাড়িয়েছে। বিয়ে করলেই কি সমস্যার সমাধান ? লিখল,—তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে বোসো না। সাহায্য করো, দেহে মনে সুস্থ করে তোলো মেয়েটিকে। কিন্তু ঝপ্ করে বিয়ে করে বোসো না। তোমাদের মধ্যে যদি ভালোবাসা হয়, তবে বিয়ে কোরো। নইলে শুধু বিয়ে করেই তোমার সমস্যার সমাধান নয়।

গৃহস্থালিতে ক্রিস্টিনের মন নেই, তাই খরচের হাতও অসংহত। সংসারের ব্যয় বেড়ে চলে, ক্ষতি হয় তার কাজের। ঋণ জমতে থাকে,—বাড়িওয়ালা,

মুদি, রুটিওয়ালা, রঙওয়ালা,—কার কাছে নয়? থিয়োও নতুন খরচের দায়িত্ব নিয়েছে, সময়ে সে টাকা পাঠায় না। প্রত্যেক মাসে তিনবার করে সে থিয়োকে টাকার জন্যে ব্যস্ত-সমস্ত চিঠি লেখে। প্রত্যেকবার টাকা আসা-মাত্র কোথায় যে উড়ে যায়! ঋণ আর শোধ হবার অবসর পায় না।

থিয়োর আশ্রিতাটির অপারেশন হবে হাসপাতালে। মস্ত একটা ধাক্কা। যেমন ভিনসেন্টকে, তেমনি নিউনেনে বাবাকে টাকা পাঠাতে হয় থিয়োর। তারপর নিজের খরচ তো আছেই। তারও অবস্থা সঙীন।

মার্চ মাসে একদিন ভিনসেন্টের হাতে একটি পয়সা নেই একটা ছেঁড়া নোট ছাড়া। ঘরে নেই একদানা খাবার, বাজারে নেই ধার নেবার একবিন্দু সঙ্গতি। থিয়োর কাছ থেকে টাকা আসতে অন্তত আরো আট ন-দিন দেরি। কোনো উপায় নেই আর।

ভিনসেন্ট বললে,—সিয়েন, বাচ্চাগুলো না খেতে পেয়ে মরবে। তুমি কদিন ওদের নিয়ে তোমার মার কাছে গিয়েই থাকো। থিয়োর চিঠি এলেই আমি তোমাদের নিয়ে আসব।

উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকালো এক মুহূর্ত। দুজনেরই মনে একটি কথা, যা মুখে প্রকাশ করা অসম্ভব। চোখ নামিয়ে ক্রিস্টিন বললে,—হ্যাঁ, এই ভালো, এ ছাড়া আর রাস্তা নেই।

ছেঁড়া নোটটার বদলে মুদি দিল কালো একটা পাঁউরুটি আর খানিকটে কফি।

ন-দিন পরে এল থিয়োর চিঠি, সঙ্গে পঞ্চাশটি ফ্র্যাংক।

থিয়ো লিখেছে,—তার আশ্রিতাটির অপারেশন ভালোই হয়েছে,—এখন তাকে রেখেছে একটা নার্সিং হোমে। আর্থিক অবস্থা তারও সঙীন, ভবিষ্যতে ভিনসেন্টকে টাকা পাঠিয়ে যেতে যে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ভিনসেন্ট প্রায় পাগল হয়ে গেল চিঠি পড়ে। এর মানে কি থিয়ো আর তাকে টাকা পাঠাবে না? তাতে তার দুঃখ নেই, কিন্তু এর মানে আর কিছুও হতে পারে। দিনের পর দিন স্কেচের পর স্কেচ সে থিয়োকে পাঠিয়েছে, জানিয়েছে তার অগ্রগতির পরিচয়। কিন্তু এসব ছবি দেখে থিয়োর মনে কি শেষ পর্যন্ত এই ধারণাই দাঁড়িয়েছে যে সে অক্ষম, অকৃতার্থ শিল্পী, ব্যর্থ তার প্রয়াস,—তাই টাকা খরচ করে তাকে পোষণ করবার কোনো মানে হয় না?

রাতের পর রাত জেগে ভিনসেন্ট থিয়োকে চিঠির পর চিঠি লিখল: কেন? কেন? আসল কারণটা কী খুলে বলো। উত্তর নেই। দিনের বেলা পথে পথে ঘুরে বেড়ালো রুজি-রোজগারের কোনো একটা উপায়ের সন্ধানে। পন্থা নেই।

১৩

ফিরে গেল ক্রিস্টিনের কাছে। দিব্যি সভা বসেছে ক্রিস্টিনের মার ঘরে— মা, ভাই, ভাই এর রক্ষিতা আর অপরিচিত একটা লোক। তাদের মাঝখানে বসে আড্ডা দিচ্ছে আর কালো চুরুট ফুঁকছে ক্রিস্টিন,—হাতে মদের গ্লাস।

মার সঙ্গে ন-দিন মাত্র বসবাসের ফলেই পুরোনো কদভ্যাসগুলি ফিরে এসেছে। ভিনসেণ্ট প্রতিবাদের সুরটুকু তুলতেই দপ্ করে জ্বলে উঠল সে।

—বেশ করব, খুব করব! চুরুট যদি নিজের পয়সায় আমি কিনে খাই তোমার বলবার কী? আর মদ? মাঝে মাঝে জিন খেতে হাসপাতালের ডাক্তারই তো আমায় বলেছে।

—বলেছে, কিন্তু যাতে ক্ষিদে বাড়ে শুধু সেইজন্যে,—ওষুধের মতো করে।

ভিনসেণ্টের মুখের ওপর খল্-খল্ করে হেসে উঠল ক্রিস্টিন,—ওষুধ! মাল টানব ওষুধের মত করে? কোথাকার...তুমি!

অত্যন্ত নোংরা সম্বোধন সে করল। এমনি কথা সে ভুলেই গিয়েছিল ভিনসেণ্টের সংস্পর্শে আসার পর থেকে।

ভিনসেণ্টেরও তখন একেবারে ভাঙা-চোরা মন,—আত্মসংযমের শক্তিটুকু নেই। এমনি জঘন্য উত্তর ক্রিস্টিনের মুখ থেকে তাকে শুনতে হবে? দুর্দমনীয় রাগে সে ফেটে পড়ল। ক্রিস্টিনও থামবার পাত্র নয়, ভয় না পেয়ে সেও চেঁচাতে লাগল সমানে।

—খেতে দাও? পরতে দাও? ইঃ, সোহাগ তো কতোখানি, চোখ রাঙাবার বাবু! এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, আমার মরদ এসেছেন!

জোর করে সে নিয়ে গেল ক্রিস্টিনকে বাড়িতে।

শীতের শেষে বসন্ত এল যেন নিরুপায় অনিচ্ছায়। ভিনসেণ্টের অবস্থা আরো নামতে লাগল। উঁচু হতে লাগল ঋণের পাহাড়। উপযুক্ত খাবার পেটে পড়ে না, পেট শুরু করল বিদ্রোহ। গলা দিয়ে কিছুই নামতে চায় না। পেটের অসুখ দাঁতকে আক্রমণ করল, দাঁত থেকে ডান কান। দাঁত গলা কান আর মাথা—সর্বদা যন্ত্রণায় দপ-দপ করে জ্বলে।

ক্রিস্টিনের মা রোজই আসা যাওয়া করে। মেয়ের সঙ্গে বসে চুরুট ফোঁকে, মদ খায়। একদিন ভাইও এল, ভিনসেণ্টকে দেখেই অবশ্য চটপট সরে পড়ল লোকটা।

ভিনসেণ্ট জিজ্ঞাসা করল,—তোমার ভাই এখানে এসেছিল কেন? তোমার সঙ্গে এখানে আবার ওর কী দরকার?

ক্রিস্টিন বললে,—ওরা সবাই বলছে, এবার তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে।

—তুমি জানো সিয়েন, ওদের কথা মিথ্যে। যতোদিন তুমি নিজে না ছেড়ে যেতে চাও ততোদিন তুমি আমার কাছে থাকবে।

—মা আমাকে বলছে চলে যেতে। বলছে, যেখানে দুমুঠো খেতেই না পাওয়া যায়, সেখানে পড়ে থেকে লাভ কী?

—গেলে কোথায় যাবে?

—কেন? বাড়িতে, মার ওখানে।

—ছেলেদেরও নিয়ে যাবে?

—এখানে থাকলে তো না খেয়ে মরবে। আমি কাজকর্ম করে রোজগারও করতে পারব।

—কী কাজ?

—এই...এই কাজ আর কী।

—আবার কাপড় কাচবে ধোপা-বাড়িতে?

—হ্যাঁ, তাও করতে পারি,—আমতা আমতা উত্তর।

মুহূর্তে ভিনসেণ্ট ধরতে পারে ও মিথ্যে কথা বলছে। কঠোর হয়ে বলে,—বুঝেছি কী কাজের জন্যে ওরা তোমাকে কু-মতলব দিচ্ছে।

—তাই যদি করি এমন আর মন্দটা কী? পয়সা তো আসে!

—শোনো সিয়েন, আবার যদি তোমার মার বাড়িতে তুমি যাও তাহলে আর প্রাণে বাঁচবে না। মা তোমাকে আবার রাস্তায় বার করাবে। লিডেনের ডাক্তার কী বলেছিল মনে আছে তো? আবার যদি বিপথে ফিরে যাও তাহলে নির্ঘাত তুমি মরবে।

—মোটেই না। শরীর আমার এখন অনেক ভালো।

—হ্যাঁ, সাবধানে আছো তাই বলেই ভালো। কিন্তু আবার যদি—

—কে আবার যাচ্ছে, যদি না তুমি আমাকে তাড়িয়ে দাও?

ক্রিস্টিনের চেয়ারের হাতলের ওপর বসল ভিনসেণ্ট, ডান হাত রইল ওর কাঁধের ওপর। বললে,—তাহলে বিশ্বাস করো সিয়েন, আমি কখনো তোমাকে পরিত্যাগ করব না। আমার যা আছে তার অংশ নিয়ে যতোদিন তুমি আমার কাছে থাকতে চাও ততোদিনই তুমি থাকবে। তবে, তোমার ভাই আর মা, ওদের তোমাকে ছাড়তেই হবে। ওদের খপ্পরে আবার পড়লে তুমি বাঁচবে না। কথা দাও তুমি ওদের সঙ্গে আর দেখা করবে না।

—কথা দিচ্ছি,—ক্রিস্টিন বললে।

দুদিন না যেতেই কোথায় রইল এ প্রতিশ্রুতি! সারাদিন বাইরে কাজ করার পর সন্ধ্যাবেলায় ভিনসেণ্ট ফিরে এসে দেখে, ক্রিস্টিন উধাও। খুঁজে পেল ঠিক তাকে তার মার বাড়িতে—মদ খাচ্ছে বসে বসে।

ধরে তাকে বাড়ি নিয়ে এল ভিনসেণ্ট। চেঁচাতে লাগল ক্রিস্টিন,—বেশ

করব, খুব করব! যা ইচ্ছে তাই করব! কেন যাব না মার কাছে? আমি কারো কেনা বাঁদি যে হুকুম করলেই হোলো? ইঃ!

ফিরে চলল সে পুরোনো কুশ্রীতায়, আগেকার সমস্ত রকমের নোংরা অভ্যাসে। ভিনসেণ্ট তাকে কতো বোঝায় কতো সাবধান করে, ভয় দেখায়,—এমনি করলে দুজনে একসঙ্গে থাকবে কী করে? উত্তরে শোনে,—হ্যাঁ, এখন তো এসব কথা বলবেই, ঝামেলা মনে মনে তাড়াতে চাও কিনা?

বাড়ি ঘর নোংরা, তছনছ সংসার। ক্রিশ্চিনের অলস উদাসীনতা সীমা ছাড়িয়ে চলেছে, কিছু বললেই ঝংকার দিয়ে ওঠে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যা আমি তাই। আমি কুঁড়ে, আমি কোনো কর্মের নই, আমি রাস্তার ময়লা,...... বেশ বেশ, রাস্তাতেই আমি যাব......নদীর জলে ডুবে মরব আমি। হোলো?

ক্রিশ্চিনের মা আজকাল রোজ আসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেয়ের সঙ্গে আসর জমায়। বিশৃঙ্খলার শেষ নেই, সামান্য রান্নাটুকু পর্যন্ত একবেলায় হয় তো আর-বেলায় বাদ পড়ে। হার্মানের ইস্কুল ঘুচেছে, সে নোংরা গায়ে ছেঁড়া জামা পরে পথে পথে ঘোরে। ক্রিশ্চিনের কুঁড়েমি যতো বাড়ে, ততো বাড়ে তার চুরুট ফোঁকা আর মদ খাওয়া। এতো নেশার পয়সা তার কোথা থেকে জোটে, তা সে ভিনসেণ্টের কাছে ভাঙতে চায় না।

গ্রীষ্মকাল এল। আর ঘরে বসে ড্রয়িং নয়, বাইরে বার হয়ে রঙিন ছবি আঁকার সময়। তেল-রঙ, তুলি, ক্যানভাস প্রভৃতি নতুন করে কেনার খরচ। থিয়ো লিখল,—তার আশ্রিতাটির শরীর ফিরছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে মানসিক জটিলতা বাড়ছে। এবার সে কী করবে মেয়েটিকে নিয়ে?

ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি চোখ বুজে রইল ভিনসেণ্ট,—ডুবে থাকতে চাইল ছবির মধ্যে। ক্রিশ্চিন নামছে দিনে দিনে, সঙ্গে সঙ্গে তাকেও টানছে রসাতলের দিকে। কীটদষ্ট জীর্ণ সংসার কোনু দিন ভেঙে পড়বে একেবারে মাথার ওপর।

কিছু করার নেই। ভোরবেলা সে বাড়ি থেকে বার হয়ে যায় ছবি আঁকার সরঞ্জাম পিঠে ঝুলিয়ে, সারাদিন মগ্ন হয়ে থাকে কাজের মধ্যে। রোজ মনে মনে ভাবে, আজকের এই ছবিটি এত সুন্দর হবে যে ক্রেতা এসে লুফে নেবেই,—এই একটি ছবিতেই রুদ্ধ হবে সর্বনাশের পথ, মিলবে আত্মপ্রতিষ্ঠা। নিজের সারাদিনের কাজ রাত্রে যখন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি মেলে দেখে, হতাশায় মন ভরে যায়। কই? কোথায়? আর কতোদিন?

একমাত্র তৃপ্তি ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে, যার নাম আণ্টুন। আশ্চর্য শক্তি ঐটুকু শিশুর! সারাদিন একলা একলা মেঝের ধুলোয় লুটোচ্ছে, যা হাতের কাছে পায় তাই মুখে পুরে ক্ষিদে মেটাচ্ছে,—আর সারাদিন তার ভাষাহারা বকবকানি আর খিল-খিল হাসি। সুন্দর বেড়ে উঠছে আপন আনন্দে। প্রায়ই সে স্টুডিয়োর কোণে বসে থাকে, কখনো ভিনসেণ্টের দিকে তাকিয়ে অর্থহীন হাসি হাসে, কখনো নিঃশব্দে দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে

থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ক্রিশ্টিন যতো তাকে অবহেলা করে, ভিনসেণ্টের স্নেহ তার দিকে ততো ধায়। এই পিতৃপরিচয়হীন মানবসন্তান, এর দাম কি কম? ক্রিশ্টিনের জন্যে আক্ষেপ করে কী হবে? এই শিশু, একে তো ভিনসেণ্টই পৃথিবীর আলো চোখে দেখিয়েছে, এর মধ্যে তো ভিনসেণ্টেরও কিছুটা সার্থকতা।

উইসেনব্রাক এলেন আর-এক দিন। গত বছরে আঁকা কয়েকটি স্কেচ ভিনসেণ্ট তাঁকে দেখালো। ভিনসেণ্টের চোখে এগুলো এখন বড়ো কাঁচা, বড়ো বাজে, বড়ো অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

উইসেনব্রাক বললেন,—ভুল ভায়া এমনি ধারণা। অনেক বছর পরে নিজের হাতের এসব পুরোনো কাজগুলির দিকে যখন তাকাবে তখন কী মনে হবে জানো? মনে হবে এগুলোর মধ্যে অনেক নিষ্ঠা ছিল, অনেক সহজ আন্তরিকতা ছিল। যাহোক, এখন তা ভাববার নয়। এখন শুধু খাটো, এগিয়ে চলো,—থেমে পড়লে চলবে না।

কিন্তু থামতেই হোলো,—দৃঢ় মুষ্টির আঘাতে। কয়েকমাস আগে পাড়ার এক বাসনওয়ালার কাছে একটা আলো সারাতে নিয়ে যায়। সে সময় দোকানদার তাকে কয়েকটা বাসন গছিয়ে দেয়। ভিনসেণ্ট বলেছিল,—টাকা নেই এখন, দাম দেব কোত্থেকে?

দোকানী বলছিল,—তাতে কী হয়েছে? নিয়ে যান, দামের জন্যে কী? যখন সুবিধে হয় দেবেন।

দু-মাস পরে বাসনওয়ালা এসে দরজায় ধাক্কা দিল। লোকটার গাঁট্টাগোট্টা জাঁদরেল চেহারা।

ভিনসেণ্ট অসামর্থ্য জানাতে হেঁকে উঠল সে,—নেই টাকা? মিথ্যে কথা বললেই হোলো? দুমাস হোলো টাকাটা ফেলে রেখেছেন, ইচ্ছে করলেই দিতে পারেন তা আমি জানিনে?

ভিনসেণ্ট বুঝিয়ে বললে,—সত্যি এখন একটি পয়সা নেই হাতে, এবার টাকা পেলেই দামটা চুকিয়ে দেব, কথা দিচ্ছি।

তাহলে ঐ জুতোওয়ালাকে টাকা দিলেন কী করে? আমার চোখ কান নেই? আমি বুঝি জানিনে? মিথ্যে কথা চালাবেন খালি আমার বেলায়?

শক্ত হয়ে গেল ভিনসেণ্ট। বললে,—বিরক্ত কোরো না, আমার এখন কাজের সময়। বলে দিয়েছি টাকা নেই, টাকা পেলে তবে দেব। এখন তুমি যেতে পার।

বারুদ হয়ে উঠল লোকটা।

—যাব? যেতেই হবে? বললেই হোলো? কড়কড়ে করকরে টাকাটা ফেলুন তবে যাব, তার আগে নয়।

একটা অবিবেচনার কাজ করল ভিনসেণ্ট। লোকটাকে মৃদু একটা ধাক্কা

দিল দরজার দিকে। ধমক দিয়ে বললে,—যাও, যাও এখন!

বারুদে আগুন লাগল। লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে বিরাট একটা ঘুসি চালালো ভিনসেণ্টের মুখে, ভিনসেণ্ট ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালে। আবার তেমনি সজোরে আর-একটা ঘুসি, ভিনসেণ্ট লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আর একটা কথা না বলে অপসৃত হোলো লোকটা।

ক্রিস্টিন যথারীতি মায়ের আড্ডায়। হামাগুড়ি দিয়ে ভিনসেণ্টের কাছে গিয়ে বাচ্চা আন্টুন তার ঘা-খাওয়া মুখে হাত বোলাতে লাগল আর কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। একটু পরে ভিনসেণ্টের জ্ঞান ফিরে এল। সে কোনো রকমে খাড়া হয়ে টলতে টলতে উঠে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

মুখে খুব আঘাত লাগেনি, শারীরিক যন্ত্রণার কোনো অনুভূতি নেই। কিন্তু বেদনাটা অন্যত্র। ঐ দুটিমাত্র আঘাতে কী যেন একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বুকের মধ্যে,—একেবারে হার হয়েছে তার।

ক্রিস্টিন এল। ওপরে গিয়ে দেখে ভিনসেণ্ট নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে বিছানায়, মাথা আর একটা হাত বিছানার বাইরে ঝুলে রয়েছে একধারে, অন্য ধারে পা দুটো। কী হোলো? চেঁচিয়ে উঠল সে।

অনেকক্ষণের অনেক চেষ্টায় যেন ভিনসেণ্ট কোনো রকমে শরীরটাকে নাড়তে পারল, মাথাটা পাতল বালিশের ওপর। নিশ্বাস টেনে টেনে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—সিয়েন, এখানে আর নয়। হেগ ছেড়ে আমাকে যেতেই হবে।

একটু সুস্থ বোধ করার পর সে আবার বললে,—চলো সিয়েন,—এই শহর থেকে পালাই। গ্রামে গিয়ে থাকব, সেখানে অনেক কম খরচ, অনেক বেশি শান্তি।

—কোথায়?

—ড্রেনথে যাব।

—আমিও যাব তোমার সঙ্গে? সে অসম্ভব। শহর বাজার নইলে আমার চলবে না,—টাকা ফুরিয়ে গেলে খাব কী?

—জানিনে সিয়েন। ধরো, উপোস করব তখন।

—একটা প্রতিজ্ঞা তুমি করবে? যে দেড়শো ফ্র্যাঙ্ক পাও, সেটা সংসারে দেবে পুরোপুরি? মডেল আর রঙের পেছনে কিছুই খরচ না করে?

—অসম্ভব সিয়েন। খাই আর না খাই, ছবি আঁকা আগে।

—ঠিক, তোমার কাছে তাই ঠিক। কিন্তু বাঁচতে তো হবে। না খেয়ে বাঁচতে পারিনে ভিনসেণ্ট।

—আমিও ছবি না এঁকে বাঁচতে পারিনে সিয়েন।

ক্রিস্টিন হাসল। আসন্ন প্রদোষের ধূসরতা সে হাসিতে। বললে,—বেশ তো। তোমার টাকা, তোমার দাবি আগে বৈকি। এখন কি পকেটে খুচরো

কয়েকটা সেণ্টিম আছে ? তাহলে ওঠ, ব্রিন্ স্টেশনের ধারের সেই ভাটিখানাটায় একবার যেতে ইচ্ছে করছে।

পেঁছিল দুজনে। ঘরটায় দেশী মদের টক-টক গন্ধ। ঘুলিঘুলি অন্ধকার, এখনো আলো জ্বালা হয় নি। প্রথম যেদিন তাদের এখানে দেখা হয়, তখন যে টেবিলে তারা বসেছিল, সেটা খালি। ক্রিস্টিন্ এগিয়ে গেল, ভিনসেণ্টকে নিয়ে সেই পুরোনো জায়গায় বসল। অর্ডার দিল দু-বোতল দেশী মদ। গ্লাসটা চেপে ধরে আঙুলগুলি খেলা করতে লাগল ক্রিস্টিনের। ভিনসেণ্টের মনে পড়ল প্রায় দু-বছর আগে ঠিক এমনি দিনে এমনি অবস্থায় ক্রিস্টিনের মোটা মোটা খাটিয়ে মেয়ের চঞ্চল আঙুলগুলি প্রথম সে দেখেছিল, আকৃষ্ট হয়েছিল মন।

টেবিলের দিকে মুখ নিচু করে ক্রিস্টিন বললে,—ওরা বলত তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে যাবে। আমিও যে তা জানতাম না তা নয়।

—সত্যি আমি তোমাকে পরিত্যাগ করে যেতে চাইনে সিয়েন।

—না গো এ পরিত্যাগ নয়, এ ভালো। ভালো ছাড়া তুমি আমার কখনো কিছু করো নি।

—আমার জীবনের ভাগ এখনো যদি তুমি নিতে চাও সিয়েন, চলো আমার সঙ্গে।

আবেগহীন স্পষ্টতায় মাথা নাড়ল ক্রিস্টিন,—না, যা আছে দুজনের তাতে চলবে না।

—সিয়েন, ভুল বোঝোনি তো আমাকে ? ভুল বুঝো না। যদি আমার বেশি থাকত, সব তোমাকে দিতাম। কিন্তু তোমাকে খাওয়াব কি আমার কাজকে খাওয়াব, এই দোটানার সামনে যখন দাঁড়াই—

ভিনসেণ্টের হাতে ডান হাতটি রাখল ক্রিস্টিন, শক্ত খসখসে তালুর চামড়া। বললে,—বুঝেছি, বুঝছি,—মন খারাপ কোরো না এ নিয়ে। আমার জন্যে সব কিছু তুমি করেছ, সব আমার মনে আছে। তবু শেষ পর্যন্ত যখন ছাড়াছাড়ির সময় আসে, আসতে দাও—

—যদি না ছাড়ি সিয়েন ? মুখ ফুটে তুমি একবার বলো সিয়েন যে তুমি খুশি হবে, আমি তোমাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যাব।

অস্ফুট গলায় ক্রিস্টিন বললে,—না। আমার মার কাছেই আমার জায়গা, সেখানেই আমি ফিরে যাব। যার যা জীবন। তুমি ভেবো না, ভালোই হবে,— আমার ভাই বলেছে নতুন একটা ঘর সে নেবে তার রক্ষিতার আর আমার জন্যে।

গ্লাসটা তুলে মুখে উপুড় করে দিল ভিনসেণ্ট। শেষ ফোঁটাটুকুর তিক্ত কষায় স্বাদ।

বললে,—সিয়েন, এটা তুমি জানো, আমি যখন যতোটা পেরেছি তোমাকে সাহায্য করতেই চেষ্টা করেছি। তোমাকে ভালোবেসেছি, স্নেহ মমতা যা ছিল

সব তোমাকে দিয়েছি। সে কথা স্মরণ করে আমার একটি কথা তুমি রাখবে বলো?

—কী কথা?

—ও পথে আর যেয়ো না। আন্টুনটার কথা অন্তত মনে করে ও পথ থেকে সরে থেকো।

চুপ করে রইল ক্রিস্টিন। তারপর বললে,—আর-এক গ্লাসের মতো পয়সা হবে?

—হ্যাঁ হবে।

গ্লাসের প্রায় অর্ধেকটা মদ এক চুমুকে শুষে নিয়ে ক্রিস্টিন বললে,—আঃ, ধন্যবাদ! পোড়া পেটের ছেলেগুলোকে খাওয়াবার জন্যেই ও পথে আমি যাই, আর কোনো কারণে নয়।

—কিন্তু সিয়েন, অন্য কাজ যদি পাও তাহলে?

—তাহলে যাব না, কথা দিচ্ছি।

—আমি তোমাকে প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাব সিয়েন,—ঐ বাচ্চাটার জন্যে। ওটাকে তুমি দেখো, ওটাকে বড়ো হবার সুযোগ দিয়ো।

—পাগল? টাকা পাঠাবে তুমি? কিছু ভেবো না। ঠিক বড়ো হবে ও। অন্যগুলোর মতোই।

ভিনসেন্ট থিয়োকে চিঠি লিখে জানালো সে ক্রিস্টিনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে গ্রামে গিয়ে থাকতে চায়। পত্রপাঠ থিয়ো উত্তরে পূর্ণ সমর্থন জানালো, আর সেইসঙ্গে পাঠালো পুরোনো সব দেনা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে অতিরিক্ত একশোটি ফ্র্যাঙ্ক। চিঠিতে লিখল,—

কদিন হোলো আমার আশ্রিতাটি অন্তর্ধান করেছে। যাবার সময় যা ছিল সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে গেছে, রেখে যায়নি কিছু,—ঠিকানাটুকুও না। তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার পর দেখেছিলাম, জীবনের মধ্যে তাকে আনবার মতো উপযুক্ত সম্পর্কটা খুঁজে পাচ্ছিনে। অতএব এ ভালোই হয়েছে। এবার তোমার আমার দুজনেরই শৃঙ্খল ঘুচেছে, দুজনেই মুক্ত।

উপরের ঘরটায় ভিনসেন্ট তার জিনিসপত্র বন্ধ করে রাখল। ভাবল আবার কিছুদিন পরে হেগ-এ ফিরে আসবে। ড্রেনথে যেদিন যাবে, তার আগের দিন নিউনেন থেকে পেল বাবার এক চিঠি, আর মার কাছ থেকে একটি পার্সেল।

বাবা লিখেছেন,—কবে তুমি এখানে আসবে? গোরস্থানের ক্রসগুলি আঁকবে না?

না, ড্রেনথে নয়, বাড়ি যাবে। পেটে ক্ষুধা, হাতে নেই অর্থ, শক্তিহীন বিষণ্ণ বুক। বাড়ি গিয়ে কদিন মার কাছে থাকলে শরীর সারবে। ব্র্যাবান্টের গ্রামাঞ্চল, তার ক্ষেত-খামার আর বন, গাছের ছায়া আর কর্মরত কৃষাণের মূর্তি,

—ওরা সবাই ডাকছে, টানছে।

ক্রিস্টিন আর তার দুটি ছেলে সঙ্গে গেল স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই, কথা নেই কারো মুখে। ট্রেন এসে দাঁড়ালো, উঠে পড়ল ভিনসেণ্ট। ক্রিস্টিন দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক নিশ্চল হয়ে। বুকে তার শিশুটি, ডান হাতে হার্মানের হাত ধরা। ভিনসেণ্ট জানলা দিয়ে দেখতে লাগল তাদের যতক্ষণ-না আধো-অন্ধকার প্লাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন গিয়ে পড়ল ঝলমলে রৌদ্রভরা প্রান্তরে। পড়ে রইল ক্রিস্টিন স্টেশনের কালো অন্ধকারে,—মিলিয়ে গেল, দৃষ্টির বাইরে, হারিয়ে গেল জীবন থেকে চিরকালের মতো।

॥ নিউনেন ॥

১

নিউনেনের ধর্মযাজকের বাড়িটা দোতলা, চুনকাম করা, সাদা ধবধবে। পেছন দিকে বিরাট একটা বাগান। তাতে দিঘি আছে, ফুলবাগান আছে, আছে বড়ো বড়ো গাছ। নিউনেনের জনসংখ্যা ছাব্বিশশোর কম নয়, কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মাত্র শ-খানেক। থিয়োডোরাসের গির্জেটিও খুব ছোট। ইটেনের মতো জমকালো শহর থেকে নিউনেনে বদলি হওয়া কিছুটা অবনতিই বলতে হবে।

শহরে পাকা বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ বাসিন্দাই হয় তাঁতী, না হয় চাষী। পাকা রাস্তা থেকে দূরে দূরে মাঠের মাঝে মাঝে তাদের কুটির। অধিবাসীরা কর্মঠ, ধর্মভীরু আর খুবই রক্ষণশীল।

দোতলার একটি ঘরে ভিনসেন্টের স্থান হোলো। ভোরবেলা পুব দিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় গির্জের চুড়োর ওপারে সূর্যোদয়, চুড়োটির ছায়া দিঘির জলে কাঁপে। সন্ধেবেলা পশ্চিম আকাশের রক্তিমা ঘন তেল-রঙের মতো ছড়িয়ে যায় দিঘির ওপর, ক্রমে মিলিয়ে যায় প্রদোষের ধূসরতায়।

মনে মনে ভিনসেন্ট তার বাবা মাকে ভালোবাসে, বাবা মাও ভালোবাসেন তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। ভিনসেন্টের আদর যত্নের অভাব নেই, প্রচুর খায় দায় আর ঘুমোয়,—মাঝে মাঝে মাঠে বেড়িয়ে বেড়ায়।

দু-সপ্তাহের মত ভিনসেন্ট এখানে এসেছে, জুড়িয়ে এসেছে শরীর-মনের ক্ষত। মনে মনে ইচ্ছে, বেশ কিছুদিন থেকে যায়। ব্র্যাবান্ট দেশ তার বড়ো আপনার, এ জায়গার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। এখানকার শস্যক্ষেত্রের শ্যামলিমা, এখানকার অরণ্যের নির্জনতা তার অন্তরে বুলিয়ে দেয় শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ। দীর্ঘ-বিড়ম্বিত ভাগ্য এখানকার উদার আকাশের নিচে যেন নিস্তব্ধ স্বস্তিতে পা ছড়িয়ে বসে।

কথা বলতে ইচ্ছে করে না, ভাবনা উড়ে যায় অলস পাখায়, ইচ্ছে করে প্রান্তর-প্রান্তে বসে শুধু চোখ মেলে দেখতে আর যা দেখে তা আঁকতে। এই তো সব! কৃষাণের জীবনযাত্রা চিরদিন তাকে টেনেছে। মনে মনে ভাবে, এই হবে তার শিল্পের উপকরণ। অনেক মন-কেমন-করার পর আবার ফিরে এসেছে গ্রামে, পল্লীজীবনে ডুবে যাবে এবার—পল্লীর ছবিই শুধু আঁকবে এবার থেকে।

মনে মনে ভিনসেন্টের কেমন একটা ধারণা ছিল যে শেষ পর্যন্ত এই

ব্র্যাবান্টেই সে ফিরে আসবে, এখানেই জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু নিউনেনে বাবার সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকা কি সম্ভব?

খোলাখুলি সে কথা বললে বাবার সঙ্গে।

বাবা বললেন,—সত্যিই তোমার ছবির হাত অনেক খুলেছে ভিনসেণ্ট। অনেক দূর তুমি এগিয়েছ। খুব খুশি হয়েছি আমি।

ভিনসেণ্ট বললে,—বেশ, কিন্তু একটা কথা আমি খোলাখুলি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনিও অকপটে জবাব দিন। আপনি সত্যিই কি চান, আপনার এখানে আমি থেকে যাই?

—নিশ্চয়!

—কতোদিনের জন্যে?

—যতোদিন তোমার খুশি। তুমি তো আমাদেরই ভিনসেণ্ট, এ বাড়ি তো তোমারই!

—কিন্তু ধরুন, কখনো যদি আপনার সঙ্গে মতবিরোধ হয়?

—হবে বৈকি তা। তবে সে নিয়ে মাতামাতি না করলেই হোলো। মতবিরোধও শান্ত মনে মেনে নিতে হবে। একে অপরকে সহ্য করে নিতে না পারলে সমাজ সংসার কিছুই তো থাকত না।

—কিন্তু আমার তো একটা আলাদা স্টুডিয়ো চাই বাবা। বাড়ির মধ্যেই নিজের জন্যে স্টুডিয়ো বানাই, সে আপনিও পছন্দ করবেন না।

—এ কথাও আমি ভেবে রেখেছি ভিনসেণ্ট। বাগানের গায়ের ছোট্ট ঘরটা তুমি নাও। ও ঘরটা একলা তোমার, কেউ ওখানে যাবে না, বিরক্ত করবে না তোমাকে। চলো দুজনে দেখে আসি।

বাড়ির পেছনে রান্নাঘর। তার পাশেই ঘরটা। ছোট ঘর, একটি মাত্র জানলা। দরজা খুললেই বাগান। কাঁচা মাটির মেঝে। ঠিক যেন চাষীর কুটির।

থিয়োডোরাস বললেন,—মেঝেটা কাঠের করে দেবো। আর চাও তো জানলাটাও বড়ো করে দিতে পারি।

ভিনসেণ্ট বললে,—না না, জানলাটা ঠিক আছে, এর বেশি আলো আমার দরকার নেই। মনে করুন এখানকার কোনো চাষীর কুটিরে যদি ছবি আঁকতাম। সে ঘরে তো এর চেয়ে বেশি আলো আসত না!

২

নিউনেনের চার পাশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লোক তারা যারা তাঁত বোনে। কাদামাটি লেপা খড়ে ছাওয়া ছোট কুটিরে তাদের বাস। সাধারণত প্রতিটি পরিবারের দুটি করে ঘর। একটি ঘর বসবাসের, একটিমাত্র চিলতে জানলা দিয়ে আলো আসে সে ঘরে। এ ছাড়া দেয়ালে চৌকো কয়েকটা ঘুলঘুলি।

এই ঘরেই শোয়া, খাওয়া, রান্না। পাশের ঘরটি আয়তনে আরো ছোট, ছাদ তার আরো ঢালু। সেই ঘরে তাঁত।

একটানা কাজ করে সপ্তাহে অন্তত ষাট গজ কাপড় একজন বুনতে পারে। পুরুষরা তাঁত চালায়, মাকুতে সাহায্য করে মেয়েরা। ষাট গজ কাপড়ে সাপ্তাহিক লাভ অল্পবিস্তর সড়ে চার ফ্র্যাংক। তবে, হয়তো প্রতি সপ্তাহেই খদ্দের জোটে না। ভিনসেণ্ট দেখল বরিনেজের কয়লা-শ্রমিকদের সঙ্গে এই গ্রাম্য তাঁতীদের অনেক তফাত। শান্তিপূর্ণ এদের জীবনযাত্রা, কথাবার্তায় নেই হতাশার কাঠিন্য বা উত্তেজনার উত্তপ্ততা। মেজাজ সর্বদা হাসিখুশি।

এই তাঁতীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমতে দেরি হোলো না ভিনসেণ্টের। এরা বড়ো সরল, সামান্য এদের চাহিদা, জীবনযাত্রার যৎকিঞ্চিৎ উপকরণেই এরা খুশি। ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে ভিনসেণ্ট তাদের ছবি আঁকে, খুশি মনেই তারা তাকে ডেকে নেয়। ভিনসেণ্টও যখন যে বাড়িতে যায়, শিশুটির জন্যে হয় নিয়ে যায় কয়েকটা মিষ্টি, বা বুড়োকর্তার জন্যে কিছুটা তামাক।

সবুজে ব্রাউনে মেশানো রঙের পুরোনো ওক কাঠের একটা তাঁত এক বাড়িতে তার চোখে পড়ল, তাতে কাঠে খোদাই করে লেখা আছে, ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দ। তাঁতটির ধারে একটি জানলা, তা দিয়ে বাইরের সবুজ একটু মাঠ চোখে পড়ে। জানলাটির ধারেই বাচ্চার একটি চেয়ার। তাতে একটি শিশু বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একমনে চলন্ত মাকুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। জীর্ণ গৃহ, কাদা-নিকোনো মেঝে, কিন্তু ভিনসেণ্টের চোখ কেমন একটা শান্তি আর মাধুর্যের রূপ খুঁজে পেল এই পরিবেশে, উতলা হয়ে উঠল মন ছবির পটে রূপটিকে ধরবার জন্যে।

প্রত্যুষে ভিনসেণ্ট ঘুম থেকে ওঠে, তাড়াতাড়ি বার হয়ে যায়। সারাদিন সে কাটায় হয় বনে প্রান্তরে, না হয় কৃষাণ বা তাঁতীদের ঘরে ঘরে। ওদের সঙ্গেই সে মিশতে পারে সবচেয়ে ভালো। তার সমস্ত শিল্পদৃষ্টি ওদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড়ো আনন্দ-বেদনার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

ড্রয়িং-এর প্রতি তার আগ্রহ আগের মতোই আছে, সঙ্গে যোগ দিয়েছে রঙের মোহ। পাকা-শস্যভরা ক্ষেতের রঙে হলুদ ব্রোঞ্জ আর সোনালির বিচিত্র সংমিশ্রণ, সেই বর্ণতরঙ্গের পেছনে অনন্ত আকাশের নিস্তরঙ্গ নীলিমার কী চমক,—কী বাহার! মাঝে মাঝে শ্রমিক-বধূদের আনাগোনা। ভারি কর্মঠ দেহ, রৌদ্রে পোড়া মেঠো লাল রঙ তাদের অঙ্গের, পরনে ধূলিমলিন ফিকে নীল পোশাক, বাদামি চুলের রাশ কালো টুপির নিচে ঢাকা।

শহরের লোক কিন্তু বাঁকা চোখে তার দিকে তাকায়। পিঠে ঈজেল বেঁধে হাতে ভিজে ক্যানভাস ঝুলিয়ে সে যখন দিনান্তে বড় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে, শহরের মেয়েরা জানলার ফাঁক দিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকায়। বাড়িতেও সকলের সঙ্গে সম্পর্কটা স্বাভাবিক নয়। বোন এলিজাবেথ তাকে ঘৃণা করে—ঘরে এমনি অসভ্য বুনো ভাই থাকতে পাছে ভালো পাত্রে বিয়ের সম্ভাবনা

তার ফস্কে যায়, এই আশংকা। উইলেমিন তার ওপর বিরূপ না থাকলেও আসলে তাকে পৌঁছেই না। ছোট ভাই কর্-এর সঙ্গেও কোনো ঘনিষ্ঠতা জন্মে নি।

ভিনসেণ্ট বাড়ির সকলের সঙ্গেই খায়, তবে, এক টেবিলে নয়। ঘরের এক কোণে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে, কোলের ওপর প্লেটটা ধরে কোনো রকমে খাওয়াটা শেষ করে। পাছে অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়, তাই সে শুকনো রুটিই চিবোয়। বাকি যেটুকু সময় সে ঘরে বসে, নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নিজের হাতের কাজ পরীক্ষা করে দেখে। সাধারণত কারুর সঙ্গেই সে কথা বলে না, ভাই বোনেরাও তাকে এড়িয়ে চললেই স্বস্তি বোধ করে। অপব্যয়ী সন্তান ঘরে ফিরে এসেছে, তবু তার একাকিত্ব ঘোচেনি।

৩

প্রায় একমাস হোলো ভিনসেণ্ট রোজ মাঠে গিয়ে ছবি আঁকছে,—এমনি সময় হঠাৎ কদিন ধরে তার মনে হতে লাগল কে যেন লুকিয়ে তার ওপর নজর রাখছে। নিউনেনের অধিবাসীরা বাঁকা চোখে তার দিকে তাকায়, মাঠের কৃষাণরা মাঝে মাঝে পাশে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তার ছবি-আঁকা দেখে,—কিন্তু এ নজর যেন অন্য রকম। ধারণা হোলো, গোপনে কেউ যেন তাকে অনুসরণ করেও চলেছে। প্রথম কদিন সে ধারণাটাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল মন থেকে। কিন্তু ঠিক পেছন দিকে জেগে রয়েছে অধরা দুটি অপলক চোখ—এ অনুভূতি বড় অস্বস্তিকর—দূরে-দূরে করলেও তাকে মন থেকে দূর করে দেওয়া অসম্ভব।

অনেকবার সে ঘুরে ঘুরে সারা মাঠটা দেখেছে, চোখে পড়েনি কিছু। রাস্তায় একবার হঠাৎ পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে মনে হয়েছে, দূরে ছাদের আড়ালে মেয়েলি একটি সাদা ঘাঘরা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আর-একদিন একটি তাঁতীর ঘর থেকে বার হয়েই মনে হোলো রাস্তার বাঁকে একটি ত্রস্ত মূর্তি যেন সরে গেল। তৃতীয় দিন বনের মধ্যে ছবি আঁকছিল, মাঝে তেষ্টা পাওয়ায় ঈজেলে ক্যানভাসটি রেখে অদূরে একটি পুকুরে জল খেতে সে গেল। ফিরে এসে দেখে নিজের রঙের ওপর কার আঙুলের ছাপ।

প্রায় দু-সপ্তাহের চেষ্টার পর মেয়েটিকে সে ধরল। ফাঁকা মাঠে লোকেরা মাটি খুঁড়ছিল, ভিনসেণ্ট স্কেচ করছিল তাদের। একটু দূরে ভাঙা একটা গাড়ি। মেয়েটি ঐ গাড়ির পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখছিল তার ওপর। হঠাৎ ঈজেল ক্যানভাস তুলে ভিনসেণ্ট হন-হন করে চলতে শুরু করল বাড়ির দিকে। মেয়েটিও ছুটতে লাগল সামনে। সে যে এখন মেয়েটিকে অনুসরণ করছে এমনি সন্দেহ যাতে মেয়েটির না হয়, এমনি ভাবে সে পেছনে পেছনে চলল। মেয়েটি ঢুকে পড়ল ঠিক তাদের পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে।

রাত্রে ভিনসেণ্ট আনা কর্নেলিয়াকে জিজ্ঞাসা করল,—আমাদের ওপাশের বাড়িটাতে কারা থাকে মা ?

—বীজম্যান পরিবার।

—কারা ওরা ?

—ওদের কর্তা বেঁচে নেই, বিধবা মা আর তার পাঁচ মেয়ে। এর বেশি কিছু জানিনে। বড়ো কুনো ওরা, বিশেষ মেশে না কারো সঙ্গে।

—ক্যাথলিক ?

—না, প্রোটেস্ট্যাণ্ট।

—মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ?

—কোথায়! সবকটাই আইবুড়ো। কেন, ওদের কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন রে ?

—না, এমনি মনে হোলো। সংসার চলে কী করে ?

—কেউ তো কিছু করে না। লোকে বলে অনেক পয়সা বুড়ো রেখে গেছে।

—কোনো মেয়ের নাম তুমি জানো মা ?

আশ্চর্য চোখে আনা কর্নেলিয়া একবার তাকালেন ছেলের দিকে। বললেন,—না, তা তো জানিনে।

পরের দিন ঠিক আগের জায়গাতে গিয়েই ঈজেল পাতল ভিনসেণ্ট। এত দিনে স্কেচটা প্রায় শেষ হয়েছিল, আজ সে রঙ চড়ালো ক্যানভাসে। নিবিষ্ট মনে কতক্ষণ কাজ করছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হোলো মেয়েটি বুঝি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ মুখ ফেরাতেই ভাঙা গাড়ির পেছনে চোখে পড়ল তার পোশাকের একটু আভাস।

—কী যন্ত্রণা! মনে মনে বললে,—ছবি শেষ না হয় না হোক, ওকে আজ আমি ধরবই!

ঈজেল সামনে নিয়ে কাজ না করে ভিনসেণ্ট পারে না, আস্তে আস্তে রঙ বোলানোও তার পক্ষে অসম্ভব। যখন সে কাজ করে তখন সবকিছু ভুলে যায়, হাত চলে নক্ষত্র-বেগে। দৃশ্য সে আঁকে না, চোখে দেখার পেছনে মনের যে অনুভূতিটা রয়ে যায়, তাকেই সে বাঁধতে চায় রঙে আর রেখায়। তার শিল্পকর্ম অদম্য আবেগে ছুটে চলে ঐ অধরা অনুভূতিটিকে বাঁধবার বাসনায়।

ভুলে গেল সে মেয়েটিকে। ঘণ্টাখানেক পরে পেছনে ফিরে দেখে মেয়েটি গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে ছুটে গিয়ে ওকে ধরবে, কৈফিয়ৎ চাইবে এমনি ব্যবহারের। কিন্তু ছবির টানে ওঠা হোলো না। আবার কিছুক্ষণ পরে পেছন ফিরে দেখে, মেয়েটি আরো ক-পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেন, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তারই দিকে।

সৃজন-প্রেরণার দুরন্ত আবেগে সে কাজ করতে লাগল। অবসর নেই

ছবি ছেড়ে ওঠার। আবেগ তার যতো বাড়ে, মেয়েটিও ততই এগিয়ে আসে। যতো উন্মাদনায় ক্যানভাসে রঙের ওপর রঙ চড়ে, ততোই যেন পশ্চাৎবর্তিনীর দৃষ্টির উত্তাপ বাড়তে থাকে। আবার একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল, মেয়েটি প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। আর স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে নেই, কিসের সম্মোহনে যেন নিশি-পাওয়ার মতো এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। নিজেকে ধরে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না, পারে না পদক্ষেপকে শাসন করতে,—এমনই অমোঘ আকর্ষণ।

এসে দাঁড়ালো ঠিক তার পেছনে, একেবারে পিঠের কাছে। ভিনসেন্ট ঘুরে তাকাতেই চোখাচোখি হোলো দুজনের। ত্রস্ত হরিণীর মতো দৃষ্টি মেয়েটির চোখে,—যেন কোন বিভ্রান্ত বাসনায় সে দিশেহারা। চোখ থেকে সরিয়ে মেয়েটি তাকিয়ে রইল ছবির দিকে। ভিনসেন্ট একটু অপেক্ষা করল,—কিন্তু কথা নেই মুখে মেয়েটির, শুধু নির্বাক একনিবিষ্ট দৃষ্টি। ভিনসেন্ট আবার মুখ ফিরিয়ে রঙ নিল তুলিতে। ছবিটা যখন শেষ হোলো তখনও তেমনি পেছনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি। আরো একটু ঘেঁষে এসেছে বুঝি, তার বসনপ্রান্তের স্পর্শ যেন লাগছে ভিনসেন্টের গায়ে।

গড়িয়ে এসেছে বিকেল। সারাদিনের কাজের পর ক্লান্ত ভিনসেন্ট, তবু সৃষ্টির খুশিতে উত্তেজিত। উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটির দিকে সে ফিরল।

সারাদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। শুকিয়ে গেছে মুখ, ডান হাতটি গলার কাছে, নিশ্বাস যেন নিতে পারছে না,—কম্পিত ওষ্ঠে ভাষাহারা ব্যাকুলতা।

ভিনসেন্ট বললে,—আমার নাম ভিনসেন্ট ভ্যান গক্, তোমাদের বাড়ির পাশেই থাকি। জানো বোধহয় ?

শোনাই যাচ্ছে না এমনি ফিস-ফিসে উত্তরে মেয়েটি বললে,—হ্যাঁ।

ভিনসেন্ট বললে,—তোমরা তো বীজম্যান। তা, বোনদের মধ্যে কোনটি তুমি ?

দুলে উঠল মেয়েটির দেহ, ভিনসেন্টের হাত ধরে চকিতে নিজেকে সামলে নিল সে। জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটি ভিজিয়ে নিল একবার, তারপর অনেক চেষ্টায় যেন বললে,—আমার নাম মার্গট।

—বেশ। তা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে মার্গট বীজম্যান,তুমি এমনি করে আমার পেছনে পেছনে ঘুরছ কেন বল তো ? ভেবেছিলে আমি বুঝি বুঝতে পারিনি ? দু-সপ্তাহের ওপর ধরে আমি দেখছি তোমার এই কাণ্ড।

অব্যক্ত একটা আর্তনাদ বার হয়ে এল মেয়েটির মুখ থেকে, নিজেকে সামলাবার চেষ্টায় ভিনসেন্টের হাতটা চেপে ধরল সে। তারপর মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাঠের ওপরে।

ভিনসেণ্ট হাঁটু গেড়ে বসে বাঁ বাহুর উপর মেয়েটির মাথা রাখল, কপাল থেকে সরিয়ে দিল বিস্রস্ত চুল। সারা মাঠ জুড়ে সূর্যাস্তের সোনালি, কৃষাণেরা ঘরমুখো। কেউ নেই চারিদিকে। ভিনসেণ্ট ভালো করে মেয়েটিকে দেখল। সুন্দরী নয়, ত্রিশের কম নয় বয়স—দু-একটি স্পষ্ট রেখা মুখে। চোখের কোণে বিষণ্ণ কালিমা। নিষ্প্রভ গায়ের রঙ।

সঙ্গে জল ছিল। অঞ্জলি ভরে ছিটিয়ে দিল চোখে মুখে, রঙ মোছবার ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল কপাল। চোখ খুলল মেয়েটি। ভিনসেণ্ট দেখল, বড়ো বড়ো ব্রাউন রঙের সুন্দর দুটি চোখ, ছায়া-ছায়া পল্লব, কেমন যেন কোমল অলৌকিক দৃষ্টি। হাতের তালু ভিজিয়ে নিয়ে আর-একবার সে ওর মুখে হাতটা বুলিয়ে দিল। থর-থর করে কেঁপে উঠল বাহুবন্দিনী।

ভিনসেণ্ট জিজ্ঞেস করলে,—একটু ভাল লাগছে মার্গট ?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল মার্গট, ভিনসেণ্টের চোখে চোখ রেখে। তারপর তার সমস্ত অন্তর মথিত করে বেরিয়ে এল একটা করুণ কান্না, দুহাতে ভিনসেণ্টের গলা জড়িয়ে তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠদুটি চেপে ধরল তার মুখে।

পরদিন গ্রাম থেকে দূরে পূর্বনির্দিষ্ট একটাজায়গায় দুজনের দেখা হোলো। মার্গটের পরনে একটি ধবধবে শাদা কেমব্রিক পোশাক, হাতে একটি রৌদ্র এড়ানোর বড়ো টুপি। এখনো ভীরু কম্পিত তার বুক, তবে কালকের চাইতে অনেকটা সংযত।

ভিনসেণ্ট ঈজেল পেতে বসে ছিল, মার্গটকে দেখে টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো। কে-র রূপের এক কণাও মার্গটের নেই, তবে ক্রিশ্চিনের তুলনায় তাকে সুন্দরী বলতে হবে বৈকি। ভিনসেণ্ট কী ভাবে তাকে সম্ভাষণ করবে স্থির করে উঠতে পারল না।

মার্গট সামনে এসে সোজাসুজি চুম্বন করল ভিনসেণ্টকে, তাকে দুহাতে জড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত টেনে রাখল বুকের কাছে—যেন কতোদিনের একান্ত আপনার প্রিয়জন। ভিনসেণ্ট মাটিতে তার কোটটা পেতে মার্গটকে বসালো। পাশে টুলের ওপর বসল নিজে। মার্গট কাছে ঘেঁষে বসে দু-হাঁটু জড়িয়ে ধরল। মুখ তুলে চেয়ে রইল তার দিকে। সে চাওয়ায় চরম আত্ম-নিবেদনের অব্যক্ত ভাষা। এই দৃষ্টির সঙ্গে ভিনসেণ্টের জীবনে প্রথম পরিচয়।

কথা এখানে অর্থহীন, তবু নামটি ধরে ডাকতে বড়ো ভালো লাগে। মার্গট ডাকল,—ভিনসেণ্ট !

কী করবে কী বলবে কিছুই ভেবে উঠতে পারে না ভিনসেণ্ট। শুধু বললে,—কী মার্গট ?

—কাল বাড়ি ফিরে তুমি আমাকে খুব খারাপ ভেবেছিলে ?

—কেন ? খারাপ ভাবব কেন ?

—বিশ্বাস করো ভিনসেণ্ট, কাল আমি যে তোমাকে চুমু খেয়েছি, তার আগে আর কোনো পুরুষকে চুমু খাইনি।

—সেকি। কাউকে কখনো ভালোবাসোনি তুমি?

—না।

—এ তো বড়ো দুঃখের কথা মার্গট।

একটুখানি চুপ করে থেকে মার্গট বললে,—ঠিকই বলেছ। আচ্ছা, তুমি ভালোবেসেছ?

—বেসেছি মার্গট।

—অনেক মেয়েকে?

—না, তিনজনকে মাত্র।

—তারাও ভালোবেসেছিল তোমাকে?

—না মার্গট, তারা বাসেনি।

—সেকি? সে আবার হয় নাকি?

—সত্যি মার্গট, ভালোবাসার ভাগ্যটাই আমার খারাপ।

মার্গট আরো নিবিড় হয়ে এল কাছে। একটি হাত তার কোলে রেখে অপর হাতটি বুলিয়ে দিতে লাগল ভিনসেণ্টের মুখে। পুষ্ট দুটি খোলা ঠোঁট, খাঁড়ার মতো নাক, ভরাট চিবুক, চওড়া কপাল—সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল তার আঙুল। বলতে লাগল অস্ফুট স্বরে,—কী জোর তোমার, কতো শক্তি! তোমার মতো পুরুষ জীবনে আমি আর দেখিনি!

ভিনসেণ্ট দুহাতের মাঝখানে ভরে নিল মার্গটের মুখ। প্রেমের উত্তাপে নতুন অনুভূতির উত্তেজনায় সে-মুখের পাণ্ডুরতায় নতুন আভা।

ত্রস্ত গলায় মার্গট শুধোলো,—আমাকে কি একটুও ভালো লাগে না ভিনসেণ্ট?

—লাগে বৈকি মার্গট।

—তাহলে একবার একটি চুমু খাও।

চুম্বন করল ভিনসেণ্ট।

—আমাকে তুমি খারাপ ভেবো না ভিনসেণ্ট। নিজেকে শত চেষ্টাতেও ধরে রাখতে পারলাম না। মনে মনে এতো ভালোবেসেছি তোমাকে, সে মনকে কতো বেঁধে রাখি বলো! কতোদিন আর দূরে সরে থাকব!

—ভালোবেসেছ? সত্যি তুমি ভালোবেসেছ আমাকে? কিন্তু কেন বল তো?

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে মার্গট চুমু খেল ভিনসেণ্টের ঠোঁটের কোণে। বললে,—এইজন্যে।

দুজনে বসে রইল চুপ করে। কিছু দূরে গ্রাম্য সমাধিক্ষেত্র। কৃষাণের জীবনের মতো তার মৃত্যুও ভিনসেণ্টকে টানে। যে মাঠটি তারা চষে, সেই

মাটির নিচেই কাজকর্ম সেরে তারা বিশ্রাম নেয়। এই চলেছে যুগ যুগ ধরে। মাটি থেকে গাছ ওঠে, শুকিয়ে ঝরে পড়ে মাটিতেই। ভিনসেণ্ট ভাবছে ছবির বুকে এই সহজ সরল মৃত্যুটির স্বরূপ কেমন করে দেবে,—শরৎ-শেষের নিশ্চুপ পাতা-ঝরার মতো যে মৃত্যু।

মৃদু গলায় মার্গট বললে,—আমার কথা কী তুমি জানো ভিনসেণ্ট?

—কিছুই না বলতে গেলে!

—মানে, ওরা—ওরা আমার কথা কিছু তোমাকে বলে নি? ধরো, আমার বয়েস—

—না, কেউ না।

—শোনো তবে, বয়েস আমার উনচল্লিশ। আর কদিন পরেই চল্লিশে পড়ব। গত পাঁচ বছর ধরে আমি মনে-মনে বলে আসছি, চল্লিশে পড়বার আগে একবার আমি ঠিক বাসব, বাসব, ভালোবাসব,—নইলে আত্মহত্যা করব।

—কিন্তু ভালোবাসা তো শক্ত নয় মার্গট!

—তাই বুঝি তোমার ধারণা?

—নিশ্চয়ই। ভালোবাসাটি ফিরিয়ে পাওয়াই শক্ত।

—না। এখানে, এই নিউনেনে, ভালোবাসাও সোজা নয়। গত কুড়ি বছর ধরে আমি প্রাণপণ কামনা করেছি কাউকে ভালোবাসব। পারিনি তো!

—কখনো না?

মুখ ঘুরিয়ে নিল মার্গট। কতো দূরে থেকে যেন বললে,—হ্যাঁ, একবার। তখন বয়েস আমার অল্প, বড়ো ভালো লেগেছিল একটি ছেলেকে!

ভিনসেণ্ট মার্গটের হাতটি স্পর্শ করে বললে,—কী হোলো?

—সে ক্যাথলিক ছিল। তাই ওরা তাকে তাড়িয়ে দিলে।

—ওরা কারা?

—আমার মা, আর আমার বোনেরা।

মাঠের নরম মাটিতে হাঁটু গেড়ে মার্গট বসল। নোংরা হয়ে যাচ্ছে সুন্দর শাদা পোশাকটা। উরুর ওপর কনুইদুটো রেখে দুহাতে মুখ ঢাকল।

—ভালোবাসাতেই যদি না ভরে, তাহলে মেয়ের জীবন শূন্যই থেকে যায় ভিনসেণ্ট।

—জানি।

—রোজ ভোরে যখন ঘুম ভাঙত, মনে মনে বলতাম, আজ নিশ্চয়ই আমার প্রেমিক আসবে। সব মেয়েরই আসে, আমার কেন আসবে না? দিন কেটে যেত, দিনের পর ব্যর্থ দিন, সারা রাত্রি-ভরা দুঃস্বপ্ন আর হতাশা। এমনি কেটে চলেছে পায়ে পায়ে নিষ্ফলা সময়, দাম-না-পাওয়া বছরের পর বছর রিক্ত জীবনের। শেষ পর্যন্ত তুমি এলে ভিনসেণ্ট, তোমাকে পেলাম। সব বঞ্চনা ঘুচল, মিলল আমার ভালোবাসার সেই চির-চাওয়া মানুষটি।

কথা নয়, যেন জয়-ঘোষণা। বাসনা নয়, যেন চরম অধিকার। বুভুক্ষু দুই হাত দিয়ে বেঁধে রাখল ভিনসেণ্টকে, ভরিয়ে দিল তার মুখ তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠের সহস্র চুম্বনে। স্তব্ধ হয়ে তার ছবি আঁকার টুলটির ওপর বসে রইল ভিনসেণ্ট, পাশে মাটিতে পড়ে রইল রঙমাখা প্যালেট আর তুলি। শূন্য প্রান্তর, অদূরে মৃত মানুষের সমাধি, কোলের মাঝে প্রেমাস্পদা নারী,—জীবনের সমস্ত নিরুদ্ধ কামনাকে যে একটিমাত্র পরম অঞ্জলিতে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছে তার পায়ে। ভিনসেণ্টের মনে হোলো,—দুঃখ নেই, ব্যর্থতা নেই, পূর্ণ হয়েছে তার জীবন-পাত্র। ধন্য এই মুহূর্ত, ধন্য এই মাটি, যেখানে বসে সর্বসমর্পিত প্রেমে অভিষিক্ত হোলো তার ভাগ্য। বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল তারও।

তার হাঁটুতে মাথা হেলিয়ে তার দুই পায়ের ফাঁকে শরীর এগিয়ে বসে রইল ওর মার্গট। চোখে ওর আলো, গালে ওর আরক্ত আভা। ফুলে ফুলে উঠছে বুকদুটি, যেন কতো কষ্ট করে নিশ্বাস নিচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রথম প্রেমের গৌরবে যেন যৌবনের নব-উজ্জীবন ওর অঙ্গে অঙ্গে। দেখে কে বলবে বয়স ওর ত্রিশের বেশি! ভিনসেণ্ট আস্তে আস্তে ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, যতোক্ষণ না ও তার হাতটি ধরে উত্তপ্ত গালের ওপর চেপে রাখল।

একটু পরে কথা শুরু করল আস্তে আস্তে।

—আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো না। তুমি আমাকে ভালোবাসবে সে হোতো দুরাকাঙ্ক্ষা, তা নিয়ে দুঃখ নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, ভালো যেন কাউকে বাসতে পারি নিজে। বিনিময়ে কারুর ভালোবাসা যে পাব সে আশা করিনি কখনো। ভালোবাসাটাই বড়ো কথা, তাই না ভিনসেণ্ট? ভালোবাসা ফিরে পাওয়া নয়।

ভিনসেণ্টের মনে পড়ল উরসুলার কথা, কে-র কথা। বললে,—ঠিক বলেছ।

ভিনসেণ্টের হাঁটুতে মুখ ঘষতে ঘষতে মার্গট বললে,—বলো, রোজ এমনি তোমার সঙ্গে আমাকে আসতে দেবে! একটি কথা বলব না, একটুও বিরক্ত করব না, শুধু চুপ করে তোমার কাছে বসে থাকব!

—নিশ্চয় মার্গট, রোজ আসবে। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। নিউনেনে যদি কোনো সাথী পাওনি, অন্য কোথাও চলে যাওনি কেন? টাকা ছিল না?

—টাকার অভাব আমার নেই। ঠাকুর্দার কাছ থেকে অনেক টাকা আমি পেয়েছি।

—হেগ-এ তবে যেতে পারতে, আমস্টার্ডামে যেতে পারতে,—সে সব জায়গায় কতো নতুন নতুন মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারতে।

—ওরা পথ আগলে রেখেছে আমার সারা জীবন।

—তোমাদের পাঁচ বোনের কারুরই বিয়ে হয়নি?

—না লক্ষ্মী, কারুর না।

হঠাৎ কেমন একটা বেদনার আঘাত লাগল ভিনসেণ্টের বুকে সম্বোধনটা

শুনে। এমনি সম্বোধনে কোনো মেয়ে তাকে ডাকেনি কোনদিন। ব্যর্থ ভালোবাসার বেদনার সঙ্গে তার গভীর পরিচয়, কোনো নারীর এমনি একান্ত ভালোবাসা পাওয়া তার নতুন। এতক্ষণ মার্গটের আত্মনিবেদনের উচ্ছ্বাসকে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সে যেন দেখছিল। এখন ঐ একটি আদরের কথায় তার মনটা যেন বদলে গেল। দুহাতে সে মার্গটের কম্পিত দেহটি বুকের কাছে টেনে নিল।

—ভিনসেণ্ট, ভিনসেণ্ট! মার্গট বলল চুপি-চুপি কানে কানে,—ভালোবাসি, কতো ভালোবাসি তোমাকে!

—আমাকে ভালোবাসো, একথা যখন বলো,—আশ্চর্য লাগে শুনতে।

মার্গট বললে,—জীবনের এতোগুলো বছর কেটেছে চাওয়ায় আর না-পাওয়ায়। দুঃখ নেই তাতে। সার্থক হয়েছে আমার প্রতীক্ষা। ভালোবাসার যতো স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে পাবার, তোমাকে সত্যি করে ভালোবাসার তুলনায় সে সব স্বপ্ন কিছু না।

—আমিও তোমাকে ভালোবাসি মার্গট।

—বোলো না, বোলো না ও কথা। মন-ভোলানো কথায় কী দরকার আমার বলো? আশা আছে একদিন-না-একদিন একটু ভালো হয়তো লাগবে তোমার আমাকে। সেটুকুই হবে যথেষ্ট। তার আগে,—আমাকে শুধু ভালোবাসতে দাও।

৪

আগের মতোই ছবি আঁকতে বাইরে বার হয় ভিনসেণ্ট, মার্গট প্রায় প্রতিদিনই তার সঙ্গে থাকে। পছন্দমতো দৃশ্যটির সন্ধানে মাইলের পর মাইল ভিনসেণ্ট হাঁটে। গরমে ক্লান্তিতে মার্গটের শরীর ভেঙে পড়তে চায়, তবু আপত্তি নেই। তার দেহে লেগেছে নতুন জোয়ার, দীপ্তিহীন শুষ্ক কেশে লেগেছে সোনালি আভা, শীর্ণ বিবর্ণ ওষ্ঠে রক্তিম পূর্ণতা। গায়ের চামড়া ছিল ফাটা ফাটা খসখসে, কদিনের মধ্যেই এসেছে তাতে লালিত্য আর মসৃণতা। চোখে নতুন আলো, দুটি বুকে পূর্ণ চন্দ্রকলা। উচ্ছল কণ্ঠস্বর, পদক্ষেপে বিজয়িনীর গর্ব। প্রেম এসে ওর অন্তরের কোন্ সুপ্ত ফল্গুধারাকে যেন মোচিত করেছে, সেই অমৃতধারায় ওর নিত্য নব স্নান।

ভিনসেণ্টকে খুশি করার জন্যে বাস্কেটে করে নতুন নতুন খাবার বানিয়ে নিয়ে আসে। যখন ভিনসেণ্টের কাছে চুপটি করে বসে থাকে, সৃষ্টির আবেগে ভিনসেণ্ট রঙের ওপর রঙ চড়ায়, সেই রঙে রাঙিয়ে ওঠে ওর মন।

ছবির বিষয়ে মার্গটের কোনো জ্ঞান নেই, কিন্তু ওর মার্জিত বুদ্ধি আছে, আর আছে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি। ঠিক কথাটি ঠিক জায়গাতে ও বলতে পারে, না জেনেও অনেকটা ও বোঝে। ভিনসেণ্টের মনে হয়, ও যেন একটি চমৎকার বীণা, অক্ষমের হাতে পড়ে মরচে ধরে গেছে যার তারে তারে।

মনে মনে বলে,—আহা, দশটা বছর আগে যদি ও আসত !

একদিন ঈজেলের শাদা ক্যানভাসে তুলির প্রথম আঁকটি যখন দেবে ঠিক করেছে, এমনি সময়ে মার্গট শুধোলো,—আচ্ছা, চোখের সামনের যে দৃশ্যটিকে তুমি পছন্দ করে নাও, ছবিতে সেই দৃশ্যটি যে ঠিক আসবে, তা তুমি বুঝতে পারো কী করে ?

মুহূর্তকয়েক ভাবল ভিনসেণ্ট। তারপর বললে,—সব সময় যে ঠিক হয় তা নয়। কখনো ভুল দৃশ্য নির্বাচন করি, কখনো বা হার মানি ছবি আঁকায়। তবু তো থামলে চলবে না, শাদা ক্যানভাস চোখের সামনে ধরলেই আমার পাগলামি আসে, মনে হয় যতো তাড়াতাড়ি পারি রঙ দিয়ে ভরে তুলতেই হবে।

—তা তুমি পারো! তোমার ছবির মতো তাড়াতাড়ি ঘাসও গজায় না।

—কী করি বলো! শাদা ক্যানভাস যেন আমাকে দুয়ো দেয়, বলে, বোকা, কিচ্ছু জানে না! আমি মনে মনে বলি, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। জীবনটা তো, মার্গট, ঠিক এই শাদা ক্যানভাসের মতো। সর্বদা তার আশাহারা দুঃখভরা শূন্য হতাশায় মুখটা মানুষের দিকে ফেরানো। কিন্তু যে মানুষের নিষ্ঠা আছে, সে ঐ শ্বেত শূন্যতা দেখে ভয় পায় না। চুপ করে বসে থাকে না সে। সে কাজ করে, গড়ে তোলে, সৃষ্টি করে,—মুহূর্তের অপব্যয় সে করে না। এরই ফলে জীবন তার আর শূন্য শাদা পাতা থাকে না, জীবন চিত্র হয়ে ওঠে।

মার্গটের এই বিহ্বল প্রেম চমৎকার লাগে ভিনসেণ্টের। এ প্রেম বিচার করে না, বিশ্লেষণ করে না, আত্মদানের আপন আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে! কর্কশ রেখাবহুল ভিনসেণ্টের মুখ, রুক্ষ তার গলার স্বর, অমার্জিত আচার ব্যবহার, মার্গটের তা চোখে পড়ে না। সে যে খালি ছবি আঁকে, পুরুষ হয়ে একটি পয়সা উপার্জন করে না, এ নিয়ে ওর বলার নেই কিছু। দিনশেষে নির্জন সায়াহ্নে দুজনে যখন বাড়ি ফেরে, মার্গটের কোমরে হাত জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতো কথা বলে ভিনসেণ্ট। প্রাণ খুলে বলে যায়,—কেন সে কাজকর্ম আর লৌকিক সফলতার পাকা রাস্তা ছেড়ে নেমে এসেছে শিল্পকর্মের ধূসর পথে, কেন তার শিল্পী-চোখে রাজার চেয়ে চাষীকে ভালো লাগে, বিলাসিনী নাগরিকাকে এড়িয়ে তালি দেওয়া ঘাঘরা-পরা গ্রামকন্যার রূপে মন মজে। মার্গটের কোনো চাহিদা নেই, প্রশ্ন নেই, ভিনসেণ্ট যেমন ঠিক তেমন ভিনসেণ্টই তার মন আছে।

তবু ভিনসেণ্টের অন্তরে অন্তরে অস্বস্তি। রোজ সে ভাবে, এবার ভুল ভাঙবে মার্গটের, নেশা কাটবে ক্ষণ-বসন্তের, ওর স্বচ্ছ চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে তার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরতা। কিন্তু তা হয় না। গ্রীষ্মের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ বাড়ে ওর রক্তের। প্রকৃতি অর্ঘ্য সাজায় ফুলে ফুলে, ও দেয় ভিনসেণ্টের হাতে তুলে ওর পরিপূর্ণ নারীত্বের অকৃপণ অকুণ্ঠিত অঞ্জলি।

ভিনসেণ্ট মনে মনে কুণ্ঠিত হয়। ভাঙুক, ভাঙুক ওর মোহ। তাই নিজের দীনতাকে ও ঘোষণার সঙ্গে প্রকাশ করে ওর কাছে, সম্ভাবনাবিহীন নিজের জীবন-চরিত্রকে কালো করে তুলে ধরতে চেষ্টা করে ওর সামনে।

আমস্টার্ডামে আর বরিনেজে তার যা হয়েছিল মার্গটকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনায়। বলে,—জানো মার্গট, কী ভাবে নষ্ট করেছি নিজেকে! কতো আশা ছিল বড়ো হবার সফল হবার,—সব খুইয়েছি নিজের ভুলে।

মার্গট শুধু মৃদু হাসে, বলে,—রাজা তুমি আমার, রাজা কি কখনো ভুল করে?

এর পরে মার্গটকে চুমু না খেয়ে কী বা করার আছে? এই চুম্বনেই হার স্বীকার।

আর-একদিন মার্গট বলে,—জানো, মা বলেছে তুমি নাকি খারাপ লোক। তুমি নাকি হেগ-এ নোংরা মেয়েমানুষদের সঙ্গে থাকতে। আমি কিন্তু খুব ঝগড়া করেছি মার সঙ্গে এ নিয়ে।

ভিনসেণ্ট ওকে ক্রিস্টিনের কাহিনী শোনালো, গোপন করল না কিছুই। শুনতে শুনতে মার্গটের দৃষ্টিতে অপরূপ এক করুণ বিষণ্ণ ছায়া নেমে এল।

সবশেষে বললে,—আমার কী মনে হয় জানো ভিনসেণ্ট? খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমার কোথায় যেন মিল আছে। সবাই তা বুঝবে না, আমার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয় বুঝতেন।

ভিনসেণ্ট বললে,—একটা ঘৃণিত বেশ্যার সঙ্গে দু-বছর আমি কাটিয়েছি। সব শুনে এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারলে না?

—ও বেশ্যা ছিল না ভিনসেণ্ট, ও সত্যিই ছিল তোমার স্ত্রী। ওকে যে তুমি কিছুতেই তুলে নিতে পারলে না শেষ পর্যন্ত, সে কি তোমার দোষ? বরিনেজের কয়লা-শ্রমিকদের যে ভাগ্যের হাঁ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারো নি, সে অপরাধ কি তোমার? এই সভ্যতার সর্বগ্রাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একলা একটা মানুষ কতোটুকু করতে পারে?

—ঠিক বলেছ মার্গট। ক্রিস্টিন আমার স্ত্রীই ছিল। আর কিছু তাকে ভাবিনি। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ছোট ভাই থিয়োকে একবার বলেছিলাম,— বউ আমার চাই,—ভালো বউ না পাই, খারাপ বউই আমার ভালো।

কেমন একটু আড়ষ্ট স্তব্ধতা। বিয়ের প্রসঙ্গ তাদের কথাবার্তায় কোনোদিন ওঠে নি। তারপর মার্গট বললে,—তোমার আর ক্রিস্টিনের ব্যাপারে একটি-মাত্র দুঃখ আমার মনে জাগল। পুরো দুটি বছরের এতো কষ্টের তোমার ভালোবাসা—এ যদি আমি পেতাম!

মার্গটের ভালোবাসাকে স্বীকার করে নিল ভিনসেণ্ট, নিতে বাধ্য হোলো। বললে,—যখন আমার বয়েস অল্প ছিল মার্গট, মনে হোতো জীবনে অনেক কিছু বুঝি হঠাৎ-হঠাৎই ঘটে যায়—আকস্মিক, অকারণ। বয়েস বেড়েছে,

মনে হচ্ছে আকস্মিকের পেছনে আসলে আছে গভীর কোনো রহস্য। অধিকাংশ মানুষই অন্ধকারে আলো খুঁজে খুঁজে ফেরে। দৈবের লীলা যখন তাকে স্পর্শ করে, তখনই রশ্মি ফুটে ওঠে তার চোখে।

—ঠিক, আমি যেমন অন্ধকারে এতোদিন খুঁজে খুঁজে মরছি তোমাকে।

ভিনসেণ্ট নিঃশব্দে মার্গটের ডানহাতটি ভরে নিল তার দুই হাতে।

শরৎকাল গেল, এল পাতা-ঝরার দিন। সারা নিউনেনে মার্গট আর ভিনসেণ্টকে নিয়ে কানাঘুষি। পড়শিরা সবাই মার্গটকে স্নেহ করে,—অবিশ্বাস করে ভিনসেণ্টকে, ভয় পায়। ওদের সম্পর্কটা ভেঙে দিতে চেষ্টা করল মার্গটের মা-বোন, মার্গট তাদের প্রবোধ দিল এই বলে যে শুধু বন্ধুত্ব ওর ভিনসেণ্টের সঙ্গে, নিতান্ত নিরীহ নিরাপদ বেড়িয়ে-বেড়ানোর সাথীত্ব। বীজম্যান পরিবার জানত ভিনসেণ্ট নিষ্কর্মা বাউণ্ডুলে,—আজ আছে, দুদিন পরেই আবার চলে যাবে কোথাও। বাড়ির লোকের যতো না দুশ্চিন্তা, ততো ভাবনা প্রতিবেশীর।—রাহুতে পেয়েছে মেয়েটাকে, এখনো যদি না ছাড়ে, তাহলে একেবারে অন্ধকারে ডোবাবে,—সকলের মুখে এই এক কথা।

ভিনসেণ্ট প্রথম-প্রথম বুঝতে পারে নি শহরের লোকের তার ওপর এমনি বিতৃষ্ণা কেন। কাউকে সে বাধা দেয়নি, ক্ষতি করেনি কারো। তার ধারণাই হয়নি এই গ্রাম্য জনপদের চির-সংস্কার-ঘেরা গোষ্পদে তার অদ্ভুত জীবনযাত্রা কতোটা আলোড়ন তুলবে। চোখ ফুটতে তার দেরি হয়নি অবশ্য। একদিন সকালবেলা সে মাঠের দিকে চলেছে, সারা শহরের মুখপাত্র হয়ে হাঁক দিয়ে তাকে ডাকল একজন দোকানী। দাঁত বের করে একগাল হেসে বললে,—যাই বলেন দাদা, গরমকালটা ছিল ভালো। শীত এসে গেল, এখন বেড়িয়ে বেড়ানোর সুখটাই মাটি।

ভিনসেণ্ট দুকথায় উত্তর দিলে,—তা ঠিক।

—তা, বলি অনেক তো বেড়ালেন, এবার কাজকর্ম কিছু একটা করুন।

পিঠের ঈজেলটাকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠিক করে নিয়ে ভিনসেণ্ট বললে,—সেইজন্যেই তো চলেছি।

—আহা, কী যে বলেন—আমি কাজের কথা বলছি, সত্যিকারের কাজ।

আস্তে আস্তে ভিনসেণ্ট বললে—ঠিকই বলেছি, ছবি আঁকাই আমার সত্যিকারের কাজ।

—কী মুস্কিল! আরে, সত্যিকারের কাজ কাকে বলে জানেন দাদা? যাতে কিনা পয়সা আসে। চাকরি, কিংবা মনে করুন পেশা।

—এই যে আমাকে সকালবেলা উঠেই মাঠে যেতে দেখছেন এই আমার পেশা,—ঠিক যেমন সকালে উঠেই দোকান খুলে জিনিস বিক্রি করা পেশা আপনার।

—বটে? আমি তো বিক্রি করি এ-জিনিস ও-জিনিস। আপনি যা করেন তা কি বিক্রি করেন?

এখানে এসে পর্যন্ত চেনা অচেনার এমনি প্রশ্নের উত্তর যে সে কতোবার দিয়েছে তার ঠিক নেই। ক্লান্ত হয়ে উঠেছে।

বললে,—করি বৈকি মাঝে মাঝে। আমার ভাই ছবির ব্যবসা করে, সে জেনে।

মাথা নেড়ে দোকানদার বললে,—না মিনহার, সত্যি, কাজকর্ম শুরু করুন এবার। নইলে বুড়ো বয়েসে দেখবেন ভবিল ফাঁক। এ বয়েসে এমনি কুড়েমি কি ভালো?

—কুড়েমি? জানেন, আপনার এই দোকান যতক্ষণ আপনি খোলা রাখেন তার ডবল সময় আমি খাটি?

—খাটেন? বসে বসে রঙের ছোপ লাগানো, ওর নাম খাটুনি? ও তো ছেলেখেলা! হ্যাঁ, একটা দোকান করুন, মাঠে গিয়ে লাঙল ঠেলুন, সেই তো জোয়ান মর্দের কাজ! কোনটে কাজ আর কোনটে ফাঁকি তা বোঝবার সময় নিশ্চয় হয়েছে। বলি, বয়েসটা তো আর কমের দিকে যাবে না।

দোকানদারের যা মন্তব্য সারা গ্রামের মত তাই। এদের ধারণায় শিল্পী আর কর্মী দুজনের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। লোকে কী বলে, কী ভাবে, তা গ্রাহ্য করা ভিনসেন্ট ছেড়েই দিল। তার ওপর লোকের সন্দেহ আর বিতৃষ্ণাও বেড়েই চলতে লাগল দিনের পর দিন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন ঘটল একটি দুর্ঘটনার ফলে।

হেলমণ্ড স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে আনা কর্নেলিয়া পড়ে গিয়ে পা ভাঙলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসা হোলো। আত্মীয়-স্বজনকে না বললেও ডাক্তার মনে মনে ভয় পেলেন,—রোগীর জীবন-সংশয়। ভিনসেন্ট দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে ছবি আঁকা দূরে সরিয়ে মার বিছানার ধারে এসে বসল। পীড়িতের সেবা কাকে বলে বরিনেজে থাকতে তা শিখেছিল। ডাক্তার তার শুশ্রূষা-পদ্ধতি দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন।

নিউনেনের অধিবাসীরা রোগীকে দেখতে আসতে লাগল—ফুল, বই এমনি নানা উপহার নিয়ে। দিন কাটতে লাগল উৎকণ্ঠায়। তারা নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ করতে লাগল ভিনসেন্টকে। একা সে দিনরাত মার শয্যার পাশে;—মাকে না সরিয়ে অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে সে বিছানা পাতে, জামা কাপড় পরায়, প্লাস্টার-বাঁধা ভাঙা পায়ের যত্ন করে। সপ্তাহ-দুয়েকের মধ্যে তার সম্বন্ধে সকলের ধারণা একেবারে বদলে গেল। কে বলে লোকটা সন্দেহকর চরিত্রের? সে তো সকলেরই মতো সহজ আর স্বাভাবিক। রোগীর শয্যা-স্ফোট কী করে বন্ধ করা যায়, কী পথ্য দেওয়া উচিত, কতোটা গরম রাখা দরকার রোগীর ঘর,—সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে এসব আলোচনা করে কী করে তাহলে? তাছাড়া পুরুষ মানুষ হয়েও এতোখানি একনিষ্ঠ সেবার গুণ যার মধ্যে রয়েছে, তার সম্বন্ধে এতোদিনের কল্পিত মন্দ ধারণা ভুল ছাড়া আর কী? মা যখন

একটু ভালো হলেন, তখন মাঝে মাঝে ভিনসেণ্ট ছবি আঁকতে বার হতে লাগল। গ্রামের লোক আর দূর থেকে বাঁকা চোখে তাকায় না, নাম ধরে কাছে ডাকে, নানা কথা শুধোয়, গাল-গল্প করে।

মার্গট সব সময় পাশে-পাশে,—পথে বা রোগীর ঘরে। ও-ই কেবল তাঁর সুকোমল সেবা-বৃত্তি দেখে আশ্চর্য হয়নি। একদিন রোগীর ঘরে চুপি-চুপি ক-জনে গল্প করছে। কথা প্রসঙ্গে ভিনসেণ্ট বললে,—মানুষের দেহটাকে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যায় তাহলে অনেক কিছুই জানা যায়। তবে, তাতে অনেক পয়সা খরচ। এ বিষয়ে জন মার্শালের খুব সুন্দর একটা বই আছে। বইটার নাম 'অ্যানাটমি ফর আর্টিস্টস'। প্রচুর দাম বইটার।

মার্গট বললে,—কেনো না কেন বইটা ?

ভিনসেণ্ট বললে,—টাকা কই ? দাঁড়াও দু-একটা ছবি বিক্রি হোক, তখন কিনব।

—আমার অনেক টাকা। আমি দেব, তুমি কেনো বইটা এখুনি।

—লক্ষ্মী মেয়ে মার্গট, খুব ভালো তুমি। কিন্তু তোমার টাকা নিতে পারিনে।

জোর করলে না মার্গট।

কয়েক সপ্তাহ পরে সে ভিনসেণ্টের স্টুডিয়োতে এসে তার হাতে তুলে দিলে একটি প্যাকেট।

ভিনসেণ্ট শুধোলে,—কী আছে এতে ?

—খুলে দ্যাখোই না।

মার্শালের সেই বইটা। ফিতে দিয়ে বাঁধা, ফিতের সঙ্গে আটকানো এক-টুকরো কাগজ। তাতে লেখা শুধু দুটি কথা—মধুরতম জন্মদিনে।

অবাক হয়ে গেল ভিনসেণ্ট, বললে,—বাঃ, আমার জন্মদিন আজ কে বললে ?

মধুর হেসে উঠল মার্গট,—তোমার কেন হবে ? আমার জন্মদিন। চল্লিশ বছরে পড়লাম আজ। জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার তুমি আমাকে দিয়েছ ভিনসেণ্ট,—আমার এই সামান্য উপহারটুকু তুমি নেবে না ? আজ আমার খুশির শেষ নেই, তুমি একটু খুশি হবে না আমার সঙ্গে ?

বাগানের মাঝখানে স্টুডিয়ো। কেউ নেই কাছাকাছি কোথাও। বাড়িতে মার কাছে শুধু উইলেমিন বসে আছে। গড়িয়ে এসেছে বিকেল, দেয়ালে শেষ-সূর্যের একফালি পড়ন্ত রোদ। ভিনসেণ্ট সযত্নে হাত বোলাতে লাগল বইটার ওপর। তার শিল্পী-জীবনে অন্তর থেকে ভালোবেসে কেউ তাকে সাহায্য করেছে,—থিয়োর পর এই প্রথম। বইটাকে বিছানায় ফেলে সে দুহাতে আলিঙ্গন করল মার্গটকে। পাছে লোকে দেখে তাই মাঠের মধ্যে মার্গটকে আদর করতে তার ভয় করে। এই নিঃসঙ্গ গৃহান্তঃপুরে মার্গট নিজেকে সমর্পণ

করতে চায় ভিনসেণ্টের হাতে উদার অকৃপণতায়। প্রেমের পুলকে বাষ্পাকুল, মুদ্রিত ওর চোখ। ভয় করে ভিনসেণ্টের। ক্রিস্টিনকে ছেড়ে আসার পর পুরো পাঁচটা মাস কেটেছে। বিশ্বাস নেই নিজের ওপর। মার্গটের ক্ষতি হয় এমন কিছু যেন সে করে না ফেলে।

ভিনসেণ্ট চুম্বন করে ওকে,—খোঁজে ওর আধ-খোলা যুগল আঁখির ভাষা। মুখে ওর তৃপ্ত হাসির আভা, চুম্বন-শেষেও স্ফুরিত ওর ওষ্ঠ নব-চুম্বনের আমন্ত্রণে। নিবিড় আবেগে ঘনিয়ে আসে আরো কাছে, মুখ থেকে পা পর্যন্ত দুজনের আলিঙ্গনে কোথাও কোনো ছেদ থাকে না। দুজনে বসে পড়ে বিছানায়,—আকুল বাহুবন্ধনে ভুলে যায় যৌবনের বিদায়ী বসন্তের যতো বেদনা, যতো আক্ষেপ।

সূর্য অস্ত গেল, মুছে গেল শেষ রৌদ্র-রশ্মিটুকু। ঘরভর্তি নরম নরম অন্ধকার। মার্গট হাত বুলিয়ে দেয় ভিনসেণ্টের মুখে—কম্পিত সে হাত, কম্পিত দুটি স্তন। কণ্ঠে ভাষাহারা অস্ফুট ধ্বনি। ভিনসেণ্ট বোঝে, ডুবছে সে বাসনার অতল অবগাহনে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায়, জোর করে ছিনিয়ে নেয় নিজেকে মার্গটের বাহুপাশ থেকে। উঠে দাঁড়ায়, ঈজেলে আঁটা অর্ধেক-আঁকা ছবিখানা হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে চেপে ধরে। দাঁতে দাঁত চাপা, ঝংকৃত দেহের প্রতিটি স্নায়ু।

কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু বাইরে বৃক্ষশাখায় নীড়ে ফেরা পাখির পাখা-ঝাপটানি, আর দূরের পথে গৃহমুখী গাভীর গলার ঘণ্টাধ্বনি। কাটে কয়েকটি মুহূর্ত, তার পরে কথা বলে মার্গট। মৃদু শান্ত গলায় সহজ আহ্বান—

—নাও ভিনসেণ্ট,—যদি চাও তো নাও আমাকে!

ওর দিকে মুখ না ফিরিয়ে ভিনসেণ্ট বলে,—কেন, কেন ডাকছ অমন করে?

—ভালোবাসি যে, সব যে দিতে চাই!

—অন্যায় হবে যে!

—অন্যায়? কী বলো তুমি? রাজার কি কখনো অন্যায় হয়?

হাঁটু গেড়ে বসে ভিনসেণ্ট বিছানার পাশে। বালিশে এলানো মার্গটের মাথা। মুখের বাঁ ধারে ওর স্পষ্ট একটি রেখা, সেইখানে ঠোঁট রাখে ভিনসেণ্ট। চুম্বন করে নাকে, চোখে, গলায়, ঘাড়ের কেশরেখাতটে,—জিভটি বুলিয়ে বুলিয়ে দেয় গালের ওপর দিয়ে। কে বলে ও যৌবন-প্রান্তবর্তিনী? গ্রহণ ও আত্মদানের উন্মুখ আবেগে শিহরিত প্রথম মিলনসুখে মূর্ছিত শ্লথ ভঙ্গিমায় দু-হাতে ভিনসেণ্টের গলা জড়িয়ে শুয়ে আছে—ও যেন আত্মবিসর্জিতা নবযৌবনা কামিনী!

ভিনসেণ্ট ওর কানে কানে বলে,—আমিও তোমাকে ভালোবাসি মার্গট। আগে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝেছি।

স্বপ্নালু কণ্ঠে মার্গট উত্তর দেয়,—ভারি মিষ্টি করে তুমি কথা বলতে পারো। আমি জানি একটুখানি অন্তত আমাকে তোমার ভালো লাগে। আর তার বদলে আমার সবকিছু দিয়ে আমি তোমাকে ভালোবাসি। তাতেই আমার তৃপ্তি।

মার্গটকে ভালোবাসল ভিনসেণ্ট। উর্সুলা আর কে-কে যেমন ভালোবেসেছিল এ ভালোবাসা সে রকম নয়। ক্রিশ্চিনকে যেমন ভালোবেসেছিল তেমনও নয়। কেমন যেন চিত্তবিগলিত করুণা ঐ মেয়েটির ওপর,—অকুণ্ঠিত আত্ম-উপঢৌকনে যে চরিতার্থ, তৃপ্তিস্তব্ধ যে তার বাহুবন্ধনে। এমনি করে যে মেয়ে নিজেকে দেয়, তার জন্যে সে কেন পাগল হতে পারে না, এই ভেবে কোমল বিষাদে ভিনসেণ্টের মন ভরে গেল,—মনে পড়ল উর্সুলা আর কে-র প্রতি উপেক্ষিত ভালোবাসার কী যন্ত্রণা সে একদা পেয়েছে। মার্গটের এই ভালোবাসার অঞ্জলি পরম শ্রদ্ধায় সে মাথায় ধরুক, কিন্তু মুখে তুলতে গেলে সত্যি কেমন যেন বিষাদ লাগে। এমনি বিস্বাদেই কি উর্সুলা তাকে উপেক্ষা করেছিল, কে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—যখন সে এমনি ভালোবাসার অর্ঘ্য নিয়ে গিয়েছিল তাদের কাছে ?

মার্গটকে ভিনসেণ্ট বললে,—অতি দীন আমার জীবন, তবু বলি, এ জীবনে তুমি কি আসবে ?

—হ্যাঁ প্রিয়, তুমি যদি ডাকো।

—নিউনেনেই আমরা থাকব, না বিয়ের পর অন্য কোথাও যাবে আমার সঙ্গে ?

ভিনসেণ্টের বাহুমূলে সোহাগে মুখ ঘষতে ঘষতে মার্গট উত্তর দিল,—যেখানেই তুমি যাবে, আমি যাব তোমার সঙ্গে ভিনসেণ্ট।

৫

কথাটা তারা ভাঙল নিজের নিজের পরিবারে। ঝড় উঠল।

ভ্যান গক্ পরিবারের আপত্তিটা সরাসরি ব্যবহারিক। বাবা বললেন,—বিয়ে অমনি একটা করলেই হোলো ? রোজগার করো, নিজের পায়ে দাঁড়াও, জীবনটাকে সোজা পথে চালাও, তারপর বিয়ের চিন্তা।

ভিনসেণ্ট বললে,—জীবন আমার সোজা পথেই চলেছে। আমার শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে আমি সত্যকে আবিষ্কার করে চলেছি। টাকা রোজগার যথাসময়ে হবেই।

বাবা বললেন,—বিয়েটাও তোমার তাহলে সেই যথাসময়েই হবে। অবিলম্বে নয়।

এ বাড়িতে বাতাসের কিছুটা ঝাপটা মাত্র, আসল কালবৈশাখী মেয়ের বাড়িতে। পাঁচ বোনের প্রত্যেকেই যদি অবিবাহিত থাকে, সমাজে পাঁচজনেরই

মাথা উঁচু। আর তাদের মধ্যে একজনের যদি বিয়ে হয়ে যায়, লোকের চোখে বাকি চারজনের দৈন্য ধরা পড়ে যাবে যে। একজনের জন্যে বাকি চারজন হার মানবে? বললেই হোলো? মাদাম বীজম্যান ভাবলেন, এক মেয়ের সুখের রাস্তা খুলবে, আর বাকি চার মেয়ে অসুখী থাকবে চিরদিন? তার চেয়ে ঐ এক মেয়ের সুখের আশায় জলাঞ্জলিই মঙ্গল।

মার্গট সেদিন দিনের বেলা ভিনসেণ্টের সঙ্গে যায়নি, সন্ধ্যাবেলা এল স্টুডিয়োতে। চোখদুটো তার ফুলো ফুলো, চেহারাটা দেখাচ্ছে সত্যিই চল্লিশ-পার-হওয়া বুড়ির মতো। কেমন এক হতাশ আকুলতায় সে জড়িয়ে ধরল ভিনসেণ্টকে।

বললে,—ওরা সারাদিন যা-তা কথা বলছে তোমার নামে। কারুর নামে এতো খারাপ কথা কোনোদিন আমি শুনিনি।

—এ তো তোমার আশা করাই উচিত ছিল মার্গট।

—আশা যে করিনি তা নয়, তবে, ওরা যে এতোটা হিংস্রভাবে তোমাকে আক্রমণ করবে তা ভাবিনি।

ভিনসেণ্ট ওকে কাছে টেনে একটি মৃদু চুম্বন করল। বললে,—ওদের কথা ভেবো না। আমি রাত্রে খাওয়ার পর তোমাদের বাড়ি যাব। আমার খুব বিশ্বাস আমি যে খুব সাংঘাতিক লোক একটা নই তা আমি ওদের বুঝিয়ে দিতে পারব।

বীজম্যানদের চৌকাঠ পার হয়েই ভিনসেণ্টের মনে হোলো, সে যেন শত্রু-ব্যূহের মধ্যে পা দিয়েছে। ছটি স্ত্রীলোক থাকে এ বাড়িতে, পুরুষের কণ্ঠস্বর এর চৌহদ্দিতে কখনো বাজে না,—কেমন যেন অশুভ আবহাওয়া।

চার বোন আর মা একসঙ্গে এসে দাঁড়ালো দরজায়, ডেকে নিয়ে গেল তাকে বসবার ঘরে। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে ঘরটা। মার্গটও উপস্থিত হোলো। ভিনসেণ্ট বাকি চার বোনের নাম জানত, জানত না কোন্ নামটি কার। সবচেয়ে বড় যে বোন সেই শুরু করল প্রশ্নবাণ।

—মার্গট আমাদের বলছে আপনি নাকি ওকে বিয়ে করতে চান। হেগ শহরে আপনার এক স্ত্রী ছিল বলে আমরা শুনেছি, আপনার সে স্ত্রীর কী হোলো জানতে পারি কি?

ভিনসেণ্ট সংক্ষেপে ক্রিস্টিনের কাহিনী বলল। শীতলতর হোলো ঘরের আবহাওয়া।

দ্বিতীয় প্রশ্ন,—আপনার বয়েস কতো জানতে পারি মিনহার ভ্যান গক্?

—একত্রিশ।

—মার্গট কি আপনাকে বলেছে যে তার বয়েস—

—হ্যাঁ। মার্গটির বয়েস আমি জানি।

—এবার কি জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনার আয় কতো?

—মাসিক দেড়'শো ফ্র্যাঙ্ক।

—আয়ের সূত্রটা কী, জানতে পারি কি?

—আমার ছোট ভাই আমাকে পাঠায়।

—ও। তার মানে আপনি বলতে চান, আপনার ভরণ-পোষণ চলে আপনার ছোট ভাইএর সাহায্যে?

—না, সে আমাকে মাস-মাহিনা দেয়, তার বদলে যা-কিছু আমি আঁকি সব তার প্রাপ্য।

—আপনার ছবিগুলো বিক্রি হয় কেমন?

—তা আমি ঠিক বলতে পারি নে।

—ও। তা, আপনি না পারলেও আমরা পারি। আপনার বাবার কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে আপনার একখানা ছবিও আজ পর্যন্ত বিক্রি হয়নি।

—এখন না হোক পরে হবে। যে টাকা এখন ভাই আমাকে দিচ্ছে, সময়ে তার অনেক গুণ সে ফিরে পাবে।

—সেটা সম্ভাবনা,—দুরাশাও হতে পারে। যা বাস্তব, তার মধ্যে আলোচনাটা সীমাবদ্ধ রাখাই এখন ভালো। কী বলেন?

বড়ো বোনের শুষ্ক কঠোর মুখটা ভিনসেন্ট ভালো করে লক্ষ করল। এই হৃদয়হীনার কাছ থেকে কোনো সহানুভূতির আশা নেই।

ভগ্নী আবার প্রশ্ন করল,—সত্যিকারের উপার্জনের যদি ক্ষমতা আপনার না থাকে, তাহলে বিয়ে করে স্ত্রীকে খাওয়াবেন কী বলতে পারেন?

ভিনসেন্ট বললে,—আমার ভাই আমার পেছনে মাসে যে দেড়'শো ফ্র্যাঙ্ক করে খরচ করে, সেটা তার খেয়াল হতে পারে, আপনার নয়। আমার পক্ষে এ টাকাটা মাস-মাহিনা। এটা আমি অমনি পাইনে, প্রচণ্ড খেটে উপার্জন করতে হয়। একটু হিসেব করে চললে এই টাকাতেই আমার আর মার্গটের খুব চলে যাবে।

এতক্ষণে কথা বললে মার্গট। প্রতিবাদ করল সে,—তাই বা কেন? আমার নিজের টাকা নেই নাকি?

বড়ো বোন ধমক দিয়ে উঠল,—চুপ করো মার্গট, তোমাকে কথা বলতে হবে না এখানে।

মা বললেন,—মনে রেখো মার্গট, আমাদের পরিবারের সম্মানহানি হয় এমন কোনো কাজ যদি তুমি করো, তাহলে ও টাকা আমি বন্ধ করে দেব। সে অধিকার আমার আছে।

হাসি পেল ভিনসেন্টের। এবার সে প্রশ্ন করলে,—মার্গট যদি আমাকে বিয়ে করে তাতে কি আপনাদের পরিবারের সম্মানহানি হবে?

মা ঘুরিয়ে বললেন,—আপনাকে আমরা খুব কমই জানি, মিনহার ভ্যান

গক্,—আর যেটুকু শুনেছি তা খুব সুখকর নয়। কদিন থেকে আপনি ছবি আঁকছেন?

—তিন বছর হোলো।

—এতোদিনে আপনি যে সফল শিল্পী হয়েছেন তা বলা যায় না। তা হতে আপনার আর কতোদিন লাগবে?

—তাও বলা যায় না।

—আচ্ছা, ছবি-আঁকার আগে আপনি কী করতেন?

—অনেক কিছু। ছবির ব্যবসা করেছি, শিক্ষকতা করেছি, বই বিক্রি করেছি, ধর্ম-প্রচারকের কাজ করেছি।

—এ সবের কোনো কাজেই আপনি টিঁকতে পারেন নি?

—তা নয়। নিজেই আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন?

— ওসব কাজের আমি উপযুক্ত ছিলাম না বলে।

—ছবি আঁকা ছাড়বেন আর কতোদিনে?

—মার্গট চেঁচিয়ে উঠল,—কখনো না!

বড়ো বোন আলোচনায় সমাপ্তি টানবার ভার নিল। বললে,—আমাদের মনে হয় মিনহার ভ্যান গক্, মার্গটের মতো মেয়েকে বিয়ে করতে চাওয়া আপনার পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার কোনো আভিজাত্য নেই, এক টা পয়সা নেই বা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই। কোনো ভদ্র-রকমের কাজে লেগে থাকবার মতো ধৈর্য আপনার নেই। আপনার মতো বাউণ্ডুলের হাতে আমাদের বোনকে আমরা তুলে দেব একথা ভাববার সাহসটুকু কী করে পেলেন তাই আশ্চর্য!

ভিনসেণ্ট ক্লান্ত স্বরে বললে,—সব কথার পরে যে কথাটা থাকে সেটা হচ্ছে এই যে মার্গট আমাকে ভালোবাসে, আমি মার্গটকে ভালোবাসি। আমার কাছে ও সুখীই হবে। বছর-খানেক এখানে আমরা থাকব। তারপর ওকে নিয়ে আমি বিদেশে চলে যাব। ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু ও জীবনে আমার কাছে পাবে না। ভয় নেই আপনাদের।

তীক্ষ্ন গলায় চিৎকার করে উঠল আর-একটি বোন,—বুঝেছি। তারপর ওকে আপনি দূর করে দেবেন। হেগ-এর সেই মেয়েমানুষটার মতো নতুন একজনকে জুটিয়ে নেবেন তারপর, তাই না?

তৃতীয় বোন বললে,—আসল কথা টাকার লোভ। মার্গটকে বিয়ে করে ওর টাকা কটা বাগাতে চান, তাই না?

চতুর্থ বোন বললে,—অতো সোজা না। মার্গট যদি ওকে বিয়ে করে, সব টাকা মা আটকে রাখবে আমাদের জন্যে। তখন দেখা যাবে মজা!

জল এল মার্গটের চোখে। উঠে দাঁড়ালো ভিনসেণ্ট। এদের সঙ্গে কথা

বাড়িয়ে লাভ নেই। সোজাসুজি মার্গটকে নিয়ে ঈণ্ডহোভেনে গিয়ে সেখানে তাকে বিয়ে করে প্যারিস যাত্রা করা ছাড়া উপায় নেই। এতো শীঘ্র ব্র্যাবাণ্ট ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে নেই, এখানে তার কাজ এখনো বাকি। কিন্তু এই নিষ্ফলা নারীদের কবলে মার্গটকে পড়ে থাকতে হবে ভেবে তার মন শিউরে উঠল।

পরের কটা দিন মার্গটের কাটল অসহ্য যন্ত্রণায়। বরফ-পড়ার দিন এল, ভিনসেণ্টের সারা দিন কাটতে লাগল স্টুডিয়োর মধ্যে। ওরা মার্গটকে ভিনসেণ্টের স্টুডিয়োতে যেতে দেয় না। সকাল সন্ধ্যা চব্বিশ ঘণ্টা ওর কানে শোনায় ভিনসেণ্টের দুর্নাম আর নিন্দা। মার্গটের জীবনের চল্লিশটা বছর কেটেছে নিজের পরিবারের সঙ্গে। সে তুলনায় ভিনসেণ্টের সঙ্গে ওর পরিচয় কদিনেরই বা। বোনদের ও ঘৃণা করে, জানে তারা ওর জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিতে চলেছে। তবে, প্রচণ্ড ঘৃণা বোধহয় ভালোবাসারই এক বিকৃত রূপান্তর, বরং ভালোবাসার চেয়ে এমনি ঘৃণার আকর্ষণ কর্তব্যক্ষেত্রে আরো অনেক তীব্র।

একদিন নিভৃতে সাক্ষাৎ হতে ভিনসেণ্ট মার্গটকে বললে,—আমি বুঝিনে তুমি আমার সঙ্গে এখান থেকে চলে যেতে চাও না কেন। কিম্বা এখানে থেকেই বা আমাকে বিয়ে করতে তোমার কেন এতো দ্বিধা।

মার্গট বলে,—ওরা যে তা দেবে না।

—তোমার মা?

—না, আমার বোনেরা। মার কোনো মত নেই, ওরা যা বলে তাতেই তাঁর সায়।

—তোমার বোনদের মত আছে কি নেই, কী এসে যায় তাতে তোমার?

—মনে আছে তোমাকে বলেছিলাম—অল্প বয়সে একটি ছেলের প্রেমে আমি পড়েছিলাম?

—মনে আছে।

—তাতেও ওরা বাদ সেধেছিল—আমার বোনেরা। জানিনে কেন, সারা জীবনে যা কিছু করতে চেয়েছি ওরা করতে দেয়নি। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতে চেয়েছি, যেতে দেয়নি। বই পড়তে চেয়েছি, বাড়িতে বই আনা বন্ধ করেছে। কখনো-বা কোনো পুরুষ আমার আমন্ত্রণে বাড়িতে এসেছে, ওরা তাকে এমন করে কুটি-কুটি করে ছিঁড়েছে যে দ্বিতীয়বার সে আর আমার দিকে চোখ তুলে চায়নি। কতোবার ভেবেছি কিছু করি, জীবনটাকে কোনো ভাবে সার্থক করে তুলি, পারিনি ওদের জন্যে। কখনো পারিনি ওদের বজ্রমুষ্টি এড়াতে।

—আর এখন?

—এবারেও ওরা দেবে না তোমাকে বিয়ে করতে।

নবজাত প্রেমের সুষমা ইতিমধ্যেই অনেকটা মুছে গেছে ওর অঙ্গ থেকে। ঠোঁটদুটি শীর্ণ, বিবর্ণ গায়ের রঙ।

ভিনসেণ্ট প্রবোধ দিল, বললে,—ওদের অতো ভয় করো কেন? ওরা তোমার কী করবে মার্গট? আমার ভাই আমাকে কতোবার বলেছে প্যারিসে যেতে। চলো এখান থেকে, প্যারিসে আমরা সুখে থাকব।

উত্তর নেই মুখে। শুধু বিছানারধারে শ্লথ ভঙ্গিতে বসে রইল মার্গট ডানহাতে রক্তহীন মুখটা ঢেকে।

হাতটি টেনে নিয়ে ভিনসেণ্ট বললে,—ওরা যদি মত না দেয়, তাহলে কি আমাকে বিয়ে করতে তুমি ভয় পাও?

—না, ভয় কিসের?

গলার সুরে কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের লেশ নেই। একটু পরে ডুকরে উঠল মার্গট,—মরব আমি, তোমার কাছ থেকে ওরা যদি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়, আমি তাহলে আত্মহত্যা করব!

—ছিঃ, পাগল! ওরা পারবে কেন? আগেই তো আমরা বিয়ে করব, পরে ওদের জানালেই হবে।

—পারব না, পারব না আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করে! আমি একলা, ওরা অনেকগুলো। ওরা যে আমাকে হারিয়ে দেবে ভিনসেণ্ট।

—কে বলেছে তোমাকে লড়াই করতে? বিয়েটা হয়ে গেলেই তো সব লড়াইএর শেষ। তখন তো শুধু তুমি আর আমি।

—না। তখনই হবে লড়াইএর শুরু। আমার বোনদের তুমি জানো না।

—বয়ে গেছে আমার জানতে। তবু, বেশ, আজ রাত্রে আবার আমি তোমাদের বাড়ি যাব। দেখি কী হয়।

বৃথা আশা, তবু সে গেল প্রস্তর-কঠিনা পঞ্চনারীর শীতল সান্নিধ্যে। বোঝালো অনেক করে।

বড়ো কন্যা শেষ পর্যন্ত বললে,—এসব আগেই অনেক শুনেছি মিনহার ভ্যান গক্, ভেবেও আমরা দেখেছি অনেক। মার্গট সুখী হোক তা আমরা সকলেই চাই, তাই বলে হাত পা বেঁধে আমরা ওকে জলে ভাসিয়ে দিতে পারি নে। আমরা স্থির করেছি যে এখন থেকে দু-বছর পরেও যদি আপনি ওকে বিয়ে করতে চান তাহলে আমাদের আপত্তি আমরা ফিরিয়ে নেব।

—দু-বছর!

মার্গট শান্তস্বরে বললে,—দু-বছর পরে আমি এখানে থাকব না।

—থাকবে না! যাবে কোথায়?

—থাকব ওপারে। ওকে বিয়ে করতে যদি আমাকে না দাও তাহলে নিজের হাতে মরব আমি।

সমস্বর প্রতিবাদে ভেঙে পড়ল পঞ্চ নারী-কণ্ঠ।

ভিনসেণ্ট বিদায় নিল নীরবে। আর কিছু তার করার নেই।

মার্গটই বা কী করবে? কতোটুকু আর শক্তি ওর পরিবারের এই সংহত প্রতিরোধকে ব্যাহত করার? বয়স ওর অল্প নয়, স্বাস্থ্য ওর ভালো নয়, উদ্যমহীন ভ্রষ্ট মনোবল। আত্মপ্রত্যয়ের কণাটুকু দিনে দিনে সংসার নিংড়ে নিয়েছে ওর বুক থেকে। বয়স যদি অল্প হোতো, সম্ভাবনার মন্ত্রে পেত যুদ্ধের প্রেরণা। আজ বড়ো দেরি। চোখে ফিরে এলো আগেকার ভীরু করুণ হতাশ দৃষ্টি, মুখের নবোদ্ভাসিত লাবণ্য গেল মুছে, ত্বকে ফুটে উঠল নিহিত বলিরেখা। দেহ থেকে বিদায় নিল ক্ষণ-বসন্তের আভা।

ভিনসেণ্ট বোঝে না মার্গটকে নিয়ে সে করবে কী। ওর রূপের নির্বাপিত ক্ষণদীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি আকর্ষণও লুপ্ত হতে চলেছে। সত্যিই যে সে ওকে ভালোবাসতে বা বিয়ে করতে মন থেকে চেয়েছিল তা নয়। সামান্যতম আসক্তিটুকুও এখন অবসিত। নিজেকে দোষী মনে হয় এইজন্যে—তাই সে জোর করে আরো উদগ্র করে তোলে প্রেমের অভিব্যক্তিকে।

একদিন কয়েক মিনিটের জন্যে মার্গট লুকিয়ে তার স্টুডিয়োতে আসে। ভিনসেণ্ট বলে,—তুমি কি আমার চাইতে তোমার মা বোনদের বেশি ভালোবাসো, মার্গট?

চমকে ওঠে মার্গট, তারপর ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়,—একথা কেন বললে, ভিনসেণ্ট?

—তাহলে আমাকে তুমি ত্যাগ করছ কেন?

ক্লান্ত শিশুর মতো মার্গট আশ্রয় নিল ভিনসেণ্টের বাহুবন্ধনে। কণ্ঠে তার সর্বহারার সুর। বললে,—আমি তোমাকে যতো ভালোবাসি তুমিও আমাকে ততো ভালোবাসো,—এই নির্ভর যদি আমার থাকত তাহলে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াতাম। কিন্তু আমার ভালোবাসা,—তোমার কাছে এর দাম কতোটুকু ভিনসেণ্ট?

—মার্গট তুমি ভুল করছ,—আমি তোমাকে ভালোবাসি—

ভিনসেণ্টের ঠোঁটে আঙুলের কোমল স্পর্শ রাখল মার্গট। বললে,—না প্রিয়, ভালোবাসতে হয়ত চাও, এইমাত্র। দুঃখ কোরো না এ জন্যে। আমি তোমাকে ভালোবাসি,—এইটেই সত্য, এইটেই বড়ো কথা।

—তাহলে তুমি ওদের ছেড়ে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াও না কেন? ভয় পাও কেন তোমার ভালোবাসাকে?

—তোমার পক্ষে একথা বলা সহজ। তুমি শক্তিমান, তুমি যোদ্ধা। কিন্তু আমার সে শক্তি কোথায়? চল্লিশ বছর বয়েস যার, এই নিউনেনের গণ্ডীর মধ্যে সারা জীবন যে কাটিয়েছে, সে কি আর যুদ্ধ করতে পারে। ভাঙবার সাহস কখনো যে পায়নি, আজ সে ভাঙতে যাবে কোন্ ভরসায়?

—তা বটে।

—শোনো ভিনসেণ্ট, এ যদি হোতো যে তুমি চাও, তোমার চাওয়ার জন্যে আমি প্রাণ দিতাম। কিন্তু এ যে আমি চাই ভিনসেণ্ট! কতো দেরি হয়ে গেছে তুমি কী তা বুঝবে! নিজের চাওয়ার দাবিতে প্রাণ দেবার মতো প্রাণ আর কি আমার আছে?

ফিসফিসিয়ে এল মার্গটের গলা। চিবুকে আঙুল দিয়ে ভিনসেণ্ট ওর মুখখানি তুলে ধরল। অশ্রুভারাক্রান্ত দুটি করুণ আঁখি।

—মার্গট, প্রিয়তমা আমার, ভিনসেণ্ট বললে,—কেন দ্বিধা করো? তোমার আমার দুটি প্রাণ সারা জীবনের জন্যে এক হতে কি পারে না? তুমি শুধু হ্যাঁ বলো, তাহলেই হবে। আজ রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বাড়ি থেকে বার হয়ে এসো। রাত্রিবেলা হেঁটে হেঁটে আমরা ঈণ্ডহোভেনে যাব, ভোরের ট্রেন ধরব প্যারিসের।

—কোনো লাভ নেই ভিনসেণ্ট। ওরা যেমন আমার অংশ আমিও তেমনি ওদের অংশ,—অচ্ছেদ্য বন্ধন। তবে হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমি যা চাই তা পাবই। শেষ পর্যন্ত যাব আমার একলা পথে।

—ও রকম করে বোলো না মার্গট। তোমার দুঃখ আমি সইতে পারিনে।

ভিনসেণ্টের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মার্গট অশ্রুবিধৌতচোখে। প্রশস্ত হাসি হেসে বললে,—না ভিনসেণ্ট, দুঃখ আমার নেই। এতোদিন ধরে যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। জেনেছি ভালোবাসার সুখ কাকে বলে।

ভিনসেণ্ট চুম্বন করল—ওর ওষ্ঠে অশ্রুর লবণাক্ত স্বাদ।

একটু পরে মার্গট বললে,—তুষার পড়া তো বন্ধ হয়েছে, কাল সকালে মাঠে ছবি আঁকতে যাবে না?

—হ্যাঁ, যাব।

—কোন্ দিকে যাবে? বিকেলে দেখা করব তোমার সঙ্গে।

পরদিন ভিনসেণ্ট মাঠে কাজ করল সারাদিন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ধূসর আকাশে সূর্যাস্তের সোনা,—প্রান্তর-প্রান্তে কোথাও লাল গুল্মের আভা, চক্রবালকে আড়াল করে কোথাও অন্ধকার অরণ্য, কোথাও ছায়া-ছায়া কুটিরের কালো রেখা। সামনে সবুজ মাঠ, মাঝে-মাঝে চষা ক্ষেতের কালো মাটি, খানাখন্দের ধারে ধারে নলখাগড়ার রাশি। আকাশপানে বাহু-বাড়ানো শীর্ণ পপলারের ডাল।

মার্গট এসে পেঁছিল। প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিনের মতো শুভ্র পোশাক তার পরনে, কাঁধে জড়ানো একটি রঙিন স্কার্ফ। গালে লেগেছে সামান্য রক্তিমাভা। হঠাৎ যেন আবার তাকে ছুঁয়েছে পুরোনো যৌবন-জ্যোতি। হাতে তার ছোট্ট একটি শেলাইএর বাস্কেট।

দু-হাতে ও গলা জড়িয়ে ধরল ভিনসেণ্টের। উদ্দাম ওর বুক। চোখ থেকে মুছে গেছে বিধুর বেদনার আভাস।

—কী হোলো মার্গট, ভিনসেণ্ট শুধোয়,—কিছু একটা ঘটেছে নাকি ?

—কিছু না, কিছু না। আবার তোমার কাছে এসেছি, বড়ো খুশি লাগছে।

—কিন্তু এমনি পাতলা পোশাক পরে বার হয়েছ কেন ? ঠাণ্ডা লাগবে যে।

এ কথার কোনো উত্তর দিল না মার্গট। একটু থেমে বললে,—ভিনসেণ্ট, যতোদূরে তুমি যাও, যতোদূরে আমি যাই তোমার কাছ থেকে,—একটি কথা কিন্তু চিরদিন মনে রেখো। বলো, রাখবে তো ?

—কী কথা মার্গট ?

—ভালোবেসেছিলাম তোমাকে, এতো ভালোবাসা কোনো মেয়ে তোমার সারাজীবনে তোমাকে বাসবে না। শুধু এই কথাটি।

—কাঁপছ কেন এতো তুমি !

—ও কিছু না। কতো দেরি হয়ে গেল, ছুটতে ছুটতে আসছি যে।

—কাজ শেষ হয়েছে ?

—একটু বাকি।

—বেশ তো, সেরে নাও। আমি চুপটি করে তোমার পেছনে বসে থাকি। বাধা দেব কেন তোমার কাজে ? কখনো তোমাকে বাধা দিতে কি চেয়েছি ? চেয়েছি শুধু চুপটি করে ভালোবাসতে,—তাই না ?

কী উত্তর দেবে ? কথা খুঁজে পেল না ভিনসেণ্ট। বেপথুমতী মার্গট স্কার্ফটা গলায় জড়িয়ে নিল,বললে,—কাজে মন দেবার আগে একবার শুধু একটি চুমু খাও, সেই সেদিন তোমার স্টুডিয়োতে যেমনি করে চুমু খেয়েছিলে, যেদিন সব ভালোবাসা নিয়েছিলে আমার, তেমনি করে !

সূর্য অস্ত গেল। দিগন্তব্যাপী প্রদোষান্ধকার। নিবিড় নিস্তব্ধ শান্তি। ভিনসেণ্ট তুলির শেষ রেখাকটি বোলাতে লাগল ক্যানভাসে। পশ্চাতে প্রতীক্ষমানা মার্গট।

হঠাৎ সামান্য একটু শব্দ, বোতল খোলার। মার্গট একটা চাপা আর্তনাদ করে হাঁটুতে ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড আক্ষেপে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। লাফিয়ে উঠে ওর সামনে এসে ঝুঁকে পড়ল ভিনসেণ্ট। চোখদুটি ওর বন্ধ, নীরব ঠোঁটে কেমন একটি বিচিত্র হাসি। ওর সারা শরীরটা কবার যেন বিদ্যুৎ-যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল, তারপরেই খাড়া, শক্ত হয়ে গেল।

ভিনসেণ্ট বোতলটা তুলে নিল। সাদা সাদা কিছুটা চূর্ণ বোতলের মুখটাতে অবশিষ্ট রয়েছে। কোনো গন্ধ নেই তার।

মার্গটকে দুহাতে বুকে তুলে নিয়ে মাঠ ভেঙে পাগলের মতো দৌড়তে লাগল ভিনসেণ্ট। আতঙ্ক,—গ্রামে পৌঁছবার আগেই যদি ও মারা যায়। অবাক বিস্ময়ে কতো লোক তাকিয়ে রইল গ্রামের রাস্তায়। বীজম্যানদের বাড়ি পৌঁছে এক লাথি মেরে সে সামনের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল। মার্গটকে শুইয়ে দিল বসবার ঘরের সোফায়।

মা আর বোনেরা ছুটে এল।

—মার্গট বিষ খেয়েছে। আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি।

আবার সে ছুটে গেল রাস্তায়।

খাবার টেবিল থেকে ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এল সে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন,—ঠিক বলেছেন, স্ট্রিকনিন?

—আমার তো তাই মনে হোলো।

—বাড়িতে যখন নিয়ে পৌঁছলেন তখন বেঁচে ছিল তো?

—হ্যাঁ ডাক্তার, হ্যাঁ। আশা করি এখনো আছে। চলুন আপনি দৌড়ে।

সোফায় শুয়ে ছটফট করছে মার্গট। খিচুনি শুরু হয়েছে দেহের প্রত্যেকটি মাংসপেশীতে। ডাক্তার পরীক্ষা করতে লাগলেন।

—ঠিক বলেছেন, স্ট্রিকনিন। তবে, যন্ত্রণা কমাবার জন্যে সঙ্গে খানিকটা আফিমও খেয়েছে। এতে বিষে বিষক্ষয় হতে পারে।

মা বললেন,—তাহলে বাঁচবে ডাক্তার?

—আশা আছে। তবে এখুনি উট্রেকট-এ নিয়ে যেতে হবে। এখানে কিছু উপায় নেই। আমার গাড়িটা ডাকুন। এক মিনিট দেরি নয়।

ভিনসেণ্ট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল এক কোণে। গাড়ি এল। ডাক্তার একটা কম্বলে অচৈতন্য মার্গটের সারা দেহ জড়িয়ে নিয়ে দুহাতে তুলে শুইয়ে দিলেন গাড়িতে। মা আর বোনেরা এগিয়ে এসে উঠল গাড়িতে। চারদিকে নির্বাক শোকাচ্ছন্ন জনতা। ডাক্তার উঠে লাগাম ধরলেন। গাড়ি ছাড়বার মুখে ভিনসেণ্টের দিকে মার্গটের মা-র চোখ পড়ল, আর্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠ ফেটে পড়ল তাঁর,—তুমি, তুমি, তুমিই এই কাজ করেছ, তুমিই মেরেছ আমার মেয়েকে! খুনে কোথাকার!

সমগ্র জনতার চোখ পড়ল ভিনসেণ্টের ওপর। ঘোড়ার পিঠে চাবুক, গাড়ি চলল।

৬

ভিনসেণ্টের মা-র হাঁটু ভাঙার আগে গ্রামের লোক তাকে সন্দেহের চোখে দেখত, তার কারণ তার জীবন-যাত্রাকে তারা বুঝতে পারত না। এর বেশি নয়। তার ওপর প্রত্যক্ষ বিতৃষ্ণা কারুর ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার পর তাকে ঘিরে তার চারিদিকে ভেঙে পড়ল ক্রুদ্ধ আক্রোশের সর্পিল তরঙ্গ। কেউ তার সঙ্গে কথা কয় না, মুখ ফিরিয়ে নেয়—সে যেন পথের ঘৃণিত কুকুর।

এতে তার দুঃখ ছিল না, কেননা কৃষাণ আর তাঁতীদের সঙ্গে তার সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ক্রমে লোকে তার বাড়িতে আসা, গির্জাতে আসা বন্ধ করল। ভিনসেণ্ট বুঝল, বাবার এখানে আর থাকা তার সম্ভব নয়।

কোথায় যাবে সে? সবচেয়ে ভালো হোতো যদি বাবা মাকে শান্তিতে রেখে

একেবারে ব্র্যাবাণ্ট অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ব্র্যাবাণ্টই তার মাতৃভূমি, তার চিরদিনের আবাস। এখানকার কৃষাণ আর তন্তুজীবীদের শিল্পী সে—ওরাই তার শিল্পসাধনার উপজীব্য। শীতে এখানে গভীর তুষার, শরতে পত্রে পত্রে পাকা সোনার রঙ, গ্রীষ্মে মাঠভরা শস্য, আর বসন্তে তৃণপুষ্পের সমারোহ। লাঙল-ঠেলা কৃষাণ আর ফসল-কাটা কৃষাণী,—কী ভালো এদের জীবনের মধ্যে মিশে যেতে, কী ভালো এখানে প্রহরের পর প্রহর মিলিয়ে সারাজীবন কাটাতে,—উষ্ণ দিনে নীল আকাশের নিচে, আর পর্ণ কুটিরে আগুনের ধারে হিম রাত্রে!

মানুষের হাতে স্বর্গীয় শিল্পসৃষ্টির উদাহরণ, ভিনসেণ্টের মতে মিলেটের 'অ্যাঞ্জেলাস'। তার বিশ্বাস মাটির বুকে যারা শস্য ফলায় তাদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মধ্যেই জীবলীলার সত্য পরিচয় মেলে। এই সত্যকে ধরবার মোহেই সে মাঠে মাঠে ছবি আঁকতে যায়,—যেখানে প্রবহমান জীবন-লীলা। দেয়ালে ঘেরা স্টুডিয়োতে নয়। শীত আছে, বর্ষা আছে, ঝড় আছে, তুষার আছে,—কিন্তু প্রকৃতি সেখানে প্রত্যক্ষ সারল্যে আপনার অন্তর্গূঢ় সত্যকে উন্মোচন করেছে। শুধু রঙ নয়, শুধু রূপ নয়,—পাকা ফসলের গন্ধ এসে লাগুক, অরণ্য-মঞ্জরীর সুবাসের স্বপ্নচিহ্ন পড়ুক তার ছবিতে,—মনে মনে এই তার ভাবনা।

আশু সমস্যাটার সমাধান হোলো এইভাবে। বাড়ি থেকে কিছু দূরে ক্যাথলিক গির্জা, তার পাশেই গির্জার রক্ষকের বাড়ি। নাম তার জোহানস্ শাফরাথ। পেশায় দর্জি, বাড়তি সময়ের কাজ গির্জা দেখাশুনো করা। স্ত্রীর নাম অ্যাড্রিয়ানা, ভারি ভালোমানুষ। সারা গ্রাম যে লোকটির পেছনে, তার প্রতি কেমন একটা করুণামিশ্রিত অনুকম্পা সে নারী অনুভব করল। জায়গা দিল ভিনসেণ্টকে। দিল দুখানি ঘর ছেড়ে। প্রথম ঘরটি বড়ো, সেটা স্টুডিয়ো। পেছনের ঘরটি ছোট, জিনিসপত্রের গুদোম। ছাদের চিলে-কোঠায় ঠাসা মাল-পত্রের পাশে শোবার একটা খাট।

স্টুডিয়োতে ভিনসেণ্ট সাজালো তার আঁকা নানা ড্রয়িং আর জল-রঙের ছবি। কৃষাণ আর তাঁতী মেয়ে-পুরুষের বলিষ্ঠ সুখের নানা বিচিত্র স্টাডি। বন্ধুত্ব করল ভাই কর্-এর সঙ্গে। তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করল প্রায় ত্রিশ রকম পাখির বাসা, ছোট ছোট গদি আর নানা রঙের শ্যাওলা আর নুড়ি, মাকু, চরকা, কাস্তে-কোদাল, শ্রমিকের পুরোনো টুপি, বুটজুতো, কয়েকটা গ্রাম্য বাসনপত্র। সাজিয়ে রাখল স্টুডিয়োর এক দেয়ালে একটা হাতে-তৈরি খোলা আলমারিতে। ঘরের এক কোণে টবে পুঁতে দিল ছোট একটা চারা গাছ। গ্রাম্য জীবনের ছোটখাটো অসংখ্য নিদর্শন যেন স্টুডিয়োতে ঢুকলেই চোখে ভাসে।

কাজ করতে শুরু করল অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে। তবু বাইরে যখন কাজ

করে, প্রকৃতিতে বাজে হাহাকার। ঘরে ফিরলে মনে হয় নিঃসঙ্গ স্টুডিয়ো যেন কারাগার।

মার্চ মাসে একটা মস্ত দুর্ঘটনা ঘটল। কর্নেলিয়াস অনেক পথ হেঁটে একজন অসুস্থ গ্রামবাসীকে দেখতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বাড়ির দরজার সিঁড়িতে তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। আনা কর্নেলিয়া ছুটে এসে দেখেন দেহে প্রাণ নেই।

গির্জার পাশের গোরস্থানেই কর্নেলিয়াসের দেহ সমাধিস্থ করা হোলো। এই ব্যাপারে থিয়ো এলো প্যারিস থেকে।

রাত্রিবেলা দু-ভাইয়ে কথা হচ্ছিল ভিনসেন্টের স্টুডিয়োতে বসে। সাংসারিক কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর কাজের কথা এল।

থিয়ো বললে,—জানো, একটা নতুন কোম্পানি আমাকে চাইছে, হাজার ফ্র্যাংক মাইনে দেবে বলছে।

ভিনসেন্ট বললে,—নেবে নাকি ?

—বোধহয় না। আমার ধারণা নতুন কোম্পানিটার আসল লক্ষ পয়সা লোটা, তা ছাড়া কিছু নয়।

—কিন্তু তুমি যে লিখেছিলে যে আজকাল গুপিলসও—

—হ্যাঁ, মোটা লাভের পেছনে লে মেসিয়ুর্স'ও ছুটছে বৈকি। তবে কিনা এদের সঙ্গে আমি বারো বছর আছি। কয়েকটা ফ্র্যাংকের লোভে নতুন মনিবের কাছে কেন যাব ? হয়ত কদিন পরে এদের কোনো ব্র্যাঞ্চ-আপিসের ভার আমার ওপর পুরোপুরি ছেড়ে দেবে। তা যদি করে তাহলে আমি ইম্প্রেশনিস্টদের ছবি বিক্রি করতে পারব।

—ইম্প্রেশনিস্ট ? কোথায় যেন নামটা পড়েছি। কারা ওরা ?

—ওরা হচ্ছে প্যারিসের তরুণ চিত্রকরের দল। এডোয়ার্ড মানে, ডেগাস, রেনোয়াঁ, ক্লড মনে, সিসলে, কোরবেট, লোত্রেক, গগাঁ, সেজান, সিউরাত, এরা সব।

—ইম্প্রেশনিস্ট নামটা পেল কোথায় ?

—১৮৭৪ সালে নাদারের একটা প্রদর্শনী থেকে। ওতে মনে-র একটা ছবি ছিল, নাম 'ইম্প্রেশন'। লুই লেরয় বলে একজন সমালোচক লিখেছিল, ওটা ইম্প্রশন-ওয়ালাদের এগজিবিশন। সেই থেকে ইম্প্রেশনিস্ট নামটা চালু হয়ে গেল।

—কী রকম রঙে ওরা কাজ করে ? ঘন, না পাতলা ?

—পাতলা বললে ভুল হবে। জলজলে রঙ। অন্ধকারকে ওরা ডরায়।

—তাহলে ওদের সঙ্গে আমার পোষাবে না। আমি যদি রঙ বদলাই তো আরো ঘন রঙের দিকেই যাব।

—প্যারিসে গেলে হয়ত তোমার মত বদলাবে।

—তা হয়ত বদলাবে।—বিক্রি হয় ?

—মানে-র দু-একটা ছবি কেটেছে। আর কারুর নয়।

—বাঃ! চলে কী করে ওদের ?

—তা বলা শক্ত। নানা ভাবে বুদ্ধি বেচে খায় অনেকে, এটুকু বলা যেতে পারে। রুসো বলে একজন শিল্পী ছোট ছেলেমেয়েদের বেহালা বাজানো শেখায়, গগাঁ তার স্টক এক্সচেঞ্জের পুরোনো বন্ধুদের কাছে ধারকর্জ করে, সিউরাতের মার কিছু পয়সা আছে, সেজানকে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে তার বাবা। আর সবাই কোথা থেকে কী জোটায় বলতে পারব না।

—তুমি এদের সবাইকে চেনো থিয়ো!

—আস্তে আস্তে আলাপ করছি। লে মেসিয়ুর্স-এর কর্তাদের অনেক করে ধরেছিলাম গুপিল গ্যালারির একটা কোণে ওদের কয়েকটা ছবি রাখতে। তা ইম্প্রেশনিস্টদের ছবি লাঠির আগা দিয়ে ছুঁতেও ওরা রাজি নয়।

—এইসব শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে বেশ হোতো, ভিনসেন্ট বললে,—সত্যি, অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করবার কোনো ব্যবস্থাই তুমি কিন্তু করছ না থিয়ো।

থিয়ো বললে,—বাঃ, তাহলে প্যারিসে থাকবে চলো আমার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত যেতেই তো হবে।

—না, এখনো আমি তৈরি হইনি। এখানে কিছু কাজ আমার বাকি আছে।

—তাহলে আমাকে দোষ দিয়ো না।

এবার ভিনসেন্ট কাজের কথা পাড়ল। বললে,—কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারিনে থিয়ো। তুমি আমার একটা ড্রয়িংও আজ পর্যন্ত বিক্রি করোনি। চেষ্টাই করোনি বোধহয়।

—সত্যিই করিনি।

—কেন বলো তো ?

—আমি তোমার কাজ ওখানকার ভালো ভালো চিত্র-সমালোচকদের দেখিয়েছি। তাঁদের মতে—

—ওঃ রেখে দাও তোমাদের সমালোচকদের কথা। তাদের মত আর মন্তব্যের ধরন আমার জানা আছে। ছবির সত্যিকারের অন্তর্নিহিত যা গুণ, তা কখনো ওদের চোখে পড়ে ? ওরা তো শুধু বাঁধা বুলি কপচায়।

—আমার ঠিক তা মনে হয় না। তোমার ছবি প্রায় বিক্রির উপযুক্ত হয়ে এসেছে ভিনসেন্ট, তবে কিনা—

—উঃ, আর তো পারিনে! থিয়ো, ইটেন থেকে প্রথম যখন তোমাকে স্কেচ পাঠিয়েছিলাম তখনও ঠিক এই কথাই তুমি আমাকে চিঠিতে লিখেছিলে, মনে পড়ে ?

—কথাটা মিথ্যে নয় ভিনসেণ্ট। প্রত্যেক বার তুমি আমাকে তোমার কাজ পাঠাও, প্রত্যেক বার আমি উৎসুক আগ্রহে সেগুলো দেখি। প্রত্যেক বারই আমার মনে হয়, এই তুমি পৌঁছলে বলে। কিন্তু প্রত্যেক বারই আবার মনে হয় আর-একটু যেন দেরি আছে।

বাধা দিয়ে বললে ভিনসেণ্ট,—থাক থাক, বিক্রি হবার কি হবার নয়, এই প্রশ্নের সামনে মাথা খুঁড়তে আর আমি পারিনে। যা ভালো তাই তুমি কোরো।

থিয়ো বললে,—ব্যস্। না তো কী? তুমি বলছ এখানে তোমার এখনো কাজ আছে। বেশ, কাজ করে যাও। যতো শীঘ্র পারো প্যারিসে আসবার চেষ্টা কোরো। ওখানে গেলেই ঠিক হবে অনেক কিছু। ইতিমধ্যে গোটাকতক ছবি পাঠাও, স্টাডি নয়। স্টাডি আজকাল কেউ কেনে না।

ভিনসেণ্ট বললে,—হায় রে! কোথায় যে স্টাডির শেষ, আর ছবির শুরু তা যদি বুঝতাম!

৭

বাবার মৃত্যুর আগে ভিনসেণ্ট মাঝে মাঝে রাত্রের খাওয়ার সময় ঘণ্টাখানেকের জন্যে বাড়ি যেত। কর্নেলিয়াসের শেষকৃত্যের পর বোন এলিজাবেথ স্পষ্টই জানিয়ে দিল এ বাড়িতে তার পা না দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কেননা হাজার হোক, বাবা না থাকলেও তাঁর পরিবারের সম্ভ্রমটা আছে। মাও দেখলেন, ছেলে তো তার নিজের ভাগ্যের জন্যে নিজেই দায়ী, পিতৃহীনা মেয়েদের দিকেই তাঁকে এখন দেখতে হবে।

ফাঁকা হয়ে গেল, নিউনেনে আর বন্ধু বলতে কেউ রইল না। আবার অসহ্য একাকিত্ব। মানুষ আঁকা ভিনসেণ্ট ছেড়ে দিল, চেষ্টা করল শুধু প্রকৃতিকে আঁকতে। সব ভুল হতে লাগল প্রথম প্রথম। প্রকৃতিকে অনুসরণ করার প্রয়াস শুধু ব্যর্থ সংগ্রাম। পরে সে নিজের প্যালেটের রঙের সঙ্গে সন্ধি করল, আঁকতে লাগল খেয়াল-খুশি মতো, প্রকৃতি হার মেনে নিজেই আসতে লাগল তার সাধনার পেছনে পেছনে। কিন্তু প্রকৃতি মানুষ নয়। মানুষ থেকে সে বিচ্ছিন্ন,—কী সমাজে, কী শিল্পসমাজে। এই অসহ একাকিত্বের বেদনা যখন যন্ত্রণার মতো বাজে তখন উইসেনব্রাকের স্টুডিয়োতে পুরোনো সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে উইসেনব্রাকের দুঃখ-প্রশস্তির তিক্ত কঠোর কথা। উইসেনব্রাকের এই দার্শনিক তত্ত্ব তার প্রিয় শিল্পী মিলেটের ভাষাতেও স্পষ্ট উচ্চারিত—বেদনাকে রুদ্ধ করতে আমি চাইনে, কেননা আমি জানি এই বেদনাই শিল্পীর বলিষ্ঠতর আত্মপ্রকাশের উৎসমুখ।

ডি গ্রুট নামে একটি কৃষক পরিবারের সঙ্গে ভিনসেণ্টের আলাপ হোলো। পরিবারে আছে মা, বাবা, একটি ছেলে ও দুই কন্যা,—সবাই মাঠে কাজ করে।

নিগ্রো-জাতীয় এদের মুখ,—মোটা বড়ো নাসারন্ধ্র, চ্যাপটা নাক, ফুলো ফুলো ঠোঁট, লম্বা কান। সরু ছুঁচলো মাথা, কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত সারা মুখটা যেন মাথা থেকে সামনের দিকে ঝুলে এসেছে। বাড়ি বলতে একটিমাত্র ঘর, তাতেই সারা পরিবারের আস্তানা।

আলু-সর্বস্ব জীবন ডি গ্রুট পরিবারের। তারা আলুর চাষ করে, আলুই তাদের প্রধান আহার্য। রাত্রিবেলা হয়ত দু-এক টুকরো মাংস ঐ আলুর সঙ্গে পেটে পোরে, গলায় ঢালে কিছুটা কালো কফি।

বড় মেয়েটি সপ্তদশী, মোটামুটি মিষ্টি চেহারা—নাম স্টিয়েন। ভিনসেণ্ট প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই ওদের বাড়ি যায়। ওদের আঁকে। সব চাইতে খুশি স্টিয়েন এতে।

বলে,—দ্যাখো কান্ড, আমাকে আঁকবেন? শহুরে বিবি নাকি আমি? দাঁড়ান, দাঁড়ান, নতুন বনেটটা তাহলে চড়িয়ে আসি মিনহার।

ভিনসেণ্ট বলে,—না স্টিয়েন, এমনিতেই তুমি খুব সুন্দর।

—সুন্দর? আমি? হাসিতে ফেটে পড়ে দেহাতি মেয়ে। চক-চক করে ওঠে দাঁত, ঝলকিয়ে ওঠে বড়ো বড়ো চোখ।

যে জীবন মাটির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তারই প্রতিচ্ছবি মেয়েটির মুখের বলিষ্ঠ সরল ভাবে। ও যখন হেঁট হয়ে মাটি থেকে আলু খুঁড়ে খুঁড়ে তোলে, ওর দেহরেখায় ভিনসেণ্ট যে স্বভাবজ লালিত্যের আভাস দেখে, তা কে-র মতো সুন্দরীর মধ্যেও সে পায়নি। ভিনসেণ্ট হৃদয়ঙ্গম করেছে যে মনুষ্যদেহ আঁকার অন্তর্নিহিত গুণটা হচ্ছে তার চলমানতা। স্থাণুত্ব দেহের ভুষণ নয়, কর্মের মধ্যে চঞ্চলতার মধ্যেই দেহের বাস্তব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। প্রাচীন শিল্পীদের দোষ ছিল যে তাঁদের আঁকা মনুষ্যদেহগুলি ছিল কর্মহীন, জীবন- সম্পর্কহীন, প্রস্তর-স্থাণু। এই ডি গ্রুট পরিবারের কতো যে স্কেচ ভিনসেণ্ট করল তার ইয়ত্তা নেই। যখন তারা মাঠে কাজ করছে,যখন তারা ঘরের কাজে রয়েছে—এমনি স্কেচের পর স্কেচ। যখনই সে আঁকে স্টিয়েন মেয়েটা তার পিঠের কাছে ঝুঁকে পড়ে দেখে আর ঠাট্টা গল্প করে। রবিবার দিন কখনো কখনো ফরসা জামা পরে ভিনসেণ্টের সঙ্গে সে মাঠে বেড়াতে যায়। চাষীর মেয়ের পক্ষে এই আনন্দটা কম নয়।

একদিন এমনি বেড়াতে বার হয়ে সে প্রশ্ন করল ভিনসেণ্টকে,—আচ্ছা, মার্গট বীজম্যান আপনাকে সত্যি ভালোবাসত?

—সত্যি বই কি।

—তাহলে আত্মহত্যা করতে গেল কোন্ দুঃখে?

—তার কারণ, ওর পরিবার কিছুতেই আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হতে দিল না।

—বাঃ, এইজন্যে? চটুলা যুবতী কটাক্ষ হেনে বললে,—আমি হলে কী

করতাম জানেন? বিয়ে হলো না তো বয়েই গেল। তার জন্যে আত্মহত্যা করতাম বুঝি? তার বদলে প্রেমটাই কষে করতাম। বলুন তো, তাই ঠিক হোতো না?

ভিনসেণ্টের মুখের ওপর খিলখিল হাসির ঝংকার তুলে স্টিয়েন দৌড় দিল পাইন-কুঞ্জের দিকে।

পাইন বনে তারা সারাদিন কাটালো,—কখনো শুয়ে বসে, কখনো ছুটোছুটি করে। উচ্চকিত হাসি স্টিয়েনের, কারণে অকারণে খুশির দমকে সে লুটোয়,—হাসির চিৎকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্য সব পথচারীর।

ভিনসেণ্টের সঙ্গে দিনে দিনে স্টিয়েনের সম্পর্কটাই হয়ে উঠল এমনি হাসির আর খেলার, সোহাগের আর ছেলেমানুষি আবদারের। মাঠে বেড়াতে গিয়ে খেলার খেয়ালে সে কুস্তি লড়ে যায়, চেষ্টা করে ভিনসেণ্টকে চিত করে তার বুকে চড়ে বসতে। ঘরে যখন থাকে, ভিনসেণ্টের কোনো আঁকা পছন্দ না হলে হাত থেকে কেড়ে হয় তার ওপর কফি ঢেলে দেয়, না হয় সেটাকে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আগুনের মধ্যে। কখনো কখনো সে তার স্টুডিয়োতে পোজ করতে আসে,—যখন ফিরে যায়, সারা স্টুডিয়োতে তখন সম্পূর্ণ হেলাগোছা বিপর্যস্ত অবস্থা।

গ্রীষ্ম থেকে শরৎশেষ পর্যন্ত কাটল। তারপর শীত। বাইরে তুষার। আবার শুধু ঘরে বসে কাজ করার দিন। নিউনেনের মতো গ্রামে স্টুডিয়োতে এসে তার সামনে পোজ করবার মতো লোকের সংখ্যা বিরল বললেই চলে, পয়সা দিয়েও মেলে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে সাহায্য পেল ডি গ্রুট পরিবারের কাছ থেকে। সন্ধ্যাবেলা পরিবারের সকলে যখন খাওয়ার টেবিলে জড়ো হয়, তখন ভিনসেণ্টও প্রায়ই গিয়ে স্কেচ করে ওদের।

যে লোক স্বধর্মবিশ্বাসী নয়, তার ওপর আবার ছবি-আঁকিয়ে, এমনি লোক গির্জার পরিদর্শকের বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকে,—ক্যাথলিক ধর্মযাজক গোড়া থেকেই ব্যাপারটা পছন্দ করেন নি। কিন্তু ভিনসেণ্টের ভদ্র, সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে স্পষ্ট আপত্তি করারও তাঁর উপায় ছিল না। একদিন খুব উত্তেজিত অবস্থায় অ্যাড্রিয়ানা শাফরাথ ভিনসেণ্টের স্টুডিয়োতে এসে ঢুকলেন। বললেন,—ফাদার পাওয়েলস এসেছেন, এক্ষুনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ফাদার অ্যাণ্ড্রিয়ান পাওয়েলস ক্যাথলিক গির্জার পাদ্রী,—মস্ত বড়ো চেহারা, লাল টকটকে মুখ। স্টুডিয়োতে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়েই একটু ঘাবড়ে গেলেন তিনি। এমন অদ্ভুত জায়গায় তিনি কখনো পা দেননি জীবনে।

ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি সামনে এসে খাতির করে বললে,—আসুন, আসুন ফাদার—কী করতে পারি আপনার জন্যে?

—কিছুই পারো না। তবে, তোমার জন্যে কিছু করব বলেই এখানে এসেছি।

—বলুন ফাদার।

—বললে শুনবে? যা বলব তা মানবে? আমার দিক থেকে যা করবার আমি তাহলে করব। কোনো বাধা তোমার হবে না।

—কী ব্যাপার? কিসের বাধা?

—শোনো। মেয়েটা ক্যাথলিক, আর তুমি প্রোটেস্ট্যাণ্ট। তবু বিশপের কাছ থেকে বিশেষ বিধান আমি নিয়ে আসব। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই বিয়েটা শেষ করে ফেলতে হবে, কেমন?

আরো দু-পা সামনে এগিয়ে এসে ফাদার পাওয়েলুসের মুখের দিকে ভালো করে তাকালো ভিনসেণ্ট। এক মুহূর্ত পরে বললে,—আপনার কথা আমি কিছুই তো বুঝতে পারছি নে!

—খুব পারছ! ধমকে উঠলেন ধর্মযাজক,—এখন আর ভান করে বোকা সেজে থাকতে হবে না। স্টিয়েন ডি গ্রুটের পেটে সন্তান এসেছে! পরিবারটার মানসম্মান পথের ধুলোয়।

—কী সর্বনাশ! কী অন্যায়!

—সর্বনাশ? অন্যায়? শুধু মুখের কথা? এর প্রতিবিধান করতে হবে না?

—কিন্তু, আপনি ঠিক জানেন ফাদার? কোথাও ভুল হয়নি তো?

—প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাতে না নিয়ে আমি কাউকে অভিযুক্ত করিনে।

—আর স্টিয়েন....তাহলে স্টিয়েন আপনাকে বলেছে যে আমিই এজন্যে দায়ী?

—না, তা অবশ্য বলে নি। নিজের মুখে কিছুতেই সে নামটা ভাঙতে চায়নি।

—তবে তার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্বের সম্মানটা আপনি আমাকে কেন দিচ্ছেন ফাদার?

—গ্রামসুদ্ধ লোক তোমাদের একসঙ্গে দেখেছে। তোমার স্টুডিয়োতে ও প্রায়ই আসে না?

—হ্যাঁ, আসে।

—রবিবারে রবিবারে ওকে নিয়ে তুমি মাঠে বেড়াতে যেতে না?

—হ্যাঁ, তাও যেতাম বৈকি।

—এর বেশি প্রমাণের আর দরকার করে?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল ভিনসেণ্ট। তারপর আস্তে আস্তে বললে,—খুব দুঃখিত হলাম ফাদার,—বিশেষ করে স্টিয়েন মেয়েটি বড়ো ভালো, খুব আমার বন্ধু,—তার এমনি বিপদের কথা শুনে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে এমনি অঘটনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

—তুমি আশা করো যে একথা আমি বিশ্বাস করব?

—না,—ভিনসেণ্ট আলাপ শেষ করল,—সে আশা অবশ্য করি নে।

দিনের শেষে আলুক্ষেত থেকে ডি গ্রুটরা ফিরে দেখে, তাদের কুটিরের দরজায় ভিনসেণ্ট দাঁড়িয়ে। আর সবাই বাড়ির মধ্যে গেল, স্টিয়েন ঝুপ করে বসে পড়ল ভিনসেণ্টের পাশে দরজার চৌকাঠের ওপর। দাঁত বার করে বললে,—আপনার ছবি আঁকার জন্যে একটা নতুন জীব এবার আমি দেব।

ভিনসেণ্ট বললে,—কথাটা তাহলে সত্যি স্টিয়েন ?

ভিনসেণ্টের ডানহাতটা টেনে নিয়ে সে নিজের তলপেটের ওপর চেপে ধরলে। সত্যিই সে অন্তঃস্বত্বা।

ভিনসেণ্ট বললে,—ফাদার পাওয়েলস্ একটু আগে আমার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি বলে গেলেন আমিই নাকি এর জন্যে দায়ী।

—হি হি ! হলে তো বেশই হোতো, খুব ভালো হোতো। কিন্তু আপনি যেন একটা কী। চাইলেনও না, পারলেনও না !

ভিনসেণ্ট তাকালো স্টিয়েনের দিকে। নবযৌবনে কানায় কানায় পূরন্ত দেহ, সারাদিনের পরিশ্রমে ঘামের সঙ্গে আলুক্ষেতের মাটি জড়িয়ে আছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, প্রকৃতির নিজস্ব লাবণ্যে উচ্ছলিত তনুরেখা। ভয় নেই ভাবনা নেই, চোখে মুখে জীবনের হাসি।

বললে ঠাট্টা করে,—সত্যি ! বেশ হোতো, এখন আফশোস হচ্ছে। ফাদার তাহলে আপনাকে ধরেছে ? ভারি মজা তো !

—এর মধ্যে মজাটা কোথায় স্টিয়েন ?

—লোকটা কে বলব ? কাউকে বলবেন না বলুন ? দিব্যি দিন !

—দিলাম।

—ঐ গির্জেরই লোক। ফাদার পাওয়েলসের সহকারী ঐ ছেলেটা, সে।

চমকে উঠল ভিনসেণ্ট। বললে,—তুমি বলোনি কাউকে বাড়িতে ?

—ছিঃ ! তা বুঝি বলা যায় ? তবে, আপনি যে নন তা সকলেই জানে।

ভিনসেণ্ট কুটিরের ভেতর গেল। আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন নেই। অবিবাহিতা চাষীর মেয়ে অন্তঃস্বত্বা হয়েছে—মেয়ে না হয়ে গোয়ালের গাভীটাও তো হতে পারত। ভিনসেণ্টের প্রতি তাদের ব্যবহারও যেমন ছিল তেমনি। ভিনসেণ্ট ধরতে পারল ওরা বুঝেছে সে এ জন্যে দায়ী নয়।

কিন্তু সারা গ্রামের কথা আলাদা। অ্যাড্রিয়ানা শাফরাথ স্টুডিয়োর দরজার ফাঁকে আড়ি পেতেছিলেন, প্রতিবেশীদের কানে কথাটা তুলে দিতে তাঁর একটুও সময় লাগল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সারা নিউনেনের ছাব্বিশশো অধিবাসীর কাছে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ডি গ্রুটদের স্টিয়েন মেয়েটার পেটে ভিনসেণ্টের বাচ্চা, ফাদার পাওয়েলস্ এখন মাথা ঘামাচ্ছেন কী করে দুজনের বিয়েটা সেরে ফেলা যায়।

বছর শেষ হয়ে আসছে। ভিনসেণ্টের এবার যাবার পালা। নিউনেনে বসবাসের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখানে যা কিছু আঁকবার সে এঁকেছে, কৃষাণ-

জীবনের যা কিছু জানবার সে জেনেছে। সারা গ্রাম জুড়ে তার বিরুদ্ধে জিঘাংসার যে প্লাবন শুরু হয়েছে, এতে সে ডুবতে চায় না। সময় এসেছে তল্পি গোটাবার। কিন্তু এবার যাবে কোথায়?

দরজায় খুট-খুট শব্দ। অ্যাড্রিয়ানা ঘরে ঢুকে বিষণ্নমুখে বললেন,—মিনহার ভ্যান গক, ফাদার পাওয়েলসের হুকুম, আপনি এখুনি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও বাসা নিন।

আপত্তি করে না ভিনসেণ্ট।—বেশ তো, তিনি যা চান তাই হবে।

পায়চারি করে বেড়ায় স্টুডিয়োর মধ্যে। পুরো দুটি বৎসরের অশ্রান্ত দাসত্বের ফল জমা হয়ে রয়েছে এখানে। তাঁতী আর তাঁতিনী, তাদের তাঁত আর মাকু, ঘর দোর আর উঠোন,—মাঠের কিষাণ কিষাণী, বাগানের বেড়ার ছাঁটা গাছের সার, অরণ্যে-প্রান্তরে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আলো-ছায়ার পরিবর্তনশীল লীলা। কতো ছবি, কতো অসংখ্য স্কেচ, কতো বিচিত্র বর্ণালি।

অবসাদে ভরে গেল মনের ধূসর এপার থেকে ধূসর ওপার। টুকরো টুকরো ছবি। জীবন নেই, শুধু জীবনের টুকরো টুকরো পাতা। অনুভূতি আছে, নেই অনুভূতির সম্পূর্ণতা। ব্র্যাবাণ্টের কৃষাণকে সে চিনতে চেয়েছিল, চিনেছে তার টুকরো টুকরো অভিব্যক্তিকে, তার দিন-যাপনের শত খণ্ডিত প্রচেষ্টাগুলি সে টুকে টুকে নিয়েছে। কিন্তু তাকে তো সে প্রকাশ করতে পারে নি তার সমগ্রতায়,—যেখানে দিনান্তের কর্মশেষে ঘরে ফেরা, আপন হাতে মাঠের থেকে তুলে আনা গুঁড়ি আলু সেদ্ধ করে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির চরিতার্থতা,—কৃষাণ-জীবনের শ্রম আর সার্থকতার সাধনা আর সাফল্যের পূর্ণ পরিচয়। ব্র্যাবাণ্টের কৃষাণকে নিয়ে অ্যাঞ্জেলাস সৃষ্টি করতে কই সে পারল? তার আগে কেমন করে সে বিদায় নেবে এখান থেকে?

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখল,—মাস শেষ হতে এখনো বারো দিন। অ্যাড্রিয়ানাকে ডেকে বললে,—ফাদার পাওয়েলসুকে বলবেন আমি পুরো মাসের ভাড়া দিয়েছি, অতএব মাস শেষ হলে তবে আমি যাব, তার আগে নয়।

ঈজেল, রঙ, ক্যানভাস, তুলি সব গুছিয়ে নিয়ে ভিনসেণ্ট চলল ডি গ্রুটের কুটিরে। কেউ তখন বাড়ি নেই। ঘরের ভেতরটার একটা পেনসিল স্কেচ করতে শুরু করল সে। পরিবারের সবাই ঘরে ফিরে এলে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল। টেবিলে গরম গরম সেদ্ধ আলু, বেকন আর কালো কফি সাজিয়ে চারিদিকে গোল হয়ে খেতে বসল ডি গ্রুটেরা। ভিনসেণ্ট ঈজেলে ক্যানভাস সাজিয়ে আঁকতে আরম্ভ করল। সবাই যখন শুতে গেল তখন সে ফিরে এল বাড়িতে। সারা রাত সে ছবিটা নিয়ে খাটল। ঘুমিয়ে পড়ল সকালের দিকে। জেগে উঠে হিংস্র হতাশায় ছবিটি ছিঁড়ল কুটিকুটি করে। আবার চলল ডি গ্রুটদের আস্তানায়।

সন্ধ্যাবেলায় ঐ আলু আর কফি খাওয়া—এই হোলো ডি গ্রুটদের প্রাত্যহিক

পরিশ্রমের ফসল। সারা জীবন ধরে এমনি একই ভঙ্গিতে টেবিলের ধারে বসে খেয়ে এসেছে, খাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তারা চিরন্তন—ঐ কৃষিজীবী মাটির সন্তানের দল। তারা পরিশ্রমী, তারা সৎ—মাটির ধনকে তারা শ্রমের মূল্য দিয়ে তুলে আনে, অপরের ধনকে হরণ করবার জন্যে হানাহানি করে না। অকিঞ্চিৎকর তাদের লভ্য, তাতেই তারা খুশি। সততা ও শ্রমের এই সহজ জীবনছন্দ—একে রঙে রেখায় প্রকাশ করবে ভিনসেন্ট,—করবেই করবে।

ক্যানভাসের ওপর ত্বরিত গতিতে রঙ চড়ানোর অভ্যাসটা এবার কাজে লাগল। প্রচণ্ডবেগে সে কাজ করে চলল। ভাববার সময়টুকু দিতে সে রাজি নয়,—এমনি কৃষাণ, তার কুটির আর তাদের দিগন্তের জটলা তো সে এর আগে হাজার হাজার এঁকেছে।

স্টিয়েনের মা বললে,—ফাদার পাওয়েলস্ আজ এখানে এসেছিলেন।

চমকে ভিনসেন্ট শুধোলে,—কেন? কী দরকারে?

—এই বলতে যে, আমরা যদি আপনাকে আমাদের ছবি আঁকতে না দিই তো তিনি টাকা দেবেন আমাদের।

—আর, আপনি কী বললেন?

—আমি বলেছি আপনি আমাদের বন্ধু।

স্টিয়েন আরো খবর দিল,—এখানকার প্রত্যেক চাষীর বাড়ি আজ তিনি ঘুরেছেন। কিন্তু সবাই তাঁকে এক উত্তরই দিয়েছে। আপনার জন্যে 'পোজ' করে বরং একটা আধলা তারা নেবে, তবু তাঁর ভিক্ষের টাকা কেউ ছোঁবে না।

পরদিন সে আবার ক্যানভাসটা ছিঁড়ল। এ কী ব্যর্থ শ্রম। এ কী ক্লীবত্ব! কিন্তু আর মাত্র দশটি দিন বাকি। তারপর নিউনেন ছেড়ে চলে যেতেই হবে। মিলেটের কাছে তার নীরব প্রতিশ্রুতি তাকে যে রাখতেই হবে।

প্রত্যেক রাত্রে সে গ্রুটদের বাড়ি যেতে লাগল। ওরা টেবিলে বসে বসে যতক্ষণ না ঘুমে ঢুলে পড়ে ততোক্ষণ সে কাজ করতে লাগল। রঙ নিয়ে ভঙ্গি নিয়ে মূল্যবোধ নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল প্রতি রাত্রে ভোর না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু দিনের আলোয় ফাঁকি ধরা পড়ে, প্রকাশ হয় অসম্পূর্ণতা।

মাসের শেষ দিন। উম্মাদের মতো অবস্থা ভিনসেন্টের। বিনিদ্র রক্ত-চক্ষু,—খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। প্রচণ্ড একটা স্নায়বিক তাড়না তাকে খাড়া করে রেখেছে, ছুটিয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত প্রতিটি মুহূর্তে। যতোবার সে ব্যর্থ হচ্ছে, তীব্রতর হচ্ছে এই তাড়না। ঈজেল সাজিয়ে রঙ গুলে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল—কখন ডি গ্রুটরা মাঠ থেকে ফিরবে। আজ শেষ চেষ্টা। কাল সকালে নিউনেনের পাট তার উঠবে,—চিরদিনের মতো।

নিঃশব্দে সে কাজ করে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ডি গ্রুটরাও বুঝল; খাওয়া শেষ হবার পর তারা টেবিল ছেড়ে উঠল না, বসে রইল হাত গুটিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চুপি চুপি কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। যন্ত্রের মতো সে

কাজ করে চলেছে, আঙুল ছুটেছে নিশি-পাওয়ার মতো। কী সে আঁকছে, কোন্ রঙ সে চড়াচ্ছে, তার যেন কোন বোধ নেই, চেতনা নেই। দশটা বেজে গেল। ঘুমে ঢুলে এল সারা দিনের কর্মক্লান্ত কৃষাণ-কৃষাণীদের চোখ। ভিনসেণ্টের সারা অঙ্গও যেন ক্লান্তিতে ভেঙে এল। উঠে পড়ল সে, গুছিয়ে নিল জিনিস-পত্র। বিদায় নিল সে নিউনেনের এই পরম বন্ধু পরিবারের সকলের কাছ থেকে, স্টিয়েনকে করল চুম্বন। পথে বার হয়ে স্টুডিয়োর দিকে হাঁটতে লাগল যন্ত্রচালিতের মতো।

স্টুডিয়োতে ফিরে এসে ক্যানভাসটা একটা চেয়ারের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখল। পাইপটা ধরিয়ে তীক্ষ্ন চোখে পরীক্ষা করল তার এই শেষ সন্ধ্যার কাজ। ভুল, সব ভুল হয়েছে। কিছুই হয়নি, আসল অনুভূতিটাই তাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে সরে গেছে, প্রকাশকে এড়িয়ে গেছে উপলব্ধি। আবার তার হার। ব্যর্থ তার ব্র্যাবাণ্টের পূর্ণ দু-বছরের পরিশ্রম।

পাইপের তামাকটা শেষ পর্যন্ত সে টানল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল ব্যাগের মধ্যে। ছবিগুলো ভরল একটা কাঠের বাক্সে। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

এমনিভাবে কতোক্ষণ সময় কেটেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ চমক লাগার মতো উঠে বসল। ক্যানভাসটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ঈজেলের ফ্রেমে নতুন একটা ক্যানভাস পরালো। নতুন রঙ গুলে আবার কাজ আরম্ভ করল।

প্রকৃতিকে শুধু অনুকরণ করবার জন্যে শিল্পী যতো উন্মাদের মতো তার পেছনে ছোটে, ততোই সে ভুল করে,—প্রকৃতি ততোই এড়িয়ে যায়, দূরে সরে যায়। কিন্তু শিল্পী যখন তার সমস্ত উপলব্ধিকে সংহত করে রঙে আর রেখায় তার সমস্ত অনুভূতি মিশিয়ে আঁকে, প্রকৃতি তখনই হার মানে, কাছে এসে ধরা দেয়। মনে পড়ল পীটারসেনের উপদেশ। সে বড়ো কাছে পেতে চেয়েছিল প্রকৃতিকে, বড়ো কাছাকাছি বসিয়েছিল মডেলকে। তাই সে পারেনি, —যতোবার সে এঁকেছে, চিত্রবস্তুর আকার সম্বন্ধেই সঠিক সচেতনতা তার হয়নি। আর এই মৌলিক বিভ্রান্তিকে কাটাতে পারেনি বলেই সব ভুল হয়েছে তার। প্রকৃতির ছাঁচে নিজের শিল্পকর্মকে ঢালতে গিয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছে। এবার সে প্রকৃতিকে ঢেলে দেখবে নিজের শিল্পকর্মের ছাঁচে।

রঙ? মূল রঙটিকে সে আবিষ্কার করল এতদিনে—জমি থেকে সবে তোলা ধুলোমাটি-মাখা নধর একটি আলুর মেটে রঙ। সব ছবিটি সে আঁকল এতোদিনের দেখার এতদিনের অভ্যাসের জীবন্ত স্মৃতি থেকে। ধোঁয়া আর ঝুল-পড়া ধূসর দেয়াল, মলিন টেবিলক্লথ, কুটিরের কালো কাঠের বরগা থেকে ঝুলছে তেলের একটা সেজ। স্টিয়েন সেদ্ধ আলু পরিবেশন করছে, মা কেটলি থেকে কালো কফি ঢালছে, ভাই মুখে ধরেছে একটা পেয়ালা। প্রত্যেকের মুখের ভাবে এই অপরিবর্তনীয় জীবন-ধারার শান্ত সহজ স্বীকৃতি।

প্রভাতসূর্য উঠল পূর্ব আকাশে, জানলা দিয়ে স্টুডিয়োর ঘরে এল তার প্রথম আভা। ভিনসেন্ট তুলি রেখে টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো। গত বারো দিনের নিত্য-নিয়ত উত্তেজনার অবসান। সারা মন জুড়ে এই প্রত্যুষের মতো শান্তি। চোখ মেলে ভালো করে তাকালো কৃতকর্মের দিকে, দেখল পুঙ্খানুপুঙ্খ করে। বেকন আর কফি আর গরম আলুর ধোঁয়াটে গন্ধ ঠিক যেন ছবিটা থেকে ভেসে উঠে নাকে এসে লাগছে। সাফল্যের খুশিতে বুক ভরে গেল তার। তার আঞ্জেলাস সে এঁকেছে। পরিবর্তমান জীবন-লীলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিরন্তনকে সে বেঁধেছে শিল্পের স্বর্ণসূত্রজালে। অবিনশ্বর হয়ে রইল ব্র্যাবান্টের কৃষাণ—চিরকাল, চিরদিন!

ডিমের শাদা অংশ দিয়ে সে ছবিটার ওপর ভালো করে 'ওয়াশ' দিল। পুরোনো ছবিভর্তি বাক্সটা সে মা-র কাছে রেখে এল, সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়ে এল তাঁর কাছ থেকে। স্টুডিয়োতে ফিরে ক্যানভাসটার নিচে লিখল, 'আলু-ভোজীরা'। এটার সঙ্গে আর কয়েকটা খুব পছন্দসই স্টাডি ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে সে বার হোলো ঘর ছেড়ে।

নিউনেনের পালা ফুরোলো। এবার চলো প্যারিস.........প্যারিস।

॥ প্যারিস ॥

১

প্রাতরাশ খেতে খেতে থিয়ো জিজ্ঞাসা করল,—তাহলে আমার শেষ চিঠিটা তুমি পাওনি ?

—মনে তো হয় না, ভিনসেণ্ট বললে,—কী লিখেছিলে সে চিঠিতে ?

—বাঃ, মস্ত সুখবর যে ! গুপিলসের চাকরিতে আমার উন্নতি হয়েছে ।

—তাই নাকি ? আচ্ছা তো তুমি থিয়ো ! কাল এ সম্বন্ধে একটা কথাও তুমি বলো নি !

—যে রকম উত্তেজিত ছিলে তুমি কাল, বলবার ফুরসত পেলাম কোথায় ? —জানো, মোমার্তে বুলেভার্দের দোকানটার ম্যানেজার হয়েছি আমি ।

—অ্যাঁ ! এ যে দারুণ খবর ! তাহলে আলাদা একটা আর্ট গ্যালারি এখন তোমার !

—আমার বললে বেশি কথা বলা হবে। কেননা গুপিলসের পলিসি আমাকে মেনে চলতেই হবে। তবে, কিছুটা স্বাধীনতা রইল আমার। ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি কিছু-কিছু আমি রাখতে পারব। যেমন ধরো, মনে, ডেগা, পিসারো আর মানে ....

—নামই শুনিনি আমি এদের !

—বেশ তো, চলো তাহলে আমার গ্যালারিতে। ছবি দেখবে এদের। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। কফি দেব আর-একটু ?

হাত থেকে কফির শূন্য পেয়ালা নামিয়ে ভিনসেণ্ট বললে,—যাই বলো থিয়ো, আবার এক টেবিলে বসে তোমার সঙ্গে খাচ্ছি, ভারি ভালো লাগছে।

থিয়ো বললে,—আমি তো কতোদিন থেকে এঁচে আছি প্যারিসে তোমাকে আসতেই হবে। তবে, জুন মাসটা পার করে এলেই ভালো হোতো। এত ছোট জায়গায় কাজের তোমার খুব অসুবিধে হবে। জুন মাসের পর আমি রু লেপিকে উঠে যাব। ফ্ল্যাট ঠিক করাই আছে সেখানে, বড়ো বড়ো তিনটে ঘর।

থিয়োর এই ফ্ল্যাটটা বলতে একখানা ঘর আর আলাদা একটা রান্নাঘর। সঙ্গে বাজে জিনিসপত্র রাখার একটা কুঠরি। সুন্দর আসবাবপত্রে ঘরটি সাজানো, কিন্তু হাঁটা-চলার জায়গাটুকু বিরল।

ভিনসেণ্ট বললে,—এর মধ্যে আবার যদি আমাকে ঈজেল পাততে হয়,

তাহলে তোমার এমন চমৎকার আসবাবগুলো যাবে। কিছু-কিছুর ঠাঁই অবশ্য হবে নিচের উঠোনে।

—সত্যি, এগুলোর বড় ভিড়। কিন্তু এত শস্তায় পেলাম, লোভ সামলাতে পারিনি। চলো, নতুন ফ্ল্যাটে গেলে মানাবে ভালো।

—হ্যাঁ, সে তো বটেই।

এবার তাড়া দিল থিয়ো,—ওঠো, তাড়াতাড়ি চলো এখন। প্যারিসের ভোরবেলাকার সুরভিই যদি নাকে না নিলে, তাহলে এখানে এসে করলে কী?

ভারি কালো কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিলো থিয়ো, ঠিক গলার নিচে বুকের ওপর ফুটে রইল কড়া-ইস্ত্রি-করা ধবধবে শাদা বো-টাই। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে কোঁকড়া চুলে কবার পরিপাটি করে বুরুশ চালিয়ে আর গোঁফটা একবার পাকিয়ে নিয়ে মাথায় চড়ালো কালো সিল্কের টুপি, হাতে দস্তানা আর রুপো-বাঁধানো ছড়ি।

—কী হোলো? অ্যাঁ, এই নাকি তুমি তৈরি? সর্বনাশ, এ জামা-কাপড় পরে প্যারিসের রাস্তায় হাঁটা-চলা করলে তোমাকে যে পুলিশে ধরবে!

ভিনসেণ্ট ফ্যাল-ফ্যাল চোখে নিজেকে দেখে নিল দুবার। তারপর বললে,—কেন? হয়েছে-টা কী? এই জামাকাপড় পরে আমি পুরো দুটো বছর কাটালাম, একটা কথাও কেউ তো বলেনি কোনোদিন।

—বলেনি? হো হো করে হেসে উঠল থিয়ো,—তা বেশ, চলো। প্যারিসের যারা বাসিন্দে, সবকিছু দেখবার অভ্যেস তাদের আছে। বিকেলে গ্যালারি বন্ধ হবার পর তোমার নতুন জামা-কাপড় কেনার ব্যবস্থা করা যাবে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেট পার হয়ে তারা পড়ল রু লাভাল রাস্তায়। বেশ চওড়া রাস্তা, দুধারে নানা রকমের বড় বড় দোকান, কোনটা ওষুধপত্রের, কোনটা ছবি-বাঁধাইএর, কোনটা মনোহারীর।

থিয়ো হাত তুলে দেখালো,—আমাদের বাড়ির মাথার মূর্তি তিনটে দেখছ? বুক পর্যন্ত তিনটি নারীমূর্তি, পত্রাস্টার অব্ প্যারিসের। প্রথমটির নিচে লেখা স্থাপত্য, দ্বিতীয়টির নিচে ভাস্কর্য, তৃতীয়টির নিচে অংকন-কলা।

ভিনসেণ্ট বললে,—বাঃ! কিন্তু অঙ্কন-কলা মেয়েটি অমন কুৎসিত দেখতে কেন?

—তা বাড়িওয়ালাই জানে। কিন্তু এটা তো বুঝতে পারছ যে বেশ পাকা জায়গাতেই এসে উঠেছ।

—সে আর বলতে! শিল্পলক্ষ্মীরা তো সব মাথায় চড়ে বসে আছেন দেখছি।

মনোরম আঁকা-বাঁকা রাস্তাটি রু মোমার্ত। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে আভেনু ক্লিচি পর্যন্ত, তারপর গড়িয়ে নেমেছে একেবারে শহরের কেন্দ্রস্থলে। রাস্তা-ভর্তি ঝলমলে রোদ, ধারে ধারে কাফেতে বসে লোকে প্রাতরাশ খাচ্ছে,

মাংস, সব্জি আর পনিরের দোকানগুলোর পাল্লা খুলছে। সত্যি, সকাল-বেলাকার গন্ধটি চমৎকার।

সাধারণ লোকের পাড়া, সারি সারি ছোট ছোট দোকান পাট। কারিগররা চলেছে দিনের কাজে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ভিড় করে। গৃহিণীরা বেরিয়েছে বাজার করতে।

লম্বা নিশ্বাস নিল ভিনসেণ্ট,—প্যারিস, শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছিলাম।

থিয়ো বললে,—হ্যাঁ এই প্যারিস,—সারা ইয়োরোপের রাজধানী, শিল্পীর স্বর্গ।

পাহাড়ের গায়ে চড়াই-উৎরাইএর রাস্তা বেয়ে প্যারিসের জীবন-স্রোত বয়ে চলেছে—ভিনসেণ্ট যেন তৃষিত কণ্ঠ ভরে পান করছে এই তরঙ্গ। লাল কালো পোশাকের পুলিশ, সৌখিন পোশাক পরা তরুণ, চাকুরে আর ব্যবসাদার, বড়ো-বড়ো-রুটি-বগলদাবা-করা মোটা-সোটা গিন্নি, নরম চটি পায়ে রাত্রি-জাগা ঢুলু-ঢুলু চোখে কয়েকটি তরুণী...অসংখ্য দোকান আর পানশালা আর ঠেলাগাড়ি। পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে রু মোমার্ত এসে পেঁছিল প্লেস চাতুদুনে। ছ-রাস্তার একটা মোড়। মোড় পার হয়েই পুরোনো একটি গির্জে—নতারদাম দ্য লোরেৎ। গির্জের দরজায় খোদাই করে লেখা ফরাসী-বিপ্লবের বিখ্যাত বাণী—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা।

ভিনসেণ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ল। জিজ্ঞাসা করলে থিয়োকে,—এ বাণীর কোনো দাম আছে আজকাল? বিশ্বাস করে কেউ?

—করে বৈকি। তৃতীয় রিপাবলিক টিঁকে যাবে বলেই মনে হয়। রয়ালিস্টরা সব ফোঁত হয়ে গেছে, সোশালিস্টদের শক্তি বাড়ছে। এমিল জোলা আমাকে সেদিন বলেছিল, এবার যে বিপ্লব হবে তা আর রাজা-রাজড়ার বিরুদ্ধে নয়, পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে।

—জোলা! তুমি তাঁকে চেনো? আলাপ আছে তোমার সঙ্গে?

—পল সিজান আমার সঙ্গে জোলার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সপ্তাহে একদিন করে আমরা একসঙ্গে বসি কাফে বাতিনোল্সে। এবার যেদিন যাব তোমাকে নিয়ে যাব সঙ্গে।

প্লেস চাতুদুন পার হবার পর থেকেই রু মোমার্ত-এর মধ্যবিত্ত চেহারাটা ঘুচল, দেখা দিল বনেদিয়ানা। বড়ো বড়ো দোকান, উঁচু উঁচু বাড়ি, জমকালো কাফে আর হোটেল। লোকজনের গায়ের পোশাকও অনেক দামি, ঝকঝকে, গাড়িরও ইয়ত্তা নেই।

জোরে পা চালালো দু-ভাই। হাঁটতে হাঁটতে থিয়ো বললে,—বাড়িতে যখন তোমার কাজ করবার সুবিধে হবে না তখন মনে হয় করম্যানের স্টুডিয়োতে কাজ করাই তোমার ভালো।

—কেমন জায়গাটা?

—শিল্পের গুরুমশাই তো করম্যান, অতএব খুব রক্ষণশীল। তবে, নিজের মতো একলা-একলা যদি কাজ করে যেতে চাও তাহলে তোমাকে ঘাঁটাবে না।

—কিন্তু খরচ তো লাগবে ?

থিয়ো হাতের ছড়িটা দিয়ে ভিনসেণ্টের উরুতে একটা টোকা মারল, বললে,—বলিনি আমার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে ? জোলার মতে, আসছে বিপ্লবে যেসব লোক গিলোটিনে যাবে, আমি এখন তাদেরই একজন।

শেষ পর্যন্ত রু মোমার্ত এসে মিশল মোমার্ত বুলেভার্দে। বিরাট রাজবর্ত্ম,—মস্ত মস্ত দোকান, লম্বা লম্বা গাড়িবারান্দা। কয়েক পা এগিয়েই ইটালিয়ান বুলেভার্দ, আর তার পরেই রাজধানীর সেরা রাস্তা প্লেস দ্য লা-অপেরা। চারদিক ফাঁকা, এখনো ঘুমিয়ে আছে রাজকীয় এলাকা। দোকানগুলোর মধ্যে মধ্যে কেরানিরা দিনের কাজের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। জ্বলজ্বলে রৌদ্রে সামান্য শীতের মেজাজি আমেজ।

গুপিল গ্যালারির যে শাখাটির থিয়ো ম্যানেজার তার নম্বর ১৯,—রু মোমার্তের ঠিক এই মোড়ে, ডানদিকে একখানা বাড়ির পরেই।

ভিনসেণ্ট আর থিয়ো রাস্তা পার হয়ে গ্যালারির দরজায় এসে পৌঁছল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজগোজ-পরা কেরানিরা উঠে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধভাবে থিয়োকে অভিবাদন করতে লাগল। ভিনসেণ্টের মনে পড়ল সেও যখন এমনি কেরানি ছিল কেমন করে ঘাড় হেলিয়ে সে টারস্টিগ আর ওবাক্‌-কে প্রাত্যহিক অভিবাদন জানাতো। সারা দোকান জুড়ে কেমন একটি যেন গন্ধ—গন্ধটা আভিজাত্য, ভব্যতা আর সংস্কৃতির,—এই গন্ধটাকেও আবার তার মনে পড়ল। সালোঁর দেয়ালে বুগেরো, কেনার আর ডেলারোকের নানা পেণ্টিং। প্রধান সালোঁটির ওপরে ছোট্ট একটি বারান্দা, পেছনদিকের সরু সিঁড়ি দিয়ে সেখানে ওঠা যায়।

থিয়ো চাপা হাসি হেসে বললে,—যে ছবিগুলো তোমাকে দেখাব বলে এনেছি সেগুলো ঐ বারান্দায়। আগে দেখে নাও, তারপর আমার আপিসে এসো। কেমন লাগল শুনব।

—চুপি-চুপি হাসছ কেন থিয়ো ?

হাসিটা প্রকট হয়েই পড়ল। থিয়ো বললে,—দেখেই এসো না।

২

কোথায় এলাম ! পাগলা গারদে ?

ধাঁধা লেগে গেল দেখে। কোনো রকমে বারান্দার একটা চেয়ারে ধপ্‌ করে বসে পড়ল ভিনসেণ্ট। দু-চোখ কচলালো কিছুক্ষণ। তারপর আবার সাহস করে চোখ খুলে হাঁ করে তাকালো দেয়ালের দিকে। বারো বছর বয়েস থেকে ছবি দেখা তার অভ্যাস—বনেদি ছবি, গভীর গম্ভীর রঙ, তুলির একটি রুক্ষ আঁচড়

পর্যন্ত যার গায়ে খুঁজে পাওয়া যায় না—একটা রঙের সঙ্গে আর-একটা রঙ আস্তে আস্তে মিশে রঙে রঙে একাকার হয়ে যায়।

কিন্তু এসব কী? দেয়ালে দেয়ালে এসব যেগুলো ঝুলছে আর যেন দাঁত বার করে তার দিকে চেয়ে হাসছে,—স্বপ্নেও সে এমনি ছবির কল্পনা করতে পারেনি। কোথায় গেল রঙের সঙ্গে অদৃশ্যভাবে রঙ মিশিয়ে দেবার রীতি,—কোথায় গেল সেই বনেদি গাম্ভীর্য। যুগের পর যুগ ধরে যে ঘন বাদামি রঙে ইয়োরোপের সব ছবি নিত্য স্নান করেছে,—সেই অতিপরিচিত রঙটাই বা কোথায় গেল? যে শিল্প ছিল চিরকাল ছায়ার আশ্রয়ে মেদুর ধূসরতায়, সেই ছায়ার আস্তরণ টুকরো-টুকরো করে কে ছিঁড়ে দিল? পলাতকা সেই চিরবিহঙ্গ মেঘমায়া, তার জায়গায় মাথা তুলে হাসি ঝিলকিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যপাগল রঙ-মাতাল সব ক্যানভাস। এরা কি ছবি? একটা ক্যানভাসে সে দেখল স্টেজের পেছনে দাঁড়ানো কয়েকটা ব্যালে-নাচের মেয়ে। লজ্জা নেই ওদের! লাল সবুজ আর নীল রঙ আলাদা হয়ে নির্লজ্জ স্পষ্টতায় আসর জমিয়েছে ওদের ঘিরে। লজ্জা নেই শিল্পীর! সে আবার নাম সই করেছে ক্যানভাসটার তলায়। নামটা পড়ল ভিনসেণ্ট। ডেগা।

নদীতীরের কয়েকটি বহির্দৃশ্য। সূর্যোকরোজ্জ্বল উষ্ণ বসন্ত-আকাশের সমস্ত আলো আর রঙ আর প্রগল্‌ভতা ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি ছবির অঙ্গে অঙ্গে। শিল্পীর নাম—মনে। জ্বলন্ত প্রভাতের ছবি—সে প্রভাতে কতো গন্ধ কতো গান, বাতাসে কতো দোলা! হল্যাণ্ডের সারা মিউজিয়ামে যতো ছবি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পাতলা রঙটি যেখানে লাগানো হয়েছে, সেইটিই মনে-র সবচেয়ে গভীর রঙ। তুলির প্রত্যেকটি রেখা নিলাজ নগ্নতায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ফুটে আছে,—প্রকৃতির বলিষ্ঠ নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশের মতো। পাকা ঘন ডেলা-ডেলা রঙ কোন পাগল শিল্পী ছুঁড়ে মেরেছে ক্যানভাসের ওপর, মোটা চটচটে চেহারা নিয়ে তারা ফুটে ফুটে আছে!

আর-একটি ছবির সামনে দাঁড়ালো ভিনসেণ্ট। ছোট্ট একটি নৌকোয় একটি লোক, গায়ে পশমের শার্ট, হাতে নৌকোর দাঁড়, মুখে কেমন একটা নিবিষ্ট ভাব। পাশে চুপটি করে বসে রয়েছে তার স্ত্রী। সারা ছবিকে ঘিরে ছুটির দিনের বিকেলবেলাকার অনায়াস আলস্য। শিল্পীর নামটা পড়ল ভিনসেণ্ট।

—মনে? একই শিল্পী? বাঃ কী আশ্চর্য! বহির্দৃশ্যের ছবিগুলোর সঙ্গে এ ছবিটার কোন মিল নেই তো!

আবার নামটা দেখল। না, ভুল হয়েছে। মনে নয়, মানে। এই মানে-র 'প্রান্তরে পিকনিক' আর 'অলিম্পিয়া' ছবির কাহিনী সে শুনেছে। লোকে উন্মাদ হয়ে ছবি হাতে নিয়ে এ ছবিদুটোকে কেটে টুকরো-টুকরো করতে ছুটেছিল,—পুলিশ এসে ছবিদুটোকে রক্ষা করে।

কী জানি কেন, মানে-র আঁকা ছবি দেখতে দেখতে জোলার রচনাবলী মনে পড়ল ভিনসেণ্টের। একজন চিত্রশিল্পী, আর একজন কথা-সাহিত্যিক। অথচ দুজনের মধ্যে মস্ত মিল যেন রয়েছে—একই নিভীক অনুসন্ধিৎসা, একই সত্যনিষ্ঠা, পংক-কলংকের মধ্যেও সৌন্দর্য আবিষ্কারের একই সাধনা। মানে-র ছবি আঁকার পদ্ধতিটা সে ভালো করে লক্ষ করতে লাগল। দেখল মৌলিক রঙগুলি বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশে পাশাপাশি উপস্থিত, এক রঙ নিজেকে বিলীন করেনি অপর রঙের মধ্যে; আঁকার মধ্যে নির্বিশেষ থেকে বিশেষে যাবার ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা নেই ;—সব জায়গাতেই—কি রঙ কি রেখা, কি আলো কি ছায়া,—শুধু আভাসে পেঁছেই থেমে গিয়েছে ; চূড়ান্ত সম্পূর্ণতায় পেঁছবার আয়াস নেই কোথাও।

ভিনসেণ্ট মনে মনে বললে,—ঠিক তো, প্রকৃতি সব কথা একসঙ্গে বলে না, সব মানে একেবারে বুঝিয়ে দেয় না ; শুধু আভাসটুকু দিয়েই তো তার ক্ষান্তি।

মনে পড়ল মভের কথা,—একটা রেখা সম্পূর্ণ করে আঁকা—এটুকু পর্যন্ত তুমি পারো না ভিনসেণ্ট ?

চুপ করে এবার সে বসে রইল কিছুক্ষণ।—ডুবুক, আস্তে আস্তে ডুবুক ছবিগুলো মনের মধ্যে। কী এগুলোর বৈশিষ্ট্য, কী করে চিত্রশিল্পের তার এতোদিনের ধ্যান-ধারণায় এগুলো এমন ভয়ংকরভাবে নাড়া দিল, যে বৈপ্লবিক নব ধারা এদের মধ্যে বেগবতী, তার উৎস কোথায় ? হঠাৎ মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল ভিনসেণ্টের, মূল তথ্যটি সে যেন আঁকড়ে ধরতে পারল। চিত্রশিল্প-বিশারদ যাঁরা, তাঁদের ছবির মধ্যে আবহাওয়া নেই বাতাস নেই, কেননা আবহাওয়া যে চর্মচোখের বাইরে। তাঁদের ছবির মধ্যে স্থান আছে আর স্থির বস্তু আছে। বস্তুর স্বাণুত্ব দিয়ে স্থানের পরিসরকে ভর্তি করে করে ছবিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আলো আছে কিন্তু রৌদ্র নেই, ছায়া আছে কিন্তু নেই ছায়ার রঙ। এই সব শিল্পীরা তাদের ছবিকে মেলে ধরেছে খোলা আকাশের নিচে সূর্যের জ্বলজ্বলে আলোর তলায়, যেখানে যেখানে বাতাসের এলোমেলো লীলা। এ বাতাস জীবন্ত, উচ্ছলতায় ভরপুর। এ আলো প্রত্যক্ষ সূর্যরশ্মির।

আলো আর বাতাস যেন কোন একটা জীবন্ত তরঙ্গ, সেই তরঙ্গের কী বিচিত্র রূপ! ভিনসেণ্টের মনে হোলো—চিত্রশিল্পের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে কেউ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, কিছুতে বাধা পড়বে না এই বিপুল তরঙ্গলীলা। এ যেন এক নতুন শিল্প।

টলতে টলতে সে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। মাঝখানে সালোঁতে থিয়ো দাঁড়িয়ে। ভাইয়ের মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল,—কী হোলো ভিনসেণ্ট, কেমন দেখলে ?

—ও, থিয়ো! এই অস্ফুট উচ্চারণটির বেশি আর কিছু ভিনসেণ্টের মুখ দিয়ে বার হোলো না।

গ্যালারি থেকে নিজেই সে ছুটে বার হয়ে গেল রাস্তায়।

সারা দিন সে প্যারিসের অচেনা পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। কোথাও বড়ো বড়ো রাস্তা, কোথাও গলিঘুঁজি। পথের ধারে বসল কিছুক্ষণ কখনো বা।

সন্ধেবেলা পুলিশকে প্রশ্ন করে করে পথ খুঁজে সে ফিরে এল থিয়োর বাড়িতে। সারা শরীরে ক্লান্তি, বুকের মধ্যে অত্যন্ত যন্ত্রণা। বাণ্ডিল খুলে নিজের আঁকা এতোদিনের ছবিগুলো সে ছড়িয়ে দিল মেঝেতে।

কী সে করছে এতোদিন? এতো ক্যানভাস, এত রঙ, সব অপব্যয়। এতো শ্রম, এতো যন্ত্রণা—সব শুধু ব্যর্থতা। বিগত শতাব্দীর মৃত অন্ধকারে সে ডুবে ছিল এতোদিন,—খোঁজই পায়নি কোথায় বয়ে চলেছে নব যুগের বিপুল আলোক-বন্যা।

থিয়ো আপিস থেকে ফিরে এসে দেখে, তেমনি বসে আছে ভিনসেণ্ট চারিদিকে ছড়ানো নিজের ছবির মাঝখানে প্রস্তরীভূত হয়ে। থিয়ো তাড়াতাড়ি এসে চুপ করে বসল তার পাশে।

একটু পরে বললে,—ভিনসেণ্ট, তোমার যা মনে হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি। সাংঘাতিক লাগছে, তাই না? যা ভেবেছ সবচেয়ে বড়ো, যা ভেবেছ অটুট অনড়, ছবি আঁকার এতদিনের আইন কানুনের পবিত্র বিধি-ব্যবস্থা—সব যেন চুরমার হয়ে গেল। ঠিক বলেছি কি না বলো?

আর্ত আহত চোখে স্থির দৃষ্টিতে ভিনসেণ্ট তাকালো থিয়োর চোখের দিকে। বললে,—থিয়ো, তুমি আগে কেন আমাকে দেখাও নি? আগে কেন আমাকে আনোনি এখানে? আমার জীবনের ছ-ছটা বছর একেবারে নষ্ট হয়ে গেল!

—নষ্ট হয়ে গেল? পাগল নাকি! তোমার যা শিল্পরীতি তা তুমি নিজে হাতে গড়ে তুলেছ। তুমি যে ছবি আঁকো তা কেবল ভিনসেণ্ট ভ্যান গকই আঁকতে পারে, দুনিয়ার আর দ্বিতীয় কেউ তা পারে না। এখানে আসবার আগে তোমার নিজস্ব প্রকাশরীতিকে খুঁজে পাওয়াটা দরকার ছিল বৈকি!

—বাজে কথা থিয়ো, সব বাজে কথা। আমার আর কোন উপায় নেই! বড়ো কালো একটা ক্যানভাসে পায়ের ধাক্কা মেরে ভিনসেণ্ট করুণ গলায় বলে উঠল,—কী করেছি আমি এতদিন! যতো সব মৃত আবর্জনার স্তূপ!

—শোনো ভিনসেণ্ট। করেছ তুমি অনেক কিছু। বাকি কিছুটা কাজ কেবল এখন বাকি। শুধু আলো আর রঙ—এটুকু এবার শুধু তোমাকে ইমপ্রেশনিস্টদের কাছ থেকে নিতে হবে। এর বেশি কিন্তু নয়। অনুকরণ

তুমি করবে না, প্যারিসের কাছে বশ্যতা স্বীকার তুমি করবে না। আগে যদি আসতে, তাহলে নিজস্ব বলে তোমার একবিন্দুও থাকত না।

—কিন্তু থিয়ো, আমাকে যে আবার গোড়া থেকে শিখতে হবে! যা কিছু আমি এ পর্যন্ত করেছি, সব যে ভুল।

—না। সব ঠিক,—কেবল আলো আর রঙ ছাড়া। এর বেশি আর ইম্‌প্রেশনিস্টদের কাছ থেকে নেবার তোমার কিছু নেই। তুমি নিজেই যে তাই। বরিনেজে প্রথম যেদিন তুমি পেন্সিল ধরেছিলে, ইম্‌প্রেশনিস্ট তুমি সেদিন থেকেই। তোমার ড্রয়িং দেখ, তুলির আঁচড় দেখ। মনে-র আগে এমনি আর কেউ আঁকেনি। মুখ দেখ, গাছ দেখ, মাঠের মুর্তগুলি দেখ। প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ তুমি করোনি, প্রকৃতির যে স্পর্শ তোমার মনে, তাই তুমি প্রকাশ করেছ। তোমার কাজে সুক্ষ্ম অনুকৃতি নেই, প্রকাশের তথাকথিত সম্পূর্ণতা নেই—আছে তোমার চেতনার তোমার অনুভূতির স্পর্শ, তোমার ব্যক্তিত্বের পরিচয়। এই তো ইম্‌প্রেশনিস্ট হওয়া,—চিরাচরিত ব্যাকরণের বেড়াজাল ভেঙে ফেলে নিজের চেতনাকে উদ্‌ঘাটিত করা। কে বলে তুমি পিছিয়ে পড়ে আছ?

—সত্যি বলছ থিয়ো?

—প্যারিসের সমস্ত তরুণ আর্টিস্ট তোমার কাজের সঙ্গে পরিচিত। যারা সফল ছবি-বিকিয়ে তারা নয়, যার নতুন পথে চলেছে, ভাবছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে, তারা। তারা সবাই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক। তাদের কাছ থেকে অনেক আশ্চর্য জিনিস তুমি শিখতে পারবে।

—তারা আমাকে চেনে? আমার আঁকা তারা দেখেছে?

উদ্‌গ্রীব আগ্রহে উঁচু হয়ে বসল ভিনসেণ্ট। হঠাৎ কেমন থিয়োর মনে পড়ে গেল তাদের ছেলেবেলার কথা। বললে,—নিশ্চয়,—নইলে এতদিন প্যারিসে বসে আমি করেছি কী? তারা জানে দৃষ্টি তোমার তীক্ষ্ণ, জানে তোমার ড্রয়িং-এর ক্ষমতা। এবার শুধু আলোটুকু বাকি। মুক্ত আকাশের আলো আনো তোমার ছবিতে, তারপর—আর তোমাকে মারে কে? ভিনসেণ্ট, জানো, সারা চিত্রকলার ওপর সূর্যের নতুন আলো ঝরে পড়ছে এ যুগে,—এ যুগ আমাদের যুগ!

—থিয়ো, থিয়ো!

আর বলতে পারল না ভিনসেণ্ট। দুহাতে ভাইএর ডান হাতটা চেপে ধরল নিরুদ্ধ আবেগে।

৩

পরদিন সকালে ভিনসেণ্ট ড্রয়িং-এর জিনিসপত্র নিয়ে করম্যানের স্টুডিয়োতে গেল। তিনতলার ওপরে মস্ত হল-ঘর, উত্তর দিক থেকে হাঁ-করা জানলা দিয়ে আলোর প্রবেশ। একধারে দরজার দিকে মুখ করে একটি নগ্ন পুরুষ মডেল।

ছাত্রদের জন্যে প্রায় ত্রিশটি চেয়ার আর ঈজেল ইতস্তত। ভিনসেণ্ট করম্যানের কাছে নাম রেজিস্ট্রি করে একটা ঈজেলের অধিকার পেল।

ঘণ্টাখানেক বোধহয় সে ড্রয়িং করেছে, এমন সময় দরজা ঠেলে একটি মহিলা এসে ঘরে ঢুকল। কানে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, দুহাতে মুখের থুতনিটা চাপা। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নগ্ন মডেলটির দিকে চোখ পড়তেই ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল মহিলাটি। তারপর সটান দৌড় দিল বাইরে।

ভিনসেণ্ট পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল,—ব্যাপার কী?

—এ ব্যাপার নতুন নয়। লেগেই আছে। পাশের ঘরের দাঁতের ডাক্তারের কাছে এসেছে, ভুলে ঢুকে পড়েছে এই ঘরে। হঠাৎ অমনি একটা উলঙ্গ পুরুষের ওপর চোখ পড়লেই অনেক সময় কী হয়, চট্ করে মেয়েদের দাঁতের ব্যথা সেরে যায়। ডাক্তার যদি আর কিছুদিন ও-ঘরে থাকে, তাহলে পশার একেবারে মাটি। —আপনি আজ নতুন এসেছেন, না?

—হ্যাঁ, সবে তিনদিন হোলো আমি প্যারিসে এসেছি।

—নামটি আপনার জানতে পারি?

—ভ্যান গক। আপনার?

—হেনরি তুলুস্-লোত্রেক। আচ্ছা, থিয়ো ভ্যান গক আপনার কেউ হয়?

—আমার ছোট ভাই।

—আঃ তাই বলুন। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে তুলুস-লোত্রেক হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য,—আপনি তাহলে ভিনসেণ্ট, না? ভারি খুশি হলাম আলাপ হতে। আপনার ভাইএর মত ছবিওয়ালা সারা প্যারিসে নেই। যারা তরুণ শিল্পী তাদের জন্যে লড়াই করে চলেছে থিয়ো। আমরা যদি কখনও শিল্প-মহলে ঠাঁই পাই, সে পাব ঐ থিয়োর জন্যে।

ভিনসেণ্ট বললে,—আমি শুনেছি।

ভালো করে নবপরিচিতকে দেখল ভিনসেণ্ট। চ্যাপটা মতো মাথা, নাক, মুখ চিবুক সব ভারি ভারি, সামনের দিকে যেন উঁচিয়েই আছে। গাল-ভর্তি দাড়ি,—নিচের দিকে ঝোলা নয়, গালের দুপাশে শুঁড়-তোলা যেন।

লোত্রেক জিজ্ঞাসা করলে,—করম্যানের মতো ওঁচা জায়গায় এসে জুটলেন কেন?

ভিনসেণ্ট বললে,—স্কেচ করবার একটা জায়গা তো চাই। আপনিই বা কেন এখানে?

—ভগবান জানে কেন। গত মাস থেকে আছি মোমার্তের একটা বেশ্যা-বাড়িতে। সবকটা মেয়ের পোর্ট্রেট এঁকেছি। সে-ই হচ্ছে আসল কাজ। স্টুডিয়োতে বসে স্কেচ করা তো শুধু ছেলেখেলা।

—ছবিগুলো আমাকে দেখাবেন একদিন?

—সত্যি দেখবেন?

—বাঃ দেখব না কেন ? নিশ্চয় !

—ব্যাপারটা কী জানেন ? অনেকেই আমাকে পাগল বলে, কারণ নাচঘরের মেয়ে, ভাঁড় আর বেশ্যা, ওদের আমি আঁকি। কিন্তু যে যাই বলুক, সত্যিকারের টাইপ চান তো ওদের মধ্যেই পাবেন।

—আমি জানি। অমনি একটা মেয়ের সঙ্গে হেগ-এ কিছুদিন আমি ঘরও করেছি।

—বাঃ বাঃ, চমৎকার। এই নাহলে ভ্যান গক পরিবারের ছেলে!—দেখি মডেলটার কেমন স্কেচ করলেন আপনি!

ভিনসেণ্ট কাগজগুলো বাড়িয়ে দিলে,—এই দেখুন, গোটা-চারেক করেছি।

কিছুক্ষণ স্কেচ-কটা ভালো করে নিরীক্ষণ করল লোত্রেক, তারপর পরিচয়টাকে ঘনিষ্ঠতার সুরে বেঁধে নিয়ে বললে,—দ্যাখো বন্ধু, তোমাতে আমাতে জমবে ভালো। আমাদের দুজনের মধ্যে মিল আছে অনেক।—ভালো কথা, এগুলো করম্যানকে দেখিয়েছ ?

—এখনো না।

—খুব ভালো। তাহলে দেখিয়ো না। করম্যানের সমালোচনা যদি একবার শোনো তাহলে দ্বিতীয় দিন আর এখানে আসতে প্রবৃত্তি থাকবে না। সেদিন আমাকে কী বললে জানো ? বললে, লোত্রেক, অতিরঞ্জন ছাড়া কি তুমি আঁকতে পারো না ? অতিরঞ্জনের ঠ্যালায় তোমার কাজ যে ভাঁড়ামিতে পৌঁছে গেছে !

লোত্রেকের তীক্ষ্ন চোখে বিচিত্র এক আলো ফুটে উঠল। বললে,—সত্যি দেখবে আমার আঁকা মেয়েদের ছবিগুলো ? ভদ্রতা করছ না তো ?

—কী মুস্কিল !

—বৎস, ওঠো। চলো তাহলে আমার সঙ্গে। এই কবরখানায় আর এক মিনিট নয়।

লোত্রেকের চেহারাটা কিম্ভুত। মোটা ঘাড়, চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল দুই বাহু। কিন্তু আসলে সে পঙ্গু। কোমর পর্যন্ত স্বাভাবিক, তার পরেই আর তার কিছু যেন নেই। শীর্ণ কয়েক আঙুল মাত্র লম্বা দুটি পা। দেহের ভার সে খেলনার পায়ে সয় না। লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে হাঁটে। কয়েক পা চলার পরই বিশ্রাম করতে হয়।

—তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, পা দুটোর আমার কী হোলো। তাই না ভ্যান গক ? শোনো তাহলে।

—কী দরকার লোত্রেক ? নাই বললে!

—না, না, সবাই তো জানে, তুমিও জানলে। লাঠির ওপর শরীরের ওপরদিককার ভার চেপে রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে বলে চলল লোত্রেক, —আমি যখন জন্মাই, শরীরের হাড়গুলো সব ঠুনকো ছিল। বারো বছর যখন আমার বয়েস তখন নাচঘরের মেঝেতে পড়ে ডান উরুর হাড়টা ভেঙে

ফেলি। পরের বছরেই আবার দুর্ঘটনা। সেবার পড়ে যাই একটা খাদের মধ্যে, বাঁ উরুর হাড়টাও ভাঙে। তার পর থেকে আমার পা আর এক ইঞ্চিও বাড়ল না।

—দুঃখ আছে নাকি এ জন্যে ?

—মোটেও না ভায়া। স্বাভাবিক যদি চেহারাটা হোতো, তাহলে কি আর ছবি আঁকতে পারতাম ? আমার বাবা হচ্ছেন তুলুস্-এর কাউণ্ট। তাঁর মৃত্যুর পর খেতাবটা আমারই পাওনা। হয়ত মার্শালের দণ্ড হাতে নিয়ে ফ্রান্সের রাজার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবো, এই ছিল পূর্বজন্মের ফল। কিন্তু সে রাজাও নেই, আর আমার পাও নেই। অতএব ছবি আঁকা আমার মারে কে? আচ্ছা তুমিই বলো, শিল্পী যদি হতে পারি তাহলে কাউণ্ট হতে যাব কোন্ দুঃখে ?

—ঠিক। কাউণ্টদের দিন ফুরিয়েছে, শিল্পীর দিন অফুরান।

—চলো।—ঐ যে গলিটা দেখছ, ওর মধ্যে ডেগার স্টুডিয়ো। লোকে বলে আমি নাকি ডেগার কপি করি, কেননা সে ব্যালে-নাচিয়েদের আঁকে, আমি আঁকি মোলা-রুজের মেয়েদের। যা বলে বলুক, আমার বয়েই গেছে। ঐ ১৯ নং রু ফঁাতেন দেখছ ? ঐ আমার আস্তানা। হ্যাঁ, ঠিক বুঝেছ, একতলাতেই আমি থাকি। সিঁড়ি ভাঙতে হয় না।

দরজা খুলে সমাদর করে লোত্রেক ভিনসেণ্টকে ঘরে আনল। বললে,—কিছু ভেবো না, আমি একলা থাকি, যেখানে খুশি জায়গা করে বসে পড়ো।

ভিনসেণ্ট তাকালো চারদিকে। ঘরের কোণে কোণে গাদা গাদা ক্যানভাস, ফ্রেম, টুল,ছোট ছোট সিঁড়ি আর ঝলঝলে পর্দা, মাঝখানে সারা মেঝে জুড়ে দুখানা বড়ো টেবিল। একটি টেবিল জুড়ে দুষ্প্রাপ্য দামি দামি মদের বোতল, ডিকাণ্টার আর গ্লাসের মিছিল। অন্য টেবিলটার ওপর নানা জিনিস এলোমেলো, স্তূপাকার,—নাচিয়ে মেয়েদের চটিজুতো, কাঁচুলি, ঘাঘরা, দস্তানা, মোজা, টুকিটাকি অলংকার, গাদা গাদা বই আর অশ্লীল ফোটোগ্রাফ, আর একগোছা চমৎকার জাপানি ছবির প্রিণ্ট। পুঁজির পাহাড়ের এক কোণে একটুখানি জায়গা। বোধহয় লোত্রেকের কাজ করার জন্যে।

—কী হোলো ভ্যান গক, হেঁকে উঠল লোত্রেক,—আরে ? বসবার একটা জায়গা পাচ্ছ না ? ঐ দ্যাখো, ঐ চেয়ারটার ওপর যা আছে সব ছুঁড়ে ফেলে দাও মাটিতে। জানলার ধারে আলোর কাছে চেয়ারটা টেনে এনে বোসো।

উত্তেজিত হাতে ছবি গোছাতে গোছাতে আবার সে বললে,—এ বাড়িতে সাতাশটা মেয়ে আছে, ভ্যান গক। সবকটার স্কেচ আমি করেছি। শুধু তাই বললে কম বলা হবে, প্রত্যেকটার সঙ্গে আমি রাতও কাটিয়েছি। সত্যি বলো, যে মেয়েকে আঁকতে চাও তার সঙ্গে শুতেই যদি না পারলে, তাহলে তাকে পুরোপুরি বুঝবে কী করে ?

—ঠিক বলেছ।

—এই দ্যাখো স্কেচগুলো। সেদিন এক ছবিওয়ালার কাছে এগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম। লোকটা কী বললে জানো? বললে,—লোত্রেক, যা কুৎসিত তার প্রতি তোমার এমনি আসক্তি কেন? অসচ্চরিত্র কদর্য সব মানুষ খুঁজে খুঁজে নিয়ে তুমি আঁকো। এই সব মেয়েগুলো এতো ঘৃণিত যে মুখে বলা যায় না, কুৎসিত পাপের ক্লেদ এদের মুখে মাখানো। যা কুৎসিত তাকে সৃষ্টি করার নামই কি তোমাদের আধুনিক শিল্প? তোমরা কি সব অন্ধ হয়ে গেছ? পৃথিবীতে যা মধুর, তা কি তোমাদের চোখে পড়ে না?

—তারপর?

আমি বললাম,—মাপ করুন মশিয়ে*, আপনার কার্পেটটা ভারি সুন্দর, আমার খুব বমি আসছে, এটাকে নোংরা করা আমার পক্ষে সত্যি ঠিক হবে না। —দ্যাখো, আলোটা ঠিক পাচ্ছ তো? বেশ ভালো করে দ্যাখো।—ও, টানবে নাকি কিছু? না না, যা চাও তাই পাবে। মুখ ফুটে একবার হুকুম করলেই হোলো।

ত্বরিত গতিতে সে টেবিল চেয়ারের ভিড়ের মধ্যে খাটো পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে দু-গেলাস মদ ঢেলে নিয়ে এল। একটা গ্লাস ভ্যান গকের হাতে তুলে দিয়ে গ্লাসভর্তি নিজের ডান হাতটা উঁচু করে তুলে চেঁচিয়ে উঠল,—জয় হোক,—যা কুৎসিত যা কদর্য, তার জয় হোক।

আস্তে আস্তে পান করতে করতে ভিনসেণ্ট লোত্রেকের স্কেচগুলো দেখতে লাগল। সাতাশটি ছবি, সাতাশজন আলাদা আলাদা মেয়ে,—প্রত্যেকটি মোমার্ত-বাসিনী গণিকা। ছবিগুলির মৌলিক গুণ এগুলির বাস্তবতা। শিল্পী যেমন দেখেছে ঠিক তেমনই এঁকেছে,—নীতি বা রুচির কৃত্রিম আবেশে এই স্বচ্ছ দৃষ্টির বাস্তবতাকে ঘোলাটে করা হয়নি। মেয়েগুলির মুখগুলি দেখবার মতো, নিরাবরণ স্বরূপে সে মুখে ফুটে আছে অনাসক্ত কৃত্রিম কামুকতা, জান্তব লাম্পট্য, মনোবিহীন শরীর-সর্বস্বতা, আর অকপট দৈন্য-বেদনা।

শুধোলো সে,—চাষীদের ছবি তোমার ভালো লাগে লোত্রেক?

—ভালো লাগে, যদি তার মধ্যে মিথ্যে ভাবালুতা না থাকে।

—বটে? কথাটা কী জানো,—আমি এই চাষীদের শিল্পী। তাদের ছবিই এতো দিন এঁকেছি। আমার মনে হচ্ছে,—তোমার এই সব মেয়েরা, এরাও কৃষাণ,—কৃষি করে এরা মাংসের। মাটি আর মাংস—একই পদার্থের দু-রকম রূপ, তাই নয়? জীবন্ত মানুষের মাংসের কর্ষণ এরা করে—ফসল ফলে বৈকি। সেই ফসল জীবন। জীবনকে তুমি বাদ দাওনি লোত্রেক, বাস্তবকে তুমি এড়িয়ে যাওনি। কাজের মতো কাজ করেছ!

—তোমার কি মনে হয়,—ছবিগুলো কুৎসিত?

—এরা সত্য,—এরা জীবনের সুগভীর পরিচিতি। সত্য বলেই এদের সৌন্দর্য খুব উঁচুদরের। এসব মেয়েদের তুমি যদি মিথ্যে আদর্শ আর ভাবালুতা

দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আঁকতে, তাহলেই এগুলো হোতো অসুন্দর—অসভ্য আর কাপুরুষতার কদর্য নিদর্শন। কিন্তু যে সত্যকে তুমি দেখেছ, তাকে প্রকাশ করতে তুমি ডরাও নি। কার সাধ্য বলে সত্য অসুন্দর?

—হে প্রভু! হে যিশু! এই ভ্যান গকের মতো লোক এতো কম পাঠাচ্ছ কেন পৃথিবীতে?—নাও, নাও, আর-একবার গলা ভিজিয়ে নাও। আর এই ছবিগুলোও ভায়া সব তোমার। যে-খানা খুশি বেছে নাও।

একটা স্কেচ উঁচু করে আলোতে তুলে ধরল ভিনসেণ্ট। খানিকক্ষণ ভালো করে লক্ষ করার পর বলে উঠল,—দ্যমেয়ার! দ্যমেয়ারের কাজ মনে পড়ছে!

জ্বলে উঠল লোত্রেকের চোখ। বললে,—হ্যাঁ, দ্যমেয়ার। শিল্পীর রাজা। জীবনে যা শিখেছি ঐ একজনের কাছ থেকেই। ঈশ্বর! ঘৃণা করবার কী অভূতপূর্ব ক্ষমতা ছিল লোকটার!

ভিনসেণ্ট বললে,—এতে কিন্তু আমার আপত্তি আছে। ঘৃণাই যাকে করব তাকে আঁকতে যাব কোন্ দুঃখে? যাকে ভালোবাসি তাকেই না আঁকতে মন চায়!

—ভুল ধারণা তোমার ভায়া, লোত্রেক উত্তর দিলে,—মহৎ শিল্প বলতে যা কিছু, ঘৃণা থেকেই তার জন্ম।—কী হোলো? গগাঁর ছবিটা পছন্দ হোলো দেখছি আবার?

—কার ছবি এটা বললে?

—পল গগাঁ। আলাপ আছে নাকি?

—না।

—তাহলে তো আলাপ করতেই হবে। ছবির মেয়েটা মার্টিনিক দ্বীপের মেয়ে। গগাঁ ও অঞ্চলে গিয়ে ছিল কিছুদিন। তার পর থেকে ওর মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে: জংলি হবে, আদিম মানুষ হবে—এই ওর নেশা। তবে, পাগল হলে কী হয়, শিল্পী হিসেবে কিন্তু অপূর্ব। স্ত্রী ছিল, তিনটি ছেলেপিলে ছিল আর ছিল স্টক এক্সচেঞ্জে মোটা মাইনের চাকরি। বছরে তিরিশ হাজার ফ্র্যাংক আয়। পিসারো, মানে আর সিস্লের কাছ থেকে ছবিই কিনেছিল পনেরো হাজার ফ্র্যাংকের। বিয়ের দিন স্ত্রীর ছবি আঁকে। সবাই বলল, আহা, আহা! রবিবার ছুটির দিনে আঁকত, স্টক এক্সচেঞ্জ ক্লাবে শাঁসালো সভ্য বলে নামডাক ছিল। একবার নিজের আঁকা একটা ছবি মানে-কে দেখায়। মানে প্রশংসা করে। ভদ্রতা করে মানে-কে ও বলে,—আমি তো নিতান্ত অ্যামেচার আঁকিয়ে।—অ্যামেচার? মানে উত্তর দেয়,—যারা খারাপ আঁকে তারাই অ্যামেচার। তারা ছাড়া অ্যামেচার কে? নির্জলা মদের মতো কটা কথা সেই যে ওর মাথায় গিয়ে চড়ল, আজ পর্যন্ত আর নামল না। চাকরি ছাড়ল, বৌ-বাচ্চাদের বিদায় দিল শ্বশুরবাড়িতে, নেশা নিয়েই মেতে রইল তার পর থেকে। নেশা ছবি আঁকা।

—বাঃ, আশ্চর্য লাগছে! আলাপ করতেই হবে এমন লোকের সঙ্গে।

—তা করবে। তবে, আগে থেকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিই, বন্ধুদের ক্ষেপিয়ে দিতে ওর মত ওস্তাদ কেউ নেই।—ভালো কথা ভ্যান গক, অপরের কথাই যখন উঠল, একদিন তোমাকে মোলা রুজ আর ইলিসি মোমার্ত দেখিয়ে আনি চলো। কী সব মেয়ে! কিছু ভেবো না তুমি, সবকটাকে আমি চিনি। আপত্তি নেই তো তোমার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে?... হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ হোলো—আলাপ করতে, নাড়াচাড়া করতে, যা প্রাণ চায় সব করতে। তাহলে একটা রাত্রি ফুর্তি করা যাক একদিন, রাজি তো?

—নিশ্চয় রাজি।

—বহুৎ অচ্ছা। কিছু ভেবো না, সে ব্যবস্থা আমার।—তারপর? আবার এখন করম্যানে যেতে হবে তো? তা, ওঠবার আগে আর-এক পাত্র করে হোক! নাও, মেরে দাও এটুকু এক চুমুকে। এই তো চাই! আর-একটু ঢালি, কেমন? আহা, তলানি রেখে কী হবে, বোতলটা শেষ করা চাই তো! ব্যস, নাও ওঠো এবার। দেখো সাবধান, টেবিলের গায়ে ধাক্কা খেয়ো না যেন। নাঃ, বড্ড জিনিসপত্র জমেছে! ঘরটা আমাকে ছাড়তেই হবে এবার। বুঝেছ ব্রাদার, টাকায় আমাদের মরচে পড়ছে। বাবার আমার মেজাজ দিলদরিয়া, খোঁড়া ছেলে পাছে মনে মনে অভিশাপ দেয়, তাই চাইবার আগেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠায়। আমি খাই দাই ফুর্তি করি,—ছবি আঁকি। যখন নতুন একটা স্টুডিয়ো ভাড়া নিই, বিলকুল খালি ঘর। তারপর জিনিসপত্র জমে। মালের ভিড়ে যখন মানুষের ঠাঁই থাকে না, তখন আবার সব ফেলে শুধু ছবিগুলো নিয়ে নতুন ফাঁকা ঘরে উঠে যাই। আবার নতুন ঘর, নতুন জিনিসপত্র,—ঠিক নতুন মেয়েমানুষের মতো।—ভালো কথা, কী রকম মেয়েমানুষ তোমার পছন্দ বলো—টকটকে গোলাপি রঙ? তোমার মতো লালচে চুল?

৪

এ আবার এমন একটা শক্ত কাজ নাকি? পুরোনো প্যালেটটা ফেলে দিয়ে কিছু হাল্কা রঙ কিনে নিলেই তো হোলো। তাহলেই তো এইসব ইম্প্রেশনিস্টদের মতো ছবি আঁকা যাবে! প্রথম দিনের চেষ্টার পরে কিন্তু কিছুটা ঘাবড়ে গেল ভিনসেণ্ট। তার পরদিন মনে জাগল কেমন যেন দিশেহারা ভাব, তারপর বিরক্তি, রাগ, হতাশা। সপ্তাহ শেষ হতে না হতে ভয়,—পিঠের শিরদাঁড়া শিরশিরিয়ে ওঠে, এমনি আতঙ্ক। রঙ নিয়ে বছরের পর বছর কতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে, তার ফল শেষ পর্যন্ত কি এই? অবস্থা যে একেবারে প্রথম শিক্ষার্থীর মতো! ক্যানভাসের পর ক্যানভাসে রঙ চড়ায়—গাঢ় নিষ্প্রভ চটচটে রঙের প্রলেপ শুধু পড়ে। করম্যানের স্টুডিয়োতে বসে বসে সে আঁকে আর নিজের ব্যর্থতায় নিজেই গজগজ করে—লোত্রেক পাশে বসে বসে শুধু তার

কাণ্ড দেখে,—কোনো উপদেশ দিতে চায় না, চুপ করে থাকে।

থিয়োর অবস্থা আরো দুঃসহ। থিয়ো অতি ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক, আচার ব্যবহার ও অভ্যাস সবই মৃদু, কোমল। পোশাকে পরিচ্ছদে গৃহসজ্জায় অতি খুঁতখুঁতে ধরনের সৌখিন। ভিনসেণ্টের দুর্দাম জীবনী-শক্তির নিতান্ত সামান্য অংশেরও সে অধিকারী নয়।

রু লাভালের ফ্ল্যাটটি থিয়ো আর তার সৌখিন আসবাবগুলির পক্ষে যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি ভিড় তার সয় না। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই ভিনসেণ্ট অমন সুন্দর ফ্ল্যাটটিকে পুরোনো মালের দোকানে পরিণত করে তুলল। মোটা বুট ঘসে ঘসে হেঁটে সে মেঝের কার্পেট নষ্ট করল, যে আসবাব সামনে পড়ে লাথি মেরে এ কোণে ও কোণে হটাতে লাগল তাকে, ক্যানভাস তুলি রঙের খালি টিউব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নোংরা করল চারিদিক। টেবিলে চেয়ারে তার ময়লা জামাকাপড় জড়ো, ডিশের পর ডিশ তার হাতে ভাঙে, রঙ ছিটিয়ে সে নোংরা করে দেয়াল। থিয়োর জীবনের প্রত্যেকটি ভব্য ধারন-ধরন চুরমার করল সে।

একটি সন্ধ্যার ঘটনা।

ছোট্ট ঘরটায় লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত পায়চারি করছিল ভিনসেণ্ট আর দাঁত কিড়মিড় করে আপন মনে বক-বক করে চলেছিল। থিয়ো বললে,—অতো ছটফট করছ কেন? ডাকাতের মাঠ পেয়েছ নাকি ঘরখানা?

হাল্কা একটা চেয়ারে শরীরের সমস্ত ওজন ধপ্ করে ফেলে ভিনসেণ্ট ভীষণ কাণ্ড করল, আর্তনাদ করে উঠল পায়াগুলো।

চিৎকার করে উঠল সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ বেদনায়,—আশা নেই, কোনো আশা নেই, বড্ডো দেরি হয়ে গেছে! চেষ্টাও কি কম করেছি। পাগলের মতো খেটেছি,—একটা নয় দুটো নয়, কুড়িটা ক্যানভাস আমি শেষ করেছি। কিন্তু কোনো উপায় নেই। নতুন করে শুরু করতে হবে আবার। যা এতদিন করেছি সব বাতিল।

থিয়ো ধমকে উঠল,—কী পাগলের মতো বকছ?

—পাগল? পাগল হতে আর বাকি আছে? সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার! এখানে যা দেখলাম এর পর হল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে ভেড়ার ছবি আঁকতে আর পারব না,—নতুন পথে যাবারও সময় আর নেই। হায় ভগবান, আমার কী হবে এখন?

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ভিনসেণ্ট দরজা খুলে বাইরের বাতাস কয়েকটা লম্বা লম্বা নিশ্বাসে টেনে নিল বুকে। তারপর দরজাটা বন্ধ করে জানলা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ এমন জোরে জানলাটা বন্ধ করল যে ঝন্-ঝন করে উঠল শার্শির কাঁচ। ছুটে গেল রান্নাঘরে। ঢক-ঢক করে জল খেল, সঙ্গে সঙ্গে খেল বিষম। ভিজে হাত মুখ আর জামা নিয়ে আবার এসে ঢুকল বসবার ঘরে।

—সত্যি, বলো থিয়ো, কী করব আমি? এতো আশা, এতোদিনের

পরিশ্রম—সব ছেড়ে-ছুড়ে দেব ? কোন আশা আর আমার নেই, তাই না ?

—ভিনসেণ্ট, এ কেমন তোমার ব্যবহার ? কচি খোকা নাকি তুমি ? ঠান্ডা হয়ে যদি বসতে পারো তো কথা বলব।—আবার পায়চারি করছ ? ঈস, এমন সুন্দর চেয়ারটি ভাঙবে নাকি লাথি মেরে মেরে ? খুলে ফেল, বুট-জুতো খুলে বোসো চুপ করে।

—কিন্তু থিয়ো, দু-বছর ধরে আমি তোমার ওপর আছি। বলো, কী প্রতিদান দিতে পেরেছি তার ? একগাদা কালো চটচটে ছবি, যার দাম কানাকড়িও নয়। কিছু শিখি নি, কিছু করি নি, শুধু এতোদিন মাসের পর মাস তোমার টাকা উড়িয়েছি। এ লজ্জায় তো মরে যাওয়া উচিত আমার।

—শোনো ভিনসেণ্ট, শোনো। মাথা খারাপ কোরো না। আচ্ছা বলো দেখি, যখন কৃষাণ-জীবন আঁকবে ভেবেছিলে, এক সপ্তাহেই কি আঁকতে শিখেছিলে ? না পুরো পাঁচটা বছর লেগেছিল ?

—তা ঠিক, কিন্তু তখন সবে যে আরম্ভ করেছিলাম আমি।

—ঠিক। আজও নতুন একটা আরম্ভ তোমার। রঙের কাজের আরম্ভ। এবং এর জন্যে আরো পাঁচটা বছর দিতে হবে বৈকি !

—থিয়ো থিয়ো, এর কি আর কখনো শেষ হবে না ? সারা জীবন কি এমনি শিক্ষানবিশি করেই কাটবে ? তেত্রিশ বছর বয়েস হোলো, পরিণতি হবে আর কবে আমার ?

—এই তোমার শেষ শিক্ষা ভিনসেণ্ট। সারা ইউরোপে যা কিছু আঁকা হচ্ছে সবকিছুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমি জানি কোথায় আরম্ভ, কতোদূরে গিয়ে শেষ। একবার যদি প্যালেটটা হাল্কা রঙের করতে পারো—

—সত্যি বলছ থিয়ো ? সত্যি বলছ আমার আশা আছে ? পারব আমি শেষ পর্যন্ত ? ব্যর্থ তাহলে নই আমি ?

—না, তুমি আর-কিছু। তুমি একটা আস্ত গাধা। শিল্পের ইতিহাসে বিরাটতম একটা বিপ্লব ঘটে চলেছে, আর তুমি ভাবছ সাত দিনে তা তুমি রপ্ত করে নেবে। চলো, রাস্তায় একটু বেড়িয়ে আসি। তোমার সঙ্গে আর পাঁচ মিনিট যদি এই ঘরে আমাকে থাকতে হয়, তাহলে দম আটকে মরব আমি।

পরদিন প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিনসেণ্ট করম্যানের স্টুডিয়োতে কাজ করল, তারপর গেল গুপিলসে থিয়োকে ডাকতে। এপ্রিল মাসের গোধূলি, পাথরের উঁচু উঁচু সারি সারি বাড়ির মাথায় পড়ন্ত বেলাশেষের গোলাপি আভা। সারা শহর জুড়ে বসন্ত-দিনান্তে ছুটির আমেজ। রু মোমার্তের পথের ধারের কাফেগুলিতে আড্ডাবাজদের ভিড়, মিষ্টি মধুর সঙ্গীত। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বালানো হচ্ছে, রেস্তোরাঁগুলোতে টেবিলে চাদর পাতছে ওয়েটাররা, বন্ধ হচ্ছে অন্য দোকানপাট।

অলস পদক্ষেপে এগোলো থিয়ো আর ভিনসেণ্ট, প্লেস চাতুদ্‌নের মোড় পার হয়ে চলল র‍্যু লাভালের পথে।

থিয়ো বললে,—একটু গলা ভিজোবে নাকি ভিনসেণ্ট ?

—হ্যাঁ, কোথাও বসলে হোতো,—এমন জায়গায়, যেখান থেকে ভিড় দেখা যায়।

—চলো তাহলে বাতেইল রেস্তোরাঁতে, সেখানে বন্ধুও কয়েকজন জুটবে।

রেস্তোরাঁ বাতেইল প্যারিসের ছবি-আঁকিয়েদের অন্যতম আড্ডাক্ষেত্র। বাইরে রাস্তার ধারে চার-পাঁচখানা টেবিল, মধ্যে দুখানা বেশ বড়ো বড়ো ঘর। একখানা ঘর মাদাম বাতেইল নির্দিষ্ট রেখেছেন শুধু শিল্পীদের জন্যে। অন্য ঘরটি সাধারণ খদ্দেরের। লোক দেখলেই তিনি চিনতে পারেন কে শিল্পী আর কে শিল্পী নয়।

থিয়ো ওয়েটারকে ডাকল,—এই যে, এক গ্লাস কুমেল এইখানে।

ভিনসেণ্ট বললে,—আমি কী খাই বলো তো থিয়ো ?

একটা কোনয়্যাক চেখে দ্যাখো। এমনি চেখে-চেখেই নিজের প্রিয় মদটা খুঁজে পেতে হবে।

ডিশের ওপর গ্লাস বসিয়ে ওয়েটার টেবিলে সাজিয়ে রাখল। ডিশের গায়েই কালো হরফে দাম লেখা। থিয়ো ধরালো একটা সিগার, ভিনসেণ্ট তার পাইপ। সামনে কতো বিচিত্র নরনারীর পথযাত্রা। বগলের তলায় ইস্ত্রি-করা জামা কাপড় নিয়ে কালো-অ্যাপ্রন-পরা কয়েকটি ধোপানী, মুখে দড়ি-বাঁধা মাছ আঙুলে ঝুলিয়ে একটি শ্রমিক, ঈজেলে ভিজে ক্যানভাস আটকে নিয়ে দু-একজন শিল্পী, চকচকে কালো জুতো আর ধূসর চেক-কাটা কাপড়ের কোট গায়ে ব্যবসাদার, সওদা-ভর্তি বাস্কেট হাতে নরম চটি পায়ে গিন্নির দল, আর কতো সুদর্শনা তরুণী—সরু কোমরে লম্বা ঢেউ-খেলানো তাদের স্কার্ট, মাথায় বাঁকা করে বসানো রঙিন পালক-তোলা টুপি।

—অপূর্ব শোভাযাত্রা, তাই না থিয়ো ?

—ঠিক। আপিরিটিফ পানের সময় যখন আসে, ঠিক তখনই প্যারিস জাগে।

—আমি ভেবে পাই না, এই প্যারিস শহরকে এতো আশ্চর্য ভালো লাগে কেন!

—কে জানে। কেউ বোধহয় জানে না। এ একটা চিরন্তন রহস্য। হয়ত ফরাসী চরিত্রের মধ্যেই কোনো একটা জাদু আছে। সত্যি, ফরাসী মেজাজ যাকে বলে তা বড়ো বিচিত্র। এর মধ্যে যেমন আছে স্বাধীনতার গোঁ, তেমনি আছে মেনে নেওয়া আর মানিয়ে চলার আমেজ, বাস্তব ব্যস্ততার সঙ্গে মিশে আছে কেমন একটা ঢিলেঢালা জীবন। ঐ দ্যাখো, আমার এক বন্ধু আসছে। আলাপ করিয়ে দেব তোমার সঙ্গে।

ভিনসেণ্টের সঙ্গে কথা বন্ধ করে গলা চড়িয়ে ডাকলো থিয়ো,—পল, এসো এসো, কেমন আছ ?

—ধন্যবাদ ধন্যবাদ,—দিব্যি আছি, খুব ভালো আছি।

—বোসো এখানে, আবসাঁৎ খাও একটা। আলাপ করিয়ে দিতে পারি ? আমার ভাই ভিনসেণ্ট ভ্যান গক। ভিনসেণ্ট, আমার বন্ধু পল গগাঁ।

আবসাঁতের পাত্রে মুখ নামিয়ে জিভের ডগাটা ভিজিয়ে নিল পল গগাঁ, তারপর ভিনসেণ্টের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—প্যারিস কেমন লাগছে মশিয়ে ভ্যান গক ?

—ভালো, খুব ভালো।

—সত্যি ? হুঁ! কী বলব বলুন, আপনার মতো লোক অনেকেই। আমাকে যদি এ প্রশ্নটা আপনি করতেন, আমি কী বলতাম জানেন ? প্যারিস বিরাট একটা আঁস্তাকুড়। তামাম নোংরা-ভর্তি একটা ডাস্টবিন। নোংরাটা কিসের জানেন ? আপনাদের এই সভ্যতার।

ভিনসেণ্ট বললে,—কোনিক্রুটা আর ভালো লাগছে না থিয়ো! এবার কী চাখি বলো তো ?

গগাঁ বলে উঠল,—আবসাঁৎ খান, মশিয়ে। শিল্পীর একমাত্র পানীয় তো এটাই।

—কী বলো থিয়ো ? আবসাঁৎ ?

—তোমার খুশি। চেখে দ্যাখো কেমন লাগে।—ওয়েটার! মশিয়ে'র জন্যে আবসাঁৎ আনো।—তারপর, পল! আজ যে খুব খুশি দেখাচ্ছে, ব্যাপার কী! ছবি বিক্রি হয়েছে একটা ?

—কী যে বলো! ছবি বিক্রি ? ও তো নিতান্ত একটা খেলো কথা বললে! আসলে আজ সকালে উঠেই চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার।

ভিনসেণ্টকে চোখ টিপলো থিয়ো। বললে,—তাই নাকি ? বলো কী অভিজ্ঞতা, খুলে বলতেই হবে—ওয়েটার, মশিয়ে গগাঁর জন্যে আর-একটা আবসাঁৎ লাগাও চটপট।

মুখের ভেতরটা আবসাঁতে ভিজিয়ে নিয়ে গগাঁ শুরু করল,—আমার বাড়ির গায়ে একটা কানা গলি আছে দেখেছ ? সেখানে একটা ঘর নিয়ে থাকে ফুরেল পরিবার। পুরুষ মানুষটা গাড়ি চালায়। আজ ভোর পাঁচটার সময় ফুরেল-গিন্নির আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল,—কে আছ, কোথায় আছ, —বাঁচাও, আমার স্বামীকে বাঁচাও! কোনোরকমে একটা ট্রাউজার্সের মধ্যে পা-দুটো গলিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে দেখি ফুরেল গলায় দড়ি দিয়েছে। লাফিয়ে উঠে ছুরি দিয়ে দড়িটা কাটতেই ধড়টা ধড়াস করে মাটিতে পড়ল। সবে প্রাণটা বেরিয়েছে, গা-টা তখনো গরম। তাড়াতাড়ি বিছানায় তুলতে গেলাম, স্বামী সত্যিই মরেছে দেখে হেঁকে উঠল তার বৌ,

—খবরদার, আর নেড়ো না, আগে পুলিশ আসুক। উল্টোদিকে থাকে একটা ফলওয়ালা। আমার বাড়ির গায়েই তার বাগান। এসে লোকটাকে ডেকে বললাম,—ভায়া একটা পাকা দেখে ফুটি দিতে পারো? প্রাতঃকালের সময় পুরো একটা আহা-মরি ফুটি খেতে খেতে ফুরেলের গলায় দড়ির কথাটা স্রেফ মুছে গেল মন থেকে। অতএব দ্যাখো,—দুঃখ আছে আবার সুখও আছে, বিষ আছে আবার বিষক্ষয়ের ব্যবস্থারও অভাব নেই।

নীরবে মাথা নাড়ল থিয়ো।

গগাঁ বলে চলল,—দুপুর বেলা লাঞ্চ খাবার ভালো একটা নেমন্তন্ন ছিল। বেশ চোস্ত সাজগোজ করে বার হলাম। ভোজ্য বস্তু চমৎকার, দলটি মধুর। সবাইকে একটু চমক লাগাবার জন্যে ভোরবেলাকার আত্মহত্যার ঘটনাটা বললাম। নিরুদ্বেগে হাসতে হাসতে সবাই একটি অনুরোধ করল,—মড়াটার গলার দড়িগাছটা জোগাড় করতে পারি কি না, যাতে তার একটু একটু করে প্রত্যেকে নিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখতে পারে। অপূর্ব! কেয়াবাৎ! কে বলে তোমার সভ্য দুনিয়ায় বৈচিত্র্য নেই?

ভিনসেণ্ট একমনে দেখছিল পল গগাঁকে। বন্য লোকের মতো কুচকুচে কালো চুলে ভর্তি মস্ত একটা মাথা, বাঁ চোখের কোণ থেকে মুখের ডান কিনার অবধি খাঁড়ার মতো নেমে এসেছে বিরাট একটা নাক। চোখদুটো বড়ো বড়ো, সামনের দিকে টেনে বার হওয়া,—দৃষ্টিতে কেমন একটা উন্মত্ত বেদনা। চোখের ওপরে, নিচে, গালে, থুতনিতে, চামড়া ঠেলে উঁচু উঁচু হাড়ের প্রকাশ। দানবের মতো দেহ, প্রতিটি অঙ্গে পাশবিক শক্তি আর কষ্টকর সংযমের পরিচয়।

মুখে মৃদু হাসি টেনে উঠে দাঁড়ালো থিয়ো। বললে,—পল, তোমার যা মনোবৃত্তি, শুধু কথায় তাকে কী বলে জানো? বলে ধর্ষকাম। নিষ্ঠুরতা তোমার এতই ভালো লাগে যে, তার মধ্যে স্বাভাবিকতা না থাকলেও তোমার আসে যায় না। যা-হোক, এখন উঠতে হোলো। ডিনারের নিমন্ত্রণ। উঠবে নাকি ভিনসেণ্ট?

গগাঁ বললে,—থাকুক না আমার সঙ্গে। তোমার ভাইএর সঙ্গে তো আলাপই হোলো না ভালো করে।

—আমার আপত্তি নেই। তবে কিনা, অভ্যেস তো নেই, বেশি আবসাঁৎ ঢেলো না ওর পেটে।

বিদায় নিল থিয়ো।

ঘনিষ্ঠ হয়ে এল গগাঁ। বললে,—তোমার ভাইটি, ভিনসেণ্ট, ভারি চমৎকার। অবশ্য একেবারে যারা তরুণ তাদের ছবি টাঙাতে ভয় পায়। কিন্তু কী করবে বেচারা? ওপরওয়ালা তো আছে।

ভিনসেণ্ট বললে,—কেন? আমি তো দেখেছি ওর গ্যালারির বারান্দায় মনে, পিসারো, সিসলে, মানে—এদের ছবি আছে!

—তা আছে। কিন্তু সিউরাত কই, গগাঁ কই? সেজান কই, তুলুস-লোত্রেক কই? যাদের আছে তারা তো বুড়ো,—দিন ফুরিয়েছে তাদের।

ভিনসেণ্ট জিজ্ঞাসা করলে—ওঃ, তুলুস-লোত্রেককে চেন তাহলে?

—হেনরি? নিশ্চয়ই! আরে হেনরিকে চেনে না কে? অদ্ভুত আঁকিয়ে, কিন্তু তেমনি অদ্ভুত পাগল। আধখানা তো মানুষ,—ভাবে, যদি সে জীবনে পাঁচ হাজার মেয়েমানুষের সঙ্গে শুতে পারে, তাহলে পুরো মানুষ না হতে পারার ক্ষতিটার উশুল হবে। পা নেই, রোজ সকালে ওঠে বুকভরা দৈন্যবোধের জ্বালা নিয়ে, প্রতি রাত্রে সেই দৈন্যবোধকে ডোবায় মদে আর মেয়েমানুষের শরীরে। কিন্তু পা তো গজাবার নয়, এ জ্বালাও নেভবার নয়। পাগল যদি না হোতো তো প্যারিসে ওর মতো আঁকিয়ের জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার হোতো।

ভিনসেণ্টকে গগাঁ নিয়ে গেল স্টুডিয়োয়। চারতলার ওপর একটা কুঠরি। একটা ঈজেল, পেতলের একখানা খাট, একটা চেয়ার, একটা টেবিল। দরজার কাছে দেয়ালের একটা খুপরিতে কয়েকটা অত্যন্ত কুৎসিত অশ্লীল ফোটোগ্রাফ।

ভিনসেণ্ট বললে,—এই ফোটোগুলো দেখে মনে হচ্ছে প্রেম সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা তোমার নেই।

গগাঁ বললে,—আরে আগে বোসো, তারপর তর্ক জুড়ো। কোথায় বসবে, খাটে, না চেয়ারটাতে? হ্যাঁ, এই নাও, পাইপে তামাক ভরে নাও। তারপর, কী বলছিলে? ও, প্রেম? হ্যাঁ, এই নাও, পাইপে তামাক ভরে নাও। হ্যাঁ নারী আমি ভালোবাসি বই কি, কে না ভালোবাসে—তবে, সেই নারী যদি দেহে হস্তিনী আর মেজাজে গৃধিনী হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর সূক্ষ্ম দেহ—এ যাদের তারা আবার স্ত্রীলোক নাকি? তুমি জানো না, কতোদিন ধরে বেশ থপথপে মোটা একটা মেয়েমানুষ আমি খুঁজছি,কিছুতে পাচ্ছিনে। যদি বা কখনো পাই তো ভীষণ বোকা বনে যাই,—দেখি মেয়ে তো নয়, হাঁসফাঁস পোয়াতি। জোলার পুষিপত্তুর মোপাসাঁর গল্প বেরিয়েছে গত মাসে পড়েছ? একটা লোক,আমারই মতো মোটা মেয়ে তার পছন্দ। ক্রিসমাসের দিন বাড়িতে দুজনের মতো খুব খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে মেয়ে খুঁজতে বার হয়েছে। দিব্যি মনের মতো একটি পছন্দ হয়েছে, বগলদাবা করে বাড়িতে এনে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসেছে। মনে কতো সাধ। হলে হবে কি, খাওয়া দাওয়া শেষ হবার আগেই হঠাৎ কিনা—ওঁয়া ওঁয়া—মেয়েটার পেট থেকে পড়ল ইয়া বড়ো ধড়ফড়ে বাচ্চা!

ভিনসেণ্ট বললে,—কিন্তু এসবের সঙ্গে ভালোবাসার সম্বন্ধ কী, গগাঁ?

গগাঁ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, মাথার নিচে পেশীবহুল একখানা হাত রেখে। ছাদের কড়ির দিকে ছড়ালো কড়া তামাকের কয়েক ঝলক ধোঁয়া।—রূপ বলো, বলব অনুভূতি আছে, আসক্তি যতো না থাক। কিন্তু প্রেম? তুমি ঠিক ধরেছ। প্রেম আমি বুঝিনে।—তোমাকে ভালোবাসি—এ দুটো কথা কাউকে বলতে আমার দাঁত ভেঙে যাবে। তবে, এ নিয়ে আমার কোনো

অভিযোগ নেই। যিশু খ্রীষ্টের যে কথা, আমারও সেই কথা—মাংস হচ্ছে শুধু মাংসই, আর আত্মা হচ্ছে আত্মা। মাংসের ক্ষুধা যখন কয়েকটা টাকা ফেললেই মেটে, তাই মিটুক। আত্মা আমার শান্তিতে থাক।

—বিষয়টাকে তুমি খুব সহজেই উড়িয়ে দিতে চাইছ।

—মোটেই না। শয্যাসঙ্গিনী নির্বাচন করা কি সহজ কথা! যে নারী সুখ পায়, তাকে নিয়ে ডবল সুখ পাই আমি। যে শুধু সুখের পেশাদারি ভান করে, সেই মিথ্যে ভানটুকুই আমার যথেষ্ট, দেহানুভূতির সঙ্গে হৃদয়াবেগকে আমি জড়াতে চাই নে। হৃদয় থাক আলাদা শুধু আমার শিল্প-সাধনার জন্যে, সৃষ্টির জন্যে।

—কথাটা ভুল নয়। সম্প্রতি আমারও ধারণা বদলাচ্ছে।—না না, আর একটুও আবসাঁৎ ঢেলো না, নেশাটা একেবারে মাথায় চড়ে উঠবে। থিয়ো তোমার আঁকার খুব প্রশংসা করে। তোমার কয়েকটা স্টাডি আমাকে দেখাবে?

—নিশ্চয়ই না। স্টাডি? সে হোলো আমার গোপন জিনিস, নিতান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি—ঠিক ব্যক্তিগত চিঠির মতো। হ্যাঁ, তবে, ছবি কয়েকটা তোমাকে দেখাতে আপত্তি নেই।

হাঁটু গেড়ে বসে খাটের নিচে থেকে গগাঁ কয়েকখানা ক্যানভাস বার করল। আবসাঁতের বোতলগুলোর গায়ে ঠেসান দিয়ে একে-একে সাজিয়ে রাখল তাদের। কিছুটা আশ্চর্য হবার জন্যে ভিনসেণ্ট প্রস্তুতই ছিল, কিন্তু এ যে অভূতপূর্ব বিস্ময়! চোখের সামনে রৌদ্রজ্বলা প্রবালের রঙমাতাল মরীচিকা,—উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কখনো আবিষ্কার করেনি এমনি সব বিচিত্র গাছের জটলা,—বিচিত্র সব মানুষ আর জন্তু অকল্পনীয় যাদের চেহারা,—সমুদ্র যেন আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত, আকাশ যার সীমানা—ব্রহ্মার কল্পনার বাইরে। অদ্ভুত-দর্শন আদিবাসীদের ছবি, যাদের নগ্ন আরণ্য দৃষ্টির অন্তরালে অনন্তের অলৌকিক ইশারা,—সবুজ আর বেগুনি আর ঘন লালের ছড়াছড়িতে অদেখা অধরা পরীরাজ্যের স্বপ্ন-দৃশ্য,—বাদামি-হলুদ উত্তপ্ত সূর্যালোকে উদ্ভাসিত উজ্জীবিত বিচিত্র কতো প্রাণী আর উদ্ভিদ।

অনেকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বিড়বিড় করে ভিনসেণ্ট বললে,—হ্যাঁ, তুমিও ঠিক লোত্রেকের মতো। ভালোবাসো না, ঘৃণা করো। মন-প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে সৃষ্টিকে খালি ঘৃণাই করো।

গগাঁ হেসে উঠল। বললে,—তা তো হোলো। আমার কাজ কেমন লাগলো ভিনসেণ্ট?

—সত্যি কথা বলতে, বুঝতে পারলাম না। ভাববার সময় দাও। তারপর আরো কয়েকবার দেখতে দাও।

—বেশ তো। যখন খুশি যতোবার খুশি এসে দেখো। সারা প্যারিসে আর একটিমাত্র তরুণ শিল্পী আছে যার ছবি আমারই সমান সমান ভালো।

জর্জেস সিউরাত, সেও আছে আদিমকে আঁকড়ে ধরে, বন্যতা নিয়ে তারও কারবার। আর যারা, তারা সভ্য গাধার পাল।

—জর্জেস সিউরাত? নাম শুনিনি তো!

—শোনবার কথা নয়। শহরের কোনো ছবিওয়ালা তার ছবি টাঙাবে না। তবু, হ্যাঁ, মস্ত বড়ো শিল্পী সে!

—তার সঙ্গে আমার আলাপ হয় না, গগাঁ?

—বেশ তো। নিয়ে যাব তোমাকে। তার আগে চলো, রেস্তোরাঁতে বসে ডিনারটা সেরে নিই। পকেটে কিছু—দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি। হ্যাঁ এই তো দু-ফ্র্যাংক আমার সম্বল। ওঠো। বোতলটা ফেলে দিয়ে কী হবে, নিয়ে চলো সঙ্গে। সাবধান, আস্তে আস্তে নেবো। পা ফসকালেই ঘাড়টি কিন্তু মটকাবে।

৫

সিউরাতের বাড়ির কাছাকাছি যখন দুজনে পেঁছোলো রাত তখন দুটো।

ভিনসেন্ট স্খলিত কণ্ঠে শুধোলে,—এত রাত্রে ডাকাডাকি করলে চটবে না তো?

—পাগল! যেমন সারাদিন তেমনি সারারাত্রিই তো ছবি আঁকে! ঘুমোয় কখন লোকটা?—এই যে, এই বাড়ি। বাড়িটা সিউরাতের মা-র। ভদ্রমহিলাই ছেলেকে রেখেছেন, বলেন,—আঁকতে চায় আঁকুক। আমি যতোদিন আছি ভাবনা নেই। সিউরাতও ভারি ভালো ছেলে, একেবারে আদর্শ যাকে বলে। মদ খায় না, তামাক ফোঁকে না, মেয়েমানুষের পেছনে ঘোরবার বাতিক নেই, ছবি আঁকার মালপত্র ছাড়া বাজে একটি জিনিসে একটি পয়সা খরচ করে না। একটি কেবল মহৎ দোষ, সে হচ্ছে ছবি আঁকা।

ভিনসেন্ট বললে,—প্যারিসের তরুণ শিল্পীর পক্ষে এ যে একেবারে অবাক কান্ড!

গগাঁ বললে,—কানাঘুষোয় শুনেছি কাছাকাছি অন্য বাড়িতে একটি রক্ষিতা আছে, একটি ছেলে নাকি আছে তার। প্রকাশ্যে ও নিয়ে কোনো কথা নেই।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো দুজনে। ভিনসেন্ট বললে,—সব যে অন্ধকার। ডেকে তুলবে কী করে?

গগাঁ বললে,—পিছন দিকে চলো না। ওপরের জানলায় ঠিক আলো দেখবে। ইঁট মারলেই বেরিয়ে আসবে, তবে সাবধান, মা-র জানলায় যেন না লাগে।

জর্জেস সিউরাত নেমে এসে দরজা খুলে দিল। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা বলতে বারণ করে চুপি-চুপি সিঁড়ি বেয়ে আগন্তুকদের নিয়ে গেল ওপরের ঘরে। তারপর ঘরের দরজাটা দিল এঁটে বন্ধ করে।

এতক্ষণে কথা বললে গগাঁ,—তোমার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এলাম

ভিনসেণ্ট ভ্যান গককে, থিয়োর ভাই। ছবি অবশ্য আঁকে ডাচম্যানের মতো, তবে বড়ো চমৎকার লোক।

বাড়ির প্রায় সারা তিনতলাটা জুড়ে বিরাট ঘরখানা। চার দেয়াল জুড়ে বিরাট মাথা-ছাড়ানো উঁচু অসমাপ্ত ক্যানভাস টাঙানো, তাদের সামনে কাঠের মই আর মাচা। মাঝখানে জ্বলছে গ্যাসের গনগনে আলো। তার নিচেই মস্ত একটা টেবিল। টেবিলে ভিজে একটা ক্যানভাস চিত করে শোয়ানো।

—আসুন মশিয়ে ভ্যান গক, খুশি হলাম আলাপ করে। একটু সময় আমাকে দিন, শুকোবার আগে ছোট্ট একটা চৌখুপি ভর্তি করে নিই।

একটা উঁচু টুলের ওপর উঁচু হয়ে বসে সিউরাত টেবিলের ক্যানভাসটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। টেবিলের ধারে পরিচ্ছন্নভাবে সার করে প্রায় কুড়িটি রঙের বাটি। সূক্ষ্মতম একটি তুলির ডগা রঙে ডুবিয়ে নিয়ে ক্যানভাসের মাঝখানে একটি ফাঁকা চৌকো জায়গা সিউরাত বিন্দুর পর বিন্দু বসিয়ে ভর্তি করতে লাগল। যন্ত্রের মতো কাজ করতে লাগল তার হাত। মুখে কোনো সৃষ্টির অভিব্যক্তি নেই, ভাবটা পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক—শিল্পী নয়, ঠিক কারিগর। সোজা করে তুলিটা ধরে ক্যানভাসের ওপর, তারপর হাত চলে,—ফুটকির পর ফুটকির পর ফুটকি। রঙ ফুরালে তুলির ডগাটা রঙের পাত্রটা একবার ছোঁয় মাত্র, তারপর আবার ঘনসন্নিবিষ্ট রঙিন ফুটকির রাশি ঝাঁকে-ঝাঁকে নামে ক্যানভাসের সাদার ওপর।

ভিনসেণ্ট হাঁ করে দেখতে লাগল।

একটু পরে সিউরাত মুখ ফেরালো, বললে,—ব্যস, ফাঁকাটা ঠিক ভরাট হয়েছে এবার।

গগাঁ বললে,—ভিনসেণ্টকে তোমার ছবিটা ভালো করে দেখাও না সিউরাত! ও যে-দেশ থেকে এসেছে সেখানে এখনো লোকে গরু ভেড়া আঁকে; আধুনিক শিল্পের সঙ্গে ওর মাত্র দিন-সাতেকের পরিচয়।

সিউরাত বললে,—তাহলে টুলটার ওপর উঠে বসুন, মশিয়ে ভ্যান গক।

টুলের ওপর বসে টেবিলে শোয়ানো ছবিটা মন দিয়ে দেখতে লাগল ভিনসেণ্ট। এমনি অদ্ভুত দৃশ্য সে জীবনে কখনো দেখেনি,—না শিল্পে, না প্রকৃতিতে। গ্রাণ্ড জাট দ্বীপের দৃশ্য ছবিটি। গথিক গির্জের চুড়োর মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা মানুষ। স্থপতি যেন তাদের সৃষ্টি করেছে অপরিমেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণবিন্দু সাজিয়ে। প্রান্তর আর নদী, নৌকো আর বৃক্ষরাজি সবেরই যেন কেমন অস্পষ্ট দুরধিগম্য রূপ,—অসংখ্য নিরবচ্ছিন্ন বর্ণোজ্জ্বল আলোকবিন্দু দিয়ে গড়া,—এতো তরল, এতো উজ্জ্বল সব রঙের ব্যবহার যা মানে বা ডেগা বা গগাঁ পর্যন্ত ব্যবহার করতে সাহস করে নি। রঙের পর রঙ কেমন করে কোথায় মিশছে খুঁজে পাওয়া যায় না, বিন্দুর পর বিন্দুতে যান্ত্রিক কারুকার্যের নির্ভুল সঙ্গতি,—মনে হয় এ যেন শিল্পীমনের বিমূর্ত

সমন্বয়ের নিঃস্পন্দ মৃত্যুরাজ্যে সক্রিয় পশ্চাদ্‌বর্তন। প্রাণ আছে, যে প্রাণ প্রকৃতিতে নেই, সমুজ্জ্বল আলো আছে, নেই বায়ুহিল্লোল নেই একবিন্দু নিশ্বাস। প্রস্ফুট প্রকৃতির এ যেন স্তম্ভিত রূপ,—চঞ্চল জীবনের মরণাহত শোভাযাত্রা।

ভিনসেন্টের পাশে গগাঁ দাঁড়িয়ে ছিল। ভিনসেন্টের মুখের চেহারা দেখে সশব্দে হেসে উঠল সে। বললে,—হ্যাঁ, সিউরাতের ছবি প্রথমবার দেখলে এইরকমই হাঁ হয়ে যেতে হয়। বলো বলো, কী ভাবছ খুলে বলোই না।

ভিনসেন্ট বিমূঢ়ভাবে সিউরাতের দিকে তাকালো। বললে,—আপনি আমাকে মাপ করবেন মশিয়ে, কিন্তু গত কদিন ধরে আমি বারে বারে এমন সব অভাবনীয় অভিজ্ঞতার ধাক্কা খাচ্ছি যে যেন আর তাল ঠিক রাখতে পারছি নে। হল্যাণ্ডের শিল্পরীতিতে আমি মানুষ। ইম্প্রেশনিস্ট কাদের বলে তাই আমি জানতাম না। এখন হঠাৎ দেখছি, এতোদিন ধরে যা কিছু বিশ্বাস করে এসেছি, সবকিছুই এখানে ধুলোয় লুটোচ্ছে।

গম্ভীরভাবে সিউরাত বললে,—আপনার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার শিল্পকর্ম সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। আমার যা রীতি তা সমস্ত চিত্রকলার জগতে প্রচণ্ড একটা বিপ্লব ঘটাতে চলেছে। এমনি একটা রীতিকে এক-চোখ দেখেই বুঝে নেওয়া অসম্ভব। ভেবে দেখুন মশিয়ে, আজ পর্যন্ত চিত্রকলা যেখানে এসে পেঁছেছে, তার মূলে রয়েছে কী? শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিতান্ত নিজস্ব কল্পনা। এই ব্যক্তিগত খেয়ালের বাইরে আমি চিত্রকলাকে নিয়ে যাব, একে আমি একটা বিমূর্ত বিজ্ঞানে পরিণত করব। আমাদের নানা মুহূর্তের নানা রকমের সব ব্যক্তিগত অনুভূতি, সে-সবকে সারবন্দী করে রাখতে হবে, মনটাকে বাঁধতে হবে সূক্ষ্ম অথচ নির্ভুল গাণিতিক নিয়মের মধ্যে। মানুষের যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর উপলব্ধি, তার প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে বিচার করে দেখতে হবে, আর প্রত্যেকটির জন্যে ভিন্ন-ভিন্ন শিল্প-প্রতীক তৈরি করতে হবে,—রেখার প্রতীক, রঙের প্রতীক। টেবিলে এইসব ছোট ছোট রঙের বাটিগুলো দেখছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকগুলো বাটি।

—এই যে এক-একটি বাটি, মশিয়ে ভ্যান গক, এতে মানুষের এক-একটি অনুভূতি ভরা আছে। আমার ফর্মুলা অনুসারে, এইসব বাটির আলাদা আলাদা রঙ কারখানায় তৈরি হবে, দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। এলোমেলোভাবে এ রঙের সঙ্গে ও রঙ মেশাবার আর কোনো দরকার হবে না। ছবি-আঁকিয়ে সোজা দোকানে যাবে, ছবির বিষয় ও অনুভূতি অনুসারে নির্দিষ্ট রঙের কৌটোগুলি কিনে নিয়ে আসবে। এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ, আমি চিত্রকলাকে বিজ্ঞানের পথে নিয়ে আসব তবে ছাড়ব। ছবির ঘাড় থেকে ব্যক্তিত্বের ভূতটাকে আমি নামাবো। শিল্পকলাকে নিয়ে যাব স্থাপত্যের সুনির্দিষ্ট রাস্তায়। আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন, মশিয়ে?

—ঠিক বুঝছি বলে ভরসা হচ্ছে না।

গগাঁ সিউরাতের অলক্ষ্যে ভিনসেণ্টের হাতে একটু খোঁচা মারল। তারপর বললে,—দ্যাখো সিউরাত, এই যে রীতি, এটাকে বারে বারে তোমার আবিষ্কার বলে চালাতে চাও কেন, বলো তো? এই তো শুনি তোমার অনেক আগে হাতে-কলমে পিসারো এটা বার করে গেছে?

দপ করে জ্বলে উঠল সিউরাত,—মিথ্যে কথা!

সারা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। হন-হন করে দুবার পায়চারি করে এসে সে টেবিলের ওপর বসালো বিরাট একটা ঘুসি।

—কে বলেছে পিসারো আমার আগে এটা আবিষ্কার করেছে? এটা আমার আবিষ্কার, এই পয়েণ্টিলিজম। পিসারো শিখেছে আমার কাছ থেকে। আদি ইটালিয়ানদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চিত্রকলার ইতিহাস আমি তন্ন-তন্ন করে পড়েছি। কেউ এ জিনিস ভাবেনি আমার আগে। তোমার তো বড়ো সাহস যে আমার থিয়োরিটা—

ভাঁটার মতো জ্বলতে লাগল চোখ। রাগে মুখ দিয়ে ফেনা বার হয় আর কি!

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ভিনসেণ্ট। আশ্চর্য! একটু আগে ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীর মতো যার শান্ত সমাহিত নিরাসক্ত দৃষ্টি, অধ্যাপকের মতো ধীর গম্ভীর কথাবার্তা, মুহূর্তে সে লোকটা এমনি পাগলের মতো ক্ষেপে উঠে নিজের দাড়ি চুমরোয় আর ঝাঁকড়া চুল ছেঁড়ে কী করে?

ভিনসেণ্টের দিকে চোখ টিপে গগাঁ বললে,—আরে থামো থামো, পাগল নাকি? বাজে লোকে কতো কথা বলে! তুমি ছাড়া পয়েণ্টিলিজম থাকত কোথায়! আমরা কী আর তা জানিনে?

আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হোলো সিউরাত, টেবিলের কাছে এসে বসল।

ভিনসেণ্ট বললে,—মশিয়ে সিউরাত, শিল্পকলার মূল কথাই তো হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। তাকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিজ্ঞানে পরিণত করা কি সম্ভব?

—নিশ্চয়ই! দাঁড়ান, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

একবাক্স ক্রেয়ন হাতে নিয়ে সিউরাত বসে পড়ল মেঝের ওপরে। একপাশে বসল ভিনসেণ্ট, আর-একপাশে গগাঁ। সিউরাতের গলায় তখনো উত্তেজিত ব্যস্ততা। বললে,—আমার মতে ছবি আঁকাকে ফর্মুলার মধ্যে আনা সম্ভব। ধরুন, একটা সার্কাসের দৃশ্য আঁকছি। এখানে খালি ঘোড়ার পিঠে একজন সওয়ার, এখানে সার্কাস-ম্যানেজার, আর এদিকে দর্শকের দল। কেমন? আচ্ছা, কী অনুভূতিটা আমি প্রকাশ করতে চাই? ফুর্তি, উত্তেজনা—তাইতো? আচ্ছা এবার বলুন, ছবি আঁকার মূল উপাদান কী? লাইন, টোন আর রঙ। বেশ, এবার আমাকে ঐ ফুর্তির অনুভূতিটি ফোটাতে হবে। এই দেখুন, সবকটি রেখাকে আমি অনুভূমিকের ওপরে তুলে দিলাম, উজ্জ্বল রঙগুলিকে আমি স্পষ্ট করলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তপ্ত টোনের ব্যবহার করলাম। কী পেলাম? ফুর্তি বলে যে জিনিসটা আমাদের উপলব্ধি-গোচর, পেলাম তার

একটা অমূর্ত ধারণা। পেলাম না ?

—তা হয়ত পেলাম, কিন্তু ফূর্তিটাকে পেলাম না।

সিউরাত মাটি থেকে চোখ তুলে তাকালো। ভিনসেণ্ট ভালো করে দেখল, কী সুদর্শন লোকটা!

সিউরাত বললে,—অনুভূতি ধরতে শিল্পীর মাথা-ব্যথা নেই, সে চায়, তারও পেছনে সেই অনুভূতির যে সারাৎসার আছে তাকে ধরতে। প্লেটো পড়েছেন ?

—পড়েছি বটে।

—বেশ। শিল্পীরা বস্তু আঁকবে না, বস্তুর যে এসেন্স আছে, তাকে আঁকবে। আপনি যদি ঘোড়া আঁকতে চান, আর একটা ঘোড়াই আঁকেন, তাহলে চিত্রকর না হয়ে ফোটোগ্রাফার হলেই তো পারতেন। আঁকতে হবে—একটা ঘোড়া দুটো ঘোড়া এমনি করে বিশ্বের সমস্ত ঘোড়ার পেছনে একটিমাত্র যে নির্বিশেষ ঘোটক-চরিত্র আছে, তাকে। মানুষ যদি আঁকতে চান, তাহলে রাস্তার মোড়ের ঐ পাহারাওয়ালাটাকে আঁকলে চলবে না, আঁকতে হবে চিরন্তন মানুষের নির্বিশেষ আত্মাটাকে। বুঝতে পারছেন ?

—বুঝতে পারছি, তবে মানতে পারছি নে।

—বেশ, মানবেন পরে। মাটি থেকে সার্কাসের ছবিটা মুছে ফেলে উঠে দাঁড়াল সিউরাত।

—আচ্ছা। এবার ধরুন একটা শান্ত প্রকৃতির দৃশ্য আঁকতে হবে। এই দেখুন রেখাগুলি সব অনুভূমিক আর সমান্তরাল, টোনে দেখুন গরম ঠাণ্ডায় কেমন সমন্বয়, রঙ দেখুন, গভীর রঙ আর হাল্কা রঙ সমান সমান। দেখতে পাচ্ছেন ?

গগাঁ বললে,—আজে-বাজে প্রশ্ন করে বক্তৃতাটা নষ্ট কোরো না সিউরাত। বলে যাও—

—আচ্ছা বেশ। এবার ধরুন দুঃখের অনুভূতি। চিত্রে এই অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। লাইনগুলি নামবে উপর থেকে নিচে, এই রকম। টোন হবে ঠাণ্ডা, গভীর রঙগুলো হবে স্পষ্ট। দুঃখের যা সারাৎসার তা ধরা পড়ে গেছে। ক্যানভাসে কিভাবে জায়গা ছাড়তে হবে, কোথায় কোন্ বস্তু বসাতে হবে তা একেবারে জ্যামিতিক নির্ভুলতায় মেপে-জুপে ঠিক করে ছোট ছোট বইয়ের আকারে বার করা যেতে পারে। আমি এমনি একটা বইয়ের মাল মশলা জোগাড় করেও ফেলেছি। শিল্পীর কাজ হবে কেবল বই মুখস্থ করে নেওয়া, তারপর রঙের দোকানে গিয়ে নির্দিষ্ট পাত্রগুলি কিনে আনা। তারপর নিয়মগুলি মানলেই হোলো। চমৎকার ছবি-আঁকিয়ে হবে সে, বিজ্ঞানসম্মত, সঠিক হবে তার কাজ। রৌদ্রেই আঁকুক কি ছায়াতেই আঁকুক, সাধুই হোক কি লম্পটই হোক, বয়েস হোক সাত কি সত্তোর,—তার হাতের কাজে স্থপতিসুলভ

বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণতা আসবেই।

চোখ পিট-পিট করতে লাগল ভিনসেণ্ট। হেসে উঠল গগাঁ, বললে,—জর্জেস, ও ভাবছে তুমি একটা আস্ত পাগল।

—তাই ভাবছেন নাকি, মশিয়ে ভ্যান গক ?

—না না, তা ভাবব কেন ? প্রতিবাদ জানিয়ে ভিনসেণ্ট বলে,—আমাকেই কত লোক বলেছে পাগল, কী এসে গেছে তাতে আমার ? তবে কিনা, এটা বলবই যে আপনার এ সব আইডিয়া খুবই অসাধারণ।

গগাঁ বললে,—ঐ দেখলে তো ? সোজা কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলল যে তুমি শুধু পাগল নও, বদ্ধ পাগল।

দরজায় ধাক্কা পড়ল। সিউরাতের মা-র ঘুম ভেঙেছে। আর আড্ডা নয়। এবার সরে পড়তে হবে।

বাড়ির দরজা পর্যন্ত বন্ধুদের পৌঁছে দিতে এসে সিউরাত বললে ভিনসেণ্টকে,—আপনাকে হয়ত আমার কথা খুব স্পষ্ট বোঝাতে পারলাম না, মশিয়ে ভ্যান গক। যখন খুশি আপনি আসবেন। দু-জনে একসঙ্গে কাজ করব। কাজের মধ্য দিয়েই বোঝাপড়া হবে। আমার যা পদ্ধতি তা যদি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে চিত্রকলার সম্বন্ধে আপনার এতদিনের যা-কিছু ধারণা সব বদলে যাবে। আচ্ছা চলি, ছবিটার আর-একটা চৌখুপি ফুটকি দিয়ে ভর্তি করা এখনো বাকি আছে, গিয়ে দেখি গে।

আকাশে তখনো শেষ রাতের জড়িমা। ঘুমন্ত নগরী। ভিনসেণ্ট আর গগাঁ খাড়াই বেয়ে মোমার্তের দিকে চলল। দুধারের ঘর বাড়ি দোকানের দরজা জানলা বন্ধ, রাস্তায় দু-একটি সবজি আর দুধের গাড়ি বার হয়েছে।

গগাঁ বললে,—চলো খাড়াইয়ের মাথায় উঠে সূর্যোদয়ে প্যারিসের ঘুম-ভাঙা দেখি।

—চলো।

বুলেভার্দ ক্লিচি থেকে রু লেপিক ধরে তারা এগোলো। রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত ঘুরে মোমার্ত পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত গিয়েছে।

বাড়িঘর বিরল হয়ে আসছে। রাস্তার দুপাশে ফাঁকা মাঠ, গুল্মরাজি আর গাছপালা দেখা যাচ্ছে। রু লেপিক ছেড়ে পায়ে-চলা একটা কাঁচা রাস্তা নিল দুজনে।

ভিনসেণ্ট বললে,—আচ্ছা গগাঁ, খুলে বল তো সিউরাত সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা ?

—জর্জেসের কথা বলছ ? আমি ঠিক ভেবেছিলাম একথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেই। রঙ যদি বল তো বলব, একমাত্র ডেলাক্রোয়ার পর রঙ ওর মত আর কেউ বোঝে না। তবে, আর্টের যে-সব থিয়োরি নিয়ে ও মাথা ঘামায়, সেগুলো বাজে। শিল্পী যে, সে কি বুদ্ধিজীবী ? অত ভাববে কেন সে ?

মাস্টারি কেন সে করবে? আঁকাই তার কাজ, আঁকাই তার ধর্ম—সে শুধু আঁকবে। আর্টের যারা সমালোচক, তারা থিয়োরি কপচাক যতো খুশি। রঙের দিক থেকে সিউরাতের একটা অবদান থাকবে নিশ্চয়ই। আর ছবির মধ্যে স্থাপত্যের ভাবটা ঐ যে ও এনেছে, আধুনিক শিল্পের প্রতি যে আকর্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেই আকর্ষণ হয়ত ওতে জোরালো হয়ে উঠবে। তবে, এসব বাদ দিয়ে সোজা কথাটা যদি বলতে হয়,—তাহলে ও বদ্ধ পাগল, তুমি নিজেই তা দেখেছ।

খাড়াইটা কম নয়, বেশ পরিশ্রম হোলো চূড়ায় উঠতে। সামনে ছবির মতো বিছিয়ে রয়েছে সারা শহরটা। সার-সার অসংখ্য বাড়ির মাথা। মাঝে মাঝে কালো কুহেলির আবরণ ফুঁড়ে মাথা তুলেছে গির্জের চুড়ো। বঙ্কিম আলোকরেখার মতো সীন নদীটাকে দেখাচ্ছে। শহরটাকে দুভাগে ভাগ করেছে এই নদী। মোমার্ত পাহাড়ের ঢালু বেয়ে বাড়িঘর নামতে নামতে সীন পার হয়ে আবার মোপার্নাসের দিকে ঠেলে উঠেছে।

সূর্য উঠল, অন্ধকার ভেদ করে আকাশে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াল শহরের তিন অতিকায় প্রহরী—পুব দিকে নতেরদাম, মাঝখানে অপেরা আর পশ্চিমদিকে আর্চ অব্ ট্রায়াম্ফ।

৬

থিয়োদের ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে শান্তি নেমেছিল ক-দিনের জন্যে। থিয়ো ভেবেছিল গ্রহভাগ্য সুপ্রসন্ন। কিন্তু নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী তা। গাঢ় প্যালেটের বদলে উজ্জ্বলতর রঙের পথে প্রকৃত অনুশীলন ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে না গিয়ে একটা সোজা রাস্তা বেছে নিল ভিনসেণ্ট। সে হচ্ছে নতুন শিল্পী-বন্ধুদের অন্ধ অনুকরণ করা। ইম্প্রেশনিস্ট হবার মত্ত আগ্রহে সে এতোদিন যা কিছু শিখেছিল সব বিসর্জন দিল। তার নিজের আঁকা বলে আর কিছু রইল না,—যা আঁকে তা হয় সিউরাত, না হয় গগাঁ না হয় লোত্রেকের বীভৎস কৃত্রিম অনুকৃতি। এতেই তার আনন্দ,—ভাবে দারুণ কিছু একটা করছে, এগিয়ে চলেছে জোর কদমে।

একদিন রাত্রে থিয়ো বললে,—তোমার নামটা কী বলো তো ভিনসেণ্ট?

—কেন? ভিনসেণ্ট ভ্যান গক।

—ঠিক বলছ? ভুল হয়নি তো? জর্জেস সিউরাত বা পল গগাঁ নয়?

—হঠাৎ এমনি ঠাট্টা কেন? কী বলতে চাও তুমি?

—বলছি, ধৈর্য ধরো। সত্যিই কি তুমি ভাবো তুমি দু-নম্বর সিউরাত হতে পারবে? সত্যিই কি তুমি বোঝো না যে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষের মধ্যে তুলস-লোত্রেক ঐ একটিই জন্মাবে, আর ভগবানকে ধন্যবাদ যে ঐ একটির পরে দুটি গগাঁ আর গজাবে না? তাহলে? ওদের নকলনবিশি করে লাভ কী?

—নকলনবিশি আমি করছি নে, আমি শিক্ষানবিশি করছি।

—না, নকলনবিশি। তোমার যে-কোনো একটা নতুন ক্যানভাস আমাকে দেখাও, আমি ঠিক বলে দেব সেটা আঁকবার আগের দিনের সন্ধেটা কার সঙ্গে তুমি কাটিয়েছ।

—কিন্তু এতে তো আমার উন্নতিই হচ্ছে। দ্যাখো, কত হালকা হয়ে এসেছে আমার রঙ।

—উন্নতি হচ্ছে। দিনের পর দিন গড়িয়ে গড়িয়ে রসাতলে যাচ্ছ। রোজ একখানা করে ক্যানভাসে রঙ বোলাচ্ছ, প্রতিটি ছবিতে ভিনসেন্ট ভ্যান গকের পরিচয়টা মুছে মুছে যাচ্ছে। অতো শস্তায় বাজিমাত হয় না। অনেক বছরের কঠোর পরিশ্রম এখনো বাকি। হ্যাঁ, এই পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই অপরের যা ভালো তা আত্মসাৎ করে নিতে পারো, অনুকরণ করে নয়।

—থিয়ো, আমি তোমাকে বলছি এ ছবিগুলো ভালো হয়েছে।

—হ্যাঁ, আর আমিও তোমাকে বলছি ওগুলো জঘন্য হয়েছে।

লড়াই চলল দিনের পর দিন।

রোজ সন্ধ্যাবেলা সারাদিনের কর্মক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরলে ভিনসেন্ট নতুন ছবি-হাতে থিয়োর সম্মুখীন হয়। মারমুখো ভিনসেন্ট, হাতের ক্যানভাস যেন মারণাস্ত্র।

থিয়োকে মাথার টুপিটা খোলার সেঅবসর দেয় না—নাও, দ্যাখো এইবার, বলো এটা ভালো হয় নি? বলো রঙ ঠিক হয় নি—বলো সূর্যের আলোর প্রতিফলনটা ঠিক ফোটে নি—বলো—

থিয়োর দুটো পথ। হয় মিথ্যে কথায় ভাইকে শান্ত করে নিজে কিছুটা শান্তি ভোগ করা, না হয় রূঢ় সত্যি কথা বলে সারারাত্রি পাগলের পাগলামির সঙ্গে যুদ্ধ করা।

ক্লান্ত শরীর সত্যি কথার ভার সয় না। তবু মন-ভোলানো মিথ্যে বলতে সে পারে না। বললে,—কাল বুঝি অমুক প্রদর্শনীতে গিয়েছিলে?

—কেন? ও কথা আসে কোত্থেকে?

—উত্তরই দাও না।

অপ্রতিভ মুখে ভিনসেন্ট বলে,—হ্যাঁ গিয়েছিলাম, কাল বিকেলে।

সুস্পষ্ট ভাষায় দৃঢ় কণ্ঠে এবার থিয়ো বললে,—তুমি জানো, ভিনসেন্ট, এই প্যারিসে এই মুহূর্তে অন্তত পাঁচশোটা আঁকিয়ে আছে যারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে শুধু এডুয়ার্ড মানেকে নকল করতে। আর তাদের অধিকাংশই এই নকলের কাজটা তোমার চাইতে অনেক ভালোই পারে।

এরপর ভিনসেন্ট একটা নতুন কৌশল করল। সমস্ত ইমপ্রেশনিস্টদের এনে সে পুরল একটা ক্যানভাসে। এইবার ধরুক থিয়ো, বলুক দেখি কী বলে!

থিয়ো বললে,—চমৎকার! সব পড়া মুখস্থ করে ফেলেছ দেখছি! এক কথায় ছবিটার নাম দেওয়া যায়—রোমন্থন, কেমন? তারপর ছবিটার নানান

জায়গায় এটা-ওটা লেবেল মেরে দিলেই হবে-এখন। এই যে গাছটা, এটা হচ্ছে গগাঁ। কোণের ঐ যে মেয়েটা, ওটা নির্ঘাত তুলুস-লোত্রেক। নদীর জলের যেখানটায় রোদ এসে পড়েছে,—ওখানটায় লেবেল পড়বে সিস্‌লের। তারপর রঙটা—মনে, পাতাগুলো—পিসারো, আকাশটা—সিউরাত আর সামনের মূর্তিটা—মানে।

সেদিন আর একটি কথা বলল না ভিনসেণ্ট।

নিষ্ঠুর লড়াই শুরু হোলো দু-ভাইএর মধ্যে। সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম সে করে, আর সন্ধেবেলা থিয়ো এসে তাকে ধমকায় ছোট ছেলেকে শাসন করার মতো। কথায় কথা বাড়ে, তুমুল ঝগড়া চলে দুজনের। একটিমাত্র ঘর দুজনের, থিয়ো ঘুমোতে চায়,—ভিনসেণ্টের জ্বালাধরা চোখ, মাথার মধ্যে আগুন। তর্ক করতে করতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে থিয়ো গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে। দপ-দপ করে আলো জ্বলে, ভিনসেণ্টের চিৎকার আর হাত-পা নাড়া তখনো থামে না। থিয়ো ভাবে কোনদিন সে পাগল হয়ে যাবে—একটিমাত্র আশা, তার আগে হয়ত তার সাধের নতুন বাসাটা মিলবে। সেখানে আলাদা একখানা শোবার ঘর থাকবে তার, আর দরজায় লাগাতে পারবে শক্ত মোটা একটা তালা।

নিজের ছবি নিয়ে তর্ক করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে ভিনসেণ্ট, তখন সে আর্ট, আর্টের ব্যবসা আর আর্টিস্টের জীবন নিয়ে হুহুংকৃত আলোচনায় থিয়োর নিদ্রাহীন রাত্রের ব্যর্থ প্রহরগুলোকে উত্ত্যক্ত করে তোলে।

বলে,—এটা আমি বুঝতে পারি নে, প্যারিসের একটা সেরা গ্যালারির ম্যানেজার হয়েও তুমি কিনা তোমার নিজের ভাইএর একটা ছবি সেখানে টাঙাবে না!

থিয়ো বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করে,—দ্যাখো, আমি তো মালিক নই। আমার মতের ওপরেও মালিকের মত তো আছে!

—একবারও চেষ্টা করেছ তুমি?

—হাজার বার।

—বেশ, স্বীকার করলাম আমার ছবি তোমার গ্যালারিতে স্থান পাবার উপযুক্ত নয়। কিন্তু সিউরাত? গগাঁ? লোত্রেক? তারাও বরবাদ?

—প্রত্যেকবার তারা নতুন ছবি শেষ করে, আর প্রত্যেকবারই আমি চেষ্টা করি, কিন্তু—

—বুঝেছি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, গ্যালারিটা কার? তোমার, না আর কারুর?

—মালিকের। আমি তো কর্মচারী।

—তার মানে, তোমার কোনো অধিকার নেই, কোন ক্ষমতা নেই। কী লজ্জা! আমি হলে কিছুতেই সহ্য করতাম না, লাথি মেরে চলে আসতাম!

—কাল সকালে এ আলোচনা হবে-খন ভিনসেণ্ট। আজ আমি বড়ো ক্লান্ত, ঘুমোতে দাও।

—ঘুমোলেই হোলো? এ ব্যাপারটার এখুনি মীমাংসা হওয়া দরকার। মানে আর ডেগা—এদের ছবি টাঙিয়ে লাভ কী? এদের নাম তো হয়েছেই। যারা নবীন, যারা অপরিচিত, তাদের জন্যেই তো এখন লড়াই করা দরকার।

—সময় দাও আমাকে। ধরো, আর বছর-তিনেক পরে—

—তিন বছর! এতোদিন অপেক্ষা করবে কে? শোনো থিয়ো, এ চাকরিটা ছেড়ে দাও, নিজের একটা গ্যালারি করো। তা নয় তো কিনা পরের গোলামি? ছিঃ!

—নিজের গ্যালারি করতে হলে টাকা লাগে ভিনসেণ্ট। মূলধন কোথায় পাব?

—যেখান থেকে পারি জোগাড় করব আস্তে আস্তে।

—আর ব্যবসা? ব্যবসা কখনো একদিনে হয়? বিশেষ করে ছবির ব্যবসা জমতে কতো দেরি লাগে তার ঠিক নেই।

—হোক দেরি। দিনরাত্রি আমরা খাটব। তোমার গ্যালারি দাঁড় করিয়ে তবে ছাড়ব শেষ পর্যন্ত। তার জন্যে যতোদিন লাগে লাগুক।

—আর ততোদিন পয়সা জুটবে কোথা থেকে? খাব কী?

—ও, বুঝেছি! আমি রোজকার করি নে, আমি তোমার গলগ্রহ, তাই বুঝি খুঁড়ছ?

—দোহাই ভিনসেণ্ট, শুয়ে পড়ো। আমি আর পারছি নে!

—না শোবো না, কিছুতে শোবো না! এ কথাটার এক্ষুনি একটা মীমাংসা হোক। আমি তোমার গলায় পাথর হয়ে ঝুলছি, আমি তোমার ডানা বেঁধে রেখেছি, এই তো? আমি যদি না থাকতাম, তুমি মুক্তি পেতে, চাকরি ছাড়তে, ব্যবসা করে বড়োলোক হতে পারতে,—এই না? বলো বলো, ঢেকে রেখো না, সত্যি কথা খুলে বলো!

নিতান্ত ক্লান্ত গলায় থিয়ো জবাব দিলে,—দ্যাখো, আমার গায়ে যদি আর কিছুটা জোর থাকত, তোমাকে আমি আগ-পাশ-তলা মার লাগাতাম। নিজে যখন তা পারব না, তখন গগাঁকে ডেকে তোমাকে একদিন ভাল করে পেটাবো। একটা কথা কেন বোঝো না ভিনসেণ্ট? তোমার আমার জীবন আলাদা, ভাগ্য আলাদা। আমি গুপিলে চাকরি করব,—আজ যেমন করছি চিরদিনই তেমনি করব। আর তোমার কাজ ছবি আঁকা,—আজ যেমন আঁকছ, চিরদিনই তেমনি আঁকবে। গুপিল থেকে যা আমি পাব, তার অর্ধেক তোমার। আর তুমি যা আঁকবে, তার অর্ধেক আমার। এই তো আমাদের মধ্যেকার চুক্তি। তাই নয়? বেশ, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ো। আর যদি জ্বালাতন করো তো পুলিশ ডাকব।

পরদিন সন্ধেবেলা থিয়ো একটা খাম দিল ভিনসেন্টের হাতে। বললে,—চলো আমার সঙ্গে এই পার্টিতে।

—পার্টি! কে দিচ্ছে?

—হেনরি রুসো। আহা, নেমন্তন্নর চিঠিখানা খুলে দ্যাখো একবার।

সুন্দর একটি কবিতা। কার্ডের কোণে কোণে হাতে আঁকা পুষ্পগুচ্ছ। ভিনসেন্ট শুধোলে,—লোকটি কে?

—এক কথায় বলা মুস্কিল। চল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ছিল কাস্টম্‌স্‌-এর কলেক্‌টর। মফঃস্বলে থাকত, গগাঁর মতো রঙ তুলি নিয়ে খেলা করত রবিবার রবিবার। ক-বছর আগে একবার প্যারিসে এল, আর ফিরে গেল না। এখন বাস্তিলের কাছে শ্রমিক-পল্লীতে থাকে। কোনো রকম শিক্ষা পায়নি, তবু ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, সুর বাঁধে। বেহালা আর পিয়ানোর মাস্টারি করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের, কটা বুড়োকে ড্রয়িং শেখায়।

—ছবি কী আঁকে?

—অদ্ভুত অদ্ভুত জঙ্গলের জটলা থেকে কিম্ভুত জানোয়ার। আসলে লোকটা চাষা,—জঙ্গল দেখুক আর না দেখুক, আর গগাঁ ওকে যতোই ঠাট্টা করুক, সত্যিকারের আদিম বন্যতা ওর রক্তে।

—কিন্তু আসলে আঁকে কেমন? তোমার মত কী?

—বলতে পারব না, বা বলব,—বুঝতে পারি নে। সবাই বলে ও মাথামোটা পাগল।

—সত্যি?

—আসলে লোকটার মনটা একটা আরণ্যক শিশুর মতো। গেলেই বুঝবে। তা ছাড়া ছবিও দেখতে পাবে।

—কিন্তু এসব পার্টি-টার্টি দেয় কী করে? পয়সা আছে নিশ্চয়ই?

—সারা প্যারিসে যতো আঁকিয়ে আছে ওর মতো গরিব কেউ নেই। বেহালাটা পর্যন্ত ভাড়া করা, কেননা কেনবার সামর্থ্য নেই। কিন্তু পার্টি দেবার ওর উদ্দেশ্য আছে, গেলেই টের পাবে।

যে বাড়িটাতে রুসো বাস করে সেটা একেবারে দিনমজুরদের আস্তানা। পাঁচতলার ওপরে রুসোর একখানা ঘর। রাস্তার ধারে ধারে বস্তি,—বাড়িটার মধ্যে ঢুকলেই নাকে আসে রান্নাঘর আর নোংরা পায়খানার গন্ধের একাকার।

থিয়ো ঘরের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলল রুসো, সম্ভ্রম-ভরা মৃদু গলায় বললে,—আসুন, আসুন মশিয়ে ভ্যান গক, আমার আমন্ত্রণটা রেখেছেন, ধন্যবাদ আপনাকে।

হৃষ্টপুষ্ট সমর্থ বেঁটে চেহারা। চৌকো মাথা, থ্যাবড়া নাক আর চিবুক। বড়ো বড়ো দুটি চোখে সরল চাউনি।

থিয়ো ভিনসেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। চেয়ার টেনে বসল দুজনে।

ঘরটি দিব্যি সাজানো, ঠিক যেন পার্টিরই জন্যে। জানলায় লাল সাদা চৌখুপি কাপড়ের পর্দা, দেয়াল-ভর্তি ছবি। একধারে পুরোনো পিয়ানোটার পাশে চারটি ছোট ছোট ছেলে বেহালা হাতে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। ফায়ার-প্লেসের ওপরের তাকের ওপর নানা রঙের কেক আর পেস্ট্রি-পিঠে, রুসোর নিজের হাতে তৈরি। এদিকে ওদিকে কয়েকটি বেঞ্চি আর চেয়ার।

রুসো বললে,—আপনারাই প্রথম এলেন মশিয়েঁ ভ্যান গক। চিত্র-সমালোচক গিলুম পিলেও দয়া করে আসবেন বলেছেন তাঁর একটি দল নিয়ে।

পাথর-বসানো রাস্তায় গাড়ির চাকার আওয়াজ, শিশুদের কলকণ্ঠ। মান্য অতিথিরা এলেন। রুসো তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা খুলল। শোনা গেল কয়েকটি চপল অস্ফুট নারীকণ্ঠ। তাদের পেছনে ভারি একটা পুরুষের গলা—ওঠো, ওঠো, দাঁড়িয়ে পোড়ো না সিঁড়িতে। একটা হাত রেলিঙে, আর একটা হাত নাকে, তাহলেই তো হোলো।

ঠাট্টাটা রুসোরও কানে এসেছিল স্পষ্ট। সে ভিনসেণ্টের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হাসল একটু। ভিনসেণ্টের মনে হোলো এমনি বিদ্বেষহীন স্বচ্ছ সরল চোখ আর কারুর কখনো দেখেনি।

হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল দশ-বারোটি প্রাণী,—মেয়ে পুরুষ। পুরুষের অঙ্গে সান্ধ্য পোশাক, মেয়েদের সবার পরনে দামি গাউন, হাতে সাদা সিল্কের দস্তানা, পায়ে নরম ভেলভেটের জুতো। ঘর ভরে গেল বিভিন্ন সুরভির সংমিশ্রণে।

চিত্র-সমালোচক পিলে দাম্ভিক গুরুগম্ভীর গলায় হেঁকে উঠলেন,—কী হে রুসো, এই দ্যাখো,—তোমার নেমন্তন্ন রাখতে এলাম তো! বেশিক্ষণ কিন্তু থাকতে পারব না, একটা বল-নাচের আসরে আবার যেতে হবে। নাও, তাড়াতাড়ি খাতির যত্ন করো আমার বন্ধুদের।

বুকের ঊর্ধ্বাংশ খোলা সুদীর্ঘ গাউন পরা একটি পিঙ্গল-কেশী তরুণী বলে উঠল,—আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন শিল্পীর। আপনি মশিয়েঁ রুসো? —সারা শহরে যাঁর নাম? আমার হাতটি আপনি চুম্বন করবেন না?

আর কে একজন বলে উঠল,—সাবধান ব্লাঞ্চ, এসব শিল্পীদের তুমি চেনো না। এরা কিন্তু—

রুসো মেয়েটির করচুম্বন করল। ভিনসেণ্ট সরে গেল ঘরের এক কোণে। পিলে কথাবার্তা বলতে লাগলেন থিয়োর সঙ্গে। দলের অন্যান্য সকলে জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতে লাগল সারা ঘরে, নাড়া-চাড়া করতে লাগল জিনিসপত্র। বিদ্রূপভরা কথার ফাঁকে ফাঁকে উচ্ছ্বসিত হতে লাগল কুটিল রসিকতা তীক্ষ্ণ হাসির দমকে।

রুসো বললে,—ভদ্রমহোদয় ও মহিলারা, আপনারা দয়া করে বসুন। এখন অর্কেস্ট্রা শুরু হবে। আমারই একটি রচনা আপনারা শুনবেন, এটি

আমি উৎসর্গ করেছি মশিয়ে পিলের নামে।

—বোসো, বোসো সবাই, পিলে হাঁকলেন,—জিনি, ব্লাণ্ড, জ্যাকেস, আর কথা নয়, গোলমাল কোরো না কেউ, চুপ করে বাজনা শোনো।

চারটি বালক কম্পিত হাতে নিজের নিজের বেহালা বেঁধে নিল। রুসো পিয়ানোতে বসে দু-চোখ বন্ধ করল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর বললে, —রেডি।

বাজনা শুরু হোলো। মনমাতানো সরল গ্রাম্য সুর। ভিনসেণ্ট কান পেতে ভালো করে শুনতে চেষ্টা করল, কিন্তু অতিথিদের চাপা হাসির শব্দে ডুবে গেল সঙ্গীত। বাজনা শেষ হওয়ামাত্র সমস্বর কোলাহলে সকলে অভিনন্দন জানালো সুরকারকে। ব্লাণ্ড পিয়ানোর কাছে উঠে গিয়ে রুসোর দু-কাঁধে হাত রেখে গুন্-গুন্ করে উঠল,—কী মধুর, কী মধুর, কী সুন্দর মশিয়ে, আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি!

রুসো বললে,—কিছুই না, আপনি আমাকে এতটা বাড়াবেন না মাদাম!

খিল-খিল হাসিতে ব্লাণ্ড লুটিয়ে পড়ে আর-কি।—শুনছ, শুনছ গিলুম শিল্পী কী বলছে? আহা, কী বিনয়!

রুসো ঘোষণা করলে,—এবার আর-একটি সুর আপনারা শুনুন।

পিলে বললেন,—না, শুধু বাজনা নয়, সেইসঙ্গে তোমার লেখা একটা গানও শোনাও।

শিশুর হাসিতে উদ্ভাসিত রুসোর মুখ।

—বেশ, বেশ, গানও শুনুন।

টেবিল থেকে গানের খাতাটি নিয়ে একটি গান বেছে রুসো আবার গিয়ে বসল পিয়ানোতে। বাজনা শুরু হোলো, সেইসঙ্গে রুসোর গান। ভিনসেণ্টের মনে হোলো সুরটি ভালোই। কিন্তু বাজনার সঙ্গে রুসোর কণ্ঠ মিশে যে রস পরিবেশিত হোলো, তা প্রায় বীভৎস রসেরই সামিল। হাঁটু চাপড়িয়ে অট্টহাস্য করতে লাগল শ্রোতারা।

গান বাজনা শেষ হবার পর রুসো রান্নাঘরে গিয়ে মোটা মোটা কাপ-ভর্তি কফি এনে অতিথিদের হাতে তুলে দিল। সঙ্গে ঘরোয়া খাবার।

পিলে বললেন,—কই রুসো, নতুন কী সব ছবি আঁকলে দেখাও! লুভর মিউজিয়ামে চালান হবার আগে তোমার স্টুডিয়োতে বসে সেগুলো দেখে কৃতার্থ হই!

আর একজন বললে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো আমাদের আসা!

রুসো বললে,—নিশ্চয়। চমৎকার কয়েকটা ছবি আছে। আপনাদের দেখাবো বলেই তো আলাদা করে বেছে রেখেছি।

ছবিগুলো একের পর এক সাজিয়ে রাখতে লাগল টেবিলের ধারে। সবাই ঘিরে দাঁড়াল। স্তুতি-ভাষণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল যেন।

ব্লাণ্ড বললে,—এইটে। হ্যাঁ এই ছবিটা! কী স্বর্গীয় রূপ! এমন সৃষ্টি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি হবে না। এটা আমার চাইই, এখনই চাই। নইলে রাত্রে ঘুমোবো কী করে। কতো হলে এটা আমাকে দেবেন মশিয়ে?

—দাম? কিছু না কিছু না, পঁচিশ ফ্র্যাংক।

—পঁচিশ ফ্র্যাংক মাত্র? শুনেছ সবাই। এই অমর শিল্প, এর দাম পঁচিশটি ফ্র্যাংক খালি! মশিয়ে, আমাকে দিলেন—এই কথাটি ছবির নিচে লিখে দেবেন তো?

পিলে বললেন,—আমার প্রণয়িনীকে বলেছিলাম তার জন্যেও একটা ছবি আনব। কোন্‌টা নিই বলো তো?

দেয়াল থেকে একটি ছবি নামিয়ে রুসো বললে,—এটি কিন্তু আমি আপনার কথা ভেবেই এঁকেছিলাম। এটা আপনার ভালো লাগবেই।

সবাই ঝুঁকে পড়ল ছবিটির ওপর। রূপকথার জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মুখ-বার-করা প্রাগৈতিহাসিক একটি প্রাণী।

পিলে মাথা নেড়ে বললেন,—সত্যি, এত ভালো ছবি আর তুমি আঁকো নি রুসো।

চিৎকার করতে লাগল অন্য সবাই।

—ওটা আবার কী? ও বাবা!

—তাই তো? ওটা কিসের মুখ?

—সিংহ নাকি?

—যাঃ! সিংহ বুঝি অমনি হয়! ওটা বাঘ।

—রামোঃ, ওটাকে আমি ঠিক চিনেছি। আমার ধোপানীর মুখ ওটা।

—বললেই হোলো? ও তো আমার পাওনাদার, গুঁড়ি মেরে আসছে!

হাত কচলিয়ে বিগলিত কণ্ঠে রুসো বললে,—এটার দাম একটু বেশি হবে মশিয়ে পিলে। সাইজে একটু বড়ো কিনা! ধরুন, তিরিশ ফ্র্যাংক।

—বেশি কী বলছ হেনরি, জলের মতো শস্তা! আমার ভবিষ্যৎ বংশধর হয়তো কোনদিন এটাকে তিরিশ হাজার ফ্র্যাংকে বিক্রি করবে।

—আমি নেব, আমার একটা চাই! আরো অনেকে চেঁচামেচি করতে লাগল।

উদার ভঙ্গিতে পিলে বললেন,—বেশ, বেশ, যে যা নেবে নগদ দাম দিয়ে নাও। তারপর চটপট চলো, দেরি করলে মুশকিল হবে। ...আচ্ছা আজকের মতো চলি হেনরি। শিগগির আবার একদিন এমনি পার্টি দিয়ো, কেমন? সুন্দর কাটল, তাই না?

ভুরভুরে সুগন্ধি রুমালখানি রুসোর নাকের সামনে পাতল ব্লাণ্ড, বললে,—বিদায় শিল্পী-প্রবর, বিদায়! কিন্তু তোমাকে কখনো ভুলব না জীবনে। আমার স্মৃতিতে তোমার মুখটি চিরদিন জেগে থাকবে।

পুরুষদের মধ্যে একজন বললে,—আর জ্বালিয়ো না ব্লাণ্ড, রাত্রে ঘুম হবে

না বেচারির।

অতিথিরা কলরব করতে করতে বিদায় নিল। বাতাসে ফেলে গেল কিছুটা বসন-সুরভি।

থিয়ো আর ভিনসেণ্ট, তারাও এগোলো দরজার কাছে। দরজার কাছে গিয়ে ভিনসেণ্ট নিচু গলায় বললে,—তুমি একাই যাও থিয়ো। আমি আর-একটু থাকি, আলাপ করি ওর সঙ্গে।

বিদায় নিল থিয়ো।

রুসো লক্ষ করেনি ভিনসেণ্ট দরজাটা বন্ধ করে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে টেবিলের ওপর ছড়ানো ফ্র্যাংকগুলো গুনছিল একমনে।

—আশি, নব্বই, একশো,—একশো পাঁচ।

মুখ তুলে তাকাতেই দেখল, ভিনসেণ্ট একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। সেই শিশুসুলভ দৃষ্টি ফিরে এল তার চোখে। টাকাগুলো সরিয়ে বোকা-বোকা হাসি মুখে ভিনসেণ্টের দিকে তাকালো।

ভিনসেণ্ট স্থির গলায় বললে,—মুখোসটা খুলে ফেল রুসো। আমি তোমাদের শহুরে আদমি নই। তোমার মতো আমিও চাষা,—আর আমিও ছবি-আঁকিয়ে।

টেবিল থেকে ঘুরে ভিনসেণ্টের সামনে এসে রুসো চেপে ধরল ভিনসেণ্টের হাত।

—তোমার ভাইয়ের কাছে দেখেছি তোমার আঁকা ডাচ কৃষাণদের সব ছবি। ভালো ছবি, মিলেটের চেয়েও ভালো। একবার নয়, বারবার ছবিগুলো দেখেছি। না চিনলেও মনে মনে শ্রদ্ধা করেছি তোমাকে।

—আর তোমার ঐ সব ওরা যখন ভাঁড়ামি করছিল, সেই অবসরে তোমার ছবিগুলোও আমি দেখেছি, রুসো। আমিও তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

—ধন্যবাদ। বসবে না? তোমার পাইপে আমার তামাক একটু ভরবে না? দ্যাখো, একশো পাঁচ ফ্র্যাংক জুটল। এ দিয়ে তামাক হবে, খাবার হবে, ছবি আঁকার জিনিসপত্র হবে!

টেবিলের দুধারে মুখোমুখি দুজনে বসে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল। নীরবে চিন্তার রোমন্থন।

কিছুক্ষণ পরে ভিনসেণ্ট বললে,—তুমি নিশ্চয় জানো রুসো, ওরা সবাই তোমাকে পাগল ভাবে?

—জানি। এও আমি শুনেছি যে হেগ-এর লোকেরাও তোমাকে পাগল বলেই জানত।

—ঠিকই শুনেছ।

—ভাবুক না ওরা যা প্রাণ চায়। দিন আমার আসবে। আমার ছবি লুক্সেমবুর্গ গ্যালারিতে ঝুলবে একদিন না একদিন।

—আলবৎ! আর আমার ছবি লুভরে।

দুজনের মনের কথা এক লহমায় দুজনেই যেন একসঙ্গে ধরতে পারল। প্রাণখোলা খুশির উচ্ছ্বাসে হেসে উঠল হো-হো করে।

ভিনসেণ্ট বললে,—ওদের কোনো দোষ নেই হেনরি। যাই বলো, সত্যিই আমরা পাগল।

—পাগল বলে পাগল! একেবারে বদ্ধ পাগল! এসো, এই পাগলামির আনন্দে একটু মদ ঢালি।

৭

পরবর্তী বুধবার দিন সন্ধ্যাবেলা ভিনসেণ্টের দরজায় ধাক্কা দিল পল গগাঁ।

—থিয়ো খবর পাঠিয়েছে গ্যালারি থেকে ফিরতে তার দেরি হবে। সোজা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে বাতিনোলস কাফেতে।—বাঃ, দেখি, দেখি ক্যানভাসগুলো!

—দ্যাখো না। এসব পুরোনো ছবি। কিছু করেছিলাম হেগ্-এ, বাকি ব্র্যাবাণ্টে।

গগাঁ অনেকক্ষণ ধরে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে ছবির পর ছবি দেখল। কথা বলবার জন্যে মুখ খুলেও মুখ বন্ধ করল কয়েকবার। ছবিগুলো সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে চট্ করে পৌঁছনো দুষ্কর।

শেষ পর্যন্ত বললে,—প্রশ্নটার জন্যে কিছু মনে কোরো না। আচ্ছা, তোমার কি মৃগীরোগ আছে?

ভেড়ার চামড়ার পুরোনো একটা কিম্ভূত-ধরনের কোট কিনেছিল ভিনসেণ্ট থিয়োর আপত্তি সত্ত্বেও। কোটটা সে গায়ে গলাচ্ছিল, গগাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—কী, কী রোগ?

—মৃগী, মৃগী। যাতে মাঝে মাঝে ফিট হয় আর-কি!

—এ রকম রোগ আমার আছে বলে তো জানি নে। রোগের এই উপসর্গের দেখাও কখনো পাই নি। একথা কেন জিজ্ঞাসা করলে বলো তো?

—মানে, কী বলব,....তোমার এই ছবিগুলো দেখলে মনে হয়....এগুলো যেন ক্যানভাস থেকে ছিটকে বার হয়ে এলো বলে। তোমার ছবি আমি যখনই দেখি...শুধু আজ নয়, এর আগেও যতোবার দেখেছি....আমার কেমন একটা দারুণ স্নায়বিক উত্তেজনা হয়,—নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারি নে। মনে হয়, হয় ছবিটা ফেটে পড়বে, নইলে আমি ফেটে পড়ব। তোমার ছবিগুলো ঠিক কোথায় আমাকে নাড়া দেয় জানো?

—না। কোথায়?

—একেবারে আমার পেটের মধ্যে। আমার নাড়ীভুঁড়ি সব যেন কাঁপতে থাকে। এমনি উত্তেজনা হয়, নিজেকে যেন সামলে রাখতে পারি নে।

হেসে ফেলল ভিনসেণ্ট। বললে,—তাহলে আমার ছবিগুলো অন্তত জোলাপ হিসেবে বিকোবে বলো! পায়খানায় টাঙিয়ে রেখে দিনের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলেই হোলো। নির্ঘাৎ ফললাভ—

—ঠাট্টা কোরো না ভিনসেণ্ট! সত্যি কথা বলছি, তোমার ছবির সঙ্গে যদি আমাকে ঘর করতে হয় তাহলে সাতদিনের মধ্যে আমি পাগল হয়ে যাব।

—খুব হয়েছে, ভিনসেণ্ট বললে,—এবার চলো।

মোমার্ত থেকে বুলেভার্দ ক্লিচির মোড় পর্যন্ত দুজনে পেঁছিল।

গগাঁ শুধোলে,—ডিনার খেয়েছ?

—না। তুমি?

—না, আমিও খাইনি। বাতেইলে যাবে নাকি?

—মন্দ হয় না—ভিনসেণ্ট বললে,—পকেটে কিছু আছে?

—ফাঁকা মাঠ। তোমার?

—আমি তো কপর্দকহীন, যথাপূর্বং। আশায় ছিলাম থিয়ো বাড়ি ফিরে খাওয়াবে।

—তাহলে আজ রাত্তিরের মতো পেটে কিছু জুটবে না দেখছি।

—না জুটুক। তবু বাতেইলেই চলো। সন্ধেবেলাকার মেনু-টা দেখতে অন্তত মন্দ লাগবে না।

মাদাম বাতেইলের হোটেলের দরজাতেই কালি দিয়ে কাঁচা হাতে লেখা মেনু ঝুলছে। ভিনসেণ্ট পড়ে বললে,—উম্‌ম্‌ম্‌! গোবৎস-মাংসের কাবাব! —ইস, আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য!

গগাঁ মুখ বেঁকিয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা নাকি আবার খাবার! আমার তো ভাবতেই বমি আসে! না খেয়ে ভালোই হয়েছে আজ। চলো, ঘুরি তো আর কোথাও।

কয়েক পা এগিয়েই ছোট্ট ত্রিকোণ একটি পার্ক। গগাঁ চেঁচিয়ে উঠল,—দেখছ কাণ্ড! ঐ যে ঐ বেঞ্চিটাতে। নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সেজান। ও যে জুতো মাথায় দিয়ে কেন ঘুমোয় বুঝি নে। চলো, ডেকে তুলি ওকে।

প্যাণ্ট থেকে বেল্টটা খুলে গগাঁ সেটা দিয়ে সেজানের মোজা-পরা পায়ে সজোরে একটা বাড়ি মারল। হঠাৎ-যন্ত্রণায় চমকে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল সেজান।

—গগাঁ? শয়তান কোথাকার, সাডিস্ট কোথাকার! এই বুঝি তোমার ঠাট্টা? তোমার মাথার খুলি ভাঙব আমি একদিন!

—বেশ করেছি। পাবলিক পার্কে খালি পায়ে শুয়ে ঘুমুলে তার শাস্তি এইরকমই হয়। বাপু হে, এই কথাটা আমি কিছুতে বুঝিনে,—নোংরা বুট-জোড়াটা পা থেকে খুলে মাথায় পরে তোমার কী সুখটা হয়? ও দুটো কি তোমার বিছানার বালিশ?

—বালিশ কে বললে ? ওগুলো কি মাথায় পরি না মাথায় দিই ? মাথার তলায় গুঁজে রাখি, যাতে ঘুমিয়ে পড়লে কেউ না চুরি করতে পারে।

গগাঁ ভিনসেণ্টের দিকে ফিরে বললে,—মানুষটার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদেরই মতো ভুখা শিল্পী, তাই না ? আসলে বাপ হচ্ছে ব্যাঙ্কের মালিক আর প্রভেন্সের অর্ধেকটা অঞ্চলের জমিদার।—পল, একে তুমি চেনো না। আলাপ করো—ভিনসেণ্ট ভ্যান গক, থিয়োর ভাই।

নিঃশব্দে করমর্দন করল দুজনে।

গগাঁ বললে,—আহা, তোমার সঙ্গে ঠিক আধঘণ্টা আগে যদি দেখা হোতো সেজান, তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে ডিনার খেতে পারতাম। বাতেইলে আজ যা তোফা কোর্মা রান্না করেছে, কী বলব !

—তাই নাকি ? খুব ভালো ?

—ভালো বলে ভালো ? মুখে তুলতে পারবে না হে ! তার আগেই জিভের জলে প্লেট টেবিল সব একাকার হয়ে যাবে। কি হে ভিনসেণ্ট, বলো না !

—সত্যি, অত্যন্ত সুস্বাদু।

—তাহলে তো গিয়ে খেতেই হয় আমাকে ! চলো না তোমরাও, আমার সঙ্গে না-হয় বসবে আর-একবার !

—ওরে বাবাঃ ! আমার পেটে আর এক গ্রাসও ঢুকবে না ! তোমার চলবে নাকি ভিনসেণ্ট ?

—মনে তো হয় না। তবু মশিয়েঁ সেজান যখন জোর করছেন—

—একটু লক্ষ্মী ছেলে হও না গগাঁ ! জানোই তো একলা-একলা খেতে আমার যাচ্ছেতাই লাগে ! কোর্মা না খাও, না-হয় তো অল্পসল্প আর-কিছু খাবে। চলো, চলো—

—চলো, নিতান্তই যখন ছাড়বে না। এসো ভিনসেণ্ট।

কাফে বাতেইলে গিয়ে টেবিল জুড়ে তিনজনে বসল। ওয়েটার প্রশ্ন করতে না করতেই গগাঁ অর্ডার দিল,—তিনটে বাছুরের কোর্মা লাগাও।

ওয়েটার জিজ্ঞাসা করল,—পান করবেন কী ?

—মদটা তুমিই পছন্দ করে অর্ডার দাও সেজান। ওটা তুমি আমাদের চাইতে ভালো বোঝো।

—আচ্ছা। ' কই মেনু-টা দেখি ?

দু-একটা পানীয়ের নাম পড়তে না পড়তেই গগাঁ বাধা দিলে, বলে উঠল, —পমার্ড খেয়ে দেখেছ এদের ? আমার তো মনে হয় মদের মধ্যে পমার্ড'ই এদের সবচেয়ে ভালো।

সেজান বললে ওয়েটারকে,—বেশ, এক বোতল পমার্ড।

সেজানের তখন অর্ধেকও খাওয়া হয়নি। গগাঁ ডিশ চেটে-পুটে শেষ করে বললে,—ভালো কথা পল, শুনেছি নাকি জোলার 'লে-ঈভার'-খানা হাজার হাজার

কপি বিক্রি হচ্ছে ?

সেজান চমকে উঠে গগাঁর দিকে উগ্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল। ডিশটা ঠেলে সরিয়ে দিল সামনে থেকে। খাওয়ার অভিরুচি তার ঘুচে গেল মুহূর্তে। তারপর ভিনসেন্টের দিকে ফিরে বললে,—বইটা পড়েছেন মশিয়ে ?

—না। আমি সবে 'জার্মিনাল' শেষ করেছি।

ক্ষুব্ধ স্বরে সেজান বলে চলল,—এই যে লে-ঈভার বইখানা, মশিয়ে, এটা একটা অতি হীন বই, সম্পূর্ণ অসত্য বই। তাছাড়া বন্ধুত্বের নামে কতো বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা যে লোকে করতে পারে, এই বইটাই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। বইটা কাকে নিয়ে লেখা জানেন ? একজন শিল্পীকে নিয়ে,—সেই শিল্পী হচ্ছি আমি। এমিল জোলা, বুঝলেন, মশিয়ে, আমার সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে এক্স-এ আমরা দুজনে একসঙ্গে বড়ো হয়েছি, একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। ও-প্যারিসে এল, আর ওরই টানে আমিও এলাম এখানে। দুজনে ছিলাম ঠিক যেন দুটি ভাই। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলেছি, একসঙ্গে কল্পনা করেছি বড়ো হলে কী করব, কী হবে জীবনের সাধনা। আমি হব শিল্পী আর ও হবে লেখক,—এ পরিকল্পনা আমরা দুজনে একসঙ্গে করেছি সেই কতোদিন আগে থেকে !

ভিনসেন্ট বললে,—তা, জোলা আপনার করেছেন কী ?

—করেছে ? ঠাট্টা করেছে, বিদ্রূপ করেছে, সারা প্যারিসের চোখে সে আমার সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে দু-হাত তুলে নৃত্য করেছে। দিনের পর দিন আমি তার সঙ্গে কাটিয়েছি,—কতো গল্প করেছি, আমার নানা থিয়োরির বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি। বলেছি আমার শিল্পী-জীবনের আদর্শ-বেদনার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। বন্ধুর অভিনয় সে সমানে করে চলেছে, পেট থেকে কথা টেনে বার করেছে আমার। আসলে তার মতলব কী ছিল জানেন ? তার এই ঘৃণিত বইখানার উপাদান সংগ্রহ করা, জগতের সামনে আমাকে বোকা বলে তুলে ধরার অভিসন্ধির ছুরিতে শান দেওয়া !

মদের পাত্রটা এক চুমুকে শেষ করে জিঘাংসা-মাখা জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে আবার সে বলে চলল,—আমাকে ব্যঙ্গ করে যে চরিত্র সে বানিয়েছে, তার মধ্যে আবার কারসাজি কী করেছে জানেন ? আমার সঙ্গে আর দুটো লোকের চরিত্র মিশিয়েছে। একজন হচ্ছে বেজিল, আর একটা হতভাগা ছেলে যার কাজ ছিল মানে-র স্টুডিয়ো ঝাঁট দেওয়া। ছেলেটার শিল্পী হওয়ার উদগ্র বাসনা ছিল, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। জোলা আমার কী পরিচয় দিয়েছে জানেন ? আমি একটা মূর্খ স্বপ্নবিলাসী, কল্পনা করি আমি বুঝি বৈপ্লবিক শিল্পী, তার কারণ আসলে প্রচলিত টেকনিকে আঁকার ক্ষমতাটুকু আমার নেই। শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যর্থতা-বোধের মুখোমুখি করেছে আমাকে, আমার শ্রেষ্ঠ কীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ছাদের বরগা থেকে দড়ি

ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করিয়ে মেরেছে আমাকে। আমার পাশাপাশি এক্স্-এর আর-একজন শিল্পীকে সে খাড়া করেছে যে প্যাঁচপেচে সেন্টিমেন্টের ফানুষ, পুরোনো বস্তাপচা যার ধ্যান ধারণা ; আমার বিরুদ্ধে তাকেই সে খাড়া করেছে মস্ত একটা জীনিয়াস করে।

গগাঁ বললে,—যাই বলো, ব্যাপারটা কিন্তু ভারি মজার। এডুয়ার্ড মানে-র বৈপ্লবিক শিল্পরীতিকে জোর গলায় সমর্থন কিন্তু এই জোলাই প্রথম করে। ইম্প্রেশনিস্টদের সপক্ষে এতো কথা আর কেউ বলেনি, তাদের এতো সাহায্য আর কেউ করেনি।

—হ্যাঁ, মানে যখন প্রাচীনপন্থীদের হটালো তখন জোলা একেবারে গদগদ হয়ে উঠল মানে-র ওপর। কিন্তু আমি যখন ইম্প্রেশনিস্টদেরও ছাড়িয়ে যেতে চাই, তখন সেটা আর তার সহ্য হয় না। জোলাকে আমার চেয়ে বেশি তোমরা চেনো ? প্রতিভা বলতে চু-চু, মানুষ বলতে ঘেন্না করে। মানে-কে প্রশংসা করবে না কেন ? আসলে দুজনেই যে বুর্জোয়া। দ্যাখো না জীবন যাপনের নমুনা ! বিরাট বাড়ি, মেঝেয় তুলতুলে কার্পেট, হাতে পায়ে ঝি চাকর, আর খোদাই-করা টেবিলে বসে কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা কামানোর তালে শ্রমিক-জীবনের কাহিনী লেখা। হুঁ, জানা আছে !

—কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম ক-বছর আগে তোমার একটা প্রদর্শনীর ব্যাপারে তোমার ছবির একটা সুন্দর পরিচয়পত্র জোলা লিখেছিল ?

—হ্যাঁ লিখেছিল বটে। কিন্তু তার পরের ইতিহাসটা জানো ? যেই সেটা ছাপাবার সময় এল, অমনি সে লেখাটাকে ছিঁড়ে ফেলল কুটি-কুটি করে। কেন বলো তো ? বন্ধুত্বের খাতিরে! আসলে ওটা ছাপা হলে পাছে বন্ধুর কিছুটা উপকার হয়, সেইজন্যে। তার বদলে সে ছাপালো লে-ঈভার। আমার ছবি ছবি নয়, ঠাট্টার খোরাক। ডেগা, মনে, গিলামিনের ছবি ডুরাঁ-রুয়েল টাঙায়, কিন্তু আমার প্রবেশ নিষেধ। এই তো বন্ধুর কাজ ও করেছে! সারা প্যারিসে আমার ছবি যদি বা কেউ কোথাও টাঙায়, সে পীয়ার ট্যাঙ্গি—তার দোকানে। কিন্তু তার হাতে একবার ছবি পড়লে বিক্রির দফা গয়া।

ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যে গগাঁ বললে,—ভালো কথা সেজান, বোতলে পমার্ড আছে নাকি কয়েক ফোঁটা ? ঢালো তাহলে এ গ্লাসে। এই জোলার বিরুদ্ধে আমার আপত্তিটা কোথায় জানো ? তার ধোপানী মেয়েরা ঠিক ধোপানীর মতোই কথা বলে, কিন্তু তাদের কথা ফুরোবার পর জোলা ভাষাটিকে আর বদলাতে পারে না।

সেজান বললে,—যাক, যথেষ্ট হয়েছে আমার প্যারিস বাস! আর এখানে নয়। এক্স্এ আমি ফিরে যাচ্ছি,—একেবারে সারা জীবনের জন্যে। শহর আর নয়, থাকব পাহাড়ের চুড়োয়। খোঁজ পেয়েছি, ঠিক পাহাড়ের মাথায় একটুকরো জমি বিক্রি আছে—সেখানে। চারদিকে পাইন গাছের বন।

সেইখানে আমি স্টুডিয়ো বানাবো, আর বানাবো আপেল বাগান। চারদিকে পাথরের উঁচু দেয়াল গেঁথে দেব, দেয়ালের ওপরে ভাঙা কাঁচ পুঁতে রাখব যাতে সারা দুনিয়ার কেউ দেয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পারে। নিশ্চিন্তে ছবি আঁকব সেখানে। জীবনে আর নড়ব না কোথাও।

গ্লাসে মুখ ভরিয়ে গগাঁ বললে,—আঁ্যা, একেবারে মঠবাসী সন্ন্যাসী।

—হ্যাঁ, সন্ন্যাসী। মঠই ভালো।

—বাঃ! একেবারে সন্ন্যাসী! কে? না, আমাদের সেজান। চমৎকার লাগছে ভাবতে। নাও, ওঠো এখন। কাফে বাতিনোল্সে চলো। এতোক্ষণে সবাই সেখানে জুটেছে।

৮

সরগরম আসর। বাকি নেই আর কেউ। লোত্রেকের সামনে ডিশের এত উঁচু পাহাড় যে তার ওপর থুতনিটাকে বসিয়ে বিশ্রাম করা চলে। জর্জেস সিউরাত একধারে আঁকোয়েতিন নামে একজন রোগা-পটকা চেহারার শিল্পীর সঙ্গে কথা বলছে। রুসো নিঃশব্দে গলা ভেজাতে ব্যস্ত। দুজন আধুনিক শিল্প-সমালোচকের সঙ্গে দারুণ তর্ক জুড়েছে থিয়ো।

বাতিনোল্সের ইতিহাস আছে। শিল্পীদের আড্ডা এখানে নতুন নয়। এডুয়ার্ড মানে সমসাময়িক ও সমভাবাপন্ন শিল্পীদের নিয়ে বসতেন এইখানেই। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লেগ্রো, ফাঁতিন-লাতুর, রেনোয়াঁ প্রভৃতি শিল্পীদের প্রতি সপ্তাহের অন্তত দুটি সন্ধ্যা কাটত এখানে, শিল্পের নতুন নতুন থিয়োরি নিয়ে কতো আলোচনা হোতো, কত তর্কবিতর্ক। আজকাল তাঁদের জায়গা নিয়েছে একেবারে তরুণ শিল্পী আর তাদের সমর্থকরা।

ঢুকতেই সেজানের চোখ পড়ল এমিল জোলার ওপর। দল থেকে সরে গিয়ে দূরের একটা টেবিলে একলা বসে সে কফি অর্ডার দিল। গগাঁ জোলার সঙ্গে ভিনসেণ্টের আলাপ করিয়ে দিয়ে লোত্রেকের পাশে গিয়ে বসল। একটি টেবিলে শুধু জোলা আর ভিনসেণ্ট।

—আমি লক্ষ করলাম, মশিয়ে ভ্যান গক, আপনি সেজানের সঙ্গে ঢুকলেন। নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে ও আপনাকে কিছু বলেছে। বলেনি?

ভিনসেণ্ট বললে,—হ্যাঁ সেজান বলেছিলেন ওঁকে নিয়ে আপনি যে বই লিখেছেন, তাতে উনি খুবই আহত হয়েছেন।

একটু চুপ করে জোলা উত্তর দিল,—পল সেজানকে নিয়ে বইটি লিখতে আমিও মনে মনে কম ব্যথা পাইনি মশিয়ে। কিন্তু ও বইএর প্রতিটি কথা সত্যি। ধরুন, বন্ধুর একটা ছবি আঁকছেন আপনি। তার সত্যিকারের প্রতিকৃতি দেখে সে দুঃখ পাবে, এইজন্যে আপনি মিথ্যে আঁকবেন? চমৎকার মানুষ পল। আমরা অনেক দিনের বন্ধু। কিন্তু ছবি-আঁকিয়ে হিসেবে ও

উপহাসের পাত্র। আমার বাড়িতে আমি ওর ছবি টাঙিয়েছি,—কিন্তু জানেন মশিয়ে ভ্যান গক, বাড়িতে বন্ধুবান্ধব আসার কথা থাকলে ছবিগুলো আমাকে দেয়াল থেকে খুলে রাখতে হয়,—নইলে তাদের ঠাট্টা আমাকে বাজে।

—কিন্তু যাই বলুন, ও'র কাজ অত খারাপ নিশ্চয়ই হতে পারে না।

—আপনি যতোটা খারাপ ভাবতে পারেন তার চাইতেও খারাপ। দেখেন নি বুঝি নিজে? বুঝেছি, সেইজন্যেই। পাঁচ বছরের একটা শিশু পর্যন্ত ওর চাইতে ভালো আঁকে। সত্যি, আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয় ওর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

—কিন্তু গগাঁ তো ও'কে খুব খাতির করে।

—এইভাবে যে সেজান জীবনটা নষ্ট করছে, জোলা বলে চলল—ভাবতে আমার বুক ফেটে যায়। দেশে দেখুন কতো মান সম্মান পরিবারটার, বাবার ব্যাংকে গিয়ে যদি লাগে সত্যি হয়তো উন্নতি করতে পারে, কিন্তু তা নয়, ছবি-আঁকিয়ে হব! কতো বড়ো পাগলামি, আর কতো বড়ো ধৃষ্টতা! আপনি দেখবেন, আমি যা লিখেছি ঠিক তাই ওর ভাগ্যে হবে,—আত্মহত্যা করবে শেষ পর্যন্ত। পড়েছেন বইটা?

—আজ্ঞে না, এই তো সবে আপনার জার্মিনাল শেষ করলাম।

—পড়েছেন জার্মিনাল? বেশ, বেশ! কেমন লাগল বলুন!

—আমার মতে ব্যালজাকের পরে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আর রচিত হয়নি।

—নিশ্চয়ই! এই জার্মিনালই হোলো আমার মাস্টারপীস। মাসিকপত্রে যখন বার হয়, তখন মন্দ সাড়া পাইনি। তারপর দেখুন, বই আকারে ষাট হাজার কপির বেশি বিক্রি হয়ে গেছে এক বছরের মধ্যে। এত আয় আমার আগে কখনো ছিল না। জমিয়েও ফেলেছি অনেকটা, মেডানে আমার বাড়িটা কিছু বড়ো করব এবার ভাবছি। তাছাড়া বইটার কী ক্ষমতা দেখুন! ওটা লেখার ফলে ফ্রান্সের খনি অঞ্চলে তিন-চারটে বড়ো বড়ো ধর্মঘট হয়ে গেছে। আপনি দেখবেন, এই জার্মিনালই বিপ্লবকে ডেকে আনবে, কবর খুঁড়বে পুঁজিবাদের।—ভালো কথা, আপনি কেমন ছবি আঁকেন বলুন তো মশিয়ে? আহা! গগাঁ যেন কী আপনার প্রথম নামটা বলল?

—ভিনসেন্ট। ভিনসেন্ট ভ্যান গক। থিয়ো ভ্যান গক আমার ভাই।

চমকে ভিনসেন্টের মুখের দিকে তাকালো জোলা। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললে,—এ তো ভারি আশ্চর্য!

—আশ্চর্য হলেন কিসে?

—আপনার নামটা। কোথায় যেন আগে শুনেছি!

—থিয়োর কাছেই বোধহয়।

—থিয়োর কাছে? তা হবে। না, দাঁড়ান, দাঁড়ান। ব্যাপারটা জার্মিনালে নিয়েছি যেন। আচ্ছা, আপনি কখনো কয়লা-খনি অঞ্চলে ছিলেন?

—হ্যাঁ, প্রায় দু-বছর ছিলাম বেলজিয়ামের বরিনেজ অঞ্চলে।

—বরিনেজ! ওয়াম্‌স! মার্কাস! জোলার বড়ো বড়ো চোখদুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে আর-কি!

—তাহলে, তাহলে, আপনিই সেই পুনরাগত যিশুখ্রীস্ট!

লাল হয়ে উঠল ভিনসেন্ট। বললে,—তার মানে?

জোলা বললে,—এই জার্মিনালের মাল-মশলা সংগ্রহের জন্যে আমি প্রায় পাঁচ সপ্তাহ বরিনেজে ছিলাম। লোকমুখে শুনেছিলাম, ধর্মযাজকের রূপ ধরে স্বয়ং যিশুখ্রীস্টের মতো কে একজন বিদেশী সেখানে বাস করে গেছেন। নামটা মনে পড়ল হঠাৎ,—আপনিই সেই লোক, তাই না?

ভিনসেন্ট বললে,—আস্তে, আস্তে, গলাটা একটু নামান।

কাছাকাছি এগিয়ে এলো জোলা। আন্তরিকতার ভাষায় বললে,— তোমাকে চিনেছি ভিনসেন্ট। কিন্তু আমার কথায় এত লজ্জা পাবার কী আছে? তুমি যা চেষ্টা করেছিলে সে তো মূল্যহীন নয়! কম নয় তার সার্থকতা। পথটা তুমি ভুল বেছে নিয়েছিলে, এইমাত্র। মনুষ্যত্ব যার নেই সেই মানুষই পরজন্মের ভরসার বিনিময়ে এ জন্মের হতাশা বঞ্চনাকে স্বীকার করে নেয়।

—আপনার কথা ঠিক। আমার বুঝতে দেরি হয়েছিল।

—দুটি বছর তুমি বরিনেজে কাটিয়েছিলে। সর্বস্ব তুমি বিলিয়ে দিয়েছিলে—টাকাকড়ি, গায়ের জামাকাপড়, মুখের খাবারটুকু পর্যন্ত। খেটেছিলে তুমি আপ্রাণ।—না না, বাধা দিয়ো না, সব আমি জানি। কিন্তু বলো, কী পেয়েছিলে বিনিময়ে? কিছু না। তোমার মতো ধর্ম-প্রচারককে ওরা পাগল বলে গির্জে থেকে বিদায় করেছিল। তুমি যখন বরিনেজ থেকে চলে আসো, শ্রমিকদের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো দেখে আসো নি।

—ভালো? তার উল্টো। অনেক, অনেক খারাপ।

—তাইতো বলছি ভিনসেন্ট, তোমার সাধনা ছিল, কিন্তু সে সাধনা চলেছিল ভুল পথে। ভুল সহায় করেছিলে ধর্মকে। আমার সহায় ভাষা, আমার অস্ত্র আমার লেখনী। এই অস্ত্রেরই জয় হবে। বেলজিয়াম আর ফ্রান্সের প্রত্যেকটি খনিমজুর, অক্ষর-পরিচয় যার হয়েছে, আমার লেখা সে পড়েছে। এমন একটা নগণ্য কাফে বা হোটেল নেই ও অঞ্চলে যেখানে বহুবার-পড়া ছেঁড়া-খোঁড়া এক কপি জার্মিনাল পাওয়া যাবে না। যারা নিরক্ষর, অপরে পড়েছে তারা বারে বারে শুনেছে। চার-চারটে ধর্মঘট ইতিমধ্যে হয়েছে, গোটা-বারো হোলো বলে। সমস্ত দেশ জেগে উঠেছে, নতুন সমাজসৃষ্টির পথে সর্বহারা মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে জার্মিনালই। তোমার ধর্ম তা পেরেছিল? আর দ্যাখো আমি কী পাচ্ছি!

—কী পাচ্ছেন আপনি?

—টাকা হে, টাকা! হাজারের ওপর হাজার ফ্র্যাংক। বুঝেছ? এসো, এক গ্লাস খাও আমার সঙ্গে।

ওদিকে লোত্রেকের টেবিল ঘিরে আড্ডা তখন গরম হয়ে উঠেছে। সবাই-এর কান সেদিকে।

সিউরাতকে ঠাট্টা করে লোত্রেক বলছে,—কী গো পদ্ধতিবিশারদ, খবর কী?

লোত্রেকের বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে সিউরাত বলে চলল,—রঙের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে একটা বই বেরিয়েছে। অগডেন রুড বলে একজন আমেরিকানের লেখা। বইটা তোমাদের সকলেরই মন দিয়ে পড়া উচিত।

লোত্রেক বললে,—চিত্রকলা সম্বন্ধে কোন বই আমি পড়ি নে। ওটা রেখে দিই যারা শিল্পী নয় এমনি সব সাধারণ লোকদের জন্যে। আঁকে যে, সে আবার পড়বে কী?

সিউরাত সাদা কালো চেক-কাটা কোটের সামনের বোতামটা খুলে নীল টাইএর নট্-টা একটু সোজা করে নিল। বললে,—যতোদিন আন্দাজে আন্দাজে রঙ মেশাবে, ততোদিন ঐ সাধারণ লোকই থেকে যাবে।

—আজ্ঞে না স্যর, আন্দাজে আন্দাজে আমি রঙ মেশাই নে, বুদ্ধি দিয়ে মেশাই। অভ্যাস আর অভিজ্ঞতা দুইয়ে মিলে এই বুদ্ধি।

গগ্যাঁ তর্কে ইন্ধন জোগালে,—আমি কিন্তু বলব, বিজ্ঞান তো আর একটা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার কিছু নয়! আমরা যেভাবে রঙ ব্যবহার করি তাকে অবৈজ্ঞানিক বলব কী করে? বহু বছরের শত-শত শিল্পীর গবেষণা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তো আমাদের পদ্ধতিটা পাকা হয়ে উঠেছে।

সিউরাত বললে,—ওতেই সব হোলো না বন্ধু। আধুনিক যুগ চলেছে নৈর্ব্যক্তিক অথচ ত্রুটিহীন উৎপাদনের দিকে। শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও ব্যক্তিগত অনুভূতি আর ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার দিন আর নেই।

তর্কটায় পরিসমাপ্তির দাঁড়ি টানল রুসো। সে বলে উঠল,—যাই বলুন আপনি, ওসব বই-টই আমি পড়তে পারি নে। পড়লেই মাথা ধরে, আর সারা দিন রাত ছবি এঁকে সেই মাথা-ধরাকে মাথা থেকে তাড়াতে হয়।

হেসে উঠল সবাই।

আঁকোয়েতিন জোলার দিকে গিয়ে বললে,—আজবেই সন্ধেবেলাকার কাগজে আপনার জার্মিনালকে কী রকম আক্রমণ করেছে দেখেছেন?

—না দেখিনি। কী বলেছে কাগজে?

—সমালোচক বলেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে দুর্নীতিপূর্ণ লেখার লেখক হচ্ছেন আপনি।

—কথাটা মিথ্যে নয় জোলা, লোত্রেক বললে,—তোমার লেখা সত্যিই দুর্নীতিপূর্ণ আর অশ্লীল।

—অশ্লীল? অশ্লীলতা কাকে বলে দেখে তুমি চিনতে পারো?

—বেশ বলেছ! এইবার লোত্রেক জব্দ। তারিফ করল গগ্যাঁ।

জোলা মেজাজি ভঙ্গিতে হাঁক দিলে,—ওয়েটার, এক-গ্লাস করে লাগাও সবাইএর সামনে।

সেজান আঁকোয়েতিনের কানে কানে বললে,—ব্যস, আর নিস্তার নেই। জোলা যখন গাঁটের পয়সা খরচ করে বন্ধুদের খাওয়াচ্ছে তখন ওর ঝাড়া একটা বক্তৃতা শুনতেই হবে।

ওয়েটার গ্লাসভর্তি মদ নামিয়ে রেখে গেল প্রত্যেকের সামনে। পাইপ ধরিয়ে শিল্পীরা গোল হয়ে বসল জোলাকে ঘিরে। দেয়ালে দেয়ালে গ্যাসের দেয়ালগিরি, টেবিলের কাছটা আবছায়া অন্ধকার। অন্যান্য টেবিলে টেবিলে আড্ডার গুঞ্জন।

জোলা শুরু করল,—যে কারণে ওরা আমার লেখাকে দুর্নীতিপূর্ণ বলে,সে কারণে ওরা তোমার ছবিকেও দুর্নীতিপূর্ণ বলে, হেনরি। সাধারণ লোকের মাথায় এটা ঢোকে না যে শিল্পের ক্ষেত্রে নীতি-দুর্নীতির কোন বিচার নেই। আর্ট নীতি-দুর্নীতির ঊর্ধ্বে। জীবনও ঠিক তেমনি। আমার মতে অশ্লীল বলে কোনো ছবি বা বই নেই, দুর্বল হাতের আঁকা বা দুর্বল হাতের রচনা আছে। জীবনকে প্রকৃত উপলব্ধি না করতে পারলে জীবনকে প্রকাশের চেষ্টায় ব্যর্থতা থাকে। সেইটেই দুর্বলতা। সেইটেই নিন্দে করার। তুলস-লোত্রেক বেশ্যার ছবি আঁকে, কে বলে সে ছবি দুর্নীতিপূর্ণ যদি সে সেই বেশ্যারই রূপকে প্রকাশ করতে পারে সত্যের তুলিতে এঁকে? কিন্তু বুগেঁরু-র আঁকা পবিত্র একটি গ্রাম্য মেয়ের ছবি অশ্লীল, কেননা সেই মেয়ের চেহারা এমনি নোংরা ভাবালুতার সঙ্গে চটচটে মিষ্টি করে আঁকা যে দেখেই গা-বমি-বমি করে ওঠে।

—ঠিক বলেছ, অতি খাঁটি কথা,—থিয়ো মাথা নাড়ল।

ভিনসেণ্ট দেখল, শিল্পীরা সকলেই জোলাকে সম্মান করে। এর মানে এ নয় যে জোলা নাম করেছে, টাকা করেছে। কারণ এই, সাহিত্য তার মাধ্যম। এ মাধ্যম চিত্রশিল্প নয়, চিত্রশিল্পীর কাছে এ মাধ্যম দুর্জ্ঞেয়। মন দিয়ে শুনতে লাগল সবাই।

জোলা বলে চলল,—সাধারণ মানুষের অনুভূতি এটা কিংবা ওটা—এইভাবে চলে। হয় এটা না হয় ওটা,—ধারণাকে সরাসরি এমনি দুভাগে ভাগ করতেই সে অভ্যস্ত। আলো কিংবা ছায়া, মিষ্টি কিংবা তেতো, জীবিত কিংবা মৃত, ভালো কিংবা মন্দ। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে এতোটা সোজাসুজি ভাগাভাগি নেই, না বিশ্বপ্রকৃতিতে, না মানব-প্রকৃতিতে। পৃথিবীতে ভালোও নেই, মন্দও নেই। পাশাপাশি শুধু হওয়া আর করা। এই হওয়া আর করার মধ্য দিয়েই জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তি প্রতিভাত হয়ে চলেছে। এই অভিব্যক্তির গায়ে যখন আমরা ভালো কিংবা মন্দর লেবেল আঁটি, কোনোটাকে বলি সুনীতিপূর্ণ আর কোনোটাকে দুর্নীতিপূর্ণ, তখন আমরা জীবনের সত্যকে অস্বীকার করি,

নিজের নিজের ব্যক্তিগত কুসংস্কারকেই বড়ো করে তুলে ধরি।

থিয়ো প্রশ্ন করল—কিন্তু এমিল, নৈতিকতার একটা নির্দিষ্ট মান যদি না থাকে তাহলে সাধারণ সামাজিক মানুষ চলবে কী করে ?

লোত্রেক বললে,—নীতিবাদ আসলে ঠিক ধর্মেরই মতো, আফিমের নেশায় মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে, জীবনের কুশ্রীতার দিকে যাতে নজর না পড়ে।

—আমি কিন্তু বলব, জোলা, সিউরাত বললে এবার,—তোমার এই নীতিকে নেতি করার যে দর্শন, এটা নৈরাজ্যবাদ। নিহিলিস্টরাও এমনি করেই নীতিকে ঘায়েল করবার তালে ছিল, কিন্তু ধোপে টেঁকে নি।

জোলা বললে,—ভুল বুঝো না। নীতি থাকবে বৈকি। নীতি থাকবে, আইন থাকবে কানুন থাকবে,—থাকবে না ? সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত জীবনের কিছু না কিছু ক্ষুণ্ণ হবেই। সামাজিক জীবনে নীতিবোধ বলে যে কথাটা আছে, তা আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু নীতির নামে বাজারে যে ন্যাকামি আর ভাঁড়ামি চলে, যার জন্যে অলিম্পিয়ার মতো ছবির গায়ে থুথু ফেলতে লোক দৌড়োয় আর মোপাসাঁর মতো মহান সাহিত্যিকের কণ্ঠরোধ করতে চায়, তাকে আমি মানি নে। দুঃখের কথা কী জানো, এই ফরাসী দেশের নীতিবোধটা একেবারে যৌন এলাকার চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনু পুরুষের সঙ্গে কোনু স্ত্রীলোক শুচ্ছে তা নিয়ে আমার বয়েই গেছে। এর চাইতে অনেক উন্নততর নীতিবোধের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

গগাঁ বললে,—বছর-দুই আগেকার একটা ডিনার খাওয়ানোর কথা মনে পড়ে গেল। কাহিনীটা শোনো। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন,—আপনার বাড়িতে সান্ধ্য ভোজ, এ তো বড়ো খুশির কথা, তবে কিনা, আপনার রক্ষিতা থাকতে আমার স্ত্রীকে তো আপনার ওখানে নিয়ে যেতে পারি নে। আমি বললাম,—তাতে কী ? একটা রাত্তিরের জন্যে রক্ষিতা না-হয় অন্যত্রই থাকবে। খাওয়া দাওয়া শেষ হোলো। ভদ্রলোকের স্ত্রীটি পার্টিতে একটি কথা বলেন নি, হয় খেয়েছেন না-হয় কখনো ঢেঁকুর আর হাই তুলেছেন। ঘরে ফিরে হাই তোলা বন্ধ করে স্ত্রী স্বামীকে বললেন,—এসো, দু-চারটে রসের গল্প শোনাও, তারপর ওটা করা যাবে। স্বামী বললেন,—না আজ ওটা থাক। পেট বড়ো ভর্তি। খালি গল্পই হোক।

সমবেত অট্টহাস্যের মাঝখানে জোলা বললে,—খাসা গল্প, একেবারে আদর্শ চরিত্রবান আর চরিত্রবতীর কাহিনী।

ভিনসেন্ট এতোক্ষণে কথা বললে,—শ্লীলতা অশ্লীলতার কথা রাখুন। আমার ছবিকে অশ্লীল কেউ বলে না,—কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ আছে। এ দুর্নীতি আরো সাংঘাতিক, এর নাম কুশ্রীতা।

—ঠিক কথা, গগাঁ বললে,—দুর্নীতির নতুন সংজ্ঞা হচ্ছে এই। মার্কুরি কাগজে আমাদের নামে কী লিখেছে জানো ? আমরা নাকি কুশ্রীতার উপাসক

সবাই।

—এ অভিযোগ আমার বিরুদ্ধেও। সেদিন একজন কাউন্টেস আমাকে বললেন,—মশিয়েঁ জোলা, এমনি অসামান্য শক্তিধর হয়ে আপনি আবর্জনার কীট ঘেঁটে ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন কেন?

লোত্রেক পকেট থেকে পুরোনো খবরের কাগজের একটুকরো বার করে বললে,—শোনো, সালোঁ দ্য ইনডিপেন্ডেন্টস্-এ টাঙানো আমার ছবিগুলো সম্বন্ধে সমালোচকের অভিমত শোনো। ইনি বলছেন—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, দূষিত আবহাওয়ায় ঘৃণ্য আমোদ-প্রমোদ আর নিম্নরুচির বিষয় নিয়েই তুলস-লোত্রেকের কারবার। মার্জিত রূপ ও মনোজ্ঞ সুন্দর ভঙ্গিমার প্রতি আকর্ষণ, এক কথায় প্রকৃত সৌন্দর্যের অনুভূতি তার নেই। কুশ্রী মুখ, পঙ্গু বিকল দেহ আর বীভৎস অঙ্গভঙ্গির প্রতি তার ঔৎসুক্য—বিকৃত যৌনরুচি থেকেই এই কুৎসিত বীভৎসার প্রতি বিজাতীয় আগ্রহের জন্ম।

সিউরাত বললে,—ঠিক বলেছে। বিকৃত রুচি তোমাদের হোক বা না হোক তোমরা যে উন্মার্গগামী তাতে কোন ভুল নেই। যা নিত্য যা মৌলিক, যেমন, রঙ রেখা টোন,—এই নিয়েই আর্টের কারবার। কুশ্রীতার অনুসন্ধান কিংবা সমাজ বিদ্রোহের জয়গান—কোনোটাই আর্টের পর্যায়ে পড়ে না—আর্ট দিয়ে এসব করতে যাওয়াও বাতুলতা। চিত্রশিল্প হবে সঙ্গীতের মতো, পৃথিবীর সব কিছু বাস্তবতার অনেক উঁচুতে হবে তার স্থান।

একথার উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন স্বীকার না করে জোলা আবার শুরু করল—গত বছর ভিক্টর হিউগোর মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ একটা সভ্যতার মৃত্যু হয়েছে। সরস মিথ্যাচার, ঝুটো রোমান্স আর চতুর পলায়নী-বৃত্তির সে সভ্যতা। আমার সাহিত্য নতুন এক সভ্যতার সাহিত্য—এ সভ্যতা সুনীতি-দুর্নীতি আর সুলভ মিথ্যাচারের মোহজাল এড়িয়ে সত্যের শক্ত বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তোমাদের ছবিও এই নতুন যুগেরই ছবি। বুর্গেরু এখনো তার মৃতদেহটাকে প্যারিসের রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে,—কিন্তু মানে যেদিন 'পিকনিক-অন-দি গ্রাস' এঁকেছিল সেইদিনই সেই সভ্যতার মৃত্যুরোগ ধরেছিল, আর নাভিশ্বাস উঠেছিল ঐ মানে-ই যেদিন 'অলিম্পিয়া' ছবিটা শেষ করে। মানে নেই, দ্যমিয়ারও নেই, কিন্তু নতুন সভ্যতার ধারা তাতে শুকিয়ে যায় নি,—সেই সভ্যতার জয়পতাকা কাঁধে নিয়ে চলেছ তোমরা—ডেগা, লোত্রেক আর গগাঁ।

তুলস-লোত্রেক বললে,—তোমার লিস্টিতে ভিনসেন্ট ভ্যান গকের নামটাও জুড়ে দাও।

চেঁচিয়ে উঠল রুসো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে লিস্টির মাথায়!

জোলা হেসে বললে,—বহুৎ আচ্ছা! কী হে ভিনসেন্ট, কুশ্রীতার উপাসকদের দলে তোমার নাম প্রস্তাব করা হোলো। রাজি আছ নাম লেখাতে?

ভিনসেণ্ট বললে,—হায় হায়, কুশ্রীতা তো আমার জন্ম-তিলক, আমার ললাট-লিখন!

—চমৎকার, চমৎকার!

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল জোলা। দীপ্তকণ্ঠে বললে,—ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের ঘোষণা-পত্রের খসড়াটা এইখানেই হয়ে যাক। প্রথমত, আমরা বিশ্বাস করি যে সত্য মাত্রেই সুন্দর, আপাতদৃষ্টিতে এই সত্যকে যতো কদর্যই লাগুক না কেন। প্রকৃতির সমস্ত কিছুকেই আমরা সমানভাবে গ্রহণ করি, পছন্দ-অপছন্দের সংস্কারে দূরে সরিয়ে রাখি নে কিছুই। আমরা বিশ্বাস করি যে মধুর মিথ্যার চেয়ে নিষ্ঠুর সত্য অনেক বেশি সুন্দর, প্যারিসের সমস্ত সালোঁর চেয়ে একমুঠো উলঙ্গ মাটি অনেক বেশি কাব্যময়। আমরা মনে করি বেদনা সুন্দর, কেননা পরমতম অনুভূতির প্রকাশ এই বেদনার মধ্যেই,—সেই অভিজ্ঞতার আধার বাজারের বারবনিতা বা তার লম্পট প্রেমিক হোক না কেন। কুশ্রীতার ওপরে আমরা চরিত্রকে স্থান দিই,—সুলভ আরামের ওপরে স্থান দিই দুর্লভ বেদনাকে, —দুনিয়ার সমস্ত ধনদৌলতের চেয়ে মহান বলে গ্রহণ করি গণজীবনের রূঢ় বাস্তবকে। জীবনকে আমরা তার সমগ্রতা নিয়ে স্বীকার করি,—নীতির বেড়াজাল তুলে তার কোনো অংশকে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখি নে। আমাদের দৃষ্টিতে সম্ভ্রান্ত মহিলা আর বারাঙ্গনায় কোনো পার্থক্য নেই; পথের পুলিশ আর জবরদস্ত জেনারেল, রাজার মন্ত্রী আর মাঠের কৃষাণ—দুইই আমাদের চোখে সমান, কেননা প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় উভয়েরই স্থান, জীবনের রথের দড়ি উভয়েই পাশাপাশি টেনে চলেছে।

চেঁচিয়ে উঠল তুলস-লোত্রেক,—বন্ধুগণ, গ্লাস হাতে নিন। এই অপরূপ কুশ্রীতার আর এই নবীন সভ্যতার নামে আসুন আমরা এক চুমুক পান করি। সুন্দরের নবজন্ম হোক, নব সৃষ্টি হোক পৃথিবীর।

—জয় কুশ্রীতার জয়!

—ছোঃ—বললে সেজান।

সিউরাত বললে,—ছোঃ বলে ছোঃ!

৯

জুন মাসের গোড়ায় থিয়ো আর ভিনসেণ্ট তাদের নতুন বাসায় উঠে গেল। এ বাড়ির ঠিকানা—৫৪, রু লেপিক, মোমার্ত। তিনতলার ওপরে ফ্ল্যাট। তিনখানা বেশ বড়ো বড়ো ঘর, একখানা ছোট ঘর আর রান্নাঘর। বসবার ঘরের পাশের ঘরখানা থিয়োর শোবার ঘর হোলো, ভিনসেণ্টের স্টুডিয়ো হোলো আর-একটা বড়ো ঘরে, ছোট ঘরখানা তার শোবার। সুন্দর করে বাড়ি সাজাবার নেশা ছিল থিয়োর। তার চমৎকার আসবাবগুলি নতুন বসবার ঘরে

খুব মানালো এবার।

থিয়ো বললে,—তোমাকে আর এবার থেকে করম্যানের স্টুডিয়োতে গিয়ে আঁকতে হবে না।

ভিনসেন্ট বললে,—যা বলেছ, বাঁচলাম এতোদিনে। তবু অবিশ্যি আরো কিছুটা নগ্ন নারীদেহ মক্সো করার দরকার ছিল।

আসবাবপত্র নিয়ে টানাটানি করে সাজাচ্ছিল দুজনে। ভিনসেন্টের স্টুডিয়োতে একটা নরম সোফা পেতে থিয়ো বললে,—অনেক দিন তুমি একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকোনি, তাই না?

—না, কী হবে এঁকে,—যতোদিন না ঠিকমত রঙ মিশিয়ে তৈরি করতে শিখছি? তবে হ্যাঁ, এতোদিন পরে যখন আমার সত্যিকারের একটা স্টুডিয়ো হোলো—

পরদিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিনসেন্ট উঠল। নতুন স্টুডিয়োতে জানলার ধারে ঈজেলটা পেতে তাতে নতুন একটা ক্যানভ্যাস চড়ালো। কদিন আগে থিয়োর কেনা নতুন প্যালেটটা বার করল, তুলিগুলো ভিজতে দিল জলে। থিয়োর ঘুম ভাঙবার সময় বুঝে সে ব্রেকফাস্ট সাজালো, জল চড়ালো কফির।

প্রাতরাশের টেবিলে থিয়ো সহজেই টের পেল ভিনসেন্টের বুকের মধ্যে কী তুমুল উত্তেজনা জমে উঠেছে।

থিয়ো বললে,—তাহলে ভিনসেন্ট, এতোদিনে তুমি তৈরি হলে, কী বলো? পুরো তিন মাস তুমি স্কুলের শিক্ষা পেলে,—মানে করম্যানের স্কুলের কথা বলছি নে, প্যারিসের স্কুলের গত তিনশো বছর ধরে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ছবি ইয়োরোপে আঁকা হয়েছে তাও দেখলে। এবার তোমার নিজের কাজ শুরু করার পালা।

সামনের প্লেটটাকে টেনে সরিয়ে একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভিনসেন্ট,—ঠিক বলেছ, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়, এখুনি আরম্ভ করতে হবে।

—আরে বোসো বোসো, খেয়ে নাও। সময় কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? যে কথা বলছিলাম। প্রাণের আনন্দে এবার থেকে জোরসে কাজ করে যাও। কোনো ভাবনা রেখো না মনে। তোমার রঙ আর ক্যানভাস আমি পাইকারি হারে কিনে রেখে দেব, যাতে কোনো অভাব তোমার কখনো না হয়। শরীরটারও যত্ন এখন থেকে করবে। ডাক্তার দেখিয়ে দাঁতগুলোর একটা ব্যবস্থা করে ফেল এবার। আর সবচেয়ে বড়ো কথা,—ছটফট করবে না। তাড়াহুড়োর দরকার নেই, বেশ ধীরে সুস্থে কাজ করে চলো।

—বাজে কথা বোলো না থিয়ো। জীবনে কোনু কাজটা আজ পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরে সুস্থে আমি করেছি?

রাত্রিবেলা থিয়ো ফিরে দেখে, ভিনসেণ্টের অবস্থা সাংঘাতিক। সুদীর্ঘ ছ-বছরের শিল্পী-জীবনে সে সুখের মুখ একদিনের জন্যেও দেখেনি, দুর্দশার চরম অবস্থার মধ্যে বসে দিনের পর দিন ছবি এঁকে গেছে। আজ তার সব দুঃখ ঘুচেছে, স্বাচ্ছন্দ্য আর সুযোগের সবকিছু চাহিদা আজ তার করায়ত্ত। তবু হঠাৎ যেন সে পঙ্গু হয়ে গেছে,—মাথার ভেতরটা খালি, আঙুলে জড়তা,—সমস্ত দিনটা কেটেছে অসহায় অকর্মণ্য ব্যর্থতায়। মুখখানা পুঞ্জিত হতাশার আঘাতে পাণ্ডুর।

অনেক বুঝিয়ে সে-রাত্রে থিয়ো ভাইকে ঠাণ্ডা করল, ফিরিয়ে আনল তার আত্মবিশ্বাস।

কয়েক সপ্তাহ কাটল এমনিভাবেই। কোনো কাজ সে করতে পারে না, যা করে তাই ভুল হয়। শুকিয়ে উঠল শরীর, কোটরগত চক্ষু, দিনরাত্রি আগুন জ্বলছে মাথায়। থিয়ো সারাদিন পরে বাড়ি ফিরে যেন পাগল নিয়ে পড়ে। ধমক দেয়, হাত থেকে আবসাঁতের বোতল কেড়ে নেয়,—শেষ পর্যন্ত ঘরে খিল দিয়ে নিজেকে পাগলামির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে শেষ রাতটুকুর জন্যে। তাও কি রোজ পারে!

গ্রীষ্মকাল এল। রাস্তায় রাস্তায় ঝাঁঝালো সূর্যালোক। পথের ধারে ধারে রঙবাহার মৌসুমি ফুলের মেলা, সীন নদীর জল নীল থেকে আরো নীল। সময় এল পথে বার হবার। ভিনসেণ্ট পিঠে ঈজেল বেঁধে ছবির খোঁজে রোজ প্রত্যূষে বার হয়। এমনি সূর্য সে হল্যাণ্ডে দেখেনি, প্রকৃতির নতুন বর্ণাঢ্যতায় সে অবাক হয়ে যায়। সন্ধেবেলা ফিরে আসে ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি, অপেক্ষা করে থাকে কখন থিয়ো ফিরবে। সারাদিনের রৌদ্র তার মাথায় বাসা বেঁধে থাকে,—এবার থিয়ো ফিরলেই হয়!

একদিন গগাঁ এল তার রঙ তৈরিতে সাহায্য করতে। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করল,—কোত্থেকে তুমি রঙ কেনো?

—জানিনে। থিয়ো একসঙ্গে একগাদা কিনে আনে।

—বাঃ, পীয়ের ট্যাঙ্গির কাছ থেকে কেনো না কেন? সারা প্যারিসে ওর চাইতে শস্তায় কেউ দেবে না,—আর পয়সা না থাকলে বিশ্বাস করে ধারেও দেবে না ওর মতো আর কেউ।

—কে হে এই পীয়ের ট্যাঙ্গি? এর নাম তোমার মুখে আগেও যেন শুনেছি।

—আরে, ওকে চেনো না? আলাপ হয়নি এখনো? কী সর্বনাশ! আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। কোটটা চাপিয়ে নাও এক্ষুনি। রু ক্লজেলে যেতে হবে।

পথে যেতে যেতে গগাঁ পীয়ের ট্যাঙ্গির কাহিনী বলল।

—প্যারিসে আসার আগে লোকটা প্ল্যাস্টারের কাজ করত। প্যারিসে এসে শুরু করল রঙ ফেরি করার ব্যবসা। শিল্পী-পাড়ার রাস্তায় রাস্তায় রঙ ফেরি করে বেড়াত। আলাপ হোলো পিসারো, মনে আর সেজানের সঙ্গে। সকলেরই

পছন্দ হোলো ওকে, আমরা সবাই ঠিক করলাম ওর কাছ থেকেই রঙ কিনব। এদিকে সে আবার পুলিশের চাকরি নিয়েছে। কম্যুনিস্টদের সঙ্গেও যোগাযোগ। হাতে বন্দুক, কিন্তু গুলি করে মানুষ খুন করার মতো সদ্‌গুণ নেই মনে। ধরা পড়ল, বিশ্বাসঘাতক বলে শাস্তি হোলো — দু-বছরের পাথর ভাঙার কয়েদ। আমরা সবাই মিলে অনেক চেষ্টায় ছাড়িয়ে আনি।

— তারপর ?

—হাতে কয়েকটা ফ্র্যাংক ছিল। সেই পুঁজি নিয়ে রু ক্লজেলে ছোট্ট দোকান খুলল একটা। দোকানের সামনের নীল রঙটা বুলিয়ে দিল লোকেক। সেজানের প্রথম ছবি সে ঝুলিয়েছে তার ঐ রঙের দোকানে। তার পর থেকে আমরাও ওকে ছবি দিয়েছি। বিক্রির জন্যে অবশ্য নয়, ছবি বিক্রি ও প্রাণ থেকে করতে পারে না। রঙ বেচে, তাও অর্ধেকের বেশি ধারে। আসলে পীয়ের ট্যাঙ্গির মতো আর্টের ভক্ত প্যারিসে দুটি নেই। গরিব,—পয়সা দিয়ে ছবি কিনতে তো পাবে না, তাই সারা দোকানের দেয়াল জুড়ে ছবির এগজিবিশন সাজিয়েছে—চারদিকে ছবি নিয়ে সারাদিন বসে থেকেই ওর আনন্দ।

—তার মানে ? খদ্দের এলেও, ভালো দাম পেলেও বেচে না ? তাহলে তো মুশকিল।

—মুশকিল বৈকি। আসলে ছবির ও প্রেমিক। কোনো ছবিতে একবার যদি নেশা ধরে যায়, সে ছবি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া শক্ত। একদিনকার ঘটনা বলি। আমি তখন ওর দোকানে ছিলাম। দামি পোশাক পরা এক ভদ্রলোক এল। সেজানের একটা ছবি পছন্দ হোলো, জিগ্যেস করলে, দাম কতো। প্যারিসের যে-কোনো ছবিওয়ালা ষাট ফ্র্যাংকে ছবিটা বেচতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যেত। ট্যাঙ্গি ছবিটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে হাঁকলে,—ছ-শো ফ্র্যাংক। খদ্দের সরে পড়ল। দেয়াল থেকে ছবিটা নামিয়ে ট্যাঙ্গি কোলের ওপর দু-হাতে চেপে ধরল, চোখে ওর জল।

—তাহলে ওর দোকানে ছবি টাঙিয়ে লাভ ?

—ঐ তো মজা! রঙ গুঁড়োনো লোকটার পেশা, কিন্তু নজর ওর আশ্চর্য! কোন্ ছবি সত্যি ভালো তার ওর মতো বোঝদার দুটি নেই। ও যদি তোমার কোনো ছবি চায়, দিলে ধন্য হবে। বুঝবে প্যারিসের চিত্রশিল্পের দরজা তোমার জন্যে খুলল, এবার তুমি জাতে উঠলে।

এসে পড়ল রু ক্লজেল। রাস্তাটা খুব চওড়া নয়, দুধারে দোতলা তিনতলা বাড়ি, একতলার ঘরগুলো অধিকাংশই ছোট ছোট দোকান। ওপরতলাগুলো বাসিন্দাদের।

পীয়ের ট্যাঙ্গি কয়েকটা জাপানী প্রিন্ট দেখছিল। এগুলোর এখন প্যারিসের শিল্পীমহলে খুব আদর।

গগাঁ বললে,—পীয়ের, আমার একজন বন্ধুকে তোমার সঙ্গে আলাপ করাতে

নিয়ে এলাম। ভিনসেণ্ট ভ্যান গক, এও তোমারই মতো দারুণ কম্যুনিস্ট।

নরম মেয়েলি গলায় ট্যাঙ্গি বললে,—আসুন আসুন, কৃতার্থ হলাম মশিয়ে।

বেঁটেখাটো চেহারা, গোল-গাল মুখ, পোষমানা কুকুরের মতো চোখের দৃষ্টি করুণ। চওড়া-কিনার-ওয়ালা একটা খড়ের টুপি দিয়ে কপালটা ঢাকা। বেঁটে-বেঁটে হাত দুখানা, মোটা-মোটা আঙুলগুলো, শক্ত খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ডান চোখটা আধবোজা।

সলজ্জ স্বরে পীয়ের ট্যাঙ্গি ভিনসেণ্টকে শুধোলে,—সত্যি আপনি কম্যুনিস্ট, মসিয়ে ভ্যান গক?

—কম্যুনিজম বলতে তুমি ভাই কী বোঝো আমি জানি নে। তবে হ্যাঁ, এ আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক মানুষই যে কাজের সে উপযুক্ত সেই কাজ প্রাণপণে করবে আর তার বিনিময়ে যা কিছু তার প্রয়োজন তা পাবে।

হেসে উঠল গগাঁ,—বাঃ বাঃ, এ তো একেবারে সোজা হিসেব দেখছি!

ট্যাঙ্গি বললে,—আঃ পল, তুমি তো স্টক এক্সচেঞ্জ করে এসেছ। টাকাই মানুষকে পশু করে। ঠিক কি না বলো?

—হ্যাঁ, বললে গগাঁ,—কিংবা টাকার অভাব!

—না, টাকার অভাব নয়। যে অভাবে মানুষ পশুর সমান হয়, সে হোলো খাদ্যের অভাব, জীবনের সামান্যতম চাহিদাগুলির অভাব।

—ঠিক বলেছ পীয়ের ট্যাঙ্গি,—বললে ভিনসেণ্ট।

পীয়ের ট্যাঙ্গি বললে,—আমাদের বন্ধু পল যারা পয়সা করে তাদের ঘৃণা করে, আর আমরা যারা পয়সা করি নে তাদেরও ঘৃণা করে। তবে, ঐ পয়সার দলে না হয়ে আমি যে দোসরা দলে আছি, এই ভালো। দিনে পঞ্চাশ সেণ্টিমের বেশি যে খরচ করে, সে ব্যাটা শয়তান।

গগাঁ বললে,—ব্যস ব্যস, তাহলে আর আমার মতো সাধুকে,—যদিও বাবা ঠ্যালায় পড়ে সাধু বনেছি। এই দ্যাখো ভায়া, তোমার পুরোনো দেনা শোধ দিতে পারছি নে, তবু যদি আর-একটু রঙ ধার না দাও তাহলে ছবি আঁকা তো শিকেয় উঠবে।

—দেব বৈকি ভায়া, দেব বৈকি। তোমাকে ধার দেব না? তবে, ধরো এই দুনিয়ার মানুষকে আমি যদি একটু কম বিশ্বাস করতাম আর তুমি যদি আর-একটু বেশি বিশ্বাস করতে তাহলে তোমার আমার দুজনের অবস্থাই আর-একটু ভালো হোতো। ছবি দেবে যে বলেছিলে, তার কী হোলো? তোমার ছবি দু-একটা বেচেও তো রঙের দামটা কিছু কিছু তুলতে পারি!

গগাঁ চোখ টিপল অলক্ষ্যে ভিনসেণ্টকে উদ্দেশ করে। উত্তরে বললে,—নিশ্চয়! একখানা কেন, দুখানা ছবি আনব। পাশাপাশি ঝুলিয়ে রাখবে। বেশি রঙ আমি চাইনে। এই ধরো, এক টিউব কালো, এক টিউব হচ্ছে হলুদ....

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাবে বৈকি, খুব পাবে, একশোবার পাবে। পুরোনো ধারটা

শোধ দাও, তবে তো ?

তীব্র তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ। চমকে তিনজনেই পেছন ফিরে তাকাল। ভেতর দিকের দরজাটা দড়াম করে খুলে দোকানের মধ্যে ঢুকল পীয়ের ট্যাঙ্গির স্ত্রী। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল গগাঁর ওপর—

—বলি, ভেবেছ কী ? আমরা কি ব্যবসা করছি না দান খয়রাত করতে বসেছি ? কথায় কথায় কেবল কম্যুনিজমের কচকচি। ঐ কম্যুনিজম ধুয়ে খাব ? পেট ভরবে তাতে ? দাও দাও, পুরোনো পাওনাটা মিটিয়ে দাও দিকি, নইলে পুলিশ ডাকব।

গগাঁ একগাল মিষ্টি হাসি হেসে ট্যাঙ্গির স্ত্রীর সামনে নিচু হয়ে তার করচুম্বন করল। বললে,—আঃ জ্যানটিপে, আজ সকালবেলায় কী মিষ্টিই না তোমাকে দেখাচ্ছে !

এই সুন্দর চেহারার শয়তানটা কেন যে তাকে সর্বদা জ্যানটিপে বলে ডাকে তা ট্যাঙ্গির স্ত্রী বোঝে না, তবে গালভরা ডাক-নামটা শুনতে তার ভালোই লাগে। বললে,—ওঃ! ভেবেছ, এমনি মিষ্টি কথা বলে আমার কাছ থেকে পার পাবে, তাই না ? সারাটা জীবন গেল আমার রঙ গুঁড়ো করে করে, আর সেই রঙ কিনা তুমি বিনিপয়সায় চুরি করে নিয়ে যাবে। ইঃ, রঙ্গ দেখে আর বাঁচি নে !

—জ্যানটিপে, আমার সোনার জ্যানটিপে ! অতো নিষ্ঠুর হোয়ো না আমার ওপর! আমি জানি তোমার মনটা আর্টিস্টের মন। তোমার মুখেই তার ছাপ রয়েছে। আর্টিস্টের দুঃখ তুমি না বুঝলে বুঝবে কে ?

অ্যাপ্রন দিয়ে আর্টিস্টের কল্পিত ছাপটা ঘামের সঙ্গে মুছে নিল পীয়ের গৃহিণী। ঝংকার দিয়ে উঠল,—আর্টিস্ট ? ঘরে এক আর্টিস্টেই আমার রক্ষে নেই! কী বলেছে ও তোমাদের, পঞ্চাশ সেন্টিমেই দিন চলবে—তাই না? বলুক তো, আমি কোমর বেঁধে রোজগার না করলে ঐ পঞ্চাশটা সেন্টিমই বা জোটে কোথা থেকে ?

—আহা, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, মাদাম, তুমি যে কী রকম পটিয়সী ব্যবসাদারনী, সারা প্যারিস তা জানে। এ কি একটা নতুন কথা হোলো ?

মাদাম ট্যাঙ্গির রুক্ষ কর্কশ ডানহাতটায় আবার গগাঁ সাদরে চুমু খেল।

হাজার হোক স্ত্রীলোক তো ! মাদাম ট্যাঙ্গির হৃদয় গলল—বুঝেছি বুঝেছি, যেমন শয়তান তেমনি খোসামুদে ! আচ্ছা এবারকার মতো ধারে দিচ্ছি। বেশি কিন্তু নিয়ো না। পুরোনো হিসেবটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিতে হবে, সেটা কিন্তু যেন মনে থাকে।

—এই যে করুণা করলে, লক্ষ্মী জ্যানটিপে, এর প্রতিদান তুমি পাবে। তোমার একখানা পোর্টেট আমি আঁকব। সেই পোর্টেট একদিন না একদিন লুভর-এ স্থান পাবে,—অমর হব তুমি আর আমি দুজনেই।

সদর দরজায় ঘণ্টা বাজল। অপরিচিত একটি লোক দোকানে প্রবেশ করল। লোকটির জিজ্ঞাসা,—ঐ সামনের জানলার ধারের স্টিল লাইফখানা কার আঁকা?

খরিদ্দার হয়তো। ট্যাঙ্গি অল্প কথায় সারতে চাইল, বললে,—পল সেজ়ানের।

—পল সেজ়ান? নামই তো কখনো শুনিনি! যা হোক, বিক্রি আছে?

—আজ্ঞে না, মানে কিনা, দুঃখের বিষয় ওখানা আগেই—

অ্যাপ্রনটা ছুঁড়ে ফেলে ট্যাঙ্গিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে সামনে এগিয়ে এল ট্যাঙ্গির স্ত্রী। বললে,—নিশ্চয় বিক্রি আছে মশিয়েঁ! চমৎকার ছবি, তাই না? আপনার যদি পছন্দ হয় তো শস্তায় দেব।

—দাম কতো?

মাদাম হাঁকল সঙ্গে সঙ্গে,—কতো—কতো দাম ট্যাঙ্গি?

ঢোক গিলল ট্যাঙ্গি। অস্ফুট স্বরে বললে,—তিনশো—

—ট্যাঙ্গি!

—তা, ধরুন দুশো।

—ট্যাঙ্গি!!

—না, তবে কিনা ঠিক দাম এই একশো ফ্র্যাংক।

—একশো ফ্র্যাংক? বিরস গলায় খরিদ্দার বললে,—তাও আবার কেউ নাম জানে না এমনি লোকের আঁকা! অসম্ভব। গোটা-পঁচিশ ফ্র্যাংক আমি দিতে পারি।

ট্যাঙ্গির স্ত্রী জানলা থেকে ছবিটা নামিয়ে খরিদ্দারের নাকের সামনে ধরে বললে,—দেখুন মশিয়েঁ, কতো বড়ো ছবিটা! চার চারটে আপেল। এক গণ্ডার দাম একশো ফ্র্যাংক। আপনি দিতে চাইছেন মোটে পঁচিশ—ওতে চারটে হবে না, একটা হবে।

লোকটা ছবিটা নিরীক্ষণ করে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললে,—বেশ তাহলে একটা আপেলই দিন, তাতেই আমার চলবে।

—বেশ, তাই দেব, আমার আপত্তি নেই। এই একটাই নিন আপনি।

কাঁচি দিয়ে কচ-কচ করে ক্যানভাসটা কেটে একদিকের একটা আপেল আলাদা করে নিল ট্যাঙ্গির স্ত্রী। ছবির বাকি অংশটা কাগজে মুড়ে রেখে দিয়ে আপেলটা খরিদ্দারের হাতে দিয়ে পঁচিশ ফ্র্যাংক হাত পেতে নিল।

খরিদ্দার দরজার বাইরে অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল ট্যাঙ্গি,—হায় হায়! আমার এতো সাধের সেজ়ানখানা!

ট্যাঙ্গির স্ত্রী ছবির বাকি অংশটা কাউণ্টারের ওপর রাখল।

—ইঃ, ভারি আমার সাধের সেজ়ান! এর পরে আবার যদি কোনো এমনি খদ্দের তোমার সাধের সেজ়ান কিনতে চায়, আর দামেও যদি এমনি শস্তা চায়, আর-একটা আপেল কেটে দিয়ো—দাঁত বার করে হাসছ কী পল গগাঁ। তোমারও

এমনি দশা হবে। তোমার ঐ জংলি ন্যাংটো মেয়ের পালকে দেয়াল থেকে নামিয়ে পাঁচ ফ্র্যাংক করে এক-একটা আমি বেচব।

গগাঁ বললে,—মরি মরি জানৃটিপে, তোমাকে যদি স্টক একচেঞ্জে পার্টনার পেতাম তাহলে এতোদিনে সারা ব্যাংক অব্ ফ্রান্সের মালিক হতাম দুজনে!

মাদাম অন্তর্ধান করল। পীয়ের ট্যাঙ্গি ভিনসেন্টকে জিজ্ঞাসা করল,—আপনিও তো শিল্পী, তাই না মশিয়ে? আমার এখান থেকেই তাহলে রঙ-টঙ কিনবেন। দু-একটা ছবিও দেখাবেন আপনার, কেমন?

ঘাড় নাড়ল ভিনসেন্ট।—নিশ্চয়। তোমার এই জাপানী প্রিন্টগুলো কিন্তু ভারি চমৎকার। এগুলোও বিক্রির জন্যে তো?

—হ্যাঁ, এগুলোর চাহিদা খুব আজকাল। জাপানী ছবির প্রভাব আমাদের তরুণ শিল্পীদের ওপরও খুব পড়েছে।

—এ দুটো আমি নেব। দেখব স্টাডি। কতো দাম?

—এক-একটা তিন ফ্র্যাংক করে।

—আচ্ছা, আমি নিচ্ছি।—ঐ যাঃ! পকেটে তো কিছু নেই! গগাঁ, ছটা ফ্র্যাঙ্ক ধার দেবে নাকি?

—কী পাগলের মতো বলছ!

ভিনসেন্ট প্রিন্টদুটো নামিয়ে রাখল—বড়ো দুঃখিত ট্যাঙ্গি। এখন থাক।

ট্যাঙ্গি প্রিন্টদুটো ভিনসেন্টের হাতের ওপর চেপে ধরল। ভীতু-ভীতু সলজ্জ মুখে বললে,—কী যে বলেন! আপনার কাজের জন্যে এগুলো দরকার; নিয়ে যান। দাম? পরে দেবেন এখন। কী হয়েছে তাতে?

১০

থিয়ো আর ভিনসেন্ট শিল্পী-বন্ধুদের একদিন পার্টি দিল। চার ডজন সেদ্ধ ডিম, একগাদা কেক-পেস্ট্রি আর এক পিপে বীয়ার। বসবার ঘরটা তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল, বিরাট চেহারাটা নিয়ে হাঁটাচলা করছিল গগাঁ,—দেখাতে লাগল কুয়াসার মধ্য দিয়ে একটা জাহাজ যেন সমুদ্রে ভেসে চলেছে। লোত্রেক এক কোণে বসে থিয়োর সুন্দর চেয়ারের হাতলে ঠুকে ঠুকে ডিম ফাটিয়ে কার্পেটের ওপর খোলার টুকরোগুলো ছড়াতে লাগল। রুসো অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা করল, একজন মহিলা ভক্ত গন্ধমাখা চিঠিতে তাকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। সিউরাতের মাথায় আবার নতুন থিয়োরি গজিয়েছে, সেজানের সঙ্গে সে সমানে তাই নিয়ে বক-বক করতে লাগল। ভিনসেন্ট মদ চালাতে লাগল। গগাঁর অশ্লীল গল্প শুনে হাসল কিছুটা, তর্ক করল কিছুক্ষণ লোত্রেকের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত সিউরাতের কবল থেকে উদ্ধার করে আনল সেজানকে।

ছোট্ট ঘরটা উত্তেজিত হৈ হল্লায় ফেটে পড়ছে। শিল্পী জাতটাই ভয়ংকর,

—ব্যক্তিত্বে সবাই এক-এক গৌরীশংকর, পরমত-অসহিষ্ণুতায় প্রত্যেকেই কালা-পাহাড়। থিয়োর মতে প্রত্যেকেই আমি-উন্মাদ ; তর্ক করতে, লড়াই করতে, নিজের থিয়োরিকে সদম্ভে ঘোষণা করতে আর পরের মতকে ভাঙতে চুরতে সবাই ওস্তাদ।

গলা তাদের রুক্ষ, চেঁচাতে তাদের জুড়ি নেই। যা কিছু অপছন্দ করে,তারই বিরুদ্ধে চ্যাঁচানি। আর অপছন্দের তো আর শেষ নেই। ঘরটা যদি কুড়িগুণ বড়ো হোতো তাহলেও বোধহয় এইসব তরুণ শিল্পীদের সরব উচ্ছ্বাসের পক্ষে ছোটই মনে হোতো।

ভিনসেন্টেরও মেজাজে বান ডেকেছে। চেঁচাচ্ছে সেও, হাত পা নাড়ছে প্রাণপণ। থিয়োর অবস্থা অন্যরকম। এদের জন্যেই সে গুপিলসে নীরবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে—এদের প্রতিষ্ঠা করাই তার লক্ষ্য। কিন্তু এদের এই ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকির মাঝখানে পড়ে সে মারা যায়। স্বভাব তার শান্ত, অনেকটা মেয়েলি,—এই রুক্ষ কর্কশ কোলাহলে সে কষ্ট পায়, তার মাথা ধরে ওঠে।

উদ্দেশ্যবিহীন অথচ তিক্ত বিদ্রূপ হানতে লোত্রেক মহা পটু। হঠাৎ নানা কথার মাঝখানে সে ছাড়ল,—সত্যি, থিয়ো যদি ভিনসেন্টের ভাই না হয়ে বউ হোতো তাহলেই হোতো ভালো।

থিয়ো চুপ করে এক কোণে বসে ভাবছিল—দিন আসবে। একদিন না একদিন সে তার সালোঁতে একখানা সেজান ঝোলাতে পারবেই। শিল্পের এই নব জোয়ারকে কতোদিন ওরা ঠেকিয়ে রাখবে? তারপর গগাঁ, লোত্রেক, শেষ পর্যন্ত ভিনসেন্ট ভ্যান গক। সফল হবে তার স্বপ্ন।

আস্তে আস্তে সে বার হয়ে গেল ঘর থেকে। নেমে গেল একলা রাস্তায়, চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল প্যারিসের আলোকমালা।

গগাঁ তখন তর্ক জুড়েছিল সেজানের সঙ্গে। এক হাতে তার ডিম, আর-এক হাতে বীয়ারের গ্লাস, মুখে পাইপ। গগাঁর গর্ব ছিল,—পাইপ মুখে দিয়ে বীয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে প্যারিসে সে অদ্বিতীয়।

চিৎকার করে গগাঁ বললে,—তোমার ছবিগুলো একেবারে ঠান্ডা সেজান, একবারে নিষ্প্রাণ। ওগুলো দেখলে আমার রক্ত হিম হয়ে যায়। শুধু রঙ বুলোলেই কি চলে? রঙের সঙ্গে একটু আবেগ মিশিয়ে দিতে হয় ভায়া, নইলে কি ছবি।

সেজান ঠুকল উত্তরে,—মাপ করো, আমি আবেগ আঁকি নে। আবেগ মানে ভাবালুতা। ওটা আমি ঔপন্যাসিকদের জন্যে ছেড়ে রেখেছি। আমি আপেল আঁকি, দৃশ্য আঁকি,—যা আঁকবার, তাই।

—আজ্ঞে না, ভাবালুতার কথা বলছি নে, আমি বলছি অনুভূতির কথা। অনুভূতি নেই তোমার, আঁকবে কী করে? আঁকো তো খালি চোখ দিয়ে।

—তা চোখ দিয়ে ছাড়া আর কী দিয়ে লোকে আঁকে?

—অনেক কিছু দিয়ে আঁকে। গগাঁ বলে চলল,—এই যে লোত্রেক, ও আঁকে ওর পিত্তি দিয়ে। ভিনসেণ্ট আঁকে হৃদয় দিয়ে। সিউরাত আঁকে তার মন দিয়ে—সেটা অবশ্য চোখ দিয়ে আঁকার মতনই খারাপ। রুসো আঁকে তার কল্পনা দিয়ে।

—বটে? আর তুমি কী দিয়ে আঁকো?

—আমি? তা জানিনে। ভেবে দেখিনি কখনো।

—বলব আমি? লোত্রেক বললে,—তুমি আঁকো তোমার ঐটে দিয়ে।

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই। হাসি আর থামে না। আচ্ছা জব্দ গগাঁ।

হাসি থামতে না থামতেই সিউরাত একটা সোফার হাতলের ওপর চড়ে বসে চড়া গলায় শুরু করল,—মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে যে ছবি আঁকে তাকে তুমি ঠাট্টা করতে পারো, কিন্তু বুদ্ধিই পথ দেখায়। এই বুদ্ধি দিয়েই আমি আবিষ্কার করেছি ছবির আকর্ষণকে কেমন করে ডবল করে তোলা যায়।

ডুকরে উঠল সেজান,—ওরে বাবা! আবার সেই বস্তাপচা বক্তৃতা শুরু হোলো!

—চুপ চুপ, সেজান। এই গগাঁ, ছটফট করে বেড়িয়ো না, এক জায়গায় স্থির হয়ে বোসো। রুসো, তোমার কাহিনী দয়া করে থামাবে? লোত্রেক, একটা কেক এগিয়ে দাও তো!—ওই ভিনসেণ্ট, কী করছ, ভরে দাও না গেলাসটা। নাও, শোনো এবার সবাই।

লোত্রেক তবু ছাড়ল না,—ব্যাপার কী সিউরাত? সেই যে একবার তোমার ছবির ওপর একটা লোক থুথু ফেলেছিল, তার পর থেকে এতোটা উত্তেজিত হতে তো কোনোদিন দেখিনি তোমাকে?

—শোনো। আজকের দিনের চিত্রশিল্পের মূল জিনিসটা কী? আলো, তাই না? বস্তুর কোনো রঙ নেই। বস্তুর ওপর আলোর বিকিরণে যে রঙ ফুটে ওঠে সেই রঙই ছবির রঙ। বস্তুকে ভাগ করো বিন্দুতে, তাহলে ছবি দাঁড়াচ্ছে অসংখ্য বর্ণবিন্দুর সমষ্টি, তাই নয়?

—ও বাবা! তোমার বিন্দু-প্রকরণ থামাও, ছবির কথা বলবে তো বলো!

—সত্যি, জর্জেস, আবার পণ্ডিতি শুরু করলে! আর যে পারিনে দাদা!

—চুপ চুপ, গোলমাল কোরো না, বলছি। আচ্ছা, ছবির কথাই যদি বললে, ধরো ছবি একটা আঁকলাম। সেটা পড়ল গিয়ে কোনো মূর্খের হাতে, সে সেটাকে বাঁধালো একটা বীভৎস সোনালি ফ্রেমে—ছবিটার যা কিছু সৌন্দর্য ছিল তা ফ্রেমে এঁটেই খতম করে দিলে। অতএব এই কথাটা মনে রাখবে যে, ছবি কখনো ফ্রেমে না বাঁধিয়ে ছাড়বে না। ফ্রেমটা রঙ করবে নিজের হাতে, যাতে করে ঐ ফ্রেমটাও ছবিরই অঙ্গ হয়ে ওঠে।

—তারপর সিউরাত, থামলে কেন? ছবিটা নিশ্চয়ই কোনো ঘরে টাঙানো হবে। দেয়ালের রঙটা যদি ঠিক না হয়, তাহলে ছবিও গেল, ফ্রেমও গেল।

তাহলে ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল রঙ করাও ধরব নাকি ?

সিউরাত বললে,—নিশ্চয় ! চমৎকার আইডিয়া !

—তারপর ? ঘরটা যে বাড়ির সেই বাড়িটা ?

—আর-একটু এগোও। বাড়িটা যে শহরে সেই শহরটা—তাই বা বাদ যায় কেন ?

—জ্বালালে জর্জেস, কী যে তোমার সব বিদঘুটে আইডিয়া !

—ঐ ! বুদ্ধি খাটিয়ে ছবি আঁকব বললে ঐ রকম বিদঘুটে খেয়ালই মাথায় গজায় !

সিউরাত আকাশে দুহাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল,—আঁকবে কোথা থেকে বুদ্ধি দিয়ে ? মাথার খুলির নিচে কিছু থাকলে তো ? যতো সব গোমুখ্যুর দল !

—দ্যাখো দ্যাখো, মুখখানা দ্যাখো জর্জেসের। বুদ্ধিওয়ালার গালফুলো মুখখানা একবার সবাই দেখে নাও চট করে।

এতক্ষণে ভিনসেণ্ট গলা চড়াল,—আচ্ছা, এই কথাটা আমি বুঝিনে, নিজেদের মধ্যে এমনি মারামারি করে কী লাভ হয় ! আমরা কি সবাই মিলে মিশে একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করতে পারিনে ?

গগাঁ বললে,—ব্যাস, চুপ, এইবার সত্যি-সত্যি চুপ সবাই। ভিনসেণ্ট আমাদের মধ্যে খাঁটি কম্যুনিস্ট, সবাই শোনো তার কথা।

ভিনসেণ্ট বললে,—আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে। আসলে ভেবে দ্যাখো, আমরা কারা ? কেউ না, কোনো দর নেই আমাদের। মানে, ডেগা, সিসলে আর পিসারো আমাদের পথপ্রদর্শক। ওদের ছবি লোকে স্বীকার করেছে, বড়ো বড়ো গ্যালারিতে টাঙিয়েছে। ওরা সব বড়ো-বড়ো রাস্তার শিল্পী। বেশ, আমরা হলাম গলিঘুঁজির ছবি-আঁকিয়ে। তাই বলে আমাদের এগজিবিশন থাকবে না কেন ? আমাদের ছবির গ্যালারি আমরা নিজেরাই করে নেব,—ছোট ছোট রেস্তোরাঁয়, শ্রমিকদের কারখানায়। প্রত্যেকে আমরা ধরো পাঁচখানা করে ছবি দেব, নিত্য নতুন জায়গায় টাঙানো হবে। সাধারণ লোক যে দাম দিতে পারে, সেই দামেই বেচব। তাছাড়া ছবিগুলো সর্বদা লোকের চোখে পড়বে, যারা গরিব তারা ভালো ছবি দেখে প্রসন্ন হবে।

ঔৎসুক্যে রুসোর চোখদুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠল,—বললে,—চমৎকার !

সিউরাত মুখ গোঁজ করে বললে,—একটা ছবি শেষ করতে আমার এক বছর লাগে। তুমি ভাবছ পাঁচ কড়ির বিনিময়ে কোনো বোকা কারিগরকে আমি তা বেচব ?

—বড়ো ছবি না দাও, তোমার ছোট ছোট স্টাডি দিতে পারো।

—কিন্তু ধরো সে সব রেস্তোরাঁ যদি আমাদের ছবি না টাঙায় ?

—আলবৎ টাঙাবে। লোকসানটা কী তাদের ? লাভই বরং, সুন্দর দেখাবে দেয়ালগুলো।

—কিন্তু এসবের ব্যবস্থা করবে কে ? নতুন নতুন রেস্তোরাঁ জোগাড়ের ভার থাকবে কার ওপর ?

উল্লসিত ভিনসেণ্ট বললে,—সেও আমি ভেবে রেখেছি। পীয়ের ট্যাঙ্গি হবে আমাদের ম্যানেজার। সে রেস্তোরাঁ ঠিক করবে, ছবি টাঙাবে, ছবি বিক্রির টাকা আদায় করবে আমাদের হয়ে।

—ঠিক বলেছ। পীয়ের ট্যাঙ্গিই এ কাজের উপযুক্ত লোক।

— রুসো, লক্ষ্মীটি, দৌড়ে গিয়ে ট্যাঙ্গিকে ডেকে নিয়ে এসো তো। বলো জরুরি দরকার।

সেজান বললে,—তোমাদের এই স্কীম থেকে আমাকে বাদ দাও।

চটে উঠল গগাঁ। বললে,—কেন ? সাধারণ লোকের চোখ লেগে লেগে কি তোমার ছবি ক্ষয়ে যাবে ?

—না, তার কারণ আমি এখানে থাকব না। মাসখানেকের মধ্যেই আমি এক্স্-এ চলে যাচ্ছি।

ভিনসেণ্ট অনুরোধ করলে,—বেশ তো, তার আগে একটিবার আমাদের সঙ্গে চেষ্টা করো। তারপর যেতে চাও তো যেয়ো।

—বেশ, রাজি আছি।

পীয়ের ট্যাঙ্গি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল। রুসো তাকে ব্যাপারটার আভাস দিয়েছে মাত্র, তাতেই ঔৎসুক্যে আর উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে সে।

পরিকল্পনাটা পুরোপুরি শুনে ট্যাঙ্গি বললে,—নিশ্চয়। রেস্তোরাঁও আমার চেনা আছে। নরভিনস্ রেস্তোরাঁ, মালিক আমার বন্ধু। তার খালি দেওয়ালে আমরা ছবি টাঙালে খুশি বই অখুশি হবে না। ওখানে প্রদর্শনী শেষ করে আর-একটা রেস্তোরাঁয় আমরা যাব। রু পিয়েরে আর-একটাকেও আমি চিনি। সারা প্যারিসে হাজারটা রেস্তোরাঁ আছে, ভাবনা কী ?

গগাঁ শুধোলে,—তাহলে কবে থেকে শুরু ?

ভিনসেণ্ট বললে,—দেরি কিসের ? কাল থেকে শুরু হতে আপত্তি কী ?

ট্যাঙ্গি বললে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল থেকেই। কাল তোমরা সবাই আমার ওখানে তোমাদের ছবি পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমি বিকেলবেলা সেগুলো রেস্তোরাঁ নরভিন্সে টাঙিয়ে দেব। লোকেরা যখন ডিনার খেতে আসবে রেস্তোরাঁর চেহারা দেখে অবাক হয়ে যাবে। কী রকম বিক্রি হবে দেখো, ঠিক একেবারে যেন ঈস্টারের মোমবাতির মতো !—একি ? গ্লাসটা ধরব ? কী আছে এতে ? বীয়ার ? চমৎকার ! ভদ্রমহোদয়গণ, ভ্যান গক বলেছেন আমরা খালি গলির শিল্পী, তাই না ? তাই বেশ, পেতিত বুলেভার্দের কম্যুনিস্ট আর্ট-ক্লাবের জয় হোক ! সফল হোক তার প্রথম প্রদর্শনী।

পরদিন দুপুরবেলা ট্যাঙ্গি ভিনসেণ্টের কাছে এল।

বললে,—নরভিনসে ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। তবে, কথা আছে, ডিনারটাও ওখানেই খেতে হবে এই শর্তে। রাজি তো?

—আপত্তি কী?

—তোমাকে নিয়ে সকলকেই বলা হোলো। সকলেই রাজি। তাহলে ঠিক চারটে নাগাদ আমার দোকানে আসবে। একসঙ্গে সবাই যাব। সাড়ে চারটের মধ্যে ছবিগুলো টাঙিয়ে ফেলতে হবে।

বিকেলবেলা পৌঁছে দেখে ট্যাঙ্গি এরই মধ্যে একটা হাতগাড়ি ছবি-বোঝাই করে ফেলেছে। দলের সবাই তৈরি।

পীয়ের হাঁকল,—রেডি, এবার চলো সবাই।

ভিনসেণ্ট বললে, —গাড়িটা আমি ঠেলব ট্যাঙ্গি।

—না না, এ আমার কাজ। আমি যে ম্যানেজার।

ছবিভর্তি গাড়ি ঠেলে চলল ট্যাঙ্গি, পেছনে শিল্পীর দল। প্রথমে পাশাপাশি গগাঁ আর লোত্রেক,—একজন যেমন লম্বা, আর-একজন তেমনি বেঁটে। তারপর সিউরাত আর রুসো। সবার পেছনে সেজান আর ভিনসেণ্ট।

বেশ কিছুটা চড়াই রাস্তা ওঠবার পর গগাঁ বললে,—ওহে ট্যাঙ্গি, এবার আমি একটু ঠেলি। গাড়ি-ভর্তি সব অমর প্রতিভার নিদর্শন, হাত লাগিয়ে আমিও একটু জন্ম সার্থক করি।

—খবর্দার! ট্যাঙ্গি চেঁচিয়ে উঠল,—ছুঁয়োনা বলছি! বিপ্লবের নিশান নিয়ে আমি চলেছি—প্রথম গুলিটা আমার বুকে এসেই বিঁধুক।

কৌতুককর শোভাযাত্রা। হাত-গাড়িতে আর্টের পাঁজা, পেছনে পদাতিক শিল্পীর দল। হাসে হাসুক পথের লোক, লজ্জা কী তাতে? সংকোচে সঙ্কুচিত হবার পাত্রই নয় কেউ। চলেছে হৈ হৈ করতে করতে।

চিৎকার করে বললে রুসো,—ওহে ভিনসেণ্ট, আজ কী পেয়েছি জানো? আবার একখানা চিঠি সেই মহিলাটির কাছ থেকে! খামে ভুরভুরে গন্ধ!

দৌড়ে ভিনসেণ্টের পাশে গিয়ে তার নাকের কাছে খামটা ধরল। উত্তেজনায় থরোথরো মুখখানা।

রুসো আবার ফিরে গেল সিউরাতের পাশে। লোত্রেক ভিনসেণ্টকে কাছে ডাকল। কানে কানে বললে,—রুসোর প্রেমিকাটি কে জানো?

—না। কী করে জানব?

খুক-খুক করে হাসল লোত্রেক। বললে,—গগাঁ। গগাঁই ওকে প্রেমের স্বাদ জোগাচ্ছে। বেচারি আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে জোটাতে পারেনি। বুক-জোড়া তৃষ্ণা নিয়ে সারাজীবন ঘুরছে। গগাঁ এখন ওর নামে কয়েকটা চিঠিপত্র

ছাড়বে, তারপর অভিসারের দিন আসবে। মেয়েমানুষ সেজে রুসোকে নিয়ে তুলবে ওপাড়ার একটা খালি ঘরে। ফুটো-ওয়ালা জানলার ফুটো দিয়ে আমরা দেখব রুসো ভায়া কেমন প্রথম প্রেমের পাঠ নেয়।

—কী কাণ্ড। ছি ছি গগাঁ, তুমি একটা শয়তান।

—আরে চটো কেন? আসলে ঠাট্টা। ঠাট্টায় আবার দোষ আছে নাকি?

শেষ পর্যন্ত শোভাযাত্রা পৌঁছল নরভিনস্ রেস্তোরাঁর সামনে। সরু গলিতে ছোট্ট ভোজনাগারটি। একপাশে মদের দোকান। নীল রঙের দেয়াল, ঘর জুড়ে গোটা-কুড়ি টেবিল, তাতে লাল সাদা চেক-কাটা কাপড়ের টেবিল-ক্লথ। এক কোণে মালিকের বসবার জন্যে উঁচু ঘেরা জায়গা।

কোন্‌খানে কার কোন্ ছবিটা টাঙানো হবে তাই নিয়ে তুমুল তর্ক শুরু হোলো। পীয়ের ট্যাঙ্গির মাথা খারাপ হবার জোগাড়, রেস্তোরাঁর মালিক চটেই আগুন,—ডিনারের সময় ঘনিয়ে এসেছে, একটু পরেই খদ্দেররা আসতে শুরু করবে।

পীয়ের ট্যাঙ্গি ভিনসেণ্টের কাছে এল। বললে,—নাও দুটো ফ্র্যাংক—আর কিছু পয়সা নিয়ে এদের সব ঐ মদের দোকানে টেনে নিয়ে যাও। পনেরো মিনিট হাতে পেলে আমি সব ছবি টাঙিয়ে ফেলব।

বুদ্ধিটা কাজে লাগল। মদের দোকানে গলা ভিজিয়ে যখন সবাই রেস্তোরাঁয় ফিরে এল, তার মধ্যে সব ছবি দেয়ালে উঠে গেছে। আর ঝগড়ার উপায় নেই। সবাই দরজার সামনে একটা বড়ো টেবিল জুড়ে বসল। পীয়ের ট্যাঙ্গি দেয়ালে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে—এসব ছবি জলের দামে বিক্রি হবে। মালিকের সঙ্গে কথা বলুন।

সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। ডিনার আরম্ভ হতে আর আধঘণ্টা দেরি। স্কুলের মেয়ের মতো মনে মনে অস্থির সকলে—কখন দরজা ঠেলে প্রথম খরিদ্দারটি আসবে। রেস্তোরাঁর ছবিভর্তি নতুন চেহারাটা দেখে হাঁ হয়ে যাবে না।

সিউরাতের কানে কানে গগাঁ চুপি-চুপি বললে,—ভিনসেণ্টের অবস্থাটা দ্যাখো। এই বুঝি প্রথম স্টেজে নামছে?

লোত্রেক বললে,—একটা পুরো ডিনার বাজি রাখছি গগাঁ,—তোমার ছবির আগে আমার ছবি বিক্রি হবে।

—আচ্ছা, আমিও রাখলাম।

সেজান বললে,—ইঃ, ভারি তো শিল্পী!

—অ্যাঁ! কার গলা? সেজান নাকি? তা তোমার সঙ্গে একটা কেন, তিন-তিনটে ডিনার বাজি রাখতে রাজি আছি। তোমার এক, আমার তিন।

লাল হয়ে উঠল সেজান। হাসল আর সবাই।

ভিনসেণ্ট বললে,—একটা কথা সবাই মনে রেখো। বিক্রির ভারটা ট্যাঙ্গির ওপর। নিজেরা যেন কেউ দরাদরি করতে যেয়ো না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু আসছে না তো কেউ! কটা বাজে?

ঘড়ির কাঁটা চলল ছটার দিকে। আর কোলাহল নেই। সবাইকার নিশ্চল চোখ ঘড়ির কাঁটারই মতো দরজার দিকে।

অস্ফুট স্বরে সিউরাত বললে,—প্যারিসের সমস্ত সমালোচকদের সামনে ছবি মেলে ধরতেও আমার এমনিধারা লাগেনি!

—চুপ চুপ, ফিসফিসিয়ে উঠল রুসো,—ঐ দ্যাখো রাস্তা পার হচ্ছে একটা লোক, ঢুকবে বোধহয়।

ঢুকল না, চলে গেল পাশ কাটিয়ে। রেস্তোরাঁর ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজল। শেষ ঢং-টার সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে ঢুকল একজন। নোংরা পোশাক, মুখের ও দেহের প্রতিটি রেখায় দিনান্তের ক্লান্তির সুস্পষ্ট পরিচয়।

ভিনসেণ্ট চাপা গলায় ঘোষণা করল,—এইবার!

লোকটি সোজা গিয়ে বসল কোণের একটা টেবিলে। মাথার টুপিটা ছুঁড়ে রাখল আর-একটা চেয়ারে। ঝোল-রুটি এল, মাথা নিচু করে চিবুতে লাগল। একবার মুখ তুলে দেয়ালগুলির দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

ভিনসেণ্ট মনে মনে বললে,—আশ্চর্য!

এবার ঢুকল আর দুজন শ্রমিক একসঙ্গে। টেবিলে মুখোমুখি বসেই আর কোন দিকে না তাকিয়ে দিনের কোন একটা ব্যাপার নিয়ে তারা তুমুল বচসা শুরু করল।

ক্রমে ঘর ভর্তি হতে লাগল। মেয়ে পুরুষ দুইই আসতে লাগল। অধিকাংশই পুরোনো খরিদ্দার, টেবিলগুলো পর্যন্ত চেনা। ক্লান্ত শরীরে চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপর খানা আসামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে, একমনে চিবোয়, খাওয়া শেষ হলে পাইপ ধরিয়ে সন্ধেবেলাকার কাগজে মুখ ঢাকা দেয়। চোখ তুলে ওপর দিকে তাকাবার সময় কোথায়?

সাতটা নাগাদ ওয়েটার এসে জিজ্ঞাসা করল,—আপনাদের এখন দেব কি?

উত্তর দিল না কেউ।

একটু পরে একজোড়া স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে ঢুকল। কোণের আলনায় টুপিটা রাখার সময় পুরুষটির চোখে পড়ল জঙ্গল থেকে উঁকি মারা বাঘের একটা মুখ। রুসোর সেই ছবিখানা। স্ত্রীলোকটিকে সে দেখালো। শিল্পীদের টেবিলে তখন তটস্থ অবস্থা। রুসো তো উঠে দাঁড়ায় আর-কি। মেয়েটি নিচু গলায় কী যেন বলতেই দুজনে হাসল। ব্যস, এই পর্যন্ত। তারপর মুখোমুখি টেবিলে বসে মাথা নিচু করে দুজনে খেতে শুরু করল গোগ্রাসে।

পৌনে আটটার সময় দ্বিতীয়বার আর জিজ্ঞাসা না করেই ওয়েটার সুপের পাত্র বসিয়ে গেল শিল্পীদের সামনে। স্পর্শ করল না কেউ। যখন ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল তখন ওয়েটার আবার পাত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল। এবার এল মাংসের কোর্মা। একমাত্র রুসো ছাড়া কারো মুখে রুচল না এমনি সুখাদ্য।

সকলেই, এমনকি সিউরাত পর্যন্ত বসে বসে মদ টানল চুমুকের পর চুমুক। তাও বিস্বাদ। চারদিকে খাবারের আর মেহনতি মানুষের ঘামের গন্ধ।

একে-একে খরিদ্দাররা দাম মিটিয়ে বিদায় নিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওয়েটার বললে,—মাপ করবেন, কিন্তু সাড়ে আটটা বেজে গেছে, এইবার বন্ধ করতে হবে।

ট্যাঙ্গি দেয়াল থেকে ছবিগুলো একে-একে নামিয়ে বাইরে ঠেলাগাড়িতে ভর্তি করল। তারপর গাড়িটা ঠেলে নিয়ে চলল ফিরতি রাস্তায়।

১২

মোড়ে মোড়ে তখন আসন্ন বিষণ্ণ অন্ধকার।

গুপিল কোম্পানির পুরোনো আদর্শবাদ আর নেই, কাকা ভিনসেন্ট ভ্যান গকের দিন গত। এখনকার লক্ষ্য শুধু বিক্রির দিকে—বাজে ছবি বেচা আর বেশি লাভ করা। ছবি যেন আর ছবি নয়, জুতোর দোকানের বা মাছের বাজারের মাল। থিয়োর এটা লাগে সবচেয়ে বেশি।

ভিনসেন্ট বলে,—থিয়ো, নতুন মনিবদের আর কতো তোষণ করবে? ছেড়ে দাও না তোমার চাকরি।

ক্লান্ত গলায় থিয়ো উত্তর দেয়,—সব ছবির ব্যবসাদারই সমান আজকাল। এতোদিন আছি, কোথায় যাব এদের ছেড়ে?

—চুলোয় যাবে। দিনের পর দিন ওদের ওখানে তুমি শুকিয়ে উঠছ। ছাড়তেই হবে তোমার এই সর্বনেশে চাকরি। আমার কথা? ভেবো না ভেবো না, ঠিক ভেসে থাকব আমি। আচ্ছা থিয়ো, সারা প্যারিসে তরুণ ছবিওয়ালাদের মধ্যে সবচেয়ে তোমার নাম। নিজে একটা দোকান করো না কেন তুমি?

—নাঃ, আবার গোড়া থেকে সেই আলোচনা করতে হবে তোমার সঙ্গে?

—না, শোনো থিয়ো। চমৎকার একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে। এস আমরা সবাই মিলে একটা কমুনিস্ট আর্টের দোকান খুলি। আমাদের সব ছবি আমরা তোমাকে দেব, তুমি দোকান চালাবে,—আর যা লাভ হবে সকলে সমান ভাগে ভাগাভাগি করে নেব। প্যারিসে একটা দোকান খোলার মূলধন শিল্পীরাই জোগাড় করে দেবে, আর গ্রামে শস্তায় সবাই এক জায়গায় বসবাস করবে। কতো কম খরচে থাকা যাবে ভাবো! আর এমনি একটা দোকান খুললে নতুন নতুন ছবি-বিলাসীদের খদ্দের করা যাবেই।

—ভিনসেন্ট, ভয়ংকর মাথা ধরেছে আমার, শুতে চললাম এখন।

—ঘুমুতে চাও তো রবিবার আছে। আজ আমার কথা মন দিয়ে শোনো। —কী, জামা কাপড় ছাড়বে? তা ছাড়ো, কিন্তু কানটা আমার কথায় রাখো। গুপিলের চাকরিতে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, এদিকে প্যারিসের এতোগুলো তরুণ

শিল্পী তোমার হাতের মুঠোয়,—তবুও এ সুযোগ তুমি নেবে না ?

পরদিন সন্ধ্যাবেলা লোব্রেক আর পীয়ের ট্যাঙ্গিকে নিয়ে ভিনসেণ্ট বাড়ি ঢুকল। থিয়ো আশা করেছিল ভিনসেণ্ট হয়তো রাত করেই ফিরবে, সে আশায় পড়ল জলাঞ্জলি।

পীয়ের ট্যাঙ্গির ছোট ছোট চোখদুটো উৎসাহে পিট্‌-পিট্‌ করছে। থিয়োর হাত চেপে ধরে সে বলে উঠল,—মশিয়ে ভ্যান গক, অপূর্ব আইডিয়া! এমনটি আর হয় না! কী মহৎ, কী বিরাট! করতেই হবে আপনাকে! আমার দোকান তুলে দিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকব। রঙ গুলব, ক্যানভাস ইস্ত্রি করব, ছবি বাঁধাই করব আমি। শুধু দুবেলা দুটি খাবার আর থাকবার আশ্রয়টুকু দেবেন। আর কিছু চাইনে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের বইটা নামিয়ে রাখল থিয়ো। বললে,—আইডিয়া তো ভালো, কিন্তু টাকা কোথায় পাব ? দোকান খোলা, বাড়ি ভাড়া নেওয়া, খোরাক জোগাড় করা—এসব হবে কোত্থেকে ?

চেঁচিয়ে উঠল ট্যাঙ্গি,—এই তো আমি এনেছি! ধরুন, ধরুন হাত পেতে। দুশো কুড়িটা ফ্র্যাংক,—এতোদিন যা কিছু জমিয়েছি, সব। এই দিয়ে শুরু করুন।

থিয়ো বললে,—লোব্রেক, তুমি তো বেশ বিচক্ষণ লোক একজন—বলো তো, এমনি পাগলামির কোনো মানে হয় ?

—পাগলামি কেন ? পরিকল্পনাটা খুব ভালোই লাগছে। পুরোনো সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই না করে এখন তো আমরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করছি। কিন্তু একবার যদি আমরা সংঘবদ্ধ হতে পারি—

—বেশ তো। তোমার তো অনেক পয়সা। আরম্ভের খরচটা তুমিই দাও।

—তাহলে কী করে হবে ? পরিকল্পনার মূলমন্ত্র হোলো সাম্য। আমি দেব—তবে, ঐ ট্যাঙ্গি যা দিয়েছে তাই,—দুশো কুড়ি ফ্র্যাংক।

—পরিকল্পনা না হাতি। ব্যবসার বাজারের কিছুটা ধারণা যদি তোমাদের থাকত—

আবার থিয়োর দুহাত চেপে ধরল ট্যাঙ্গি—মশিয়ে ভ্যান গক, অনুরোধ করছি আপনাকে, এমন আইডিয়াটাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দেবেন না। এটা আপনাকে সফল করে তুলতে হবে।

ভিনসেণ্ট বললে,—আর তোমার পালাবার রাস্তা নেই থিয়ো, বাঁধা পড়েছ অষ্টে-পৃষ্ঠে। আমরা সবাই মিলে যতোটা সম্ভব টাকা তুলে তোমার হাতে দিচ্ছি। তোমাকে কর্তা বানাচ্ছি আমাদের। গুপিলের কথা ভুলে যাও। ওখানকার কাজ তোমার খতম। এখন থেকে তুমি আমাদের কম্যুনিস্ট আর্ট কলোনির ম্যানেজার।

ঘর্মাক্ত কপালটায় থিয়ো একবার হাত বুলিয়ে নিল, ভালো করে কচলে

নিল চোখদুটো।

বললে,—কলোনি না চিড়িয়াখানা! মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—তোমাদের মতো বুনো জানোয়ার চরিয়ে আমি বেড়াচ্ছি দিনের পর দিন।

পরদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে থিয়ো দেখে, মস্ত মিটিং বসেছে। শিল্পীদের ভিড়। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার, হট্টগোলে প্রায় চিড় ধরে ঘরের দেয়ালে। হাল্কা একটা টেবিলের ওপর চড়ে বসেছে ভিনসেন্ট, সে-ই এই সভার মূল গায়েন।

ঢুকতেই সে শুনল ভিনসেন্টের চিৎকার,—না না, মাইনে আবার কী? টাকা ছোঁবে না কেউ অন্তত একটি বছর। থিয়ো শুধু ছবি বেচবে; আমরা পাব আহার, আশ্রয় আর ছবি আঁকার জিনিসপত্র।

সিউরাত হাঁকলে,—আর যাদের ছবি বিক্রি হবে না কোনকালে? কতোদিন তাদের আমরা পুষব?

—যতোদিন তারা আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়, একসঙ্গে কাজ করতে চায়।

গগাঁ বললে,—চমৎকার! সত্যিকারের চিড়িয়াখানা! সারা ইয়োরোপের যতো অ্যামেচারের দল দোরগোড়ায় ভিড় করে আসবে তাহলে! এমন তোফা আরাম আর নিখরচায় মিলবে কোথায়?

থিয়োর ওপর প্রথম চোখ পড়ল পীয়ের ট্যাঙ্গির। চিৎকার করে উঠল সে,—এই তো মশিয়ে ভ্যান গক এসে গেছেন,—জয়, আমাদের ম্যানেজারের জয়!

—জয়, ম্যানেজারের জয়! বন্ধুপ্রবর থিয়ো ভ্যান গকের জয়!!

প্রত্যেকের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলবার আছে। রুসোর প্রশ্ন, কলোনিতে গিয়ে সেখানে সে বেহালা বাজানো শেখাতে পারবে কি না,—কেননা সেটা তার উপরি আয়ের পথ। আঁকোয়েতিন বললে, —তাড়াতাড়ি চলো, কেননা তার তিনমাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। সেজানের মত,—কারো যদি অতিরিক্ত নিজস্ব টাকা থাকে, যে টাকা খরচ করার অধিকারও থাকবে। ভিনসেন্ট বললে,—না, এ হলে সাম্যবাদের মৃত্যু। সবাইকার ভাগ সমান, আলাদা কিছু কারুর থাকলে চলবে না। লোত্রেক জানতে চায় কলোনিতে থাকতে ইচ্ছেমতো মেয়েমানুষ আমদানি করা চলবে কি না, সেখানেও সাম্যবাদ কি না? গগাঁ বললে,—প্রত্যেকের অন্তত মাসে দুটো করে ছবি আঁকা চাইই চাই। সিউরাত বললে,—মাপ করো তাহলে আমাকে, আমার একটা ছবি শেষ করতে এক বছর লাগে।

পীয়ের ট্যাঙ্গি নতুন একটা প্রশ্ন তুলল,—আচ্ছা, রঙ আর ক্যানভাসও কি প্রত্যেকে হপ্তায় সমান ভাগে পাবে?

ভিনসেন্ট বললে,—তা কেন? সত্যিকারের যার যতোটা আঁকার জিনিস-পত্র দরকার ঠিক ততোটাই পাবে। খাবারের মতো আর-কি।

—বেশ, কিন্তু বাড়তি টাকাটা কী হবে? মানে, ছবি বিক্রি শুরু হবার

পর টাকা তো আসবে, লাভ তো হবে,—লাভটা পাবে কে ?

—কেউ না। যেই হাতে কিছু টাকা জমবে, অমনি আর-একটা বাড়ি নেব ব্রিটানিতে। আরো কিছু জমলে প্রভেন্সে। এমনি করে আমাদের কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েই চলবে। ঘুরে ঘুরে বেড়াব আমরা যখন যেখানে খুশি।

—আচ্ছা, রেলভাড়াটা কে দেবে শুনি ? সেও কি ঐ লাভ থেকেই ? তাছাড়া কে কতোটা বেড়াবে, তার হিসেব করবে কে ?

—ধরো, খুব ভালো সময়ে কোনো একটা কেন্দ্রে শিল্পীদের গাদাগাদি ভিড়। কে জায়গা পাবে, আর কে জায়গা না পেয়ে অন্য কেন্দ্রের সন্ধানে রেলে চাপবে—এর হুকুম দেবে কে ?

—থিয়ো আমাদের ম্যানেজার, থিয়ো জবাব দিক এসব প্রশ্নের। এই ধরো না কেন—সভ্য হবে কারা, নতুন সভ্য নেওয়া হবে কি না, যা খুশি আঁকবার স্বাধীনতা থাকবে কি না, যার যেমন খুশি মডেল আনতে পারবে কি না—এসব এখুনি ঠিক করে নিতে হবে বৈকি।

সভা ভঙ্গ হোলো শেষ রাত্রে। থিয়ো শুতে গেল চারটের সময়—ভিনসেন্ট পীয়ের ট্যাঙ্গি প্রভৃতি সবচেয়ে উৎসাহীদের নির্দেশ কানে নিয়ে, যে আগামী মাসের পয়লা তারিখেই তাকে গুপিলস্-এর চাকরিতে নোটিশ দিতে হবে।

দিন যায়, উত্তেজনা বাড়ে। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। সু-প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা যেমন সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল, তেমনি মুখর হোলো তরুণ শিল্পীরা উৎসাহদীপ্ত আলোচনায়। ভিনসেন্ট দিনরাত পাগলের মতো বকতে আর খাটতে লাগল। ব্যবস্থার আর শেষ নেই,—হাজার রকমের ব্যবস্থা। —কোথা থেকে টাকা আসবে, কোথায় দোকান করা হবে, কী রকম দাম ধরা হবে এক-একটা ছবির, কারা কারা সভ্য হবে, গ্রামের আস্তানা কোথায় হবে, কারা পরিচালনা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। থিয়ো অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও শেষ পর্যন্ত এই উত্তেজনায় গা ভাসিয়ে দিলে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তার ফ্ল্যাটে ভিড় আর ভিড়। খবরের কাগজের রিপোর্টার আসে খবর কুড়োতে, চিত্র-সমালোচকরা আসে এই নতুন আলোড়ন নিয়ে আলোচনা করতে, সারা ফ্রান্সের যতো তরুণ শিল্পী প্যারিসে পৌঁছে আসে সভ্য হবার আবেদন জানাতে।

থিয়ো যদি এই নব-আন্দোলনের রাজা, ভিনসেন্ট তাহলে রাজমন্ত্রী। সে-ই আসল সংগঠক। অসংখ্য পরিকল্পনা, প্রচারপত্র, হিসেব, আবেদন, ইতিহাস সে বার করতে লাগল,—সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দিল এই নতুন কম্যুনিস্ট আর্ট কলোনির খবর।

এতো কাজের মধ্যে একটি কাজ সে ভুলে গেল,—সে কাজ ছবি আঁকার কাজ।

প্রতিষ্ঠানের তহবিলে প্রায় তিন হাজার ফ্র্যাঙ্ক জমা হোলো। শিল্পীরা তাদের শেষ কপর্দক পর্যন্ত তুলে দিল। বুলেভার্দ ক্লিচিতে একটা শিল্পমেলা বসল,

প্রত্যেক শিল্পী সেখানে নিজের নিজের ছবি বিক্রি করতে বসল। ইয়োরোপের সব জায়গা থেকে চিঠি আসতে লাগল, এবং কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যও। প্যারিসের শিল্প-বণিকরাও অনেকেই ভিক্ষার ঝুলিতে কিছু কিছু ফেলতে লাগলেন। এতো সব ব্যাপারের প্রকৃত সম্পাদক বলতে ভিনসেণ্ট, কোষাধ্যক্ষ বলতেও ভিনসেণ্ট।

থিয়ো জোর করল, পাঁচ হাজার ফ্র্যাংক সংগ্রহ হবার আগে সে নামতে রাজি নয়। রু ট্রঁশেট একটা চমৎকার দোকানঘর সে ইতিমধ্যেই দেখে রেখেছে। মফঃস্বলে একটা বিরাট বাড়িও খুঁজে বার করেছে ভিনসেণ্ট, স্বল্পতম ভাড়ায় যেটা মিলবে। সভ্যনামলোভীদের আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ছবিও আসতে লাগল, রু লোপেকের ঘর-কখানায় হাঁটা-চলার জায়গা আর রইল না। এত স্বল্প পরিসরের মধ্যেই ঐ ছোট্ট ফ্ল্যাটটিতে প্রতিদিন শত-শত লোকের আনাগোনা। থিয়োর অতো সাধের আসবাবগুলোর আর কিছু রইল না। বাড়িওয়ালা এতো হট্টগোল দেখে নোটিশ দিল থিয়োকে।

দিনান্তে ভিনসেণ্টের তার প্যালেটের কথা মনে পড়ে না। সময় কোথায়? মুহূর্তের বিশ্রাম নেই যে। কতো চিঠি লিখতে হচ্ছে, কতো লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হচ্ছে, প্রতিটি নতুন শিল্পীর প্রাণে যে জাগিয়ে তুলতে হচ্ছে এই নব শিল্প-আন্দোলনের উদ্দীপনা! চিৎকার করে করে গলা তার ভেঙে গেল, চোখে ফুটে উঠল জ্বরাক্রান্তের দৃষ্টি। আহার নিদ্রা ঘুচল। কেবল কাজ আর কাজ।

বসন্তকালের গোড়ার দিকে পাঁচ হাজার ফ্র্যাংক জমল। থিয়ো ঠিক করল এবার চাকরিতে ইস্তফা দেবার সময় এসেছে। দোকানটা নেওয়া সে স্থির করল। ভিনসেণ্ট গ্রামের বাড়িটার জন্যে অগ্রিম ভাড়া পাঠিয়ে দিল কিছু টাকা। থিয়ো, ভিনসেণ্ট, পীয়ের ট্যাঙ্গি, গগাঁ আর লোত্রেক—এই পাঁচজনে মিলে প্রাথমিক সভ্যদের তালিকা প্রণয়ন করল। ছবির পাহাড় ঘেঁটে থিয়ো তার প্রথম প্রদর্শনীর চিত্র নির্বাচন করল। দোকানের ভিতরটা কে সাজাবে আর বাইরেটাই বা কে—এই নিয়ে রুসো আর অঁকোয়েতিনের মধ্যে অতি যাচ্ছেতাই ঝগড়া হয়ে গেল একদিন। থিয়োরও ঘুম নেই, ঘুম নেই বলে দুঃখও নেই। ভিনসেণ্টের মতো সেও লেগেছে প্রাণপণে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। গরমকাল পড়তে না পড়তে কলোনির প্রতিষ্ঠা হবে,—সেইসঙ্গে প্যারিসের দোকানেরও।

একদিন সারারাত্রি পরিশ্রমের পর একান্ত ক্লান্তিতে ভিনসেণ্ট ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। থিয়ো অফিসে বার হবার সময় তাকে ডাকল না। ঘুম ভাঙল একেবারে দুপুর বেলা। পায়ে পায়ে সে তার স্টুডিয়োতে গেল। ঈজেলের ওপর কতোদিন থেকে একটা ক্যানভাস লটকে রয়েছে। প্যালেটের রঙগুলো শুকনো, ধুলোপড়া। রঙের টিউবগুলো ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে ঘরের এক

কোণে মেঝেতে। শুকনো রঙমাখা নোংরা তুলিগুলো এদিক ওদিক ছড়ানো।

অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠল একটি নীরব প্রশ্ন,—শোনো, একটি কথা। বলো তো, কে তুমি? শিল্পী? না সাম্যবাদী সংগঠক?

গাদা-গাদা ক্যানভাস সারা ঘরে। শিল্পীনামলোভী সভ্যপদপ্রার্থীদের আঁকা। সব ছবি সে কুড়িয়ে নিয়ে থিয়োর শোবার ঘরে ফেলে রেখে এল। রইল শুধু নিজের আঁকা ছবিগুলো। একটা একটা করে সেই ছবিগুলো সে ঈজেলে দাঁড় করিয়ে দেখতে লাগল—নিবিষ্ট মনে, সমালোচকের দৃষ্টিতে। ব্যস্ততার তার শেষ নেই,—তবু একলা ঘরে নির্জন দুপুরে বয়ে যেতে লাগল হিসাববিহীন সময়।

হ্যাঁ, সত্যি সে উন্নতি করছিল বৈকি, এগিয়ে চলছিল নির্ভুল পথে। রঙ তার হাল্কা হয়ে আসছিল, ক্রমে যেন তার সৃষ্টির দিগন্তে নেমে আসছিল আকাশের ঔজ্জ্বল্য। অনুকরণের চিহ্নও তো নেই! যে লোক একদা ভেবেছিল অন্য শিল্পীদের অনুকৃতির মধ্য দিয়েই সুলভ শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবে, তার সৃজনী-শৈলীতে একান্ত ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট প্রকাশে আর নবীনত্বে নিজেই সে বিস্মিত হয়ে গেল। এসব কার হাতের কাজ? তার নিজের!

ইম্প্রেশনিজম‌এর যা মৌলিক গুণ তা সে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে, কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি তারই মধ্যে। তার অংকনপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে বিচিত্র একটা ধরনে,—একান্ত স্বকীয় বিশিষ্টতায়।

একেবারে শেষের দিকে আঁকা ক্যানভাসগুলো ঈজেলে রেখে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে। প্রায় সে ধরে ফেলেছে নিজের একটা বিশিষ্ট পদ্ধতিকে, সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষের নীরব সাড়া যেন চুপি-চুপি প্রকাশ হয়ে চলেছে ঐ ছবিগুলোর মধ্যে।

অনেক দিন সে কাজ করেনি। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে সে তাই তার কাজ দেখতে পারছে। বুঝতে পারছে পথ সে পেয়েছে—হবে তার।

আরশিতে ভালো করে নিজের চেহারাটা দেখল ভিনসেন্ট। দাড়ি ছাঁটা দরকার, চুল কাটা দরকার, বদলানো দরকার ময়লা পোশাক। পরনের সুটটা সে ভালো করে ইস্ত্রি করে নিল, পরল থিয়োর একটা ফরসা শার্ট। পকেটে পাঁচটা ফ্র্যাংক নিয়ে গেল নাপিতের দোকানে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল মোমার্ত বুলভার্দ—একেবারে থিয়োর গুপিল-গ্যালারি পর্যন্ত।

—থিয়ো, আমার সঙ্গে একটু সময়ের জন্যে বাইরে আসতে পারবে?

—কী হোলো তোমার?

—কিছু না। টুপিটা নাও, বাইরে চলো। কাছাকাছি কোথাও একটা কাফে নেই যেখানে নিরিবিলি কথা বলা যায়?

কাফের পেছন দিকের নিভৃত কোণের বেঞ্চিতে বসে থিয়ো বললে,—জানো

ভিনসেণ্ট, বোধহয় মাসখানেক পরে তোমার সঙ্গে এই একলা বসে কথা বলছি।

—জানি, জানি। বোকা আমি।

—একথা কেন বললে?

—থিয়ো, একটা প্রশ্নের জবাব দাও। আমি কী? শিল্পী, না সাম্যবাদী সংগঠক?

—তার মানে?

—শিল্পীদের এই কলোনিটা বানাতে এতো আমি খাটছি যে, আমিও যে আঁকি সে কথা ভুলে গেছি। আর, একবার যদি বাড়িটা নেওয়া হয়, তারপর তো আর রক্ষা থাকবে না।

—তা বটে, কথাটা সত্যি।

—থিয়ো, আমার কথা শোনো। আমি শিল্পী, আঁকতে চাই। গত ক-বছর ধরে যে পরিশ্রম আমি করেছি, তা অপর আঁকিয়েদের মেস ম্যানেজার হবার জন্যে নয়। নিজের রঙ, নিজের তুলির তৃষ্ণায় বুক আমার শুকিয়ে এসেছে। ইচ্ছে হচ্ছে কালই আমি প্যারিস ছেড়ে পালাই।

—কিন্তু ভিনসেণ্ট, এতটা এগিয়ে—

—বলিনি তোমাকে,—বোকা আমি। নিরেট বোকা। শুনবে পুরোপুরি আমার স্বীকারোক্তি?

—বলো।

—এই শহর আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, এখানকার অন্য সব শিল্পীদের আমার অসহ্য লাগছে। আর এক মুহূর্ত যেন আমি সইতে পারছি নে এদের বক্তৃতা আর পরনিন্দা আর আত্মপ্রশংসা। হেসো না থিয়ো, জানি, আমিও এদের দলে নাম লিখিয়েছি। কিন্তু চোখ আমার ফুটেছে। মভ একটা দামি কথা বলেছিল,—কেউ হয়তো ছবি আঁকে, আর কেউ ছবি নিয়ে কথা বলে,—কিন্তু দু-কাজ একসঙ্গে কেউ পারে না। থিয়ো, তুমিই বলো, এই সাতটা বছর তুমি যে আমার ভরণ পোষণ করছ, সে কি আর্ট নিয়ে খুব মাতব্বরি তর্ক করতে আমি শিখব—তাই বলে?

—কিন্তু এই কলোনির জন্যে তুমি অনেক দামি কাজ করেছ ভিনসেণ্ট!

—হ্যাঁ, এইবার সময় এসেছে কলোনির উঠে যাবার। ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনকে আমি বুঝতে পারছি। আমি যেতে চাইনে। ঐ আড্ডায় থেকে আর কোনো কাজ আমি করে উঠতে পারব না। থিয়ো, আমার মনের কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব কি না জানি নে,—কিন্তু যে করে হোক, বুঝতে তোমাকে হবেই।....পারবে না? মনে করো আমি যখন একলা হেগ-এ বা ব্র্যাবাণ্টে থাকতাম,—সঙ্গী-সাথী কেউ ছিল না—নিজেকে মনে হোতো একটা প্রয়োজনীয় লোক। আমি যেন একলা একটা মানুষ—সারা দুনিয়ার সমস্ত শত্রুতার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমি শিল্পী, কেবলমাত্র শিল্পী। যা কিছু

আঁকছি তার প্রত্যেকটির দাম আছে,—একদিন না একদিন পৃথিবী আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য হবেই—মানতেই হবে,—হ্যাঁ, লোকটা অপূর্ব একটা আঁকিয়ে।

—আর এখন ?

—হায় রে হায়! এখন আমি কোথায় ? অগণিতের ভিড়ে হারিয়ে গেছি। আমার চারদিকে প্রতি মুহূর্তে একশো ছবি-আঁকিয়ের ভিড়, ওরা সবাই যেন আমাকে বিদ্রূপ করছে। ভেবে দ্যাখো, আমাদের কলোনিতে যোগ দেবার জন্যে কতো আঁকিয়ে কতো গাদা-গাদা ছবি পাঠিয়েছে। তারা সবাই ভাবছে মস্ত শিল্পী হবে প্রত্যেকে। আজ আমার আর কোনো নিজস্ব সত্তা নেই, ওদেরই অন্যতম হয়ে গেছি। আমিও কি মস্ত শিল্পী হব কোনোদিন? কে জানে ? আমিও তো ওদেরই একজন। ভরসা কোথায় আর আমার ? এতো মূর্খ যে আছে,—যারা অলীক স্বপ্ন দেখে ব্যর্থ জীবনের বোঝা বয়ে চলে,—আগে আমি জানতাম না। প্যারিসে এসে জানলাম। তাই এতো আশংকা, এতো আতংক।

—কিসের ভয় তোমায় ? ওদের সঙ্গে কী সম্বন্ধ তোমার ?

—কিছুই না। কিন্তু তবু ভয়। একবার আত্মবিশ্বাসের ভিত নড়েছে, সেই দুর্বলতাটা ঘুচছে না কিছুতেই। গ্রামের মধ্যে একলা যখন থাকি, ভুলে থাকি যে পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজার হাজার ছবি আঁকা হচ্ছে। ভাবি যে-ছবিটি আমি আঁকছি শুধু সেইটির কথা, মনে হয় আমার শিল্প পৃথিবীর হাতে সুন্দরতম উপহার। যতো খারাপই হোক না আমার কাজ, তবু গ্রামে বসে মায়া নিয়ে মতিভ্রম নিয়েই হয়তো কাজ করে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন? বুঝতে পারছ না আমার কথা, থিয়ো ?

—বুঝছি বৈকি ভিনসেন্ট।

—তাছাড়া দ্যাখো, শহরের শিল্পী আমি নই। এখানকার কেউ আমি নই। কৃষাণ জীবন নিয়ে আমার কারবার, আমার সেই দিগন্তজোড়া শস্যের ক্ষেতে আমি ফিরে যেতে চাই। সেখানকার মুক্ত আকাশের দুরন্ত রোদ আমার মনের সবকিছু আবর্জনা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে, শুধু শিল্প-সাধনার একান্ত আগ্রহটি ছাড়া।

আস্তে আস্তে থিয়ো বললে,—তার মানে...তুমি...এই প্যারিস থেকে চলে যেতে চাও ?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে আমাকে, থিয়ো।

—আর, এই কলোনির কী হবে ?

—না, আমি নাম কাটিয়ে দেব। তুমি এটাকে গড়ে তোলো।

থিয়ো মাথা নাড়ল,—না, তুমি না থাকলে আমি নেই।

—কেন থিয়ো ?

—জানি নে। তোমার জন্যেই আমি এর পেছনে খেটে চলেছিলাম,—তুমি চেয়েছিলে বলেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুজনে, পরে ভিনসেণ্ট বললে,—তুমি এখনো চাকরিতে নোটিশ দাওনি, না?

—না। পয়লা তারিখে দেব ভেবেছিলাম।

—যে যে টাকা দিয়েছে, তাদের টাকা ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

—হ্যাঁ, তা চলবে। কবে তুমি যেতে চাও?

—দেরি করব না, প্যালেটটা আর-একটু হাল্কা হলেই বিদায় নেব।

—ও!

—কোথায় যাব জানি নে। হয়তো দক্ষিণে। সমুদ্রের ধারে কোনো অজানা জায়গায়। যেখানে আমি আবার একলা হতে পারব, সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে আবার শুধু আঁকতে পারব, যেখানে খুঁজে খুঁজে আবার ফিরে পাব নিজেকে।

ভিনসেণ্ট দুহাত বাড়িয়ে থিয়োর কাঁধদুটো জড়িয়ে ধরলো,—থিয়ো, বলো, তুমি আমাকে ঘেন্না করো না? তোমাকে এতোদূর টেনে এনে সব নষ্ট করে দিয়ে আমি সরে পড়ছি, বলো রাগ করবে না এতে আমার ওপর?

ম্লান করুণ হাসি হাসল থিয়ো,—ঘেন্না করব! তোমাকে? রাগ করব তোমার ওপর?

ভিনসেণ্টের ডানহাতটিতে ছোট্ট একটু চাপড় মেরে সে উঠে দাঁড়াল। বললে,—পাগল! বুঝেছি বৈকি আমি! তুমিই ঠিক। চলে যাবে বৈকি। নিশ্চয়! —নাও, গেলাসটা শেষ করে নাও। আমাকে গুপিলসে আবার ফিরে যেতে হবে।

১৩

কোথায় যাব? কোথায় গেলে আবার ফিরে পাব আমাকে? শিল্পলক্ষ্মী কেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দূরে সরে যায় অধরা মায়াবিনীর মতো? কবে সে ধরা পড়বে আমার রেখার বন্ধনে, রঙের ইন্দ্রজালে!

ছটফট করে ভিনসেণ্ট। একমাস কেটে গেল,—একমাস আগে আহ্বান এসেছে, তবু সে এখনো বন্দী।

থিয়োই কথা বললে,—বুঝেছি, পেয়েও হারাচ্ছ যেন, তাই না? কী যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? আমি জানি এর কারণ।

—জানো? জানো থিয়ো? কী বলো তো?

—যা ভেবেছিলে তাই। প্যারিস।

—প্যারিস?

—হ্যাঁ; প্যারিস হল তোমার আঁকা-শেখার ইস্কুল। যতোদিন এখানে থাকবে ইস্কুলের ছাত্র হয়েই থাকবে। আমাদের হল্যাণ্ডের ইস্কুলের কথা মনে

আছে? সেখানে শুধু শিখেছিলাম কী করে কী করতে হয় আর লোকে কী কী করে। নিজেরা কিন্তু কিছু করিনি।

—আর-একটু স্পষ্ট করে বলো।

—নিজে যখন সত্যিকারের কিছু করবে তার আগে মাস্টারের সাহচর্য ঘুচিয়ে নিতে হবে। ততোদিন ছাত্রবৃত্তি, যতোদিন শিক্ষা—সাধনা নয়, সৃষ্টি তো নয়ই। তুমি চলে গেলে কতোটা ফাঁকা লাগবে আমার সে আমিই জানি, তবু তোমাকে যেতে হবে। পৃথিবীতে তোমার নিজের একটা জায়গা তুমি পাবেই—আর সে জায়গা তোমার নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু যতো শীঘ্র পারো এই পাঠশালার গলি তোমার না ভুললে চলবে না।

—জানো ভাই, কোন্ দেশের কথা আজকাল আমার কেবলই মনে পড়ছে?

—বলো।

—আফ্রিকা।

—আফ্রিকা!

—হ্যাঁ। সেখানকার আকাশে জ্বলন্ত সূর্য, কুয়াসা-জড়ানো নয় সেখানকার রোদ। এই জঘন্য দীর্ঘ শীত সেখানে অজানা। সেখানেই দেলাক্রোয়া তার রঙ খুঁজে পেয়েছিল, আমিও সেখানে হয়তো খুঁজে পাব আমাকে।

—আফ্রিকা—সে যে অনেক দূরে!

—শোনো থিয়ো, সূর্যকে আমি চাই—যে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ আর প্রচণ্ড শক্তি,—সমস্ত সৃষ্টি সমস্ত জীবন যে শক্তিতে নিত্য উদ্ভাসিত; প্যারিসের এই শীত—এ আমার প্যালেটে বাসা বেঁধেছে। সারা শীতকাল ধরে আমি খালি দক্ষিণ দেশের কথা ভেবেছি—বিষুবরেখা আমাকে যেন চুম্বকের মতো টেনেছে। তুমিও তো বলছ প্যারিসে আমার আত্মবিকাশের কোনো রাস্তা নেই। জ্বলন্ত সূর্যের নিচে সূর্যমুখীর মতো বিকশিত হতে চাই আমি। আমার বুকের মধ্যে শীত জমে আছে, সেই শীতকে আফ্রিকার সূর্য ছাড়া কে তাড়াবে? আগুন লাগিয়ে কে দেবে আমার প্যালেটে?

—আমার মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। দাঁড়াও, ভেবে দেখি,—বললে থিয়ো।

পল সেজান প্যারিস থেকে বিদায় উপলক্ষে বন্ধুদের এক পার্টি দিল। বাপের আনুকূল্যে এক্সের পাহাড়ে সে কিছুটা জমি কিনেছে, সেখানে স্টুডিয়ো বানিয়ে থাকবে।

ভিনসেন্টকে সে বললে,—তুমি প্যারিস ছাড়ো ভিনসেন্ট, প্রভেন্সে চলো। অবশ্য এক্স্ নয়, সেটা আমার এলাকা, তবে কাছাকাছি আর কোনো জায়গায়। অমন রোদ আর দুনিয়ায় কোথাও পাবে না। আমি এই যে যাচ্ছি, আর ফিরছি নে।

গগাঁ বললে,—এর পরে আমার পালা। আমি আবার ট্রপিকসে ফিরে

যাব। প্রভেন্সের রোদের কথা বলছ, মারকোয়েসাসের সূর্যকে তোমার ঐ প্রভেন্সে বসে কল্পনাও করতে পারবে না। ওখানকার যারা অধিবাসী তারা যেমন আদিম, ওখানকার সূর্যও তেমনি আদিম।

সিউরাত বললে,—আমারও তো দেখছি তোমাদের মতো সূর্য-উপাসকদের দলে যোগ দিলেই ভালো হয়!

ভিনসেন্ট বললে,—আমিও চলতি—আমি যাব আফ্রিকায়।

লোত্রেক বললে অস্ফুট স্বরে,—বটে, বটে! তাহলে দু-নম্বর দেলাক্রোয়া গজাবে আর-কি!

গগাঁ শুধোলে,—ভিনসেন্ট, সত্যি?

—সত্যি। আজ না হোক, দু-দিন পরে—যাবই। সূর্যটাকে সইয়ে নেবার জন্যে কদিন ঐ প্রভেন্সেই কোথাও গিয়ে থাকা উচিত, তাই না?

সিউরাত বললে,—মার্সাই বাদ দিয়ে;—ওটা মন্তিচেলির জায়গা।

ভিনসেন্ট বললে,—ঐ তো মুশকিল। এক্স্ বাদ দিয়ে,—ওটা সেজানের। আন্তিবিসএ যাবার উপায় নেই, ওটা মনে-র জায়গা বলে বিখ্যাত। কোথায় যাই তাহলে?

—দাঁড়াও! লোত্রেক বলে উঠল,—আমি একটা জায়গার নাম বলতে পারি। আর্লস-এর কথা ভেবে দেখেছ?

—আর্লস? পুরোনো একটা রোম্যান জনপদ, তাই না?

—হ্যাঁ, ঠিক রোন নদীর ওপর। মার্সাই থেকে ঘণ্টা-দুয়েকের রাস্তা। আমি একবার গিয়েছিলাম। ওখানকার ল্যান্ডস্কেপের রঙ দেলাক্রোয়ার রঙকে লজ্জা দেবে!

—সত্যি বলছ? সূর্যটা কেমন?

—সূর্য? তোমাকে পাগল বানাবার মতো। আর তা ছাড়া আর্লস-এর মেয়ে! আহা! সারা দুনিয়ায় এমন জবর মেয়ে আর কোথাও মিলবে না ভায়া! মুখে চোখে সেই প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য, যেন চিকণ করে পাথরে কুঁদে কাটা। চেহারাটা কিন্তু ঠিক রোম্যানদের মতো—হাত, পা, বুক—একেবারে খাসা জিনিস! এদিকে আবার গায়ের গন্ধ কেমন জানো? একেবারে পূর্ব দেশের। সত্যিকারের যে ভিনাস তার দেখা আজও ঐ আর্লসএই মিলবে।

—খুব লোভ দেখাচ্ছ যে! ভিনসেন্ট বললে।

—বাপ্‌, তোমার আমার নয়, দেবতাদের লোভ লাগে! এর ওপর আবার যখন ঝড়ের ঝাপট খাবে, তখন তো বুঁদ হয়ে যাবে!

—ঝড়ের ঝাপট! সেটা কী রকম?

—আগে যাও। গেলেই টের পাবে।

—তা ছাড়া থাকা-খাওয়া কেমন? শস্তা?

—ঐ থাকা আর খাওয়া। ত ছাড়া আর খরচ নেই। অতএব এর চাইতে

শক্তা আর কী চাও ?

—আর্লস,—বিড়-বিড় করে ভিনসেণ্ট বললে,—আর্লস, আর আর্লসের মেয়ে—মন্দ কী ?

জ্বালা-ধরানো মদের মতো প্যারিস, যেন উত্তেজক নেশা। ' আবসাঁতের পর আবসাঁত, আড্ডার পর আড্ডা, তর্কের পর তর্ক। আর, কত কাজ—। প্যারিসের জীবন যেন স্নায়ুবিকার।

মন বলে, পালাও,—চলো কোনো নিভৃত নির্জনে যেখানে জীবনের সমস্ত আবেগকে একটি স্রোতে ঢেলে দিতে পারবে,—সে স্রোত শিল্পধারার। প্যারিসের জীবন যেন অপরিণত ফল। চলো সূর্যের দেশে,—এ ফল রসালো হয়ে উঠুক সুপক্ক পরিপূর্ণতায়। এতো দীর্ঘ দিনের সাধনা, এতো দুঃখদৈন্যব্যথিত তপশ্চর্যা—এর প্রতিদান আর দূরে নেই, ভাগ্যের সার্থক প্রসাদ আসন্ন। তবে কেন পথভ্রষ্ট হওয়া, তবে কেন লক্ষ্যহীনতার কাছে আত্মসমর্পণ !

ছেড়েই যাব প্যারিস, যাব তপস্যার অরণ্যে। এখানে নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা—আছে নির্ভর আছে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, থিয়োর কাছে একান্ত নির্ভয় আশ্রয় আছে। ক্ষুধার অন্ন আর ছবি আঁকার জিনিসপত্রের অভাব কখনো হবে না। কখনো ভাঁটা পড়বে না থিয়োর সহানুভূতিতে।

কিন্তু প্যারিস থেকে যদি বিদায় নিই—আবার জীবনের পথ হবে বন্ধুর। আবার অভাব। দুবেলা আহার হয়ত জুটবে না, হাতে পয়সা থাকবে না রঙ কিনবার মতো, নোংরা হোটেলে কাফেতে যাযাবরের মতো দিন কাটবে, শুষ্ক দুটি ঠোঁট বন্ধুহীন জগতে ভাষা খুঁজে মরবে।

পরদিন লোত্রেক আবার বললে,—দ্বিধা কোরো না ভায়া, সত্যিই যদি যাবে তো আর্লসেও যাও। শিল্পীর স্বর্গ ও-জায়গাটা। এই প্যারিস যদি আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে না রাখত, আমিও যেতাম।

সেদিন সন্ধেবেলা দু-ভাই গেলো ভাগনারের একটা কনসার্ট শুনতে। সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে এল, নিরালা ঘরে মুখোমুখি বসে গল্প করল অনেকক্ষণ। ছেলেবেলাকার কতো স্মৃতি নিয়ে টুকরো টুকরো গল্প।

পরদিন ভোরবেলা উঠে ভিনসেণ্ট ব্রেকফাস্ট তৈরি করল। থিয়ো খেয়ে দেয়ে অফিস যাবার পর সে সারা বাড়িটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করল। সযত্নে দেয়ালে টাঙালো নিজের আঁকা কয়েকটি ছবি।

দিনের শেষে থিয়ো শূন্য ঘরে ফিরে এসে দেখল, টেবিলের ওপর একখানা চিঠি—

ভাই থিয়ো,

আর্লসেই গেলাম। পেঁাছে চিঠি দেব আবার। দেয়ালে কটি ছবি টাঙিয়ে গেলাম, যাতে আমাকে না ভোলো।

মনে মনে আমার আলিঙ্গনটি নাও। ভিনসেণ্ট

॥ আর্লস ॥

১

আর্লসের জ্বলন্ত সূর্য অমোঘ বর্শার মতো আঘাত করল ভিনসেণ্টের কপালে ঠিক দুচোখের মাঝখানে, ধাঁধিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল তার চৈতন্য। ইস্পাত-কঠিন নীল আকাশের শীর্ষে সূর্য যেন পোড়া হলুদ রঙের ঘূর্ণায়মান তরল পাবককুণ্ড, চোখ-অন্ধ-করা তার প্রতিটি রশ্মি। প্রচণ্ড উত্তাপ আর চক্রবাল থেকে চক্রবাল জুড়ে প্রদীপ্ত আলোক-বন্যার ক্ষমাহীন বিস্তার—এ যেন কোন্ অপরিচিত গ্রহান্তর!

ভোরবেলা ভিনসেণ্ট থার্ড ক্লাস কামরা থেকে স্টেশনে নামল। স্টেশন থেকে বাজার পর্যন্ত আঁকা-বাঁকা রাস্তা, একধারে তার রোন নদীর বাঁধ, অপর ধারে নোংরা নোংরা খাবারের দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ। সামনে চড়াইএর কিনার বেয়ে আর্লস শহর, দূর থেকে ছবির মতো দেখতে—ঝাঁঝালো রোদ্রে ঝিমোচ্ছে।

কোথায় উঠবে সে নিয়ে ভিনসেণ্টের কোন ভাবনা নেই। বাজারে পেঁছে সামনেই যে হোটেলটা চোখে পড়ল, তাতে ঢুকে একখানা ঘর ভাড়া নিল। হোটেলটার নাম হোটেল দ্য লা গেয়ার। ঘরে একটা পুরোনো পেতলের খাট, চটা-ওঠা একটা জলের কুঁজো আর একটা চেয়ার। মালিক একটা রঙ-না-করা টেবিল এনে পেতে দিল। ঈজেল পাতবার জায়গা নেই, কিন্তু ভিনসেণ্টের আপত্তি নেই তাতে। সে তো সারাদিন বাইরে বাইরে থাকবে।

খাটের ওপর সুটকেসটা ছুঁড়ে ফেলে সে শহর দেখতে বার হোলো। বাজার থেকে শহরের মাঝামাঝি পেঁছোবার দুটো রাস্তা। একটা রাস্তা চওড়া, গাড়ি-ঘোড়া চলে, চড়াইটার কিনার দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে শহরে গিয়ে পৌচেছে। আর একটা আছে আঁকাবাঁকা শর্টকাট পায়ে চলার পাথুরে পথ। দ্বিতীয় পথটাই ভিনসেণ্ট বেছে নিল। চড়াইটা খুব কঠিন, পথও মাঝে মাঝে খুব সরু; দুধারে প্রাচীন সব পাথরের ঘর বাড়ি, সেই রোমক যুগ থেকেই তারা যেন এমনি খাড়া হয়ে আছে। সূর্যের প্রখর আলোর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দুধারের বাড়ির মাঝের গলিপথগুলো যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ, ঝড়ের হাত এড়াবার জন্যে গলি-গুলো গোলকধাঁধার মতো যতোটা সম্ভব আঁকাবাঁকা। পথের ধারে ধারে নোংরা আবর্জনা। প্রতি দোরগোড়ায় শিশুর জটলা। সব জড়িয়ে কেমন একটা শুকনো বীভৎস রূপ।

ভিনসেণ্ট শহরের প্রধান রাস্তায় এসে পেঁছল, তারপর শহরের পেছন দিয়ে

পাথুরে টিলা টপকে টপকে একেবারে পৌঁছল পাহাড়টার চুড়োয়। গভীর একটা খাদের ধারে কালো একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে এবার পাইপটা ধরালো।

সামনের পাহাড়ের ঢালু বেয়ে রোন নদীর তীর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে আর্লস শহর। বিভিন্ন রাস্তার বিচিত্র জ্যামিতিক প্যাটার্ন আর ছোট বড়ো বাড়ির সারি। অধিকাংশ বাড়িরই লাল মাটির ছাদ, তবে রোদ্রে জ্বলে জ্বলে কোনোটার রং বাদামি, কোনোটার পোড়া ইঁটের মতো, কোনোটার আবার ধূসর অঙ্গার।

রোন নদী বেগবতী। শহরের গা ঘেঁষে পাহাড়ের কিনার ঘিরে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে নদী চলে গেছে ভূমধ্যসাগরের দিকে। বাঁকের দু-ধারে পাথরের বাঁধ।

অপর তীরে ত্রিংকোয়েতেল শহর ঠিক যেন পটের মতো আঁকা সীমান্তের গায়ে। পেছন ফিরে দেখলে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়, সামনে দুধারে যতো-দূর চাও—শস্যক্ষেত্র আর বাগান আর দিগন্তে মেশা উদ্ভিদ-তরঙ্গ।

এই মাঠ বন আর দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে উঠল ভিনসেন্টের। আকাশ নীল,—এমনি প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ভরসাহারা নীল, যে তাকে নীল বলেই মনে হয় না—মনে হয় ও রঙের যেন কোনো নাম নেই। শস্য-ক্ষেত্রের এই সবুজ যেন এতোদিনের পরিচিত স্নিগ্ধ শান্ত সবুজ নয়—এ সবুজ আকাশের আলোকে সুরার মতো পান করে চিরমাতাল হয়ে রয়েছে। আকাশের সূর্যটা ঠিক যেন কমলা-হলুদ বিশাল একটা পিণ্ড...দগদগে লাল নিষ্ফলা পোড়া মাটি....আকাশের কোন কোণে নিঃসঙ্গ একটি মেঘের অবর্ণনীয় শুভ্রতা —অবিশ্বাস্য এইসব বর্ণবাহার। কোথায় ছিল এইসব রঙ, উলঙ্গ যারা নির্লজ্জতায়, আদিমতায় যারা আপোষবিহীন নিষ্ঠুর? লাল আর কমলা-হলুদ, নীল আর সবুজ—সমস্ত প্রকৃতিতে ওরা যেন জুড়ে বসেছে বিজয় সেনানীর মতো,—প্যালেটে ওদের কুড়িয়ে আনা কি মানুষের সাধ্য!

বড়ো রাস্তা ধরে ভিনসেন্ট এবার ফিরে চলল। হোটেলে ফিরেই ঈজেল, ক্যানভাস আর রঙ তুলি নিয়ে আবার বার হোলো, হাঁটতে শুরু করল রোন নদীর তীর ধরে। বাদাম গাছে ফুল ধরেছে—নাকে তার তিক্ত- মধুর গন্ধ। জ্বলন্ত সূর্যরশ্মি চোখে এসে বিঁধছে। টুপিটা আনতে মনে ছিল না, তেতে পুড়ে আরো লাল হয়ে উঠল মাথার চুল। প্যারিসের নাগরিক জীবনে সঞ্চিত যা কিছু আর্দ্রতা, যা কিছু ক্লান্তি আর হতাশা আর সহজ তৃপ্তির আলস্য বিলাস—সব যেন তার দেহ মন থেকে শুষে নিল সূর্যজ্বলা আকাশের জ্বলন্ত দাহ।

কিছুদূর যাবার পর সামনে চোখে পড়ল সরু একটি পুল, ওপর দিয়ে চলেছে ছোট একটি ঠেলাগাড়ি—নীল আকাশের পটে ছবির মত যেন আঁকা। নদীর জলও নীল, দুই কিনারের হলুদ রঙের ওপর গাঢ় সবুজ তৃণক্ষেত্র। একলা একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি ধোপানী মেয়ে কাপড় কাচছে,

মাথায় তাদের নানা বিচিত্র রঙের টুপি।

মাঠের ওপর ঈজেলটা পেতে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস টেনে ভিনসেণ্ট চোখদুটো বন্ধ করল। এমনি বর্ণাঢ্যতা উপলব্ধির গভীরে গিয়ে আঘাত করে, খালি চোখ মেলে তাকে ধরা যায় না। অন্তর থেকে তার খসে পড়তে লাগল অনেক আবর্জনা অনেক জঞ্জাল—বৈজ্ঞানিক পয়েণ্টিলিজম নিয়ে সিউরাতের জ্ঞানগর্ভ যুক্তি, আদিমতার সপক্ষে গগাঁর যত বক্তৃতা, রূপের পেছনে রূপের সারাৎসার নিয়ে সেজানের তর্ক আর লোত্রেকের ঘৃণাবাদের ঘোষণা। ঘুচল এতদিনের সবকিছু অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ।

পড়ে রইল শুধু ভিনসেণ্ট ভ্যান গক।

সারাদিনের পরে সান্ধ্য ভোজের সময় সে হোটেলে ফিরে এল। সারাদিন কেটেছে বিচিত্র অনুভূতির আলোড়নে, ভুলেই গেছে ক্ষুধার কথা। ছোট্ট একটা টেবিল টেনে বসে একটা আবসাঁত অর্ডার দিল। পাশের একটি লোক দেখল তার হাতে মুখে জামায় রঙ। আলাপ করল তার সঙ্গে।

পরিচয় দিয়ে লোকটি বললে,—আমি প্যারিসের একজন সাংবাদিক, তিন মাসের জন্যে এখানে এসেছি আমার রচনার কিছু মাল মশলা সংগ্রহ করতে।

ভিনসেণ্ট বললে,—আমি এসেছি মাত্র আজ সকালে।

লেখক বললে,—দেখেই তা মনে হোলো। অনেকদিন থাকবেন নাকি?

—সেইরকমই তো ইচ্ছে।

লেখক বললে,—ওটি করবেন না। আমার উপদেশ নিন, বেশিদিন এখানে কাটাবেন না। আর্লসের মতো এমনি পাগল-করা জায়গা দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

—আপনার এ ধারণা হোলো কেমন করে? ভিনসেণ্ট শুধোলো।

—ধারণা নয়, আমি জানি। এখানকার লোকদের আমি গত তিনমাস ধরে দেখছি। সবাই কিছু-না-কিছু পাগল। ওদের চোখগুলো দেখলেই ধরতে পারবেন। অস্বাভাবিক, অর্ধ-উন্মাদ দৃষ্টি।

—আশ্চর্য তো!

—সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্যি কি না। সারা প্রভেন্সে এই আর্লসের মতো এমনি মার-খাওয়া জায়গা দুটি নেই। মারছে সূর্য, মারছে বড়। রোদটা কেমন বলুন তো? যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে চারিদিক। এই রোদ বুকের মধ্যেটা জ্বালিয়ে দেয়, পুড়িয়ে খাক করে ফেলে মাথার মধ্যেটা। তারপর ঝড় তো এখনো দেখেননি। বছরের মধ্যে দু-মাসের বেশি উন্মাদ বড় এখানে বয়। তখন রাস্তায় যদি বার হন, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে বাড়ির দেয়ালে,—মাঠে যদি থাকেন, ধাক্কায় ধাক্কায় শুইয়ে ফেলবে মাটির ওপর। বাতাসের দমকে সারা শরীরটা যেন ভেঙে ভেঙে পড়বে, ফাঁকা হয়ে যাবে বুকের ভেতরটা, বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইবে পেটের নাড়িভুঁড়ি।

অসহ্য হয়ে উঠবে প্রত্যেকটা মুহূর্ত! আমি দেখেছি সে ঝড় কেমন। সে ঝড়ে দরজা জানলা ভাঙে, গাছ ওড়ে, মানুষ পশু মাটিতে ছিটকে পড়ে গড়াগড়ি দেয়। সবে তিনমাস এখানে থেকেছি, এরই মধ্যে আমিও যেন আধপাগলা হয়ে গেছি। আর নয়।

—তাহলে?

—কালই আমি পালাচ্ছি।

—কিছু মনে করবেন না, বাড়িয়ে বলছেন না তো? এখানকার লোকজনদের যেটুকু দেখলাম সে রকম কিছু তো মনে হোলো না!

—ঐ 'যেটুকু' দেখেছেন বলেই। দেখেছেন আর কতোটুকু? ভেতরে ভেতরে ভয়ানক একটা ব্যাপার চলেছে মশাই,—শুনতে চান?

—বাঃ নিশ্চয়ই! আসুন আমার টেবিলে, একটা আবসাঁত খান।

—শুনুন তাহলে। মৃগীরোগ জানেন তো? সমস্ত আর্লস শহরটা এই মৃগীরোগে ভুগছে। নার্ভাস উত্তেজনার চরমে এসে পৌঁছেছে, সময় এল বলে—যখন দাঁতে দাঁত বাধিয়ে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করবে, আর গাঁজলা গাঁজলা ফেনা বার হবে মুখ দিয়ে।

—কিন্তু কখন আসবে সে-সময়?

—আসে না, কখনো আসে না, সেইটেই আশ্চর্য। ভাঙনের ঠিক মুখের ওপর এরা বসে থাকে। কতোবার আমার মনে হয়েছে এইবার পাগল হোলো সবাই, বাধল খুনোখুনি, টুঁটি টিপে ধরল এ ওর। ঠিক সেই মুখেই হঠাৎ হয়তো আকাশে একটু মেঘ দেখা দেয়, না-হয় ঝড়টা কমে। পাগলামির ঢেউটা আর আছড়ে পড়ে না, সরে যায় কিছুদিনের মতো।

—যাক, মৃগীরোগের উপসর্গগুলো তাহলে শেষ পর্যন্ত ফুটে ওঠে না বলুন!

—না, তা নয়। তবে, রোগটা ঘুমিয়ে থাকে, ঝোঁকে ঝোঁকে ওঠে—আবার ঘুমিয়ে পড়ে। বিপদটা তাতেও কম নয়! এ সম্বন্ধে একটা জার্মান ডাক্তারি পত্রিকায় একটা রিপোর্ট আমি পড়েছি। তাতে কী বলেছে জানেন?

—বলুন তো!

—শত-শত রোগীর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একরকম স্নায়বিক ব্যাধি আছে, যাকে ঠিক মৃগী না বললেও অর্ধমৃগী বলা যেতে পারে। রোগটা আসলে মৃগী, কিন্তু উপসর্গ কখনোও মূর্ছায় গিয়ে পৌঁছয় না। স্নায়বিক উত্তেজনা বাড়ে আবার কমে, কিন্তু যখন বাড়ে, আবার আগের চেয়েও বেশি বাড়ে। এমনি বেড়েই চলে, ঢেউ যেমন ফিরে যায় আর বারে বারে এগিয়ে আসে। এমনি চলে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়েস পর্যন্ত। বছর ছত্রিশ বয়েসে প্রথমে প্রচন্ড একটা ফিট দেখা যায়। তারপর বছর দুয়েকের মধ্যে আর দু-চার বার। তারপরই সব শেষ। হয় উন্মাদ অবস্থা না-হয় মৃত্যু।

—কী বলেন! ছত্রিশ? এত অল্প বয়েসে সব শেষ! এই বয়েসেই যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সবে শুরু!

লেখক বললে,—আপনি এ হোটেলে আর কিছুদিন আছেন তো? এ বিষয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখছি। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,—প্যারিস থেকে আপনাকে পাঠিয়ে দেব এককপি। আমার কী ধারণা জানেন? সারা আর্লসের নাড়ী এমনি প্রচ্ছন্ন মৃগীর ধমকে ক্ষেপে ক্ষেপে চলছে। একদিন আসবে যেদিন আগ্নেয়গিরি ফাটবে। সেদিন আর রক্ষা নেই। তার জন্যেই তো তাড়াতাড়ি সরে পড়ছি। আপনাকেও বলছি, খুব বেশিদিন থাকবেন না।

২

প্রত্যেক দিন অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে জামা কাপড় পরে বার হয়ে যায় ভিনসেণ্ট। ছবি আঁকার মনের মতো জায়গার সন্ধানে নদীর কিনার ধরে হাঁটে মাইলের পর মাইল। প্রতিদিন রাত্রে সে ফিরে আসে হাতে একটি করে সম্পূর্ণ ছবি নিয়ে। তারপর কোনরকমে খেয়ে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

সে যেন আর মানুষ নয়, অন্ধ একটা আঁকবার যন্ত্র মাত্র। রঙ চড়িয়ে চলেছে ক্যানভাসের পর ক্যানভাসে, কী যে আঁকছে তাই বোধহয় জানে না। সারা দেশ জুড়ে যত বাগান আছে সব এখন ফুলন্ত। সবকটা পুষ্পগুচ্ছ সে কি এঁকে শেষ করতে পারবে না? আর সে ছবি আঁকার কথা ভাবে না, শুধু অশ্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন এঁকেই যায়। গত আট বছরের পরীক্ষার ফল সে পাচ্ছে, এতদিনের সাধনা এবার ছবির পর ছবিতে বিজয়োচ্ছ্বাসে উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে। সকালে যে ক্যানভাসটা ঈজেলে সাজায়, কোন-কোন দিন দুপুরের মধ্যেই সেটা শেষ হয়ে যায়। শহরে ফিরে এক কাপ চা গলায় ঢেলে আবার নতুন ক্যানভাস নিয়ে বার হয় প্রান্তরে।

এতো যে আঁকছে, ছবি ভালো কি খারাপ হচ্ছে খেয়াল নেই তার। রঙের নেশায় সে মাতাল।

কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না, সেও কথা বলে না কারো সঙ্গে। ছবি আঁকার পর যেটুকু শক্তি থাকে সেটুকু লাগে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে। সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন দুর্দান্ত ঝড় বয়। মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে ঈজেলকে বেঁধে রাখতে হয়। তবু খাড়া রাখা যায় না—উল্টে পড়ে ঈজেল, উড়ে যায় ক্যানভাস, হারিয়ে যায় রঙ তুলি। বাতাসের দমকার সঙ্গে সারাদিন যুদ্ধ করে সন্ধ্যাবেলা যখন ফেরে, শরীরের অবস্থা এমন হয়, কে যেন তার সর্বাঙ্গে ঠেঙিয়েছে।

বহুকাল ধরে টুপি মাথায় দেওয়ার অভ্যাস নেই ভিনসেণ্টের। আর্লসের নৃশংস সূর্য ক্রমে ক্রমে মাথার চাঁদির চুলগুলো পুড়িয়ে দেয়। রাত্রিবেলা যখন হোটেলের বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়ে, মনে হয় মাথার মধ্যে যেন অগ্নিকুণ্ড

জ্বলছে। জ্বলে গেছে দৃষ্টিশক্তিও—শস্যক্ষেতের সবুজ আর আকাশের নীলের পার্থক্য চোখ দিয়ে সে ধরতে পারে না, তবে, ঘরে ফিরে যখন নিজের আঁকা ক্যানভাস দেখে, ঠিক বুঝতে পারে ওতে প্রকৃতির নিভুর্ল প্রতিচ্ছবি উজ্জ্বল, ভাস্বর হয়ে ফুটেছে।

একদিন সে একটি লাইলাক বাগানের ছবি আঁকল। ছবিতে লাল একটি বেড়া, গোলাপি রঙের দুটি পীচ গাছ, পেছনে জ্বলজ্বলে নীল আকাশ। ভারি পছন্দ হোলো কাজটা, নিজের মনে বললে,—এতো ভালো ল্যাণ্ডস্কেপ আর কখনো আঁকিনি!

হোটেলে ফিরে একটা চিঠি সে পেল। জানল যে হেগ-এ অ্যাণ্টন মভ মারা গেছেন। পীচ গাছের এই ছবিটির তলায় লিখল,—মভের স্মরণে—ভিনসেণ্ট আর থিয়ো। ছবিটা পাঠিয়ে দিল হেগ-এ মভের স্ত্রীর কাছে।

পরদিন পথে বার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পড়ল ফুলগাছের একটি বাগান। গাছগুলোর শাখায় শাখায় সবে কুঁড়ি ফুটতে শুরু করেছে। আঁকতে বসল ভিনসেণ্ট। একটু পরেই বিশ্রী ঝড় উঠল। সমুদ্রের ঢেউএর মতো ঝড়ের দাপট বারে বারে আসে আর ফিরে যায়। যখন বাতাস চুপ থাকে তখন সূর্যের আলোয় গাছের মাথায় মাথায় সাদা পুষ্পস্তবকের রাশি জ্বল-জ্বল করে জ্বলে। ভিনসেণ্ট আঁকে আর ভাবে, কখন বাতাসের এই হুড়োহুড়ি ধাক্কায় ঈজেল-শুদ্ধ সব কাজ ধুলোয় গড়াগড়ি যায় বুঝি! মনে পড়ে শেভেনিনজেনের দিনগুলির কথা, যখন সে সমুদ্রের ধারে বসে আঁকত আর সমুদ্রের শিকররাশি ধুয়ে যেত তার ছবিকে, উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইত বালুকা-ঝড়। পুষ্পমঞ্জরীর সাদা রঙ অনেক ছড়ালো এই ক্যানভাসটাতে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্বর্ণ-হলুদ আর নীল আকাশ-রঙ। ছবিটা শেষ হবার পর হঠাৎ সে নিদারুণ আশ্চর্য হয়ে দেখল, ছবিটার মধ্যে অজানিতভাবে নতুন একটা জিনিসকে সে স্থান দিয়েছে—সে হচ্ছে ঝড়।

ঝড় মথিত করেছে সমস্ত দৃশ্যপটকে। এই ঝড়ের রূপ আশ্চর্য অভিনবত্বে ছবির মধ্যে প্রকটিত।

নিজের মনে হেসে উঠল ভিনসেণ্ট,—লোকে ভাববে, আমি যখন এটা আঁকি নিশ্চয়ই তখন নেশা করেছিলাম।

থিয়োর গতকালকার চিঠির একটা লাইন মনে এল। মিনহার টারস্টিগ প্যারিসে বেড়াতে এসেছিলেন, থিয়ো তাঁকে ছবি দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল। সিসলের একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে টারস্টিগ বলেছিলেন,—আমি না ভেবে পারছি নে, যে-আর্টিস্ট ছবিটা এঁকেছে সে নিশ্চয়ই আঁকবার সময় কিছুটা নেশার ঘোরে ছিল।

ভিনসেণ্ট ভাবল,—টারস্টিগ যদি আমার আর্লসে আঁকা ছবি দেখতেন তাহলে নিশ্চয় ভাবতেন এ শুধু নেশা নয়, একেবারে প্রচণ্ড প্রলাপের অবস্থায়

ফল।

আর্লসের লোকজন ভিনসেন্টকে অনেক দূরে রেখে চলে। তারা দেখে লোকটা ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে শহর ছেড়ে দ্রুত পদক্ষেপে বার হয়ে চলে যায়, মাথায় টুপি নেই, পিঠে ভারি ঈজেলের বোঝা, চোখে উত্তপ্ত উত্তেজনা। আর দেখে দিনের শেষে ফিরছে লোকটা আপন মনে বকতে বকতে আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে করতে। সারা দিনের রৌদ্র-তাপের পর কোটরে ঢোকা চোখদুটো লাল ভাঁটার মতো, মাথার চুলবিহীন চাঁদিটা কাঁচা মাংসের মতো দগদগে লাল, বগলের তলায় ভিজে ক্যানভাস। শহরের লোক তার একটা ডাক-নাম দিল। কথায় কথায় চালু হয়ে গেল নামটা সকলের মুখে মুখে—লাল-চুলো পাগল বা লাল-পাগল।

ভিনসেন্ট ভাবে, সত্যিই আমি লাল-চুলো পাগল, ওদের কাছে। বলে বলুক, বয়েই গেল।

হোটেলের মালিক ভিনসেন্টের শেষ ফ্র্যাঙ্কটি পর্যন্ত তাকে ঠকিয়ে নেয়। আর্লসে সবাই বাড়িতে খায়। হোটেলে খাওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই। সত্যিকারের খাওয়াই জোটে না এই হোটেলে। রেস্তোরাঁগুলোতেও খাবার খুবই খারাপ, দামও তেমনি চড়া।

ভিনসেন্ট হোটেলওয়ালীকে খাবারের জন্যে তাগাদা না করে পারে না। সে বলে,—কয়েকটা আলু রান্না করা কি খুব শক্ত, মাদাম?

—শক্ত? একেবারে অসম্ভব।

—তাহলে একমুঠো চাল?

—সে তো কাল হবে।

—অন্তত ময়দার দুটো চাপাটি?

—কী যে বলেন! ময়দা তো একেবারে বাড়ন্ত।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে চিন্তা করা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ালো। যা জোটে তাই কোনো রকমে গলাধঃকরণ করা ছাড়া গতি নেই। জঠরে কান্না জমলেও অন্তর কিন্তু ভরে উঠছে সূর্য-নেশায়। খাদ্যের অভাব মেটে তামাকে আর মদে। সারা দিন প্রচণ্ড উত্তাপে আর ঝড়ের তাণ্ডবে ঈজেলের ওপর ঝুঁকে থেকে ঝিমিয়ে পড়ে স্নায়ুমণ্ডলী। তখন আবার ক্লান্ত স্নায়ুকে কশাঘাতের জন্যে দরকার হয় ঝাঁঝালো সুরার।

গ্রীষ্মের তেজ বাড়তে লাগল, সমস্ত প্রকৃতি জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। যেদিকে তাকাও রঙ শুধু ব্রোঞ্জের, ঝলসানো তামার,—কোথাও বা পুরোনো সোনার হাঁপ-ধরা গরমে আকাশের নীলে পর্যন্ত কেমন যেন সবুজের আভাস লেগেছে। তামাটে রঙের ওপর সূর্যের আলো পড়ে ঠিকরে যায়, রঙ হয়ে যায় হলুদ। এই মাথা-ঝিম-ঝিম করা নেশা-ধরানো হলুদ তার প্যালেটের প্রধান রঙ হয়ে ওঠে, ছড়িয়ে যায় ক্যানভাসে। হলদে রঙটা অচল, রেনেসাঁর পর

থেকে ইয়োরোপীয় শিল্পে এই রঙটা একেবারে অপাঙক্তেয়—কিন্তু তাতে সে ভয় পায় না। টিউবের পর টিউব হল্‌হলে হলদে রঙ গড়িয়ে গড়িয়ে সোজা এসে পড়ে তার ক্যানভাসে, আটকে আটকে যায়। হলদে ছাড়া রঙ কই? সূর্য যে তাকে মেরেছে! সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে উদ্ভাসিত, বিদগ্ধ, জ্বলন্ত তার প্রতিটি ছবি। সেইসঙ্গে প্রতিটি ছবি জুড়ে উন্মত্ত বায়ু-তরঙ্গের আলোড়ন।

সে জানে সার্থক একটি চিত্রসৃষ্টি দুর্লভ ভাগ্য,—পরশপাথর খুঁজে পাওয়ার মতো। সে জানে পাগলের মতো প্রতিদিন যা সে এঁকে চলেছে মূল্য তার নিতান্ত নগণ্য। তবু ছবি আঁকতেই হবে। ছবি যদি না আঁকে, অন্তর-কন্দরে চিত্রদীপকে যদি অনির্বাণ জ্বালিয়ে না রাখে, তাহলে তো মৃত্যু! ব্যক্তিগত জীবন বলতে তার কিছু নেই। সে যেন একটা কোন অদৃশ্য-শক্তি-তাড়িত অন্ধ অচেতন যন্ত্র, দিনে দিনে রঙিন ক্যানভাস বানিয়ে যাওয়া যার নিত্য-নির্দিষ্ট কাজ।

কিন্তু কেন? কী হবে এতে? বিক্রি হবে? পাগল! কোনো মোহ নেই আর। জানে ভিনসেণ্ট, তার ছবি কেউ কিনবে না। তবে কেন এতো ত্বরা, কেন এই অপরিসীম আত্মনিগ্রহ! কী হবে হোটেলের বন্ধ ঘরের মেঝের কোণে কোণে রঙ-বোলানো ক্যানভাসের পাহাড় জমিয়ে তুলে?

সাফল্যের বাসনা আর ভিনসেণ্টের নেই। কাজ করে চলেছে কাজ করতেই হবে বলে, আর কোনো স্বপ্ন নেই কাজের পেছনে। কাজ যদি না করে তাহলে পাগল হয়ে যাবে,—এইজন্যে। স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, সংসার নেই, গৃহ নেই,—নেই সন্তাপহর সান্নিধ্যতম স্নেহস্পর্শ। সুখ নেই, স্বাস্থ্য নেই,—ক্ষুৎপীড়িত নিরাশ্রয় ভিক্ষুক জীবন। ভরসা নেই, নেই ঈশ্বর-বিশ্বাস। আছে শুধু উন্মত্ত একটা প্রেরণা—যা সবকিছুর চাইতে বড়ো, আপন সত্তার চেয়েও—সৃষ্টির উদ্দাম উন্মাদনা।

৩

ভিনসেণ্ট মডেল জোগাড় করবার চেষ্টা করল, কিন্তু পয়সা দিয়েও কাউকে বসানো শক্ত। আশেপাশেবাসীদের ধারণা লোকটা কিম্ভূত ছবি-আঁকিয়ে, সে ছবি যদি কেউ দেখে তাহলে যাদের ছবি তারা হবে ঠাট্টার পাত্র। ভিনসেণ্ট জানত সে যদি বুগেরুর মতো মিষ্টি মিষ্টি পোর্ট্রেট আঁকত তাহলে লোকে সেধে তার কাছে আসত। মডেলের আশা সে ছেড়েই দিল, দৃশ্যপটই আঁকতে লাগল সমানে।

একদিন ভাগ্যক্রমে মাঠের মধ্যে একজোড়া মডেল তার জুটে গেল। কিশোরী একটি মেয়ে,—কফির রঙ গায়ে, ধূসর রঙের চুল, কটা চোখ। গায়ে একটি হাল্কা গোলাপি রঙের প্রায়-স্বচ্ছ ব্লাউজ, যার মধ্য থেকে সুগোল শক্ত দুটি ছোট-ছোট স্তনের আভাস সুস্পষ্ট। সরল সজীব কৃষাণ কুমারী। সঙ্গে তার মা,—নোংরা নীল রঙের পোশাক-পরা বিরাট মোটা এক মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক। অল্প কিছু

পয়সার বিনিময়ে তারা কয়েক ঘণ্টার জন্যে মডেল হতে রাজি হোলো।

সন্ধেবেলা যথারীতি হোটেলে ফিরে এল ভিনসেণ্ট। শরীরজোড়া ক্লান্তি, কিন্তু সেই কফি-রঙের মেয়েটির কথা মাথার মধ্যে ঘুরছে। কতো দিন হয়ে গেল একটি মেয়ের সঙ্গে সে কথা পর্যন্ত বলেনি। অবশ্য হোটেলওয়ালী বা পথের কোনো দোকানদারনী ছাড়া। ঘুম আসে না, নারীসঙ্গের কামনা রক্তকে চঞ্চল করে তোলে। হঠাৎ মনে পড়ে মার্গটের কথা—তার আলিঙ্গন, তার চুম্বন, তার কম্পিত আত্মদান।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল ভিনসেণ্ট। বার হোলো পথে। জানে সে, শহরে কয়েকটা বাড়ি আছে যেখানে ফ্র্যাঙ্ক-পাঁচেক খরচ করলেই কয়েক ঘণ্টার জন্যে মেয়েমানুষ জোটে। সাধারণত সেগুলোর খদ্দের ভাড়াটে নিগ্রো সৈনিকের পাল। তবু তার পা চলল সেই পথে।

বিষম হট্টগোল। একজোড়া নিগ্রোকে কয়েকটা মাতাল ইটালিয়ান খুন করেছে। পুলিশ এসেছে, দৌড়চ্ছে লোকজন। ভিনসেণ্টও দৌড়ল। রুবিকো-লেতের ১ নম্বর বাড়িটাতে সে ঢুকে পড়ল। এ অঞ্চলের অন্যতম গণিকাগৃহ। মালিক তাকে খাতির করে হলঘরের পাশের একটা ফাঁকা ঘরে বসালো।

বললে,—কী রকম চান স্যার? একটি মেয়েকে দেখাই, ভারি খুবসুরৎ। একেবারে কচি, র‍্যাচেল নাম। অবশ্য তাকে যদি পছন্দ না হয়, অন্য মেয়েও হাজির করব।

টেবিলের ধারে হেলান দিয়ে বসে ভিনসেণ্ট পাইপ ধরালো। বাইরে একটু খিলখিল হাসির শব্দ, তার পরেই একটি মেয়ে নাচতে নাচতে এসে ঘরে ঢুকল। ভিনসেণ্টের সামনের চেয়ারটায় বসে মেয়েটি হাসিমুখে তার দিকে তাকালো—আমার নাম র‍্যাচেল।

—তোমাকে পাঠিয়েছে? বিস্ময় ভিনসেণ্ট বললে,—তুমি যে বাচ্চা খুকি।

—খুকি! ইঃ, বললেই হোলো! জানেন? আমার বয়েস ষোলো!

—কতোদিন থেকে তুমি এখানে আছ?

—পুরো একটি বছর।

—তাই নাকি? আচ্ছা, দেখি তো তোমাকে ভালো করে।

গ্যাসের হলদে আলোটা পেছন দিকে। আবছা অন্ধকারে মেয়েটির মুখ। দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে সে উঁচু করে মুখটি তুলল।

গোলগাল সরল মুখটা, ভাষাহীন নীল চোখ, চিবুক। মাথার কালো চুল-গুলি উঁচু করে বাঁধা, তাতে মুখটা আরো গোল দেখাচ্ছে। গায়ে একটা হাল্কা ছাপা কাপড়ের জামা, পায়ে পাতলা চটি। সুগোল বুকের বৃন্তদুটি স্পষ্ট চোখে যেন চেয়ে আছে ভিনসেণ্টের দিকে দ্বিধাহীন ইঙ্গিতে।

ভিনসেণ্ট বললে,—তোমাকে তো বেশ দেখতে র‍্যাচেল।

শিশুসুলভ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মেয়েটির শূন্য দৃষ্টি। কাছে

এগিয়ে এসে ভিনসেন্টের হাতদুটি ধরল,—ভালো লেগেছে আপনার ? আমাকে যাদের ভালো লাগে, সেসব লোককে আমারও ভালো লাগে। নইলে কেমন যেন অসুবিধে হয়, তাই না ?

—ঠিক বলেছ। আচ্ছা আমাকে তোমার কেমন লাগছে ?

খিল-খিল করে হেসে উঠল র‍্যাচেল। বললে,—আপনি তো মজার মানুষ গো ! লাল-পাগল !

—লাল-পাগল ! চমকে উঠল ভিনসেন্ট, চেনো তুমি তাহলে আমাকে ?

—বাঃ, আমি যে আপনাকে প্লেস লামার্টিনে দেখেছি। ওইখানে তো আপনি থাকেন, তাই না ? ভোরবেলা পিঠে মস্ত একটা বোঝা নিয়ে হন-হন করে আপনি রোজ যান কোথায় ? আর মাথায় টুপিই বা দেন না কেন ? রোদে মাথা পোড়ে না ? চোখদুটো তো দেখি টকটকে লাল, ব্যথা করে না ?

হেসে উঠল ভিনসেন্ট মেয়েটির সোজাসুজি কথা বলার ঢঙে। বললে,— তুমি ভারি মিষ্টি র‍্যাচেল। আমাকে 'আপনি আপনি' বলছ কেন ? আচ্ছা, আমার নামটা যদি তোমাকে বলি, সেই নামে আমাকে ডাকবে ?

—কী নাম ?

—ভিনসেন্ট।

—না, লাল-পাগলই ভালো, ঐ নামেই ডাকব, রাগ কোরো না। আর, একটা কিছু মদ নাও না গো ! দেখছ না, বাড়িওয়ালা বুড়ো কেমন করে দূর থেকে তাকাচ্ছে ?

সদা হাসি-হাসি মুখ মেয়েটির। খুশি হতে চায়, খুশি করতে চায়। দাঁত-গুলো বেশ সমান সাজানো, যদিও খুব চকচকে নয়। ঘন নিম্নোষ্ঠটির নিচে চিবুকের ওপরের গভীর ভাঁজটি সুস্পষ্ট, সুন্দর।

ভিনসেন্ট আপত্তি করল না। বললে,—একটা বোতল নাও। তবে, খুব দামি জিনিস নিয়ো না, বেশি টাকা নেই আমার কাছে।

মদ আসতে র‍্যাচেল বললে,—চলো না, আমার ঘরে গিয়ে খাব। অনেক ভালো লাগবে সেখানে !

—বেশ তো, চলো।

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে র‍্যাচেলের ছোট্ট ঘর। সরু একটি খাট, একটি চেয়ার, নিচু একটি টেবিল-আলমারি। টেবিলের ওপর আরশির দুপাশে ছেঁড়াখোঁড়া দুটি পুতুল।

র‍্যাচেল বললে,—পুতুলদুটো বাড়ি থেকে এনেছি। ওদের নিয়ে ছেলেবেলায় বাড়ি-বাড়ি খেলতাম। নাও, ধরো দেখি দু-হাতে, দেখি তোমাকে কেমন দেখায় ! এই এর নাম জ্যাকেস, আর এর নাম ক্যাথারিন। খোকা আর খুকি।

বোকার মতো হাসিমুখে দুই হাতে দুই পুতুল নিয়ে দাঁড়াল ভিনসেন্ট। এই দেখে র‍্যাচেলের হাসি আর থামে না। তারপর পুতুলদুটো ভিনসেন্টের হাত

থেকে নিয়ে সে নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর এক ঝটকায় পোশাকটা খুলে ফেলল গা থেকে। বললে,—বোসো লাল-পাগল। এবার আমরা বাড়ি-বাড়ি খেলব। তুমি হবে বাবা আর আমি মা, ঠিক না?

বেঁটে মোটা-সোটা মেয়েটির দেহ, শক্ত বাঁধুনি। পৃথু জঘন, দৃঢ় দুটি স্তনের সূক্ষ্মাগ্র বৃন্তদ্বয়, সুগোল স্ফীত উদর, নিম্নোদরটি গভীর।

ভিনসেণ্ট খাটে বসে বললে,—র‍্যাচেল, তুমি যেমন আমাকে লাল-পাগল বলে ডাকছ, আমিও তেমনি তোমার একটা ডাক-নাম দেব।

হাততালি দিয়ে উঠল র‍্যাচেল,—ভিনসেণ্টের কোলে বসে পড়ে বললে,—কী মজা! কী ডাক-নাম,—কী নামে ডাকবে?

—পায়রা একটা তুমি। আমি তোমাকে ডাকব পায়রামণি বলে।

ঠোঁট ফুলোলো র‍্যাচেল,—ছাই নাম, পচা নাম! আমি বুঝি পায়রা?

ভিনসেণ্ট র‍্যাচেলের ফুলো ফুলো গোলগাল পেটটির ওপর হাত বুলিয়ে দিল। বললে,—হ্যাঁ ঠিক তোমাকে পায়রার মতো দেখতে যে! পায়রার মতো নরম নরম চোখ, আর তুলতুলে ফুলো পেটটি।

—আচ্ছা বেশ। তা পায়রা হওয়া ভালো না খারাপ?

—খুব ভালো। পায়রারা খুব সুন্দর, সবাই তাদের ভালোবাসে। আর তুমিও তো তাই—

র‍্যাচেল ভিনসেণ্টের গায়ে এলিয়ে পড়ে তার কানের কাছে চুমু খেয়ে কোল থেকে লাফিয়ে উঠল। মদ খাবার জন্যে দুটো বড়ো গেলাস নিয়ে এল সে। লাল টকটকে মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সে বললে,—লাল-পাগল, তোমার কানদুটো কী ছোট্ট ছোট্ট, ভারি মজার দেখতে।

—শেষ পর্যন্ত আমার কানদুটো তোমার পছন্দ হোলো নাকি?

—হ্যাঁ, ভারি নরম, ঠিক যেন কুকুরছানার কান। কেবল খেলা করতে ইচ্ছে করে ওদুটো নিয়ে।

—বটে! তাহলে আমার কানদুটো একদিন তোমাকে দিয়েই দেব।

আবার হাসিতে ফেটে পড়ল র‍্যাচেল। মুখের কাছে ধরা গ্লাসটা থেকে কয়েক ফোঁটা লাল মদ তার বাঁ বুকের ওপর চলকিয়ে পড়ল, তারপর শীর্ণ একটি রক্তিম রেখায় দু-বুকের উপত্যকা দিয়ে গড়িয়ে স্ফীত উদরটি পার হয়ে হারিয়ে গেল ত্রিভুজের অন্ধকারে।

—তুমি খুব ভালো লাল-পাগল! সবাই বলে তোমার মাথা খারাপ, ওরা কেউ তোমাকে জানে না। আচ্ছা তুমি বলো তো, সত্যি তুমি পাগল?

হেসে বললে ভিনসেণ্ট,—তা হবে, তবে কিনা একটু-একটু।

আবদারের সুরে র‍্যাচেল বললে এবার,—আচ্ছা লাল-পাগল, তুমি আমার ভালোবাসার মানুষ হবে? রোজ রাত্তিরে আসবে আমার কাছে?

—রোজ পারব না, র‍্যাচেল।

—কেন পারবে না ?

—অনেক কারণে, তার মধ্যে একটা ধরো এইজন্যে যে, রোজ আসবার মতো টাকা আমার নেই।

ভিনসেন্টের ডান কানটা ধরে আদর করতে করতে র‍্যাচেল উত্তর দিল,—ইঃ, ভারি তো মোটে পাঁচটা ফ্র্যাঙ্ক। না থাকে, তার বদলে তোমার একটা কান আমাকে দিয়ে দেবে বলো ? আমি তাহলে রোজ তোমার কান নিয়ে খেলা করতে পারব।

—বেশ, কিন্তু পরে যদি পাঁচটা ফ্র্যাঙ্ক শোধ দিই, কানটা আমাকে ফেরত দেবে তো ?

—ও লাল-পাগল, কী মজার মানুষ তুমি! কতো লোক এখানে আসে, তোমার মতো লোক বেশি করে আসে না কেন।

—কেন পায়রামণি ? তোমার কি এখানে ভালো লাগে না ?

—তা লাগবে না কেন ? তবে ঐসব কালো নিগ্রোগুলো, ওদের কি কেউ সইতে পারে নাকি ?

মদের গ্লাসটা নামিয়ে র‍্যাচেল দু-হাতে শক্ত করে ভিনসেন্টের গলা জড়িয়ে ধরল। তার শক্ত বুক চেপে ধরল ভিনসেন্টের বুকে, গোল পেটটি একটু একটু ঘষতে লাগল তার শরীরে। ভিনসেন্টের মুখে মুখটি ডুবে গেল তার। নিম্নোষ্ঠটি তার কাঁপতে লাগল ভিনসেন্টের ক্ষুধার্ত চুম্বনে।

—বলো লাল-পাগল, কথা দাও আবার তুমি আসবে, ভুলে যাবে না আমাকে?

—আসব, আসব পায়রামণি।

—তাহলে আর দেরি নয়। এসো, এবার আমরা বাড়ি-বাড়ি খেলা শুরু করি, কেমন লাল-পাগল ?

আধঘণ্টাটাক পরে ভিনসেন্ট নিষ্ক্রান্ত হোলো বাড়িটা থেকে। সারা বুক-জোড়া জ্বালা-ধরা তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণা মিটল আকণ্ঠ ঠাণ্ডা জল পান করে।

৪

ভিনসেন্ট দেখল, শুকনো রঙকে যতো মসৃণভাবে গুঁড়ো করা যায়, তেলের সঙ্গে সেই রঙ জমে ততো ভালো। তেলটা তো রঙ নয়, রঙের বাহক মাত্র। প্যারিসের গুঁড়ো রঙ চমৎকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রঙওয়ালা গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পাউডার বানায় রঙের। ক্যানভাসের ওপরটা মসৃণ চেহারার না-ই বা হোলো, ভিনসেন্টের এমন কিছু তাতে এসে যায় না। থিয়োর নির্দেশমতো পীয়ের ট্যাঙ্গি তার কাছে মোটামুটি কয়েক প্রকার রঙের ডেলা পাঠিয়েছে, ভিনসেন্ট নিজেই তার হোটেলের ঘরে বসে গুঁড়িয়ে নিতে লাগল। ব্যবহার করতে শুরু করল নিজের হাতে তৈরি করা টাটকা রঙ খরচও অনেক কম পড়তে লাগল এতে।

এরপর তার অসুবিধে হতে লাগল ক্যানভাস নিয়ে। সাধারণত ক্যানভাসের ওপর পাতলা করে প্ল্যাস্টারের কোটিং লাগানো থাকে, রঙকে শুষে নেবার জন্যে। কিন্তু যে মোটা রঙ সে চড়ায় তার ছবিতে, প্ল্যাস্টারের অতো পাতলা কোট তা টেনে উঠতে পারে না। থিয়োকে বলে সে কাঁচা ক্যানভাসের থান আনাতে শুরু করল। থান থেকে ক্যানভাস কেটে নিয়ে নিয়ে রাত্রে বসে নিজেই তাতে প্ল্যাস্টার দিতে লাগল। রাত্রে প্ল্যাস্টার শুকোবার পর পরদিন সেই ক্যানভাসে ছবি আঁকতে কোনো অসুবিধে নেই।

ছবির ফ্রেম সম্বন্ধে চিন্তা জর্জেস সিউরাতই প্রথম তার মাথায় ঢোকায় প্যারিসে থাকতে। আর্লস থেকে প্রথম-প্রথম যখন থিয়োর কাছে ছবি পাঠাতে ভিনসেণ্ট শুরু করল, তখন সে প্রতিটি ছবি কী রকম কাঠে কোন্ রঙের ফ্রেমে বাঁধাই করতে হবে তারও নির্দেশ দিতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের ছবির ফ্রেম নিজের চোখে না দেখে নিজের হাতে না তৈরি করে তার তৃপ্তি হয় না। দোকান থেকে লম্বা লম্বা চেরা কাঠ সে কিনে আনতে লাগল। সাইজ-মতো সেই কাঠ কেটে নিয়ে প্রত্যেক ছবির ফ্রেম নিজেই সে বানাতে লাগল। প্রতিটি ফ্রেম রঙ করতে লাগল ছবির সঙ্গে মানিয়ে।

নিজের রঙ নিজেই সে বানায়, ক্যানভাসেও নিজেই সে প্লাস্টার করে, নিজের ছবির ফ্রেম তৈরি করে নিজের হাতে।

মনে মনে বলে,—এবার নিজের ছবিগুলো নিজেই যদি কিনতে পারতাম তাহলে আর কারো মুখের দিকে তাকাতে হোতো না।

আবার ঝড়ের দিন এল। প্রকৃতি-জোড়া উত্তাল তাণ্ডব। মেঘচিহ্নবিহীন আকাশে খরকরোজ্জ্বল সূর্য, এদিকে দুরন্ত বাতাসে তুহিনশীতল ঝাপট। ঘরে বসে বসে ভিনসেণ্ট সযত্নে একটি স্টিল লাইফ আঁকল। নীল এনামেলের একটি কফি-পট, নীল আর সোনালী রঙের পেয়ালা, নীল আর সাদা চৌখুপি কাটা দুধের পাত্র, লাল সবুজ আর ব্রাউন রঙের নক্সা-কাটা একটি জগ, তিনটি পাতিলেবু আর দুটি কমলা।

ঝড়ের দিন ফুরোবার পর ভিনসেণ্ট আবার বার হোলো ঘর থেকে। আঁকল রোন নদীর ওপরে ট্রিংকোয়েতেলের লোহার পুলটাকে কেন্দ্র করে একটি বহির্দৃশ্য। আবসাঁত রঙের আকাশ আর নদীর বুক, গভীর কালচে নীল রঙের লোহার পুলটা, কোথাও সুস্পষ্ট কমলা রঙ আর গভীর সবুজের ছোপ, পুলের ওপর রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ধুসর কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি। সমস্ত দৃশ্যপট জুড়ে কেমন একটা হৃদয়বিদারক হতাশার ভাব জড়ানো।

যেমন দেখছি ঠিক তেমনটি আঁকতে হবে, একথা ভিনসেণ্ট বিশ্বাস করে না। ইচ্ছেমত রঙের ব্যবহার সে করে বলিষ্ঠতর অভিব্যক্তির প্রেরণায়। প্যারিসে তাকে পিসারো এই কথাটাই বলেছিল,—রঙ শুধু প্রকৃতির প্রতিফলন নয়, রঙ অতিরঞ্জন করে, আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে। মোপাসাঁর রচনাতেও এই কথাটিই

এক জায়গায় সে পেয়েছে,—অতিশয়োক্তির অধিকার শিল্পীর আছে,কেননা শিল্পী জগতের বাস্তবতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকতে পারে না, সুন্দরতর জগতের সন্ধান সে দেয়; আনে করুণতর আশ্বাসের ইশারা।

একদিন সে রৌদ্রজ্বলা শস্যক্ষেত্রে বসে সারাদিন খুব খাটল। ছবি আঁকল সে লাঙল-চষা মাঠের—ওলটপালট মাটির গাঢ় বেগুনি রঙের চাঙড়ের পর চাঙড়, নীল আর সাদা পোশাক পরা একজন কৃষাণ, চক্রবালের কাছাকাছি পাকা শস্যের আভাস, মাথার ওপর হলদে রঙের আকাশ আর হলদে রঙের সূর্য।

ভিনসেণ্ট জানে, প্যারিসের সমালোচকদের মতে বড়ো তাড়াহুড়ো করে সে আঁকে। বয়ে গেল তাতে! প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণ যদি তাকে তাড়না করে নিয়েই চলে, কেন অনুভূতির উৎসদ্বার সে রুদ্ধ করে রাখবে? এমনি কতো প্রহর যায় যখন সে আঁকে উন্মত্তের মতো; মনেই থাকে না যে সে আঁকছে, খেয়াল থাকে না কোন্ রঙের পর কোন্ রঙ সে চড়াচ্ছে, রেখার পর রেখার সামঞ্জস্য আসছে কেমন করে, কোন্ মন্ত্রবলে সম্পূর্ণ হচ্ছে ছবির পর ছবি। আবার কতো নিষ্ফলা দিন হয়তো জীবনে আসবে যখন কোনো ভাবকে আঁকড়ে ধরতে পারবে না মন, কোনো প্রেরণা জাগবে না হৃদয়ে, দিনের পর দিন কাটবে কর্মহীন অচরিতার্থতায়! দেরি করবার, আস্তে আস্তে কাজ করবার সময় তাহলে তার এখন কোথায়?

ছবিটা শেষ করে দিনের শেষে পিঠে ঈজেল বেঁধে সে যাত্রা শুরু করল শহরের দিকে। পথে সামনে আস্তে আস্তে হাঁটছিল একটি লোক আর একটি ছেলে। শীঘ্রই সে তাদের ধরে ফেলল। কাছে আসতে দেখল, লোকটি ডাকপিওন রুলিন। কাফেতে অনেকবার সে রুলিনকে দেখেছে, তবে, আলাপ হয়নি কোনদিন।

কাছাকাছি এসে ভিনসেণ্ট ডাকল,—নমস্কার, মঁশিয়ে রুলিন।

—কে? ও, শিল্পী বুঝি? নমস্কার। বিকেলে ছেলেকে নিয়ে একটু বেড়াতে বার হয়েছি।

—সুন্দর দিনটা, তাই না?

—সত্যি। এই ঝড়টা যখন বন্ধ হয়, তখনই দিন ভালো হয়।—ছবিটা আজই আঁকলেন নাকি? আমি অশিক্ষিত লোক মঁশিয়ে, আর্টের কিছুই জানিনে। তবু কী আঁকলেন, দয়া করে একটু দেখাবেন?

—নিশ্চয়ই, এ তো আনন্দের কথা।

ছেলেটি এগিয়ে চলল। রুলিন নিবিষ্ট মনে ছবিটা দেখতে লাগল। ভিনসেণ্ট এই অবসরে ভালো করে লক্ষ করল রুলিনকে। গায়ে তার নীল রঙের ইউনিফর্ম,মাথায় নীল টুপি। শান্ত কৌতূহলী চোখদুটি রুলিনের, বুক পর্যন্ত নেমে আসা ঢেউখেলানো দাড়ি। সারা মুখে কেমন একটা সহৃদয় করুণ ভাব—ভিনসেণ্টের মনে পড়ল পীয়ের ট্যাঙ্গিকে।

রুলিন আবার বললে,—আমি একেবারে মুখ্যু মানুষ, মশিয়ে, আবোল তাবোল যদি কিছু বলে ফেলি, মনে কিছু করবেন না। আপনার ছবির এই শস্যক্ষেত্র আশ্চর্য জীবন্ত কিন্তু,—ঠিক ঐ ক্ষেত যেখানে বসে আপনি আঁকছিলেন, ঐ সত্যিকারের ক্ষেতের মতোই জীবন্ত।

—ছবিটা ভালো লাগল তাহলে আপনার?

—তা বলতে পারব না। ভালো লাগল কি না বলা শক্ত। তবে একথা বলব, ছবিটা যেন একেবারে এইখানে, এই বুকের মধ্যে এসে নাড়া দিল।

মো-মাজুরের প্রাচীন মঠটার কাছে এসে তারা একটু থামল। শেষসূর্যের রক্তিম ছটা মঠের চূড়োটা রাঙিয়ে দিয়েছে, আশে-পাশে টিলার মাথায় পাইন শাখার সবুজে সূর্যাস্তের সোনার মাখামাখি। দূরের বৃক্ষশ্রেণী নীলাভ ঘন সবুজ, পশ্চিম আকাশে যেমনি আরক্ত বর্ণাঢ্য, পূর্ব আকাশে তেমনি নীলাভ ধূসরতা। ঐ নীল যেন নেমেছে সাদা বালি আর সাদা পাথরের বুকে।

রুলিন চারদিকে তাকিয়ে বললে,—এও জীবন্ত, তাই না মঁশিয়ে?

ভিনসেন্ট বললে,—হ্যাঁ। আমাদের জীবন যখন ফুরিয়ে যাবে, তখনো এমনি জীবন্তই থাকবে।

দুজনে পাশাপাশি আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে এগোলো। সরল রুলিনের মন, কথাবার্তায় সারল্য আর গভীরতার সমন্বয়। সংসারে তার স্ত্রী আর চারটি ছেলেমেয়ে। আয় মোটে মাসিক একশো পঁয়ত্রিশটি ফ্র্যাংক। প্রতি বৎসরে যৎসামান্য করে বেড়ে বেড়ে এতোদিনে এই বেতনে এসে পৌঁছেছে।

—আমার যখন বয়েস কম ছিল মঁশিয়ে, রুলিন বললে,—ভগবানের কথা খুব ভাবতাম। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাটা কমে আসছে, তাই বলে অবিশ্বাসী আমি নই। আপনার আঁকা ঐ শস্যের ক্ষেত, আর মো-মাজুরের এই সূর্যাস্ত,—এদের মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন। কিন্তু যখন মানুষের কথা ভাবি, মানুষের হাতে গড়া এই পৃথিবীর কথা ভাবি—

ভিনসেন্ট তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—আমি বুঝি রুলিন। কিন্তু মানুষের গড়া সভ্যতা দিয়ে ভগবানকে বিচার করা চলে না। এ যেন একটা ছবি, যেটা ঠিকমতো আঁকা হয়নি। কিন্তু যিনি চিত্রকর তাঁকে যদি ভালোবাসি তাহলে তাঁর এই একটা ছবি খারাপ হলেই বা কী? নিন্দে করব না, বিশ্বাস হারাব না। হ্যাঁ, তবে মনে মনে কামনা করব বৈকি—ভালো হোক, আর-একটু ভালো হোক।

রুলিন বললে,—যা বলেছেন,—বেশি চাই না,—একটুখানি ভালো হোক, তাই অনেক।

ভিনসেন্ট বললে,—একটি ছবি দেখেই শিল্পীকে বিচার করলে চলবে না। তাঁর অন্য ছবিগুলোও দেখতে হবে। পৃথিবীটা ঈশ্বরের একটা তাড়াতাড়ি-খারাপ-করে-আঁকা ছবি, শিল্পীর বদ-মেজাজের সৃষ্টি।

আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথে সন্ধ্যা নেমেছে। কালচে নীল আকাশের ঘন আস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে কয়েকটি উজ্জ্বল তারা। রুলিনের সরল চোখদুটি ভিনসেন্টের মুখে গভীর একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজল। শুধোলো,— আপনি বিশ্বাস করেন মঁশিয়ে, এই ইহজগতের পরেও জগৎ আছে?

—জানিনে রুলিন। ছবি আঁকাকে কাজ বলে নেবার পর থেকে ওসব চিন্তা আমি ছেড়ে দিয়েছি। তবে এটা ঠিক যে এ জীবনটা বড়ো অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়, জীবন আর মৃত্যুর কথা ভাবলে মনে হয় যেন এই আছি আর এই নেই,—কিছুই করা হয়ে উঠল না।

—আপনারা শিল্পী কিনা, কত কথাই যে আপনাদের মাথায় আসে!

ভিনসেন্ট এবার বললে,—রুলিন, একটা উপকার আমার করবে? তোমার একটা পোর্টেট আঁকব, আঁকতে দেবে?

—কী বলেন আপনি! এ তো আমার মস্ত ভাগ্য! কিন্তু আমাকে যে বড়ো কুৎসিত দেখতে মঁশিয়ে,—আমার ছবি আঁকবেন কেন?

—কে বললে কুৎসিত? ঈশ্বর যদি সত্যি থাকেন,—নিশ্চয়ই তাঁর তোমার মতো চোখ, তোমার মতো দাড়ি।

—ঠাট্টা করছেন মঁশিয়ে?

—ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি। তোমার একটা ছবি আমি আঁকতে চাই।

—কাল রাত্রে তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন। খুব সামান্য আমাদের খাওয়া দাওয়া, গরিব তো? তবে, যদি আসেন বড়ো খুশি হবো।

মাদাম রুলিন ভারি মিষ্টি স্বভাবের মহিলা। তাঁকে দেখে মাদাম ডেনিসের কথা ভিনসেন্টের মনে পড়ল। টেবিলের ওপর লাল-সাদা চেক কাপড়ের টেবিল-ঢাকা, আলুসেদ্ধ তরকারি, ঘরে-সেঁকা রুটি, আর টক মদ এক বোতল। খাওয়া শেষ হবার পর ভিনসেন্ট রুলিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাদাম রুলিনের একটা স্কেচ করতে লাগল।

রুলিন বললে,—বিপ্লবের সময় আমি, মঁশিয়ে, রিপাবলিকান ছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি লাভ আমাদের কিছুই হয়নি। শাসন আমাদের যারা করবে, তারা রাজাই হোক বা মন্ত্রীই হোক গরিবের ওপর শোষণ তাতে কমবে না। আমি ভেবেছিলাম রিপাবলিক হলে সত্যিই বুঝি সবাই সমান হবে, সমান হবে সকলের সুখ সুবিধে।

—তা হবার নয়, রুলিন।

—দেখছি তা, কিন্তু মনের প্রশ্নটা তাতে যায় নি। সারা জীবন ধরে এই কথাটা ভাবলাম,—এ কেমনধারা কাণ্ড —একজন শুকিয়ে মরবে, আর একজনের স্বচ্ছলতার শেষ থাকবে না? একজন রক্ত জল করবে খেটে খেটে, আর একজন নিশ্চিন্ত আলস্যে দিন কাটাবার সুযোগ পাবে—এ কেমন করে সম্ভব? লেখাপড়া বিশেষ জানিনে, সেজন্যেই বুঝতে পারিনে হয়তো। খুব পণ্ডিত হলে বোধহয়

বুঝতে পারতাম,—তাই না মশিয়ে ?

চট করে ভিনসেণ্ট তাকাল রুলিনের চোখের দিকে। না, কোনো ব্যঙ্গের আভাস নেই। তেমনি স্বচ্ছ সরল দৃষ্টি।

ভিনসেণ্ট বললে,—এর নাম সামাজিক অবিচার, রুলিন। পৃথিবীর নানা পণ্ডিত বড়ো বড়ো যুক্তি দিয়ে এই অবিচারকেই সুবিচার বলে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু আমিও তোমারই মতন অজ্ঞ, অশিক্ষিত, রুলিন। তাই সেসব যুক্তি বুঝতেও পারিনে,—মানতেও পারিনে।

৫

পর-পর সাতটি দিন। প্রত্যূষ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাতদিনে সাতটি ছবি সে আঁকল, একটি করে রোজ। সাতদিন পরে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল সারা শরীর মন। তুলি ধরতে পারে না হাতে, মনে পড়ে না কোন্ রঙের কী নাম।

এমনি সময়ে আবার শুরু হল সর্বনেশে ঝড়,—ধুলোয় সাদা হয়ে উঠল গাছের পাতার রঙ। ঘর ছেড়ে বার হবার উপায় নেই,—দিনে ষোলো ঘণ্টা করে ঘুমোতে লাগল ভিনসেণ্ট।

আবার ভাগ্য খারাপ। সব পয়সা ফুরিয়ে গেল বৃহস্পতিবারের মধ্যে। সোমবার দুপুরের আগে থিয়োর কাছ থেকে টাকা আর চিঠি আসবার কথা নয়। থিয়োর দোষ নেই। আগেকার মতোই দশ দিন অন্তর অন্তর সে পঞ্চাশ ফ্র্যাংক করে পাঠায়। এর ওপর ছবি আঁকার সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম তো আছেই। ছবিগুলোতে ফ্রেম লাগাবার আগ্রহে হিসেবের বাইরে অনেকগুলো টাকা সে খরচ করে ফেলেছে। তাই তার এই দুরবস্থা চলেছে। পেটে পড়ছে শুধু শুকনো রুটি আর কফির পর কফি।

গৃহবন্ধ ক্লান্ত শরীরে ও মনে নেমে এল পাণ্ডুর হতাশা। অর্থহীন তার জীবন, থিয়োর যে ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থ দান,—এই নিরর্থক শিল্পী-জীবন দিয়ে তার মূল্য শোধ করা যাবে না। থিয়োর যত টাকা সে খরচ করেছে, সে টাকা নেবার অধিকার কোথায় তার ছিল ? সে টাকা ফিরিয়ে দেবে কোন্ উপায়ে ? ছবির পর ছবি পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে, —কী দাম তাদের ? যে মূল্য দিয়ে ঐ সব ছবির আঁকিয়ে হবার আত্মপ্রসাদ সে পেয়েছে, তার এক কণাও মিলবে না ঐ ছবি থেকে।

সমস্ত গ্রীষ্মকাল ধরে ঝাঁক-ঝাঁক মৌসুমি পাখির মতো তার মনে ভিড় করে এসেছে কতো ছবির আইডিয়া। পাগল হয়ে কাজ করেছে। দম ফেলবার সময় পায়নি, নিঃসঙ্গ মনে হয়নি এক মুহূর্তের জন্যেও। এখন মাথাটা ফাঁকা, পকেট খালি, বুকজোড়া একাকিত্ব। এইসব ছবি একের পর এক সামনে ছড়ানো,—ছবির জঞ্জাল সব।

মনে মনে বললে ভিনসেণ্ট,—যাই হোক, সাদা ক্যানভাসের চাইতে রঙ-লেপা

ক্যানভাস ভালো, এইটুকুই হোক আমার কাজের সার্থকতা। এর বেশি অহমিকা নাই বা থাকল। এইটুকুই থাক আত্ম-অধিকার।

এই আর্লসের উষ্ণ সূর্যের তলায় একক জীবনেই সে খুঁজে পাবে আপনার সৃষ্টি-সত্তাকে। সময় নেই, জীবন বড়ো স্বল্প। ছবি তাকে আঁকতেই হবে—মুহূর্ত অপব্যয় না করে।

ভাবল মনে মনে,—শরীর যাক, শিল্পীর আঙুলগুলো আমার নরম হচ্ছে নিশ্চয়ই।

কী কী রঙ প্রয়োজন তার একটা তালিকা সে পাঠাল থিয়োর কাছে। হঠাৎ মনে হোলো, যেসব রঙ তার চাই, ডাচ শিল্পে সেসব রঙের একটিরও দেখা পাওয়া যাবে না। মভ, মারিস বা উইসেনব্রাক সযত্নে এই তালিকার প্রত্যেকটি রঙকে বর্জন করবে। হল্যান্ডের শিল্পরীতির সঙ্গে তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়েছে এই আর্লসে এসে।

সোমবার দিন টাকা আসতে সে একটা রেস্তোরাঁ জোগাড় করল যেখানে এক ফ্র্যাংক খরচ করলে বেশ একপেট ভালো খাওয়া যায়। বড় পছন্দ হোলো রেস্তোরাঁটা।

দিনকয়েক সে চুপচাপ বাড়িতে বসে ছিল। এবার ঠিক করল, কদিন রাত্রে কাজ করবে। রেস্তোরাঁটির রাত্রির ছবি সে আঁকল,—খদ্দেররা ডিনার খাচ্ছে,—ছুটে বেড়াচ্ছে পরিচারিকার দল। আঁকল সে প্রভেন্সের বড়ো বড়ো তীক্ষ্ণোজ্জ্বল তারকা-খচিত কালো-নীল উন্মুক্ত আকাশ। পথের ধারের সাইপ্রেস গাছ চাঁদের আলোয় ধরা পড়ল তার ছবিতে। কাফে দি নুইট সারারাত্রি খোলা থাকে,—মাতাল আর যাযাবররা আশ্রয় নেয় দিনের শেষ থেকে দিনের শুরু পর্যন্ত যখন খুশি। এই কাফে হোলো তার শিল্পসৃষ্টির উপজীব্য।

এক রাত্রে সে কাফের বাইরেটা আঁকল,—আর এক রাত্রে ভেতরটা। লাল আর সবুজ এই দুটি মুখ্য রঙ দিয়ে সে প্রকাশ করতে চাইল মানুষের বিভিন্নমুখী অন্তর্দাহকে। কাফের ভেতরটা সে আঁকল রক্তের মতো লাল আর জ্বলজ্বলে হলুদ রঙ দিয়ে,—মাঝখানে বড়ো একটা বিলিয়ার্ড টেবিল সবুজ। চারটে কমলা রঙের বাতি, তাতে সবুজের আভা মাখানো হলদে আলো। এদিকে ওদিকে ঘুমন্ত মানুষের মূর্তি। লাল আর সবুজ রঙের মধ্যে কোনো সমতা নেই, কোনো ছন্দ নেই। কেমন একটা বীভৎস রূপ সমস্ত ছবিটিকে জড়িয়ে—এই কাফে যেন একটা ভয়ংকর জায়গা,—এখানে প্রকাশ মনুষ্যচরিত্রের ধ্বংসের চেহারা—অন্যায় আর পাপ যে ধ্বংসের পথে মানুষকে টানে।

আর্লসের লোকেরা ভিনসেন্টের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেল। দ্যাখো লাল-পাগলের খেয়াল! রাতে আঁকে, আর সারা দিন ঘুমোয়। ভারি মজা তো!

মাসকাবারে হোটেলওয়ালা বললে,—ঘরভাড়া বাড়াতে হবে, আর যে ছোট্ট

ঘরখানায় ভিনসেন্ট ছবি রাখে সেখানার জন্যেও আলাদা ভাড়া চাই। এই হোটেলটা ভিনসেন্টের অসহ্য হয়ে উঠেছে—ঘৃণিত এর মালিকের ব্যবহার। এখানকার খাওয়া খেয়ে পেটের অসুখ চলেছে। পয়সাও জলের মতো নষ্ট। কিন্তু যাবে কোথায় ? শীত আসছে। স্টুডিয়ো নেই, কাজই বা করবে কেমন করে ?

একদিন বুড়ো রুলিনের সঙ্গে প্লেস লামার্টিন পার হবার সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল হলদে একটা বাড়ি। তার গায়ে লেখা রয়েছে—বাড়ি ভাড়া। বাড়িটার মাঝখানে চওড়া একটা দেউড়ি, দু-ধারে দুটি অংশ। লোভী দৃষ্টিতে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভিনসেন্ট বললে,—নাঃ, বাড়িটা যে বড্ডো বড়ো ! এমনি যদি একটা বাসা পেতাম নিজের থাকবার জন্যে !

রুলিন বললে,—তা মঁশিয়ে, গোটা বাড়িটা ভাড়া নেবার আপনার কী দরকার ? ঐ ডানদিকের অংশটা আলাদা করে আপনি ভাড়া নিতে পারেন।

—অ্যাঁ, তা কি সম্ভব ? কখানা ঘর হবে ডানদিকটাতে ? খুব বেশি ভাড়া পড়বে নাকি ?

—তিন-চারখানা ঘর হবে। আর ভাড়া হবে আপনার হোটেলভাড়ার অন্তত অর্ধেক। কাল দুপুরবেলা খাওয়ার ছুটির সময় আপনাকে নিয়ে আসব। মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা হবে তখন। কী বলেন ?

পরদিন সকাল থেকে ভিনসেন্টের উত্তেজনার সীমা নেই। বাড়িটার সামনে পায়চারি করতে লাগল বারে বারে। ঘুরে এদিক ওদিক থেকে বাড়িটাকে ভালো করে দেখতে লাগল কেবল। দেখল, বাড়ির ডান অংশটাই খালি, বাঁ অংশটাতে লোক বাস করছে। ডান অংশে ঢোকবার আলাদা একটা দরজাও আছে।

দুপুরবেলা রুলিনের সঙ্গে সে বাড়িটাতে ঢুকল। খালি অংশটা দিব্যি বড়ো। একতলা দোতলা মিলিয়ে চারখানা ঘর। চকচকে লাল টালির মেঝে, দেওয়ালগুলো চুনকাম করা, পরিষ্কার।

বাড়ির মালিককে রুলিন আগেই খবর দিয়ে রেখেছিল,—সে উপস্থিত। রুলিন আর বাড়িওয়ালা প্রভেন্সের ভাষায় কি-সব কথাবার্তা বলল ভিনসেন্টের তা অবোধ্য। রুলিন তারপর ভিনসেন্টের দিকে ফিরে বললে,—এ জানতে চায় কদিন আপনি এখানে থাকবেন।

—কদিন ? তা কী করে বলব ! অনির্দিষ্টকালের জন্যে, বলে দাও।

—অন্তত ছ-মাসের জন্যে নেবেন তো ?

—বাঃ, ছ-মাস তো নিশ্চয়ই !

—বেশ। তাহলে বাড়িওয়ালা বলছে ভাড়া পড়বে মাসিক পনেরো ফ্র্যাংক।

—পনেরো ফ্র্যাংক ? মাত্র ? সারা অংশটা পাওয়া যাবে মাত্র পনেরো ফ্র্যাংকে ? এর তিনগুণ যে দিতে হয় হোটেল-ভাড়া ! পকেট থেকে তাড়াতাড়ি টাকা বার করে ভিনসেন্ট বললে,—এই নাও, এখুনি টাকাটা দিয়ে দাও। এ বাড়ি আমি

নিলাম।

রুলিন আবার বললে,—এ জিজ্ঞাসা করছে কবে থেকে আপনি আসবেন।

—আজ থেকেই। এখুনি।

—কী বলেন মঁশিয়ে! জিনিসপত্র কই আপনার? আগে কিছুটা গোছ-গাছ করে নিয়ে তবে তো আসবেন?

—কিছু দরকার নেই রুলিন। একটা তোশক আর একটা চেয়ার এখুনি আমি কিনে নিচ্ছি। তাই যথেষ্ট। তুমি জানো না, ঐ হোটেলটা এই মুহূর্তে ছাড়তে পারলে আমি বাঁচি।

বাড়িওয়ালা বিদায় নিল। রুলিনও গেল তার কাজে। ভিনসেণ্ট ঘুরে ঘুরে তার নিজের রাজত্বটা দেখতে লাগল ভালো করে। গতকালই পঞ্চাশ ফ্র্যাংক এসেছে,—তার ত্রিশটা ফ্র্যাংক এখনও তার পকেটে। রাস্তায় বার হয়ে সে একটা তোশক আর একটা চেয়ার কিনে সেগুলো কাঁধে করে নিয়ে এল বাড়িতে। তোশকটা রাখল নিচের বড়ো ঘরে, এটা হবে তার শোবার ঘর। চেয়ারটা নিয়ে গেল দোতলার বড়ো ঘরটায়। এটা হবে তার স্টুডিয়ো।

হোটেলের মালিক আস্ত ঘুঘু। এটা-সেটার ওজুহাতে সে হিসেবের মধ্যে অতিরিক্ত চল্লিশটি ফ্র্যাংক জুড়ে দিল। এও ভয় দেখালো যে কড়াক্রান্তিতে সব মিটিয়ে না দিলে ছবিগুলো পর্যন্ত সে আটকে রাখবে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের শরণাপন্ন হয়ে আর এই মিথ্যে হিসেবের অর্ধেকটা মিটিয়ে ভিনসেণ্ট নিস্তার পেল।

বিকেলবেলা ভিনসেণ্ট এক দোকানদারের কাছ থেকে ধারে জোগাড় করল একটা গ্যাসের উনুন, একটা কেরোসিনের আলো আর কয়েকটা বাসনপত্র। হাতে আর তিনটি ফ্র্যাংক। তাই দিয়ে সে কিনল কিছু রুটি, আলু, মাংস আর কফি। একতলার ছোট ঘরটা হোলো রান্নাঘর। আশ্রয় মিলল, রইল কিছু সঞ্চিত খাদ্য। পকেট কেবল খালি।

রাত্রিবেলা একলা বাড়ির রান্নাঘরে স্টোভ জেবলে ভিনসেণ্ট মাংসের ঝোল রান্না করল, বানালো কফি। তোশকের ওপর কাগজ পেতে তার ওপর সে খাবার নিয়ে বসল। কাঁটা-চামচ নেই আগে খেয়াল ছিল না, তুলির একটা হাতল দিয়ে সে ঝোলের পাত্র থেকে মাংস আর আলু তুলে খেল। খাবারে কেমন রঙ-রঙ গন্ধ।

খাওয়া শেষ করে কেরোসিনের আলোটা হাতে নিয়ে একবার গেল দোতলায়। ফাঁকা ঘরখানা। একধারে চেয়ার, মাঝখানে ফাঁকা ঈজেলটা পাতা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে জানলা দিয়ে। জানলার বাইরে অদূরে প্লেস লামার্টিনের বাগানের গাছপালায় অন্ধকারের জটলা।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সে তাড়াতাড়ি গেল ওপরের ঘরে। জানলা-গুলো সব খুলে দিল। সবে সূর্য উঠছে, সামনের বাগান আর আঁকাবাঁকা

রাস্তাটির দৃশ্য চমৎকার। চমৎকার ঘরখানা সে জোগাড় করেছে। কী বড়ো ঘর, কেমন চকচকে মেঝে, কেমন ঝকঝকে নতুন-চুনকাম-করা দেওয়াল! চট করে কফি বানিয়ে কফির পাত্রটা হাতে নিয়ে সে পায়চারি করতে লাগল,—আর ভাবতে লাগল কেমন করে স্টুডিয়োটা সে সাজাবে, কোথায় কী রাখবে, কোন্ দেওয়ালে টাঙাবে কী ছবি। এতোদিন পরে সত্যিকারের নিজের বাড়ি হোলো তার। এলো স্বস্তির দিন।

পরদিন বন্ধু পল গগাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি এল। করুণ ভাষায় গগাঁ তার চরম দুরবস্থার কথা জানিয়েছে। ব্রিটানির এক ছোট শহরে একটা সরাইখানায় বন্দী হয়ে আছে গগাঁ,—রুগ্ন শরীরে, কপর্দকহীন অবস্থায়। দেনার জন্যে সরাইওয়ালা তার সবকটা ছবি আটকে রেখে দিয়েছে, অচেনা জায়গায় ভিক্ষার হাত পাতার মতোও কেউ নেই।

চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল ভিনসেন্ট। ভাবতে লাগল অন্য মনে। এই তো শিল্পীর জীবন! ভবঘুরে তারা, সমাজচ্যুত তারা,—অসহায়, নিরন্ন, ভিক্ষুকের দল! অবহেলিত, উপহসিত তাদের ভাগ্য, দৈন্য গ্লানি তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভূষণ। কেন এমন হয়? কী তারা করেছে? কেন তারা একঘরে হয়ে পথের কোণে পড়ে থাকে কুকুরের মতো? এমনি প্রতি মুহূর্তে উপদ্রুত আত্মা নিয়ে কেমন করে তারা মহৎ সৃষ্টির সাধন করবে? কেমন করে স্বপ্ন দেখবে পরম সৌন্দর্যলীলার?

গগাঁ, তার প্রিয় বন্ধু—কোথায় পড়ে আছে,নিঃসহায়,নির্বান্ধব! স্বাস্থ্য নেই, অর্থ নেই, পথ্য নেই, ঔষধ নেই!

গগাঁ কি যে-সে লোক! অতো বড়ো শিল্পী, অতো বিরাট মানুষ,—পৃথিবীতে কি দুটি মেলে? গগাঁ যদি না বাঁচে—শিল্পের তাতে অপূরণীয় ক্ষতি! এ ক্ষতির ভাবনা দুনিয়ায় কেউ কি ভাবে না?

মনস্থির করতে এক মুহূর্ত দেরি হোলো না। বাড়িটা তাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। চারখানা ঘর, প্রত্যেকের একটা করে স্টুডিয়ো আর একটা শোবার ঘর থাকবে। নিজে হাতে যদি রঙ তৈরি করে, রান্না করে, খরচের দিকে নজর রেখে চলে তাহলে থিয়োর দেড়শো ফ্র্যাংকেই দুজনের স্বচ্ছন্দ চলে যাবে। বাড়ি-ভাড়া তো আর বেশি লাগবে না, আর একজনের খাবার খরচ আর কতোটা পড়বে! বিনিময়ে সে বন্ধু পাবে, পাবে সহকর্মী,—কতোদিন সে কোনো শিল্পী-বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেনি—তা ছাড়া গগাঁর কাছে কতো কী শিখতেও সে পারবে।

হঠাৎ তার মনে হোলো, কী ভয়ানক নির্বান্ধব, একলা সে। গগাঁর আঁকা একখানা করে ছবি যদি প্রতি মাসে থিয়োকে পাঠাতে পারে, তাহলে কি থিয়োর কাছ থেকে মাসে আর পঞ্চাশটা করে ফ্র্যাংক পাওয়া যাবে না? মনে তো হয় যাবে।

না, কোনো দ্বিধা নেই, গগাঁকে এখানে আনতেই হবে। এখানে আর্লসের এই প্রখর সূর্যতাপে সব রোগব্যাধি তার ঘুচবে। দুজনে মিলে তারা ছবি

আঁকবে। দক্ষিণ দেশে তাদের স্টুডিয়োই হবে প্রথম। দেলাক্রোয়া আর মন্টিচেলির ট্র্যাডিশন তারা বহন করে চলবে। সূর্যের আলোয় আর জ্বলজ্বলে রঙে জ্বলন্ত হবে তাদের শিল্পসৃষ্টি, প্রকৃতির উন্মাদ বর্ণাঢ্যতায় তারা জাগিয়ে তুলবে পৃথিবীকে।

বাঁচাতেই হবে গগাঁকে।

৬

ব্যাপারটা কিন্তু অতো সোজা নয়। প্রতি মাসে গগাঁর একটা করে ছবির বিনিময়ে পঞ্চাশ ফ্র্যাংক করে বেশি পাঠাতে থিয়োর আপত্তি নেই, কিন্তু গগাঁর পুরোনো ধার মিটিয়ে রেল-ভাড়া দিয়ে তাকে আর্লসে পৌঁছে দেবার খরচ তার ক্ষমতার বাইরে। গগাঁর শারীরিক অবস্থাও খুব খারাপ। অতএব চিঠি-লেখালেখিই শুধু চলল কিছুদিন ধরে।

হলদে বাড়িটার প্রেমে পড়ে গেছে ভিনসেন্ট। থিয়োর টাকা দিয়ে সে একটা টেবিল আর একটা আলমারি কিনল প্রথম সুযোগেই। থিয়োকে লিখল— এক বছরের মধ্যে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাব থিয়ো। তবে একথা ভেবো না যে তখন এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব। কখনো না! আমার বাকি সারাটা জীবন আমি এই আর্লসেই কাটাবো। তোমারও ছুটিতে আসবার একটা জায়গা হোলো। আমি আস্তে আস্তে সব ব্যবস্থা করে ফেলছি, যাতে ছুটির সময়টা আমার এখানে কাটাতে তোমার কোনো অসুবিধে না হয়।

যা পারে সব টাকা সে খরচ করতে লাগল এই বাড়িটার পেছনে। বাড়িটাকে সাজিয়ে তোলাই হোলো তার প্রধান নেশা। কী দরকার মাংস খেয়ে? সেই টাকায় কয়েকটা সুন্দর পাত্র তো কেনা যায়। নতুন জুতো একজোড়া পরে কিনলেই চলবে, সেই পয়সায় গগাঁর জন্যে ঐ সবুজ লেপটা কিনে রাখাই তো ভালো। থাক না ছবির ফ্রেমের কাঠ কেনা, তার জায়গায় কয়েকটা নিচু বেতের চেয়ার কিনলে বসবার ঘরটা সাজানো যায় না কি?

আসলে বাড়িটা তার মনে নতুন একটা প্রশান্তি এনে দিয়েছে। অস্থির যাযাবর জীবনে এনেছে স্বস্তির আস্বাদ, ভবিষ্যতের স্বপ্ন। অনেক সে ঘুরেছে সারা জীবন—আর নয়। এবার সে আর নড়বে না। স্টুডিয়ো বানাবে,—যেখানে তার অবর্তমানে নতুন শিল্পী এসে বাসা বাঁধতে পারে। শিল্পীর একটা স্থায়ী আবাস সে রচনা করছে—নিজের জন্যে নয়, দক্ষিণ দেশকে ভালোবেসে যে আঁকতে চাইবে এমনকি তার মৃত্যুরও পরে,—তার জন্যে। মাথায় তার সর্বদা চিন্তা—বাড়িটাকে সাজাবে কেমন করে, কেমন করে সার্থক করে তুলবে তার এই স্টুডিয়োর প্রতিষ্ঠা।

সঙ্গে সঙ্গে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেছে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে। তার

ধারণা, একটা দৃশ্যকে যদি বহুবার বহুক্ষণ ধরে দেখা যায় তাহলে সে দৃশ্য নতুনতর অর্থ নিয়ে গভীরতর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। মো-মাজুরে সে পঞ্চাশ বার গেল একই দৃশ্যপটকে নিরীক্ষণ করার জন্যে। আবার ঝড় জোর হল— বাতাসে ঈজেল উল্টে পড়তে চায়, মনের ভাবের সঙ্গে হাতের তুলির সাম্য থাকে না। তবু সে বারে বারে আঁকে।

রুলিন বললে এক সন্ধ্যাবেলায়,—কালকের দিনটা শেষ কড়া রোদ পাবেন। তার পরের দিন থেকেই শীতের আরম্ভ।

ভিনসেণ্ট জিজ্ঞাসা করলে,—আর্লসে শীতকালটা কেমন ?

—মোটেই ভালো নয়। প্রচুর বৃষ্টি, ঝোড়ো বাতাস আর কনকনে ঠাণ্ডা। সুখের কথা, মাস-দুইয়ের বেশি শীত এখানে থাকে না।

—তাহলে বলছ বাইরে বেরিয়ে ছবি আঁকার দিন কালই শেষ ? ঠিক আছে। কোন্ বহির্দৃশ্যটা কাল আঁকব তাও চট করে আমার মাথায় এসে গেছে। কল্পনা করো দেখি রুলিন—শরতের একটি শ্যামল অরণ্য-প্রান্তরের দৃশ্য। বোতলের মতো চেহারার ঘন সবুজ একজোড়া সাইপ্রেস গাছ,—তিনটি ছোট ছোট চেস্ট-নাট গাছ, সোনালি-কমলা রঙের পাতা তাদের,—কয়েকটি লাল টকটকে পাতা-বাহারের ঝোপ। এ ছাড়া কিছুটা বালি, কিছুটা নীল আকাশ।

—আহা মঁশিয়ে, আপনি যখন এমনি করে বর্ণনা দেন, ধিক্কার হয় মনে,— ভাবি, এতোদিন বুঝি অন্ধ হয়ে ছিলাম।

পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিনসেণ্ট উঠল। মনটা তার ভারি খুশি। দাড়ির গোড়াটা সে কাঁচি দিয়ে ছাঁটল, আর্লসের খর সূর্য মাথার যে-কটি চুল তখনো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খসিয়ে দেয়নি তা ভালো করে আঁচড়ালো।
কটি চুল তখনো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়নি তা ভালো করে আঁচড়ালো। পুরো একটা সুট গায়ে চড়ালো, সঙ্গে প্যারিসে কেনা খরগোসের চামড়ার বনেটটা। আজ এবারকার মতো শেষ সূর্যের দিন। বিদায় দিতে হবে সূর্যকে আজ,—তারপরে আসবে শীত আর কুয়াসা।

রুলিনের ধারণা ঠিকই হয়েছিল। হলুদ রঙের অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলজ্বলে হয়ে সূর্য উঠল, ধাঁধিয়ে দিল ভিনসেণ্টের চোখ। যে শরৎ-দৃশ্যটি ভিনসেণ্ট আঁকবে ঠিক করেছিল, তা ভিনসেণ্টের বাড়ি থেকে অন্তত দু-ঘণ্টার পথ, টারাসকনের রাস্তায়। একটা ছোট পাহাড়ের পাশে জায়গাটা অবস্থিত। বাগানটার ধারে একটা সদ্য-লাঙল-দেওয়া শস্যক্ষেত্র।

ভিনসেণ্ট সেখানে ঈজেলটা বসালো। মাথা থেকে বনেটটা আর গা থেকে নতুন কোটটা খুলে মাটিতে ফেলল। পরিষ্কার সাদা একটা ক্যানভাস চড়ালো ঈজেলে। বেলা হয়নি মোটেও, এরই মধ্যে প্রখর রোদ জ্বালিয়ে দিল মাথার তালু।

খুব ভালো করে সামনের দৃশ্যটি নিরীক্ষণ করল, চিন্তা করে নিল কী কী

রঙ লাগবে। দৃশ্যটি ভালো করে মনের পটে তুলে নেবার পর সে তুলিগুলি ভিজিয়ে নিল, রঙের টিউবগুলির মুখ খুলে পরিষ্কার করে নিল ছুরিটা যার ওপর টিউব থেকে প্রথম রঙ সে ঢেলে নেয়। আবার একবার সামনের বাগানটির দিকে তাকিয়ে প্যালেটে সে কিছুটা রঙ মিশিয়ে নিল, তুলিটি তুলল আঙুলে।

পেছন থেকে মৃদু মধুর কণ্ঠে কে তাকে ডাকল,—এখুনি তোমার আঁকা শুরু করবে, ভিনসেন্ট?

ভিনসেন্ট চমকে পেছন দিকে তাকাল।

—এই তো সবে ভোর, ভিনসেন্ট—সারা দিন তো রয়েছে তোমার হাতে।

নারী,—অপরিচিতা। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভিনসেন্ট চেয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে। পূর্ণযৌবনা তরুণী,—আর্লসের রাত্রির মতো কৃষ্ণনীল তার চোখ, বিলম্বিত কেশগুচ্ছে সূর্যের সোনালি রঙ। আর দেহরেখা কে-র চেয়েও পেলব, অথচ প্রতিটি বঙ্কিম তটে দক্ষিণ দেশের সুপক্ব পূর্ণতা। তপ্ত কাঞ্চনের মতো গায়ের রঙ, হাস্যমধুর সুরক্তিম ওষ্ঠের নিচে শ্বেতকরবীর মতো তার দন্তরাজি। পরনে তার দীর্ঘ একটি সাদা গাউন, রুপোর বগলস আঁটা একটি বেল্ট কোমরে। পায়ে হালকা একজোড়া স্যান্ডাল। সাদা পোশাকের নিচে দেহের রেখাগুলি পরিস্ফুট,—স্বাস্থ্য, কমনীয়তা আর প্রসন্ন রূপের প্রতিমূর্তি যেন।

আবার মধুরভাবে বললে অপরিচিতা,—কতোদিন তোমাকে ছেড়ে দূরে রয়েছি, তাই না?

ঈজেলের ঠিক সামনে এসে সাদা ক্যানভাসটার ওপর হেলান দিয়ে সে দাঁড়াল ঠিক ভিনসেন্টের চোখের সামনে বাগানের দৃশ্যটাকে আড়াল করে। সূর্যরশ্মি আটকে গেল তার কেশজালে, মাথার পেছনে পিঠের ওপর দিয়ে যেন বয়ে গেল স্বর্ণাভ অগ্নিধারা। ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে এমন সহজ স্বচ্ছ প্রাণখোলা হাসি সে হাসল যে ভিনসেন্ট দুহাতে তার চোখদুটোকে না কচলিয়ে পারল না।

—এ কি জাগরণ, না নিদ্রা? স্বপ্ন, না মতিভ্রম?

—ঠিকই তো, আমারই ভুল হয়েছে। তাই তো চিনতে পারোনি আমাকে।

—কে তুমি?

—আমি তোমার বন্ধু, ভিনসেন্ট। এ পৃথিবীতে তোমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু।

—তুমি আমার নাম জানলে কী করে? আমি তো তোমাকে আগে কখনো দেখি নি!

—না, দেখো নি। কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছি,—অনেক বার।

—কী নাম তোমার?

—মায়া।

—মায়া? শুধু মায়া?

—হ্যাঁ ভিনসেন্ট। তোমার কাছে এই নামটুকুই আমার যথেষ্ট।

—তুমি আমাকে এই মাঠ পর্যন্ত অনুসরণ করে করে এসেছ। কিন্তু কেন?

—যে কারণে সারা ইয়োরোপে তোমার পেছনে পেছনে ফিরেছি, সেই একই কারণে। তোমার কাছাকাছি থাকব বলে।

—তুমি নিশ্চয় ভুল করেছ। যে মানুষের সন্ধানে তুমি ফিরছ, আমি সে নই।

শীতল নরম হাতটি রাখল ভিনসেন্টের মাথায়, হাত বুলিয়ে দিল তার রোদে পোড়া রুক্ষ লাল চুলে। ঐ শীতল করুণ স্পর্শটুকু, আর তার মৃদু কণ্ঠ,—যেন কোন্ গভীর কূপের তৃষ্ণা-মেটানো পানীয়।

—ভুল করব কেন? ভিনসেন্ট ভ্যান গক পৃথিবীতে একজনই আছে। তাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।

—কতোদিন হোলো তুমি আমাকে চেনো?

—আট বছর।

—আট বছর? আট বছর আগে আমি তো ছিলাম—

—আমি বলব বন্ধু? বরিনেজে।

—সেই তখন থেকে তুমি আমাকে চেনো?

—শরতের এক অবসন্ন অপরাহ্নে তোমাকে আমি প্রথম দেখি—মরচে-পড়া একটা লোহার চেয়ারের ওপর তুমি বসে ছিলে মার্কাস খনির সামনে।

—হ্যাঁ, শ্রমিকরা বাড়ি ফিরছিল, বসে বসে আমি দেখছিলাম।

—ঠিক। প্রথম যখন তোমার ওপর আমার চোখ পড়ল, তুমি চুপটি করে বসেই ছিলে। আমি চলে যাচ্ছিলাম পাশ কাটিয়ে। হঠাৎ দেখি পকেট থেকে পুরোনো একটা খাম বার করে তুমি স্কেচ করতে শুরু করেছ পেন্সিল দিয়ে। তোমার কাঁধের পেছন থেকে আমি উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলাম কী তুমি আঁকছ। সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেলাম।

—প্রেমে পড়ে গেলে! কী বলছ তুমি? আমার প্রেমে?

—হ্যাঁ ভিনসেন্ট, প্রিয় আমার, তোমার প্রেমে।

—হবে! তখন আমাকে দেখতে এতোটা খারাপ ছিল না নিশ্চয়ই।

—না। এখন তোমাকে যতো ভালো লাগে দেখতে, তার অর্ধেকও তখন তোমাকে লাগত না।

—তোমার গলার স্বর, মায়া, কেমন যেন আশ্চর্য লাগছে। মনে হচ্ছে এ স্বর যেন চেনা। কবে কোনদিন এমনি স্বরে অন্তত একটি মেয়ে বুঝি আমাকে ডেকেছিল।

—ডেকেছিল বৈকি। সে মার্গট। আমি যেমন ভালোবাসি সেও তেমনি ভালোবেসেছিল যে।

—তুমি মার্গটকে চিনতে?

—দু-বছর আমি ব্র্যাবাণ্টে ছিলাম তোমার কাছে-কাছেই। মাঠে যখন ছবি আঁকতে যেতে, রোজ আমি যেতাম তোমার পিছু পিছু। ঘরে বসে যখন আঁকতে,

আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম জানলার ধারে। আমি দেখতাম মার্গট তোমাকে ভালোবাসে। খুশিই হতাম তাতে।

—তখন বুঝি আর তুমি আমাকে ভালোবাসতে না ?

—নিশ্চয় বাসতাম। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি সেদিন থেকে এ ভালো-বাসায় ছেদ কখনো পড়ল না।

—তাহলে মার্গটকে দেখে তোমার হিংসে হোতো না ?

মৃদু হাসল মেয়েটি। চোখে ফুটে উঠল অনন্ত কারুণ্যের বেদনাহত দৃষ্টি। হঠাৎ ভিনসেন্টের মেন্ডিস ডা কস্টাকে মনে পড়ে গেল।

—না, হিংসে করব কেন ? বললে মেয়েটি,—ওর প্রেম তোমার মঙ্গলই করেছে। কিন্তু কে-কে যে তুমি ভালোবাসতে সেটা আমার ভালো লাগেনি। ওতে তুমি দুঃখই শুধু পেয়েছ।

—উরসুলাকে যখন ভালোবেসেছিলাম সে সময়টা আমাকে চিনতে ?

—না, সে আমার তোমাকে চেনবার অনেক আগে নিশ্চয়।

—তখন চিনলে কিছুতেই আমাকে তোমার ভালো লাগত না। বোকা ছিলাম তখন।

—তাতে কী এল গেল ? জীবনে বোকামির পালা তো গোড়ার দিকে আসেই, —নইলে পরে বুদ্ধিমান হবে কেমন করে ?

—কিন্তু বরিনেজে থাকতেই তুমি যদি আমাকে চিনতে, ভালোবাসতে —এতোদিন দেখা দাও নি কেন ?

—এতোদিন তুমি আমার জন্যে প্রস্তুত ছিলে না ভিনসেন্ট।

—অ্যাঁ ? আর আজ ?

—হ্যাঁ, আজ মিলনের ক্ষণটি এসেছে।

—এতো বছর কেটে গেল,—তুমি এখনো আমাকে ভালোবাসো ? এখন—আজ—এই মুহূর্তে ?

—হ্যাঁ ভিনসেন্ট, এখন, এই মুহূর্তে,—আর অনন্ত কাল পর্যন্ত।

—কেমন করে তা সম্ভব ? তোমার মতো মেয়ে কী করে আমাকে ভালো-বাসতে পারে ? দ্যাখো, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো আমার দিকে। আমার মুখের মাড়িগুলো সমস্ত পচে গেছে, একটা দাঁতও আমার নিজের নয়। রোদে জ্বলে পুড়ে খসে ঝরে গেছে মাথার চুলগুলো, চোখদুটো যৌন-রোগীর চোখের মতো টকটকে লাল। এবড়ো-খেবড়ো হাড়-বার-করা কংকালের মতো আমার মুখ। আমি জানিনে ভাবছ, যে আমার মতো কুৎসিত পুরুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই ? ওলটপালট হয়ে গেছে আমার নার্ভের মধ্যে, হাড়ে একবিন্দু মজ্জা নেই, মাথা থেকে পা পর্যন্ত দূষিত আমার রক্ত। মানুষ নই, আমি একটা জীবন্ত ব্যর্থ প্রেত,—আর আমার প্রেমে পড়ে আছ তুমি ? পাগল !

—বোসো ভিনসেন্ট, চুপটি করে বোসো তো !

ভিনসেণ্ট তার টুলের ওপরে বসল। মেয়েটি বসল তার পাশে ক্ষেতের নরম মাটির ওপর।

—করো কী, করো কী! অমন সুন্দর সাদা পোশাকটা যে নষ্ট হয়ে যাবে! ওঠো, আমার ছেঁড়া কোটটা পেতে দিই।

হাতের মৃদু স্পর্শে ভিনসেণ্টকে নিবৃত্ত করল মায়া, বললে,—কতো বার তোমাকে অনুসরণ করে আমার পোশাক আমি নোংরা করেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই এ পোশাক আমার আবার সাদা হয়ে গেছে।

ডানহাতের আঙুলগুলো সে রাখল ভিনসেণ্টের চিবুকের নিচে। তার মুখটা উঁচু করে চোখে চোখ রেখে বললে,—কে বললে তুমি কুৎসিত ভিনসেণ্ট, তুমি বড় সুন্দর। তোমার এই সামান্য দেহটাকে তুমি কষ্ট দিয়েছ, ক্লিষ্ট করেছ, —কিন্তু তোমার আত্মা তো তাতে মলিন হয়নি। উন্মত্ত পরিশ্রমে পরিশ্রমে একদা তোমার দেহ আর চলবে না, কিন্তু তোমার আত্মা এগিয়ে চলবে অব্যাহত অনির্বাণ,—আর তারই সাথী হয়ে চিরন্তন চলবে আমার এই প্রেম।

ঘণ্টাখানেক হোলো সূর্য উঠেছে, খর হয়ে উঠল রোদ। ভিনসেণ্ট বললে, --চলো আমার সঙ্গে। এই রাস্তার ধারে কটা সাইপ্রেস গাছ। ওদের নিচে ছায়ায় বসে তৃপ্তি পাবে।

—না, এখানেই ভালো। রোদ আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। কষ্ট হয় না।

—অনেকদিন তাহলে আর্লসে আছ বলো?

—তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তো এখানে এসেছি প্যারিস থেকে।

দপ করে জ্বলে উঠল ভিনসেণ্ট। উঠে দাঁড়িয়ে এক লাথিতে টুলটা সরিয়ে দিল সামনে থেকে। চেঁচিয়ে উঠল,—জোচ্চুরি করবার আর জায়গা পাওনি? কার পয়সায় তুমি এসব করছ, ঠক কোথাকার? আমার জীবনের পুরোনো খবর সব জানে এমন আমার কোন শত্রু আমাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। বলো, বলো কে সে?

রাগের আগুনে মেয়েটি ছুঁড়ল হাসির বাণ,—ঠক নই, মিথ্যে নই বন্ধু। সত্য আমি, তোমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো সত্য। শুধু ধমক দিয়েই কি আমার এ ভালোবাসাকে তুমি এড়াতে পারবে?

—ভালোবাসা! আবার তুমি মিথ্যে কথা বলছ? ঠাট্টা পেয়েছ আমাকে নিয়ে? ঠাট্টা তোমার ভাঙছি!

কর্কশ হাতে সে টেনে তুলল মেয়েটিকে। আপনি সে ঘনিয়ে এল তার রুক্ষ বাহুর বন্ধনে।

—এখুনি যদি চলে না যাও, এমনি যদি আমাকে যন্ত্রণা দাও,—আমিও তোমাকে যন্ত্রণা দেব! দেখবে?

—মারো আমাকে, মারো ভিনসেণ্ট। ভালোবাসার অঙ্গই তো দুঃখ পাওয়া।

—বটে?

সজোরে বুকের কাছে জাপটে ধরল মেয়েটিকে। তার মুখে মুখ রেখে নিষ্ঠুর চুম্বনে নিপীড়িত করতে লাগল তার পেলব ওষ্ঠ।

আত্মদানের সহজ আকুতিতে মেয়েটি তার ঠোঁটদুটি ফাঁক করল, তার মুখের মধুর আস্বাদ গভীরভাবে পান করতে দিল ভিনসেণ্টকে। তার প্রতিটি অঙ্গ মিশে যেতে চাইল ভিনসেণ্টের দেহে।

এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে ভিনসেণ্ট টলতে টলতে টুলটার ওপর গিয়ে বসল। মেয়েটিও ঢলে পড়ল মাটিতে, দুহাতে তার পা জড়িয়ে তার হাঁটুর ওপর মাথা রেখে স্থির হয়ে রইল। ভিনসেণ্ট আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার চুলে।

অস্ফুট স্বরে কেবল বললে মেয়েটি,—বিশ্বাস হোলো এতোক্ষণে?

অনেকক্ষণ পরে ভিনসেণ্ট কথা বললে,—আমার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি এখানে এসেছ বললে। তাহলে পায়রামণিকেও তুমি চেনো?

—র‍্যাচেল তো? ভারি মিষ্টি মেয়েটি।

—ওতেও তোমার আপত্তি নেই?

—শোনো ভিনসেণ্ট। তুমি পুরুষ, নারীসঙ্গ তোমার চাই। এতোদিন আমার সময় হয়নি, তাই তুমি এর-ওর কাছে গেছ। এবার থেকে—

—এবার থেকে?

—আর তার দরকার হবে না। কোনো দিন না।

—কী বলছ? মানে তুমি—

—হ্যাঁ ভিনসেণ্ট, আমি। ভালোবাসি যে আমি তোমাকে।

—বিশ্বাস করিনে, বিশ্বাস করিনে। কী করে তুমি আমাকে ভালোবাসবে? আর যা পাই, ভালোবাসা পাইনি। মেয়েরা আমাকে চিরদিন ঘৃণাই করে এসেছে।

—ভালোবাসা পেলে যে তোমার চলত না ভিনসেণ্ট। তোমার অন্য কাজ ছিল করবার।

—কাজ? বাঃ, খুব কাজ। মূর্খ আমি! হাজার হাজার ছবি আমি এঁকেছি। কে নেবে এগুলো? কে পয়সা দিয়ে কিনবে অন্তত একখানা?—প্রকৃতিকে আমি বুঝেছি, তার অধরা রূপের সামান্যতম কণাও আমি ধরতে পেরেছি আমার রঙ-তুলি দিয়ে—প্রশংসার এই সামান্যতম কথাটুকু কে বলবে?

—সারা পৃথিবী একদিন বলবে ভিনসেণ্ট,—মুখরিত হবে তোমার নামে।

—একদিন? কবে সে? সে তো অলীক স্বপ্ন দেখি,—আবার আমি স্বাস্থ্য ফিরে পাব, পাব স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ভরা সংসার,—আর এই ছবি এঁকেই পাব স্বচ্ছলতা? গত আট বছর ধরে আঁকছি। এ পর্যন্ত একটা ছবিও কেউ কেনেনি। তবু আঁকছি। আমার চেয়ে বড়ো মূর্খ আর কে আছে?

—মূর্খ বটে, তবে হ্যাঁ—আশ্চর্য, অপরূপ মূর্খ তুমি! তুমি যেদিন এ মর্ত্যে থাকবে না, সেদিন এ মর্ত্য চিনবে তোমাকে, কী তুমি বলতে চেয়েছ কান

পেতে সেদিন তা শুনবে, বুঝবে। আজ তোমার যে-সব ছবির একশো ফ্র্যাঙ্কও দাম মেলে না,লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে একদিন তা কিনতে লোকে পাগল হবে।—হাসছ? ভাবছ বাজে কথা? তা নয়। আমস্টার্ডাম, হেগ, প্যারিস, ড্রেসডেন, মিউনিক, মস্কো, নিউ ইয়র্ক—সমস্ত বড়ো শহরের শিল্পাগারে তোমার ছবি পাবে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন। অক্ষুণ্ণ হবে তোমার শিল্পসৃষ্টি, কেননা দাম দিয়ে তা কেনা যাবে না। তোমার প্রতিভা নিয়ে বই লিখবে লোকে, নাটক উপন্যাস রচিত হবে তোমার জীবনকে ঘিরে। চিত্রশিল্পকে ভালোবাসে এমনি দুটি লোক যেখানে দাঁড়াবে সেখানে নেমে আসবে তোমার নাম পবিত্র মন্ত্রের মতো।

অবাক ভিনসেন্ট বললে,—তোমার চুম্বনের স্বাদ এখনো যদি আমার মুখে না লেগে থাকত, তাহলে ভাবতাম হয়তো স্বপ্ন দেখছি,—কিংবা পাগল হয়ে গেছি।

—এসো, আমার পাশে এসে বোসো। হাত রাখো আমার হাতে।

সূর্য আকাশের শিখরে। সানুদেশ থেকে দূর পর্বতরেখা পর্যন্ত সমস্ত দিগন্তল জুড়ে তার স্বর্ণকিরণ-জাল। লাঙল-চষা মাটির ওপর মেয়েটির পাশে গা এলিয়ে দিল ভিনসেন্ট। গত ছ-মাস ধরে এক র‍্যাচেল আর এক রুলিন ছাড়া কারো সঙ্গে সে কথা বলেনি। সব কথা আর সব ব্যথা জমা হয়ে আছে বুকের মধ্যে। অপরিচিতা প্রণয়িনী গভীর দুটি চোখ রেখেছে তার চোখে,—আস্তে আস্তে সে কথা বলতে শুরু করল।

নিজের সারা জীবনের দুঃখ বেদনার ইতিবৃত্ত। বললে উরসুলার কথা, গুপিল-গ্যালারিতে তার কেরানী-জীবনের কথা। বললে কেমন সে ভালোবেসেছিল কে-কে, কোন্ বিবর্ণ আশায় ঘর বাঁধতে চেয়েছিল ক্রিস্টিনকে নিয়ে। শিল্পীজীবনের ধ্যান ধারণা, আশা-বঞ্চনার কথাও বলল ধীরে ধীরে। কেন ড্রয়িংএ বিশুদ্ধতা আনতে সে চায়নি, কেন সে তার ছবির মধ্যে সুলভ সম্পূর্ণতা এড়িয়ে গেছে,—কেন বৈপ্লবিক রঙের প্রতি তার আকর্ষণ। কতো দুর্নাম শুনেছে,—তবু শিল্পের জন্যে কী করতে চেয়েছে, কী স্বপ্ন দেখেছে! আর আজ তার এই শরীর—রুক্ষ চামড়ার তলায় জিরজিরে হাড়,—কেমন করে রাজ্যের ক্লান্তি দুর্বলতা আর ব্যাধি এই শরীরে তার বাসা বেঁধেছে!

যতো বলে, ততো বুকের মধ্যে ফুলে ওঠে বলার ফোয়ারা। এতোদিন পরে তার কথা কেউ মন দিয়ে শুনছে—টিউব নিংড়ে যেমনি রঙ বেরোয় তেমনি হৃদয় নিংড়ে উজাড় করে ঢেলে দিতে পারছে তার আত্মপরিচয়ের নিরুদ্ধ ভাষা।

স্তব্ধ হয়ে শুনছে পার্শ্ববর্তিনী নারী, চোখের দিকে তাকিয়ে যেন নীরবে বলছে সে—বলো বলো, সব কথা বলো তোমার, ঢেকে রেখো না আমার কাছে। বুঝতে চাই, জানতে চাই তোমাকে,—অনুভব করতে চাই তোমার প্রতিটি হৃৎস্পন্দন।

হঠাৎ চুপ করল ভিনসেন্ট। রাশ টানল জিহ্বার,—কম্পিত সর্ব অঙ্গ। কাছে টেনে নিল তাকে নারী,—বললে,—চুমু খাও আমাকে ভিনসেন্ট!

আতপ্ত ওষ্ঠ মেয়েটির। আতপ্ত মাটির ওপর দুজনে শুয়ে; এবার চুমু খেতে লাগল মেয়েটি তাকে। চুমু দিল তার চোখে, তার কানে, নাসারন্ধ্রে, ওপরের ওষ্ঠে। নরম লাল জিহ্বাটি দিয়ে আদর করতে লাগল তার মুখে। অঙ্গুলির বিস্তৃত স্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগল তার কণ্ঠে, দাড়িতে, কাঁধে, বাহুমূলে।

কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ভিনসেণ্টের প্রতিটি স্নায়ু। উতরোল তার রক্তধারা। দেহতটে বাসনার উন্মাদ জোয়ার, রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অগ্নি-প্রদাহ, ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি দ্বারে কামনার এ কী মত্ত প্রহার! কোনো নারী এমনি উত্তপ্ত আশ্লেষে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, চুম্বনে চুম্বনে আনেনি এমনি তড়িৎ শিহরণ!

ভিনসেণ্ট দুই ব্যাকুল হাতে তাকে জড়িয়ে নিষ্পিষ্ট করতে চাইল বুকের মধ্যে—প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চাইল মসৃণ শ্বেত পোশাকের অন্তরালে তার প্রতিটি অঙ্গের রোমাঞ্চ শিহরণ।

—একটু থামো,—অস্ফুট গলায় কানে কানে নারী বললে।

উঠে দাঁড়াল একটিবার। কোমর থেকে রুপোলি চাবিটি খুলল,—ছুঁড়ে ফেলে দিল বরতনুর সর্ব আবরণ। আবার এসে ধরা দিল ব্যাকুল বাহুবন্ধনে। যেমন তার মুখ, তেমনি সুবর্ণবর্ণ তার সমস্ত দেহত্বক,—আত্মনিবেদনে উৎসুক পুলকিত কুমারিত্বই তার নগ্নতার শ্রেষ্ঠ ভূষণ। রমণীর দেহ যে এত অপূর্ব সুষমিত হতে পারে, ভিনসেণ্টের কল্পনার বাইরে তা ছিল এতোদিন। নারীর দেহদান যে এতো মধুর, এতো পবিত্র, এতো হৃদয়বিদারী হতে পারে, সে ধারণাও কখনো করেনি ভিনসেণ্ট।

চুপি-চুপি বললে,—ভয় কী প্রিয়, ভয় কী? কাঁপছে কেন তোমার বুক? আমি তোমার! ধরো আমাকে,—যেমন করে তুমি আমাকে চাও, যতো খুশি চাও,—নাও আমাকে।

সূর্য পশ্চিম আকাশে। উত্তপ্ত মৃত্তিকা। এই মাটিতে কতো বীজ উপ্ত হয়েছে, কতো শস্য জন্মেছে, আবার ঝরে পড়েছে কতো শুষ্ক বীজ। সৃষ্টি ও ধ্বংসের, জীবন ও মৃত্যুর অবিনশ্বর নিত্য লীলা এই মাটির অভ্যন্তরে নীরবে স্পন্দিত হয়ে চলেছে। এই মাটির বুকে এই মুহূর্তে পুরুষ ও প্রকৃতির রতি-রভস-স্পন্দন।

অনুভূতির বন্যায় আপ্লুত হয়ে গেল ভিনসেণ্টের দেহ মন। এই সঙ্গম, এই দেহ-মিলন, রক্তে সুখের এই চরম ঝনুঝনি,—এ যেন নিরন্তর বেদনার মতো বাজে,—যন্ত্রণা আর তৃপ্তি একাকার হয়ে যায়। বুকের ওপরে ভিনসেণ্টকে নিল মেয়েটি, টেনে নিল বুকের মধ্যে একেবারে,—আপন কম্পিত স্তনে তাল মেলালো তার হৃৎকম্পনের। এতোদিন প্রতি প্রহরে প্রহরে যে অপরিসীম অতৃপ্ত বাসনা বিদীর্ণ করেছে তার স্নায়ুকে, বিধ্বস্ত করে চলেছে বুভুক্ষু উপবাসী তার প্রতিটি

ইন্দ্রিয়কে,—বাসনার সেই অগ্ন্যুৎপাতকে গ্রহণ করল আপন অঙ্গের গোপন গভীর হ্রদতটে, বিচিত্র নিগূঢ় আন্দোলনে আন্দোলনে তাকে উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেল সঙ্গমের আত্মবিস্মৃত চরমে।

তন্দ্রা নামল চোখে। তৃপ্ত অবসন্ন ভিনসেণ্ট ঘুমিয়ে পড়ল—জীবন-প্রণয়িণীর স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

ঘুম যখন ভাঙল, কেউ নেই আর,—একা সে। আরক্তিম পশ্চিম দিগন্তে অবসিত দিনমান। উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল মাটিতে, ঘামে ভেজা গালে লেগে আছে মাটির চাবড়া। শীতল ধরিত্রী-অঞ্চল থেকে কেমন একটা ম্লান সুরভি ভেসে এল নাকে। উঠে দাঁড়াল। কোটটা পরে টুপিটা মাথায় দিয়ে ঈজেল বেঁধে নিল পিঠে। ক্যানভাসটা নিল বগলের তলায়। অন্ধকার একলা পথে ফিরে চলল গৃহপানে।

—মায়া! মায়া!—চলে, আর অস্ফুট উচ্চারণ করে,—মায়া তোমার নাম?

হলদে বাড়িতে পেঁছে ঈজেল আর ক্যানভাসের বোঝা ছুঁড়ে ফেলল তোশকটার ওপর। পথে বার হোলো, চলল কফিখানায়।

—মায়া? মায়া তোমার নাম? কোথায়, কবে যেন এ নাম শুনেছি! কী অর্থ এ নামের?

পর-পর দু-কাপ কফি খেয়ে ভিনসেণ্ট আবার ফিরল বাড়িতে। ঠাণ্ডা বাতাসে আসন্ন বর্ষণের ইশারা।

দেশলাই জেলে কেরোসিনের বাতিটা জ্বালল। ঘর ভরে পেল বিষণ্ন হলদে আলোয়। হঠাৎ তার চোখ পড়ল বিছানায়। তোশকের একটা অংশ যেন রঙে জ্বল-জ্বল করছে। চমকে উঠে এগিয়ে সকালবেলাকার ক্যানভাসটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিল মলিন শয্যা থেকে।

চারিদিকে দেয়াল দিয়ে মোড়া সেই একলা ঘরের মধ্যে কেরোসিনের ধূম্রল আলোয় তার চোখের সামনে বিকশিত হয়ে উঠল শরতের অপূর্ব সুন্দর মায়া-কানন। সেই দুটি ঘন-সবুজ সাইপ্রেস, সেই ধূসর আর কমলা রঙের ইউ গাছটি, রক্তের মতো লাল ঝাঁকড়া পাতার সেই দুটি ঝোপ। ছবিটির সামনের দিকে কিছুটা সবুজ তৃণ,—পেছনে সুনীল আকাশ, আর সেই আকাশের মাঝখানে জ্বলন্ত পাবক—সূর্য।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিনসেণ্ট ছবিটা দেখল। তারপর চিৎকার করে উঠল—হয়েছে, ধরতে পেরেছি এতোদিনে,—চমৎকার হয়েছে!

৭

শীতকাল এসে গেল। স্টুডিয়োর আরামদায়ক উত্তাপে ভিনসেণ্টের দিন কাটে। থিয়ো লিখেছে যে গগাঁকে অনেক চেষ্টায় প্যারিসে ফিরিয়ে আনা গেছে, কিন্তু আর্লসে যেতে সে একেবারে নারাজ। এদিকে ভিনসেণ্টের পরিকল্পনা,

তার হলদে বাড়িটা হবে দক্ষিণ দেশের সব আধুনিক শিল্পীর বাঁধা স্টুডিয়ো। যে কোনো শিল্পী এখানে আস্তানা নিতে পারবে, দরকার হয় বাড়িটার বাকি ঘরগুলোও এজন্যে ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। এটা হবে শিল্পীর ধর্মশালা, বিনিময়ে কেবল প্রত্যেককে মাসে একটি করে ছবি পাঠাতে হবে থিয়োর কাছে। থিয়োর হাতে যখন যথেষ্ট-সংখ্যক ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি জমবে, তখন সে স্বচ্ছন্দে গুপিল গ্যালারির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজের গ্যালারি খুলতে পারবে।

ভিনসেণ্ট তার চিঠিতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল যে গগাঁ যদি আসে তাহলে সে-ই হবে আর্লসের এই শিল্পীসংঘের পরিচালক, তার হাতেই থাকবে সমস্ত কর্তৃত্ব। গগাঁ এলে যে ঘরটায় থাকবে সে ঘরটিকে খাবারের পয়সাটুকু পর্যন্ত বাঁচিয়ে সাজাতে লাগল ভিনসেণ্ট। ফিকে বেগুনি রঙ দিল দেয়ালে,—মেঝেটা লাল টালির। চেয়ার খাট সব সাজালো, ফিকে হলুদ রঙ করল সেগুলোকে। খাটে পাতল নরম গদি, তোশকের সুন্দর বিছানা, কচি লেবু রঙের বালিশের ওয়াড় আর মসৃণ চাদর। পাশের বাথরুমের দরজাটা লাইলাক রঙের, নীল রঙের বেসিন, টয়লেট করার টেবিলটার রঙ কমলা। জানলার পুরোনো খড়খড়িগুলো সব খুলে ফেলল, তার জায়গায় টাঙালো রঙিন পর্দা, দেয়ালে খানকয়েক পছন্দসই ছবি। বর্ণাঢ্য ঘরটির একটি সম্পূর্ণ ছবি এঁকে সে থিয়োর কাছে পাঠালো, যাতে গগাঁ দেখে পছন্দ করতে পারে।

শীতকালে কাজ ঘরে বসে, মডেল ভাড়া করার পয়সা হাতে থাকে না, ভিনসেণ্ট আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে বার বার নিজের ছবি আঁকে। র‍্যাচেল মাসে কবার এসে মডেল হয়ে যায়। একটা সপ্তাহ ধরে রোজ মাদাম রুলিন এলো বাচ্চাদের নিয়ে। যে কফিখানায় সে যায়, তার মালিকের স্ত্রীও এলেন কদিন।

আফ্রিকান একটা জোয়াভ তরুণকে কদিনের জন্যে অল্প পয়সার বিনিময়ে পাওয়া গেল। ষাঁড়ের মতো মোটা তার ঘাড়, বাঘের মতো জ্বলজ্বলে চোখ। ভিনসেণ্ট তার নীল ইউনিফর্ম পরা পুরো চেহারাটা আঁকল। মাথায় তার লালচে একটা টুপি, ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডটা ঘন সবুজ। চোখ-ধাঁধানো অবিশ্বাস্য রকমের রঙ পাশাপাশি জমল ছবিটাতে—অত্যন্ত চড়া রকমের রঙ, চিৎকার-করে-গলা-ফাটানো রঙ,—কিন্তু ছবির চরিত্রের সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে গেল।

এ ছাড়া প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলার ধারে বসে সে কাগজ পেন্সিল নিয়ে ড্রয়িং করতে লাগল। কখনো পুরুষ, কখনো নারী, কখনো বা শিশু—কিংবা ঘোড়া বা কুকুর। সামান্যতম বলিষ্ঠ রেখায় সম্পূর্ণ একটা অবয়ব বা চরিত্রকে কী করে প্রকাশ করা যায়, তার চেষ্টা সে করে চলল সমানে। গ্রীষ্ম-কালে নিজের আঁকা অনেকগুলো ছবির কপিও সে করল ঘরে বসে,—এই আশায় যে, এসব স্টাডি যদি থিয়ো শস্তায় বিক্রি করতে পারে, তাহলে থিয়োর কাছে তার ভার হয়তো কিছুটা লাঘব হবে।

রঙ নিয়েও নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা সে করল সারা শীতকাল ধরে।

এ সমস্ত পরীক্ষা থেকে যেসব ফল সে পেল তা তার শিল্পীজীবনের মহার্ঘ সঞ্চয়।

ভ্যান গক পরিবারের তার এক কাকা মারা গেলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু টাকা থিয়ো পেল। থিয়ো স্থির করল এই টাকার অর্ধেকটা সে গগাঁর পেছনে খরচ করবে—গগাঁ যাতে আর্লসে গিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। বিশেষ করে ভিনসেন্টের যখন এতোটা ইচ্ছে। ভিনসেন্টের হাতেও বেশ কিছু টাকা এই বাবদে এল। সে মহা আনন্দে গগাঁর শোবার ঘর আর স্টুডিয়ো সাজাতে মত্ত হোলো। কিন্তু গগাঁকে অবিলম্বে নড়ানো সম্ভব হোলো না। যেতে ট্রেন ভাড়া খরচ করতে হবে না নিজের, পেঁছিলে স্বচ্ছন্দ আরামে থাকতে পারবে —এতো প্রলোভন সত্বেও গগাঁ আর্লসে যেতে নারাজ। যেখানে আছে, সেখানকার দুঃখ দৈন্য আর মালিন্য ঘাটতেই তার ভালো লাগছে।

বসন্ত এল। ভিনসেন্টের হলদে বাড়ির পেছনে রক্তকরবীর ডালে ডালে টকটকে লাল আগুন লাগল। মেদুর রঙ লাগল তৃণক্ষেত্রে, সুনীল আকাশের কোণে আবার জলহারা সাদা মেঘের হাতছানি। উদ্যানের ধারে দাঁড়িয়ে কয়েকটি প্রভাতী সূর্যমুখী ভিনসেন্ট আঁকল। বাকিগুলো ডালশুদ্ধ বাড়িতে এনে আঁকল সবুজ ফুলদানিতে বসিয়ে। প্রতিবেশীর হাসি-ঠাট্টা গায়ে না মেখে সে নিজের হাতে বাড়ির বাইরের দেয়ালে একপোঁচ হলুদ রঙ নতুন করে লাগালো।

বাড়ির রঙ শেষ হতে না হতেই এল গ্রীষ্ম। আবার জ্বলন্ত সূর্য আর প্রচণ্ড ঝড়,—মাঠে পথে দিক্‌বিদিক্‌-হারানো বিপর্যস্ত মানুষের নিত্যযন্ত্রণা।

সেইসঙ্গে শেষ পর্যন্ত এল পল গগাঁ।

শেষ রাত্রের গাড়িতে গগাঁ এসে পেঁছিল আর্লসে। প্রভাতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল রাত্রি-জাগা একটা কাফেতে বসে। কাফের মালিক তার মুখের দিকে একবার ভালো করে চেয়েই বলে উঠল,—হ্যাঁ, ঠিক চিনেছি, আপনিই আমাদের শিল্পীর বন্ধু, তাই না?

গগাঁ আশ্চর্য হয়ে বললে,—কী করে বুঝলেন?

—বাঃ, আপনি মঁশিয়ে ভ্যান গককে আপনার একটা ছবি পাঠান নি প্যারিস থেকে? সে ছবিটা আমাদের যে তিনি দেখিয়েছেন!

দুই বন্ধুর উচ্ছ্বসিত পুনর্মিলন। এ ওর হাতে ঝাঁকুনি লাগায়, ও এর পিঠ চাপড়ায়। চিৎকারে সারা বাড়ি সরগরম। ভিনসেন্ট গগাঁকে সারা বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো, তার জিনিসপত্র খুলে খুলে সাজালো,—জিজ্ঞাসা করল প্যারিসের অসংখ্য খবর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল উত্তেজিত আলাপে প্রলাপে।

তারপর হঠাৎ সম্বিত ফিরল ভিনসেন্টের, জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁ হে গগাঁ, সারাদিন আড্ডা দিয়ে কাটাবে, না আজ কাজ করবে কিছু?

—কাজ! প্রথম দিনই কাজ? পেয়েছ কী আমাকে! কলুর বলদ?

—না, এমনি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—ব্যস, অমনি বোকার মতো আর জিজ্ঞাসা কোরো না।

অপ্রতিভ মুখে ভিনসেণ্ট বললে,—বেশ, তাহলে আমারও আজ ছুটি। চলো আমার সঙ্গে, শহর দেখিয়ে আনি তোমাকে।

গগাঁকে নিয়ে সে আর্লসের শহর-বাজারের রাস্তায় ঘুরতে বার হোলো। বাজারের পেছনে জোয়াভ সৈনিকদের ব্যারাক। সামনের মাঠে তারা প্যারেড করছে। রোমান ফোরামের সামনের পার্কে তরুণীরা বেড়াতে বার হয়েছে। ভিনসেণ্ট তো এখানকার মেয়েদের রূপবর্ণনায় মুখর।

বললে,—এখানকার মেয়ে দেখলে, কেমন লাগল বলো তো!

—এমন কিছু আহা-মরি নয়, যতই বলো।

—আরে ভায়া, ওদের চেহারা দেখতে বলিনি, গায়ের রঙ দ্যাখো। চামড়ার ওপর রোদ পড়ে পড়ে গায়ের রঙ কেমন অদ্ভুত হয়েছে তাই দ্যাখো।

গগাঁ বললে,—পাওয়া-টাওয়া যায়?

ভিনসেণ্ট বললে,—বাঁধা ঘর আছে কয়েকখানা পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক করে দর,—জোয়াভরা সাধারণত যায়।

বাড়ি ফিরে এসে দুজনে সংসার-নির্বাহের টুকি-টাকি ব্যবস্থা করতে লাগল। ভিনসেণ্ট বললে,—তুমি তো বেশ ভালো রান্না করতে পারো, তাই না?

—ফার্স্টক্লাস! জাহাজির কাজ করেছি যে কিছুদিন।

—বেশ, ভবিষ্যতে রান্না করবে তুমি। আজ প্রথম দিন অবশ্য তোমার সম্মানে ঝোলটা আমিই রাঁধছি।

রাত্রে সেই ঝোল যখন রান্না হয়ে পাতে এসে পৌঁছল গগাঁ তা মুখে তুলতে পারল না—ঈস! কী সব মিশিয়েছ এর মধ্যে? ঠিক যেমন তোমার রঙ মেশানো, তেমনি তোমার রান্নার মশলা মেশানো! আরে রামো রামো!

—বটে? তা আমার ছবির রঙ মেশানোর ভুলটা কোথায় পেলে শুনি?

—দ্যাখো ভায়া ভিনসেণ্ট, সত্যি কথা বললে খামোখা চটে উঠো না। আমি দেখছি যে তুমি এখনো নিও-ইমপ্রেশনিজম-এর পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছ। কিন্তু এ রাস্তা তোমার নয়। এ পদ্ধতি তোমার রপ্ত হবে না। এ পথ ছেড়ে তুমি তোমার নিজের পথেই যাও।

—একচোখ দেখেই সব তুমি বুঝে নিয়েছ, তাই না? মস্ত সমালোচক তুমি হয়েছ! সামনে থেকে ঝোলের বাটিটা সরিয়ে চেয়ারে খাড়া হয়ে বসল ভিনসেণ্ট।

—বাঃ, তুমি নিজেই দ্যাখো না! তুমি কি অন্ধ? ধরো, ঐ যে হলহলে হলদে রঙটা দিয়েছ। ওটা কি একটা রঙ হয়েছে নাকি?

চোখের সামনে দেয়ালে আঁটা ছবিতে জীবন্ত সূর্যমুখী ফুলগুলো।

ভিনসেণ্ট বললে,—আমার সূর্যমুখীগুলোর সম্বন্ধে আর কিছু তোমার বলবার নেই?

—আছে বৈকি, সমালোচনা করবার মতো আরো অনেক কিছু আছে।

—যথা ?

—যথা ? যথা ওদের অসহ্য এলোমেলো ভাব। ওদের মধ্যে কোনো সু-সমতা নেই, কোনো ছন্দ নেই, কোনো সম্পূর্ণতা নেই।

লাফিয়ে উঠল ভিনসেন্ট,—মিথ্যে কথা!

—আরে, বোসো বোসো ভিনসেন্ট। অমন করে চোখ পাকাচ্ছ—খুন করবে নাকি ? মনে রেখো তোমার চেয়ে বয়েস হয়েছে আমার অনেক, অভিজ্ঞতাও হয়েছে বেশি। আর তুমি এখনো নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। আমার কথা শোনো, এতে তোমার উপকার বই অপকার হবে না।

ভিনসেন্ট লজ্জিত হয়ে বললে,—আমাকে মাপ করো পল। তোমার কাছে সাহায্য পেতেই তো আমি চাই।

—বেশ। তাহলে তোমার প্রথম কাজ হোলো তোমার মন থেকে অনেক আবর্জনা ঝাঁটিয়ে দূর করা। সারাদিন তুমি মিসোনিয়ার আর মন্তিচেলি নিয়ে বক-বক করছ। ওদের দুজনেই যাচ্ছেতাই! ওদের মতো শিল্পীর ছবির কদর যতোদিন তুমি করবে, ততোদিন একটি ছবিও নিজে ভালো আঁকতে পারবে না।

ভিনসেন্ট প্রতিবাদ করে বললে,—মন্তিচেলি মস্ত লোক ছিলেন। তাঁর যুগে রঙের জ্ঞান তাঁর চেয়ে বেশি আর কারো ছিল না।

—রাখো রাখো!—একটা মূর্খ মাতাল ছিল লোকটা!

আবার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ভিনসেন্ট। টেবিলে ঝোলের বাটিটা উল্টে গেল। চিৎকার করে উঠল সে,—খবরদার, অমনি কথা বোলো না! নিজের ভাইয়ের মতো আমি ভালোবাসি ওঁকে! মাতাল ছিলেন, তাঁর মাথা খারাপ ছিল,—এসব হিংসুকদের মিথ্যে গুজব। মাতাল হলে অমন ছবি তিনি আঁকতে পারতেন না। ছটি মূল রঙকে নিয়ে যে নিখুঁত নির্ভুল বিচার তিনি করে গেছেন—মাথাখারাপ লোকের পক্ষে তা অসম্ভব। তাঁর দুর্নাম রটনা করতে শুরু করেছিল যে জঘন্য স্ত্রীলোকটা, তুমি ঠিক তারই মতো জঘন্য মনের পরিচয় দিচ্ছ।

গগাঁ তার মুখের ওপর হেসে উঠল। সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল ভিনসেন্টের। কোনো রকমে রাগকে চাপা দিতে না পেরে ভিনসেন্ট তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

৮

পরদিন সকালবেলা আগের দিনের ঝগড়া ভুলে গেল দুজনেই। একসঙ্গে কফি আর প্রাতরাশ খেয়ে দুজনে বার হোলো নিজের নিজের পথে ছবির উপজীব্যের সন্ধানে। সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরে ভিনসেন্ট দেখে, গগাঁ ইতিমধ্যেই রাতের সাপার রান্না আরম্ভ করেছে। শান্তভাবে কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ,—তারপর যথারীতি আলোচনা শুরু হোলো শিল্প আর শিল্পী নিয়ে।

আবার বাধল যুদ্ধ।

যেসব শিল্পীদের গগাঁ পছন্দ করে, ভিনসেণ্ট তাদের দেখতে পারে না, আর ভিনসেণ্ট ভালোবাসে যাদের,—গগাঁর তারা চক্ষুশূল। চিত্রশিল্পের পদ্ধতি নিয়েও তাদের মতের অমিলের শেষ নেই। অন্য বিষয়ে কথাবার্তা হলে অবশ্য কিছুটা শান্তি বজায় থাকত, কিন্তু চিত্রশিল্প নিয়েই দুজনের জীবন, ছবিই তাদের আহার্য আর পানীয়,—ছবি ছাড়া সত্যিকারের আলোচনা তারা করবে কী নিয়ে? স্নায়বিক শক্তির শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত দিয়ে নিজের নিজের আইডিয়ার জন্যে তারা লড়াই করতে লাগল। দৈহিক শক্তিতে গগাঁ ভিনসেণ্টের দ্বিগুণ, কিন্তু মানসিক উত্তেজনার শক্তিতে ভিনসেণ্ট গগাঁকে ছাড়িয়ে যায়।

এমনকি যে যে বিষয়ে কোনো মতান্তর নেই, সেইসব বিষয়ে আলোচনাও আগ্নেয়গিরির লাভা-প্রবাহের মতো। আলোচনার শেষে মাথাটা মনে হয় শুকনো একটা ব্যাটারির মতো, যা থেকে সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তি নিষ্কাষিত হয়ে গেছে।

—কস্মিন কালে তুমি শিল্পী হতে পারবে না ভিনসেণ্ট, গগাঁ জোর গলায় ঘোষণা করে,—যদি না তুমি বাইরের প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার পর স্টুডিয়োতে ফিরে এসে তবে আঁকো—উত্তেজনা কাটিয়ে, ঠান্ডা মাথায়।

—ঠান্ডা মাথায়? বোকা কোথাকার! আমি আঁকতে চাই গরম মাথায়,—টগবগিয়ে ফোটা রক্ত নিয়ে। নইলে আর্লসে এলাম কেন?

—আজ পর্যন্ত তুমি যা কাজ করেছ তাও শুধু প্রকৃতির নির্বোধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। আঁকতে হয় মন থেকে,—এক্সটেম্পোর বক্তৃতার মতো।

—হা ভগবান! মূর্খের প্রলাপ আর তো শুনতে পারিনে!

—আর একটা কথা। সিউরাতের কাছ থেকে কিছুটা শিক্ষা নেওয়া তোমার উচিত ছিল। শিল্প হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক। তোমার ছবিতে তুমি যেন কাহিনী বলতে চাও, নীতিকথা আওড়াতে চাও। ও-সব রাবিশ।

—ছবিতে নীতিকথা! আমি?

—হ্যাঁ তুমি! ধর্মকথা বলতে চাও তো গির্জেয় গিয়ে পাদ্রী হও গে আবার। রঙ রেখা আর রূপ—এই হোলো ছবির আদ্যোপান্ত। প্রকৃতির মধ্যে সজ্জা যেটুকু, সেটুকু নিয়েই শিল্পীর কারবার। তার বেশি নয়।

—আর্টের কাজ হবে শুধু সজ্জা? এর বেশি নয়? প্রকৃতির থেকে এইটুকু উপলব্ধিই যদি তোমার মাথায়,—ও মাথাটাকে নিয়ে আবার তোমার স্টক এক্সচেঞ্জে ফিরে গেলেই পারো!

—যাবো বৈকি—তবে তা যদি যাই তো প্রত্যেক রবিবার রবিবার এসে তোমার ধর্মবক্তৃতাও শুনে যাব, কেমন? প্রকৃতি থেকে তুমি কী পাও, ব্রিগেডিয়ার?

—প্রকৃতির মধ্যে আমি খুঁজে পাই চলমানতা, গগাঁ,—জীবনের স্পন্দন!

—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ!

—আমি যখন সূর্য আঁকি, আমি চাই সূর্যের প্রচন্ড বিঘূর্ণনকে প্রকাশ করতে, সমস্ত সৌরজগতে আলো আর উত্তাপ বিকিরণের সূর্যের যে অতুলনীয় শক্তি,—সেই শক্তিকে উপলব্ধিগোচর করতে। আমি যখন একটা শস্যক্ষেত্র আঁকি, আমি চাই দর্শক উপলব্ধি করুক কোন্ গুপ্তমন্ত্র-বলে কাঁচ শস্য পাকা হচ্ছে, ফেটে পড়তে চাইছে অজ্ঞাত শক্তিতে। যখন একটা আপেল আঁকতে চাই, তাতে থাকে বীজ থেকে ফলের অপ্রতিরোধ্য ক্রমবিকাশ, খোসার অন্তরালে রসের আকর্ষণ।

—ভিনসেন্ট, আমি তোমাকে কতবার বুঝিয়ে বলেছি যে শিল্পীর কোনো থিয়োরি থাকবে না।

—থামো, থামো। আঙুর-বনের এই দৃশ্যটা দ্যাখো গগাঁ। মনে হচ্ছে না, আঙুরগুলো এখুনি যেন ঠিক তোমার চোখের সামনে একেবারে ফেটে পড়বে? দ্যাখো দেখি এই ঝর্ণাটা! অনন্তকাল ধরে কতো লক্ষ লক্ষ টন জল এই ঝর্ণাটা দিয়ে বয়ে বয়ে চলেছে—ঠিক সেই অনুভূতিটা ফুটে উঠেছে কি না বলো তো? আমি যখন কোনো লোকের পোর্ট্রেট আঁকি, তার মুখটাকেই শুধু আঁকি নে,—তার সমস্ত আনন্দ-বেদনা, জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার রূপ দিতে চেষ্টা করি।

—খুব বক্তৃতা হয়েছে। আসলে তোমার বক্তব্যটা কী?

—আমার বক্তব্য হোলো এই: যে মাঠে শস্য ফলে, যে নদীতে স্রোত বয়, যে ফল রসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আর যে মানুষ জীবনকে স্বীকার করে চলার পথে এগিয়ে চলে,—এরা সবাই এক প্রকৃতির, একই চলমানতার অঙ্গ। কী প্রকৃতিতে কী মানব-জীবনে, একটা পরম ঐক্য আছে। সে ঐক্য ছন্দের ঐক্য। তোমার মধ্যে যা আছে, একটা আঙুরের মধ্যেও তাই আছে—দুজনকে নিংড়োলে সেই একই রস বার হবে। মাঠে যে কৃষাণ কাজ করছে তাকে যখন আমি আঁকি, আমি চাই লোকে অনুভব করুক যে মাটি আর ঐ কৃষাণ এক ছন্দে বাঁধা, সৃষ্টির একই স্পন্দনে স্পন্দিত। সূর্যের আলো এসে পড়ছে ঐ কৃষাণের মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে মাটিতে শস্যের শিসে আর লাঙলে, সে আলোকে যে প্রাণশক্তি উজ্জীবিত, সেই শক্তি সূর্যের অন্তর-শক্তি থেকে আলাদা নয়। সারা জল-স্থল-আকাশের সেই অমোঘ ছন্দোবন্ধ শক্তিকে যখন বুঝতে পারবে, তখনই বুঝতে পারবে জীবনকে, অনুভব করতে পারবে সেই অদ্বিতীয় ছন্দবিধাতাকে—যাঁর নাম ঈশ্বর।

কথা বলতে বলতে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ভিনসেন্ট, কেঁপে কেঁপে উঠেছিল সে। গগাঁ হেঁকে উঠল,—বাহবা, বাহবা ব্রিগেডিয়ার! কী বলাই না বললে! কী যুক্তি! কী তত্ত্ব!

চমকে উঠল ভিনসেন্ট। এমনি প্রচন্ড শ্লেষের আঘাতে হতবাক হয়ে গেল সে। হাঁ করে চেয়ে রইল গগাঁর মুখের দিকে।

একটু পরে গগাঁ বললে,—অতঃপর ?

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে ভিনসেণ্ট বললে,—অতঃপর চলো কাফেতে যাই, আবসাঁত টানি গে।

দিন পনেরো পরে একদিন সন্ধ্যায় গগাঁ বললে,—চলো, তোমার সেই গুপ্তগৃহে যাওয়া যাক। দেখি বেশ মোটা-সোটা একটা মেয়ে আমার বরাতে জোটে কি না।

ভিনসেণ্ট বললে,—নিশ্চয়। চলো এখুনি। তবে, গিয়ে কিন্তু র‍্যাচেলের ওপর নজর দিয়ো না। ও আমার।

সরু সরু পাথুরে গলি পার হয়ে তারা পেঁছিল সেই গণিকা-গৃহে। ভিনসেণ্টের গলা শুনেই র‍্যাচেল ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বাড়িওয়ালা লুইসের সঙ্গে ভিনসেণ্ট গগাঁর পরিচয় করিয়ে দিল।

লুইস প্রচুর সম্ভ্রম সহকারে গগাঁকে বললে,—মঁশিয়ে গগাঁ, আপনি যখন একজন শিল্পী, তখন একটা উপকার আমার করতে হবে। গত বছর প্যারিসে গিয়ে আমি দুখানা ছবি কিনে আনি। ছবিদুটো কেমন, সে সম্বন্ধে আপনার মত আমি জানতে চাই।

—বেশ তো। কোত্থেকে কিনেছিলেন ?

—গুপিলস্ থেকে। আসুন আপনাকে দেখাই।

র‍্যাচেল ভিনসেণ্টের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। ধাক্কা দিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে সোজা উঠে বসল তার কোলের ওপর।

ভিনসেণ্ট বিরস মুখে বললে,—দ্যাখো, গত দুমাস ধরে আমি এখানে আসছি, আর লুইস কিনা আমাকে একদিনও তার ছবি যাচাই করতে বলেনি!

—তুমি যে সত্যিকারের শিল্পী তা ও ভাবতেই পারে না লাল-পাগল!

—তা হবে!

এবার বিবর্ণ মুখ করার পালা র‍্যাচেলের। ঠোঁট ফুলিয়ে বললে,—তুমি আর আমাকে একটুও ভালোবাসো না!

—কেন একথা তোমার মনে হোলো, বকবকম্ ?

—এতোদিন তুমি আসোনি কেন ? সেই কবে এসেছিলে মনে আছে ?

—কী করব ? বন্ধুর জন্যে ঘর সাজাতে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম যে!

—তাহলে বলছ, দূরে থাকলেও তুমি ঠিক আমাকে ভালোবাসোই ?

—ঠিক বলেছ। দূরে থাকলেও।

ভিনসেণ্টের ছোট ছোট কানদুটি নিয়ে খেলা করতে করতে দু-কানে দু-বার চুমু খেল র‍্যাচেল। বললে,—তার প্রমাণ দাও। তোমার এই কানদুটো আমার কাছে রেখে যাও। প্রতিজ্ঞা করেছিলে দেবে, মনে নেই ?

সেই পুরোনো কৌতুকটা। হাসতে হাসতে ভিনসেণ্ট বললে,—বেশ তো, মাথা থেকে খুলে নিতে পারো, তো খুলে নাও।

—হি হি! লাল-পাগল! তোমার কান কি আমার পুতুলের কান? সুতো দিয়ে সেলাই করা?

হলের ওপারের ঘরটাতে হঠাৎ খুব শোর উঠল, কে যেন খুব চেঁচাচ্ছে,—হয় হাসছে না-হয় কাঁদছে। কোল থেকে র‍্যাচেলকে ধপ্ করে নামিয়ে ছুটল ভিনসেণ্ট।

মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে গগাঁ, জল ঝরছে চোখ দিয়ে। আলো হাতে লুইস অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভিনসেণ্ট তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে গগাঁর কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

—পল, পল, কী হয়েছে তোমার!

হাসছে গগাঁ। হাসির দমকে দমকে বেঁকে-চুরে যাচ্ছে সমস্ত শরীর, কথা বলতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ এমনি নিরুপায় হাসির পর হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে,—ভিনসেণ্ট, ভিনসেণ্ট, শেষ পর্যন্ত জিত হয়েছে আমাদের! প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে আমাদের!

—হোলো কী?

—দ্যাখো,—দ্যাখো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। প্যারিসের গুপিল গ্যালারি থেকে বেশ্যাবাড়ির বৈঠকখানা সাজাবার জন্যে লুইস এতো শখ করে যে ছবিদুটো এনেছে সে দুটোই বুগের‍্যুর আঁকা!

কোনো রকমে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে গগাঁ চলল দরজার দিকে।

ভিনসেণ্ট চিৎকার করল,—দাঁড়াও, এক মিনিট! কোথায় চলেছ?

—যাচ্ছি টেলিগ্রাফ অফিসে! তার করতে হবে একটা! এমন একটা খবর,—বাতিনোল্সের আড্ডাধারীদের এখুনি জানানো চাই!

গ্রীষ্ম এল আবার, সেই দুর্দম প্রচণ্ড উত্তাপ। সমস্ত গ্রামাঞ্চল যেন ফেটে পড়ল রঙে আর রঙে। সবুজ আর নীল, হলুদ আর লাল—এমনি নির্লজ্জভাবে প্রগল্ভ তারা যে চোখ যেন ফিরে ফিরে আসে। যেখানে লাগে সূর্যের স্পর্শ সেখানেই লাগে আগুন, আমূল দগ্ধ হয়ে যায়। সারা রোন নদীর উপত্যকা জুড়ে যেন উন্মত্ত উত্তাপের উত্তাল তরঙ্গের পর তরঙ্গ। এর মাঝখানে নবাগত দুজন শিল্পী। সূর্য তাদের আঘাত হানছে পলে পলে, বিশুষ্ক করে দিচ্ছে দেহ, বিচূর্ণ করে দিচ্ছে সহন-ক্ষমতা। এর সঙ্গে আবার ঝড়ের তাণ্ডব। ঝটিকার অত্যাচার তাদের শরীরে যেন প্রতি মুহূর্তের চাবুকের প্রহার,—শুধু দেহে নয়, প্রতিটি স্নায়ুতে। হাওয়ার ধাক্কায় মাথার ভেতরে মস্তিষ্ক নড়ে নড়ে যায়, কখন বুঝি খুলি ভেঙে খান্-খান্ হয়ে পড়ে। তবু আশ্রয়ের লোভ নেই, বিশ্রামের মমতা নেই, বিরতি নেই কাজের। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা বার হয় ঘর ছেড়ে পথে,—আকাশ-জোড়া দিবসের নীল আর্তনাদ আবার যতোক্ষণ না দিনান্তের নীল আর্তনাদে গিয়ে বিলীন হয় ততক্ষণ তারা কাজ করে চলে।

ভিনসেণ্ট আর গগাঁ,—ঠিক যেন দুটি আগ্নেয়গিরি। একটি থেকে লাভা-

প্রবাহ নির্গত হয়ে চলেছে, আর একটি ফুঁসছে অন্তরে অন্তরে। সারাদিন ধরে কাজের মধ্যে দুজনের মাঝখানে বিরাট একটা সংঘাত সৃষ্টি হয়। দিনান্তে ঘরে ফেরামাত্র সেই সংঘাত প্রচণ্ড নির্ঘোষে ফেটে পড়ে। রাত্রে সারা দেহে এতো ক্লান্তি যে ঘুমোতে পারে না, সারা স্নায়ুতে এতো আক্ষেপ যে চুপ করে বসেও থাকতে পারে না,—তখন সঞ্চিত শেষ শক্তিটুকু দিয়ে লড়াই করে এ ওর সঙ্গে,—মর্মান্তিক লড়াই। হাতের পুঁজি কমে আসে,—অবসর বিনোদনের খোরাক থাকে না। নিরুদ্ধ কামনা মুক্তি পায় একে অপরকে আক্রমণ করে, আঘাত করে।

সুযোগ পেলেই গগাঁ ভিনসেন্টকে রাগিয়ে রাগিয়ে একেবারে পাগল করে তোলে। ভিনসেন্ট যখন একেবারে ছটফট করতে থাকে তখন চট্ করে পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা করে ঠাট্টার চরম অস্ত্র হানে,—বাঃ বাঃ, ব্রিগেডিয়ার, চমৎকার!

গগাঁ বলে,—ভিনসেন্ট, তুমি যে কাঁচকলা ছবি আঁকো, তোমার স্টুডিয়োই তার প্রমাণ। এটা স্টুডিয়ো, না আঁস্তাকুড়? ইস, রঙের বাক্সটারই বা কী ছিরি! ডাচ্ দেশের লোকের মাথায় আর কতো বুদ্ধি হবে? ঐ মাথায় যদি মন্তিচেলি আর দোদে অতো না ঢোকাতে তাহলে মাথাটাও কিছুটা পরিষ্কার হোতো, জীবন-যাত্রাটাও খানিকটা ভব্য হোতো।

—বেশ, বেশ! আমার স্টুডিয়ো নোংরা, তোমার তাতে কী? তোমার স্টুডিয়ো কেমন তা নিয়ে আমি তো কথা বলতে যাচ্ছি নে।

—ও, হ্যাঁ। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা দরকার। তোমার স্টুডিয়ো যেমন জঞ্জাল-ভর্তি, তেমনি জঞ্জাল তোমার মাথার খুলির নিচেও। তামাম দুনিয়ায় যতো লোক পোস্টেজ স্ট্যাম্প এঁকেছে, সবাইএর নামে তুমি উচ্ছ্বসিত, অথচ এটা তোমার মাথায় ঢোকে না যে ডেগার মতো শিল্পী—

—ডেগা! একটা ছবি সে এঁকেছে যা মিলেটের একটা আঁচড়ের পাশে দাঁড়াতে পারে?

—মিলেট! সেই সেন্টিমেন্টাল বুদ্ধুটা?

ক্ষেপে উঠল ভিনসেন্ট। এতো বড়ো কথা মিলেটের নামে? যিনি তার শিল্পগুরু, যিনি তার আত্মার জনক! তাড়া করল সে গগাঁকে, গগাঁ দৌড়তে লাগল এ-ঘর থেকে ও-ঘর। বাড়িটা বড়ো নয়। মুখোমুখি হোলো দুজনে। তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল ভিনসেন্ট। ঘুসি বসালো গগাঁর নাকের ওপর। বিনিদ্র উত্তপ্ত রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত চলল দুজনের বিচারহীন তর্ক আর হিংস্র সংঘাত।

সারাদিন কাজ যখন করে তখনো তাদের অমিত শক্তি। খুঁজে পেতেই হবে প্রকৃতির গোপন রহস্যকে, সেই রহস্যের সঙ্গে শিল্পের অন্তর-রহস্যকে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধতেই হবে। অনির্বাণ এই সন্ধান,—চির-অতৃপ্ত এই পিয়াসা।

সারাদিন তারা যুদ্ধ করে তাদের বর্ণবিধ্বস্ত প্যালেট নিয়ে, আর সারা রাত্রি

তাদের ক্ষতবিক্ষত অহং নিয়ে। যখন তর্ক বা ঝগড়া করে না, তখন আলোচনাও এমনি প্রচণ্ড হয় যে ঘুম পালাতে পথ পায় না। থিয়োর কাছ থেকে টাকা আসতে না আসতেই মদে আর তামাকে সব টাকা উড়ে যায়। এতো গরম, যে খাওয়া যায় না কিছু। মনে ভাবে যে আবসাঁত খেলে স্নায়ুমণ্ডলী বুঝি ঠাণ্ডা হবে। উল্টে উত্তেজনা শুধু বেড়েই চলে।

দিনের পর দিন ধরে দারুণ ঝড় চলল। বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো অসম্ভব। অমনি সাংঘাতিক দুটো মানুষকে অতোটুকু আস্তানার মধ্যে শান্তিতে ধরে রাখা অসম্ভব। এক বাড়ির মধ্যে ভিনসেন্টের সঙ্গে বাস করে ঘরে বসে তুলির একটা আঁচড়ও দিতে পারে না গগাঁ। তার একমাত্র কাজ হোলো ভিনসেন্টকে চটানো, কথায় কথায় পাগল করে তোলা। আইডিয়া নিয়ে তর্ক করতে করতে কোনো লোক যে এতোটা ক্ষেপে যেতে পারে, গগাঁর তা ধারণার বাইরে ছিল। ভিনসেন্টই তার খেলার উপকরণ—এই বীভৎস নিষ্ঠুর খেলায় সে মাতল পরম উল্লাসে।

এমনি কাটল চারদিন। পঞ্চম দিনের দিন ভিনসেন্টের প্রমত্ত উত্তেজনা যখন বাইরের ঝড়ের উদ্দীপনাকে হার মানিয়েছে, করুণা হোলো গগাঁর। বললে,
—থামো, থামো,—ঠাণ্ডা হও ভিনসেন্ট!

দাঁত খিঁচিয়ে ভিনসেন্ট বললে,—খুব হয়েছে, আর উপদেশ দিতে হবে না। ঠাণ্ডা হও তুমি!

—একটা কথা তোমাকে বলা দরকার ভিনসেন্ট। তুমি জানো না, আমার সঙ্গে একসঙ্গে থেকেছে আর তর্ক-বিতর্ক করেছে এমনি বেশ কয়েকজন লোক শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়েছে।

—তার মানে? ভয় দেখাচ্ছ নাকি আমাকে?

—না, ভয় দেখাচ্ছি নে। সাবধান করে দিচ্ছি।

—ওসব সাবধান করা তোমার নিজের জন্যে তুলে রাখো, বুঝলে?

—বেশ! সাবধান করবার, আমি করলাম। পরে যদি কিছু হয় আমাকে যেন কেউ দোষ না দেয়, এও বলে দিলাম।

একেবারে ভেঙে পড়ল ভিনসেন্ট এই কথায়। চিৎকার করে উঠল,—পল, পল, তুমি থামো! থামাও তোমার এই তর্ক আর ঝগড়া। আমি স্বীকার করছি যে আমার চাইতে তুমি অনেক ভালো আঁকো। মেনে নিচ্ছি যে তোমার কাছে মুখ বুজে আমার অনেক কিছু শেখবার আছে। কিন্তু তুমি যে এমনি করে আমাকে ঘেন্না করবে, আর ঠাট্টা করে করে দগ্ধাবে, তা আমি সইব না। কিছুতে সইব না, বুঝলে? ন-বচ্ছর ধরে আমি এই ছবি আঁকা নিয়ে ক্রীতদাসের মতো খেটেছি। রঙের ভাষাকে আলবৎ আমি আয়ত্ত করেছি,—এই ভাষায় আমারও কিছু বলবার আছে দুনিয়ার কাছে। বলো, জবাব দাও তুমি—স্বীকার করো কি কারো না?

গগাঁ শুধু বললে,—বাঃ বাঃ ভায়া ব্রিগেডিয়ার,—চমৎকার!

শান্ত হয়ে এল ঝটিকা। আবার লোকজন বার হোলো রাস্তায়। আবার সূর্যের ফোস্কা-পড়ানো তাপ। দুরন্ত একটা জ্বর নেমে এল সারা আর্লসের নাড়ীতে। যেখানে-সেখানে মানুষে মানুষে হানাহানি,—জমা হতে লাগল অত্যাচারের অপরাধ। পদে পদে হার মানতে লাগল পুলিশ। লোকজনের চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা জ্বালাধরা হিংস্রতা। কেউ হাসে না। কেউ কথা বলে না। ঝাঁ-ঝাঁ রোদে পাথরের দেয়াল আর ছাদগুলো পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। পথে ঘাটে ঘুসোঘুসি আর ছুরি-মারামারি লেগেই আছে। লেগেই আছে সুস্থ মানুষের হঠাৎ দাঁতে দাঁত লেগে মূর্ছা যাওয়া। বাতাসে যেন কোন্ এক অশুভ দুর্ঘটনার সংকেত। সারা আর্লসের স্নায়ু থর-থর করে কাঁপছে—সুস্থতার বাঁধ এবার ভাঙল বুঝি। রোন নদীর রৌদ্রজ্বলা বাঁধও কবে বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে দিগন্তপানে।

ভিনসেন্টের মনে পড়ে প্যারিসের সেই জার্নালিস্টের কথা।

মনে মনে ভাবে,—এবার? এবার কি ভূমিকম্প? না বিপ্লব?

তবু সে স্তব্ধ থাকে না, আশ্রয় খোঁজে না কোটরের অন্ধকারে, অবিশ্রান্ত কাজ করে যায় দাঁতে-দাঁত-চাপা আত্ম-অঙ্গীকারে। প্রত্যুষ থেকে প্রদোষ পর্যন্ত প্রতিদিন তার কাটে রৌদ্রজ্বলা প্রান্তরের ক্ষমাহীন রুক্ষতায়—খালি মাথায়, কেননা টুপি পরা তার অভ্যাস নেই। তার অন্তরের প্রচন্ড জমাট অনুভূতিকে গলিয়ে ফেলে প্রকাশের ধারায় বেগবতী করার জন্যে ঐ অমনি প্রচন্ড উত্তাপেরই প্রয়োজন। তার মস্তিষ্ক যেন একটা ঘূর্ণমান জ্বলন্ত যন্ত্র, খালি জন্ম দিয়ে চলেছে তপ্ত লোহিত ক্যানভাসের পর ক্যানভাস।

প্রতিটি ছবি সম্পূর্ণ হয় আর ভিনসেন্টের অন্তরে ফুলে ফুলে ওঠে সম্ভাবনার জোয়ার। এতো বছরের পরিশ্রম এতদিনে বুঝি সার্থক হোলো! এতো অনির্বাণ প্রয়াস আর সাধনা আর যন্ত্রণা এবার বুঝি চরম রূপ পেল সকল শিল্পসৃষ্টিতে।—আর্লসের এই অগ্নিস্রাবী আকাশের নিচে গ্রীষ্মের এই অমূল্য কটি সপ্তাহ জীবনে হয়তো আর আসবে না, কিন্তু এই কটা দিনেই সে ভবিতব্যের হাতে রেখে যেতে পারবে সম্পূর্ণ ও মহত্তম শিল্পীর স্বাক্ষর। এমনি ছবি আগে সে কখনো আঁকেনি,—ক্যানভাসের পর ক্যানভাসে প্রকৃতির নিগূঢ় নির্যাসের সঙ্গে আপন আত্মার নিগূঢ় নির্যাসকে এমন ওতপ্রোতভাবে আগে কখনো মেশাতে পারে নি, আর কখনো বুঝি পারবেও না জীবনে।

সূর্যের প্রথম রশ্মি প্রকৃতিকে যখন তার চর্মচক্ষের সামনে উদ্ভাসিত করে তখন সে আঁকা শুরু করে, শেষ করে দৃশ্য যখন দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় সূর্যরশ্মিহারা প্রদোষ-অন্ধকারে। কখনো দুটো বা কখনো তিনটে সম্পূর্ণ ছবি সে একদিনে এঁকে শেষ করে। জীবনে একটি মাত্র ঋতুকালের মধ্যে তার সমগ্র অন্তরমন্থিত সৃষ্টিজ্বালাকে উজাড় করে বার করে দিতে চায়, তারপর যা

হবার হোক। মূল্য নেই জীবনের, মূল্য নেই সুদীর্ঘ আয়ুর,—মূল্য শুধু সেই আশ্চর্য ক্ষণকালটুকুর যখন সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ শিল্পসৃষ্টির চরমতম আবেগে থরোথরো, যখন সৃজন-বেদনার নিষ্ঠুরতম আঘাতে হৃদয়তন্ত্রী পূর্ণকম্পমান। শিল্পী সে, শিল্পসৃষ্টি দিয়েই তার জীবনের পরিমাপ, পঞ্জিকার ফুরিয়ে-যাওয়া পাতা দিয়ে নয়।

কেমন করে জানে না ভিনসেন্ট—মনে হচ্ছে তার,—সে যেন তার শিল্পী-জীবনের একটা তুঙ্গ ক্ষণে এসে পেঁাছেছে,—এতোদিনের প্রয়াসিত আকাঙ্ক্ষিত এই বিরল ক্ষণ। এ ক্ষণ কতোটুকু তা সে জানে না,—এটুকু বোঝে, জীবনের মহার্ঘতম অংশ এই ক্ষণ। তাই এক মুহূর্ত নষ্ট করা এখন চলবে না। আঁকতে হবে—ছবির পর ছবি, তারপর আরো ছবি—রুদ্ধশ্বাস অনপচয়িত প্রতিটি প্রহর ধরে। এ মাহেন্দ্রক্ষণ যেন অনন্ত কালসমুদ্রে বিশিষ্ট একটি তরঙ্গ। ফুলে উঠেছে আকাশের দিকে মুখ করে,—এখনি আবার ভেঙে যাবে, মিশে যাবে বিপুল বারিধির সঙ্গে একাকার হয়ে। ভিনসেন্টের তাই সময় নেই;—সৃজন-কামনাকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে হবে, অন্তর-আকূতিকে সম্পূর্ণ নিংড়ে দিতে হবে এই মাহেন্দ্রক্ষণটুকুর মধ্যে।

সারাদিন কাজ, আর সারারাত্রি গগাঁর সঙ্গে যুদ্ধ। আহার নেই, নিদ্রা নেই। শুধু রঙ আর রৌদ্র, শুধু উত্তাপ আর উত্তেজনা, শুধু তামাক আর কড়া মদ। দেহের অঙ্গে অঙ্গে প্রকৃতির কশা, সৃষ্টির উত্তেজনা আর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের উত্তেজনার কশা মনে। ঝিম-ঝিম করে মাথা, টগবগ করে রক্ত, শুকিয়ে আসে কণ্ঠনালী। সূর্য তার দগ্ধ করে, চাবুক মারে ঝড়, প্রকৃতি আর প্যালেটের রঙ ছুরিকাঘাত করে চোখে। খালি পেটে সুতীব্র মদ স্ফীয়মান রক্তে আনে জ্বরের সঙ্কেত। তারপর প্রতিটি রাতের প্রহরের পর প্রহর ধরে বাড়ির কখানা ঘরের দেয়ালে দেয়ালে বীভৎস উত্তেজনা। ঘুম নেই কারো চোখে,—আক্রোশে, ঘৃণায়, তর্কে আর ঝগড়ায় সমানে ক্ষতবিক্ষত করে চলে একে অপরকে।

একদিন ভিনসেন্ট মাঠে বসে কয়েকটা লাঙলের ছবি আঁকছে, গগাঁ পাশে বসে ভিনসেন্টের একটা পোর্ট্রেট আঁকল। ভিনসেন্ট বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল ছবিটার দিকে। হঠাৎ এই প্রথম সে উপলব্ধি করল গগাঁ সত্যি-সত্যি কী তাকে ভাবে, গগাঁর চোখে তার কী রূপটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে গেছে।

একটু পরে অট্টহাসি হেসে বললে,—ঠিক এঁকেছ। এ আমি,—কিন্তু যে আমিটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দুই বন্ধু কাফেতে গেল। আবসাঁতের গেলাস সামনে। হঠাৎ কী হোলো, ভিনসেন্ট গ্লাস-ভর্তি পানীয় ছুঁড়ে মারলে গগাঁর মুখে। গগাঁ লাফিয়ে উঠে চেপে ধরল ভিনসেন্টকে। সবলে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল কাফে থেকে বাড়িতে। বিছানায় পড়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল ভিনসেন্ট।

পরদিন সকালবেলা উঠে খুব শান্ত গলায় বললে,—ভাই গগাঁ, একটু একটু

কেমন মনে পড়ছে কাল সন্ধ্যাবেলা যেন আমি তোমাকে অপমান করেছিলাম।

গগাঁ বললে,—তার জন্যে সর্বান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা করছি। কিন্তু আমার ভয়, কালকের ঘটনা আবার ঘটতে পারে। এবং এও হতে পারে কোনদিন এমনি অবস্থায় আমিও ক্ষেপে উঠে তোমার গলা টিপে ধরব। আমার মনে হয় আমি থিয়োকে চিঠি লিখে দিই যে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

—না, না, কখনো না। পল, এ কাজ তুমি করতে পারো না। চলে যাবে এখান থেকে? এ বাড়ি যে আমি তোমার জন্যেই সাজিয়েছি!—আর্ত কণ্ঠে একেবারে ভেঙে পড়ল ভিনসেণ্ট।

সারাদিন বইল তর্কের ঝড়, হৃদয়াবেগের উদ্দাম হানাহানি। গগাঁকে রাখার জন্যে ভিনসেণ্ট লড়তে লাগল প্রাণপণে। তেমনি প্রাণপণে গগাঁ এড়াতে লাগল ভিনসেণ্টের প্রতি যুক্তি, প্রতিটি অনুনয়। কখনো অনুনয়, কখনো ভিক্ষা, কখনো দাবি, কখনো হুহুংকৃত অভিশাপ। একবার এমনকি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল ভিনসেণ্ট। বন্ধু যদি রাগ করে ব্যথা পেয়ে চলে যায়, তাহলে কাজ কী এ জীবনে? শেষ পর্যন্ত ভিনসেণ্টেরই জয় হোলো। ক্লান্ত হয়ে পড়ল গগাঁ সারাদিনের এই হৃদয়-রণে। দিনান্তে সে হার মেনে পেল মুক্তি। থাকবে, থাকবে সে, ছেড়ে যাবে না ভিনসেণ্টকে। ছেড়ে যাবে না এই হলদে বাড়ি।

রাত্রি নামল। শুয়েছে যে যার বিছানায়। ভৌতিক স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতায় কী যেন আসন্ন অশুভের ইঙ্গিত।

সারারাত ঘুম এল না গগাঁর চোখে। শেষরাত্রে তন্দ্রায় জড়িয়ে এল চোখ। হঠাৎ কি একটা অনুভূতির চমকে চোখ খুলল সে। দেখে, অন্ধকারে ভিনসেণ্ট দাঁড়িয়ে তার বিছানার সামনে। নিঃস্পন্দ নির্বাক, শুধু জ্বলজ্বল করে ক্ষুধিত তার দুটো চোখ।

অন্ধকারে হেঁকে উঠল গগাঁ,—এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কী হয়েছে তোমার ভিনসেণ্ট?

একটি কথা না বলে ভিনসেণ্ট বার হয়ে গেল ঘর থেকে।

তার পরদিন শেষরাত্রে ঠিক তেমনি আর্ত অনুভূতির ধাক্কায় ঘুম ভাঙল গগাঁর। দেখল, তেমনি নিশ্চল পাথরের মতো অন্ধকারে ভিনসেণ্ট দাঁড়িয়ে তার সামনে।

লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে চিৎকার করে উঠল গগাঁ,—যাও যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে!

নিঃশব্দে অপসৃত হয়ে গেল ভিনসেণ্ট—অন্ধ রজনীর ভাষাহারা প্রেত-মূর্তি যেন।

পরের দিন রাত্রে খাবার সময় তুমুল ঝগড়া হোলো দুজনের।

গগাঁ চেঁচিয়ে উঠল ঝগড়ার মাঝখানে,—নিশ্চয় তুমি আমার ঝোলে খানিকটা

রঙ ঢেলে দিয়েছ, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম যখন। এ ঝোল আবার আমি মুখে তুলব ভেবেছ? স্বীকার করো, দাওনি মিশিয়ে?

প্রেতহাস্য হাসল ভিনসেন্ট। মুখে উত্তর না দিয়ে দেয়ালে রঙ-খড়ি দিয়ে বড়ো বড়ো করে লিখল,—রঙ নয়, বিষ!

এর পর কদিন ভিনসেন্ট একদম চুপচাপ রইল। কেমন একটা বুক-চেপে-ধরা বিষণ্ণ স্তব্ধতা। কথা বলে না, মুখ ধোয় না। পড়ে না এক লাইন, শুধু চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে শূন্যমনে চেয়ে থাকে একদিকে।

চতুর্থ দিন বিকেলবেলা সে মুখ খুলল। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড় বইছে। গগাঁকে ডেকে বললে,—চলো আমার সঙ্গে পার্কে, জরুরি কথা আছে।

—কথা আছে, তা পার্কে কেন? বেশ আরামে তো আছি বাড়ির মধ্যে, এখানেই বলো না!

—না, বসে বসে বলতে পারব না। হাঁটতে হাঁটতে তবে বলব।

—বেশ, চলো তাহলে।

পথে বার হোলো। তুমুল দাপট ঝড়ের। দুঃসাধ্য সেই বাতাসের বেগের বিরুদ্ধে পথ করে চলা। পার্কের সাইপ্রেস গাছগুলোর মাথা ঝড়ে যেন মাটিতে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

ভিনসেন্টের কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে শুধোলো গগাঁ,—কী বলবে, বলো?

এত হাওয়ায় কথা বলাও মুশকিল। বাতাস মুহূর্তে শব্দকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

ভিনসেন্ট বললে,—পল, গত কদিন ধরে আমি খুব ভাবছি। দারুণ একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়!

—মাপ করো। ঝড়ে প্রাণ গেল আমার। তোমার আইডিয়া শোনার বিন্দুমাত্র কৌতূহল আমার নেই।

—দ্যাখো, শিল্পী হিসেবে আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছি। কেন তা জানো?

—কী বললে? কিছু শুনতে পারছি নে। কানের কাছে চেঁচিয়ে বলো।

গলা চড়ালো ভিনসেন্ট,—জানো তুমি কেন আমরা সবাই শিল্পী হিসেবে ব্যর্থ হয়েছি?

—না, জানি নে। কেন?

—আমরা সবাই একলা একলা আঁকি বলে।

—সে আবার কী?

—কোন-কোন জিনিস আমরা প্রত্যেকে ভালো আঁকি আবার কোন-কোন জিনিস খারাপ আঁকি। ভালো খারাপ দুইই একই ক্যানভাসে ধরা পড়ে। শুনছ?

—বলো, ব্রিগেডিয়ার—কান পেতে আছি।

—হল্যান্ডের সেই বেথ ভাইদের মনে পড়ে? একজন দৃশ্য আঁকত ভালো,

আর একজনের হাত ছিল মানুষ আঁকার। দুজনে মিলে তারা একখানা ছবি আঁকত। একজন দৃশ্য, আর একজন মানুষ। দুজনে মিলে তারা সার্থক শিল্পী হয়েছিল।

—কী যন্ত্রণায় পড়া গেল, কখন যে শেষ হবে!

—কী বললে? চেঁচিয়ে বলো এবার তুমি।

—বলছিলাম যে,—তারপর? থামলে কেন?

—হ্যাঁ। শোনো পল, আমাদেরও তাই করতে হবে। তুমি, আমি, সিউরাত, সেজান, লোত্রেক, রুসো—একই ক্যানভাসে সবাই মিলে আমরা কাজ করব। সেই হবে আমাদের সত্যিকারের সাম্যবাদ। আমাদের প্রত্যেকের হাতে সত্যিকারের ভালো যেটুকু আসে একটি ছবিতে সেইটুকুই আমরা দেব। সিউরাত আঁকবে বাতাস, তুমি আঁকবে দৃশ্যপট, সেজান আঁকবে ছবির সামনের অংশটা, লোত্রেক আঁকবে মানুষ,—আর আমি আঁকব চাঁদ, তারা আর সূর্য। সবাই মিলে আমরা বিরাট একটা আর্টিস্টে পরিণত হবই। কী বলো?

—বাঃ বাঃ ব্রিগেডিয়ার! হো-হো! হো-হো! কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ! বর্বর কর্কশ অট্টহাস্যে একেবারে ফেটে পড়ল গগাঁ। প্রচণ্ড বিদ্রূপরাশির উন্মত্ত উচ্ছ্বাস যেন ছিটিয়ে দিল ভিনসেণ্টের মুখের ওপর,—ঢেউএর ধাক্কায় ছিটিয়ে পড়া সমুদ্রের জলকণার মতো।

একবার নিশ্বাসটা আটকে নিয়ে গগাঁ বললে,—ব্রিগেডিয়ার, এইসা বড়িয়া আইডিয়া পৃথিবীতে আর কারুর মাথায় কখনো গজায় নি, হলফ করে বলছি। দাঁড়াও, আর-একটু হেসে নিই।

দুহাতে পেট চেপে ধরে পথের ধারে উবু হয়ে বসে গগাঁ দমকে দমকে হাসতে লাগল।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভিনসেণ্ট।

সহসা আকাশ থেকে নেমে এলো কালো কালো সব উড়ন্ত ছায়ার পাল, যেন কালো দাঁড়কাক সব। হাসছে গগাঁ, অসংখ্য কাকের কর্কশ কা-কা শব্দ স্পন্দিত হচ্ছে ভিনসেণ্টের কানে। ছায়ার পাল জড়িয়ে ধরল ভিনসেণ্টকে, আচ্ছন্ন করল তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়,—কান দিয়ে, মুখ দিয়ে, নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে যেতে লাগল তার মাথার মধ্যে, আক্রমণ করল তার মস্তিষ্ক। বায়ুহীন অন্ধ কৃষ্ণ পক্ষ-বিধূননে অসংখ্য ছায়ার আস্তরণে মগ্ন হয়ে গেল তার চৈতন্য।

গগাঁ তাকে ডাকছে, ঝড়ের ওপার থেকে যেন—চলো চলো, —এমনি আইডিয়ার পর লুইসের আড্ডায় গিয়ে বেশ একটু ফূর্তি না করে এলে চলে না!

নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মতো ভিনসেণ্ট চলল তার পিছু-পিছু।

পৌঁছবামাত্র গগাঁ একটি মেয়েকে ধরে তার সঙ্গে দোতলার ঘরে গেল।

র‍্যাচেল দৌড়ে হলঘরে এসে বসল ভিনসেণ্টের কোলে। বললে,—ওপরে আমার ঘরে যাবে না, লাল-পাগল?

—না।

—না! কেন না?

—ঐ তোমার দর্শনী, পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক সঙ্গে নেই বলে।

—না থাকে, চলো। টাকার বদলে তোমার একটা কান দিলেই হবে। দেবে বলেছিলে মনে নেই?

—মনে আছে।

একটু পরে গগাঁ নেমে এল। দুজনে চলল বাড়ির পথে। দুজনে আবার ঢুকল হলদে বাড়িতে। এবার রাত্রের খাবার পালা। দুজনকে মুখোমুখি বসতে হবে এক টেবিলে। গগাঁ পালাল। কোনো কথা না বলে সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল পথে।

হন-হন করে হাঁটতে লাগল। প্লেস লামার্টিন প্রায় পার হয়েছে, এমন সময় পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন শির-শির করে উঠল। মনে হোলো কে যেন তাকে অনুসরণ করে ছুটে আসছে। হ্যাঁ, ঠিক,—তবে দূরে, অনেক দূরে,—ক্রমে দূর থেকে কাছে। অসংযত দ্রুত পদক্ষেপ, পরিচিত পদধ্বনি—কাছে, আরো কাছে,—এবার একেবারে শিউরে-ওঠা শিরদাঁড়াটার পেছনে যেন।

এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়াল গগাঁ।

ভিনসেণ্ট। ছুটে আসছে মত্ত দানবের মতো। হাতে উন্মুক্ত একটা তীক্ষ্ন ক্ষুর।

দেহ মনের সমস্ত সচেতনতা সংহত করে স্থির হয়ে দাঁড়াল গগাঁ। চেয়ে রইল ভিনসেণ্টের চোখের দিকে।

মাত্র দু-হাত দূরে থাকতে থমকে দাঁড়াল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গগাঁর দিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দৌড় দিল বাড়ির দিকে।

গগাঁ সোজা গিয়ে উঠল একটা হোটেলে। সেখানকার ঘরে ভালো করে দরজা এঁটে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

ভিনসেণ্ট ফিরে গেল ত্যর হলদে বাড়িতে। টকটকে লাল সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছল তার শোবার ঘরে। দেয়াল থেকে আর্শিটা পেড়ে নিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। এই আর্শিতে নিজের মুখ দেখে অনেকবার নিজের পোর্ট্রেট এঁকেছে।

তাকিয়ে রইল তার রক্তবর্ণ দুই চক্ষুর প্রতিচ্ছবির দিকে।

বাকি নেই আর। জীবনের সেই বিরল সুবর্ণক্ষণের পরিসমাপ্তি। বুঝেছে সে, নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে পেয়েছে নিশ্চিত সংকেত।

আর কেন? এইবার বাঁধ ভেঙে দাও!

ক্ষুরটা সে তুলল ডান হাতে। সুতীক্ষ্ন ইস্পাতের স্পর্শ সে অনুভব করল নিজের চামড়ায় ঠিক কণ্ঠনালীর কাছে।

কথা বলছে কারা? কানের কাছে ভাষাহারা ফিসফিসিনি কাদের?

হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেল দুচোখ। সূর্য! সূর্য! আর্লসের আকাশজোড়া সূর্য

ঐ গভীর রাতের আকাশকে মূর্তিত করে নেমে এল তার দৃষ্টি আর আর্শিতে তার ঐ প্রতিচ্ছবির সামনে। মুহূর্তে হারিয়ে গেল আত্মপরিচয়।

ডান হাতের একটা ঝটকায় তীক্ষ্ন ক্ষুর দিয়ে ডান কানটা সে কেটে ফেলল। কানের গোড়াটুকু কেবল আটকে রইল গালের সঙ্গে।

ক্ষুরটা পড়ে গেল হাত থেকে। গাল বেয়ে রক্তের ধারা চুইয়ে পড়ছে মাটিতে। একটা তোয়ালে দিয়ে মাথাটা সে জড়িয়ে নিল।

টেবিল থেকে কাটা কানটাকে হাতে তুলে ভালো করে বেসিনের জলে ধুলো। তারপর ড্রয়িং পেপারে সেটাকে মুড়ে নিয়ে মোড়াটাকে আবার মুড়ল পুরোনো খবরের কাগজে।

মাথাভর্তি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তার ওপর চড়ালো একটা টুপি। বার হোলো রাস্তায়। প্লেস লামার্টিন পার হয়ে চড়াই ছাড়িয়ে গিয়ে পৌঁছল লুইসের গণিকা-গৃহে।

অনেক রাত। দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিতে দিতে সাড়া মিলল। একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলল।

—র‍্যাচেলকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

—ও, লাল-পাগল, তুমি? এতো রাত্রে যে? কী দরকার?

—একটা জিনিস এনেছি তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে? উপহার?

—হ্যাঁ, উপহার।

—কী ভালো তুমি লাল-পাগল! কই দাও।

—এই নাও। সাবধানে রেখো। মনে কোরো, এই আমার স্মৃতি-চিহ্ন।

—কী আছে এতে?

—খুললেই দেখতে পাবে।

—দাঁড়াও তাহলে, খুলি।

মোড়কটা খুলল র‍্যাচেল।

আতংক-বিস্ফারিত চোখে কাটা কানটার দিকে চেয়ে রইল এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল সংজ্ঞাহারা হয়ে।

ফিরে গেল ভিনসেন্ট আবার তার সেই নিঃসঙ্গ হলদে বাড়িতে। দরজায় খিল দিয়ে ওপরের ঘরে উঠে এসে চোখ বুজোলো বিছানায়।

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ গগ্যাঁ এসে দেখে, হলদে-বাড়ির দরজার সামনে ভিড়। রুলিন হাত মোচড়াচ্ছে।

গোল মস্ত টুপি মাথায় একটা লোক গম্ভীর গলায় তাকে জিজ্ঞাসা করল,—কী করেছেন আপনার বন্ধুর?

—কী করেছি? জানি না তো!

—জানেন, জানেন। খুব জানেন। আপনার বন্ধু যে বেঁচে নেই, সে খবরটা আপনার অজানা ?

তাকে ঘিরে সমস্ত জনতার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। ভাবতে একটু সময় নিল গগাঁ। তারপর বললে,—ওপরে চলুন, ওপরে না গেলে বোঝা যাবে না কিছু।

নিচেকার দুখানা ঘরের মেঝেতে রক্তমাখা ভিজে তোয়ালের রাশ। ওপরে ভিনসেণ্টের শোবার ঘর পর্যন্ত সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে ধাপে রক্তের রেখা। এক-গাদা চাদর জড়িয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে নিস্পন্দ ভিনসেণ্ট। বেঁচে আছে তো! কম্পিত হাতে গগাঁ তার গা-টা স্পর্শ করল। না, গরম রয়েছে, ভয় নেই। এক মুহূর্তে গগাঁর চরম আশংকাটা কাটল, আবার শক্তি ফিরে পেল সে।

পাশে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। গগাঁ বললে,—ঘুমুচ্ছে। কিন্তু ওকে খুব সাবধানে জাগাবেন মঁশিয়ে। আমার কথা জিজ্ঞাসা করে তো বলবেন আমি প্যারিসে চলে গেছি। আমার উপস্থিতি ওর পক্ষে মর্মান্তিক হতে পারে।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তারকে খবর দিল আর একটা গাড়ি আনতে পাঠাল। সবাই মিলে ধরাধরি করে ভিনসেণ্টকে গাড়িতে তুলল। গাড়ি চলল হাসপাতালে। বুড়ো রুলিন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটল গাড়ির পেছনে।

৯

হাসপাতালের স্থায়ী ডাক্তারটির নাম ফেলিক্স রে। বেঁটে-খাটো শক্ত-সমর্থ চেহারার মানুষ। ভিনসেণ্টের দেহের আহত অংশের শুশ্রূষা করে তিনি তাকে কয়েদখানার মতো ছোট্ট একটা ঘরে পুরলেন। সে ঘর থেকে অন্য সবকিছু জিনিসপত্র আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, শুধু একটা বিছানা।

বিকেলে সূর্যাস্তবেলায় ডাক্তার রে ভিনসেণ্টের নাড়ী দেখছেন, এমন সময় রোগীর ঘুম ভাঙল। চোখ মেলল ভিনসেণ্ট। একবার সাদা ছাদ, তারপর ঘরের সাদা দেয়াল, তারপর বাইরে ঘন নীল আকাশের দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে তার চোখ ফিরে এল ডাক্তার রে-র মুখের ওপর।

ম্লান গলায় বললে,—হ্যালো!

ডাক্তার উত্তর দিলেন,—হ্যালো।

—কোথায় আমি ?

—শহরের হাসপাতালে।

—ও, বুঝেছি।

সহসা উপলব্ধি হোলো যন্ত্রণাটার। ডান হাতটা তুলল ডান কানের ক্ষত-স্থানটার কাছে। হাতটা চেপে ধরলেন ডাক্তার।

—না, ছোঁবেন না এখন।

—হ্যাঁ। এখন....এতক্ষণে...মনে পড়েছে।

—ক্ষতটা খুব পরিষ্কার। কোনো ভাবনা নেই। কদিনের মধ্যেই আবার খাড়া হয়ে উঠবেন।

—আমার বন্ধু কোথায়?

—প্যারিসে চলে গেছেন।

—ওঃ, চলে গেছে....ছেড়ে গেছে আমাকে!—আমার পাইপটা?

—এখুনি নয়,—পরে।

ডাক্তার রে ক্ষতটা ভালো করে ধুয়ে মুছে নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন।

—ঘাবড়াবেন না আপনি। এটা একটা দুর্ঘটনা,—নিতান্ত সামান্য দুর্ঘটনা। কান বলতে আমরা যা বুঝি, গালের দু-ধারে বাঁধাকপির মতো যে দুটো খাড়া হয়ে থাকে,—আসলে তা দিয়ে তো আমরা শুনিনে! শ্রবণশক্তি নষ্ট না হলেই হোলো, কী বলেন? দুদিন পরে টেরই পাবেন না—

—আপনার দয়ার সীমা নেই ডাক্তার। কিন্তু ঘরটা এমনি একেবারে ফাঁকা কেন?

—জিনিসপত্র সব সরিয়ে নিয়েছি,—আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে।

—আমাকে রক্ষা করবার জন্যে? কার হাত থেকে?

—আপনার নিজেরই হাত থেকে।

—ওঃ হ্যাঁ,—বুঝেছি, বুঝেছি বৈকি।

—আচ্ছা, এবার আমি যাই। আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন, একটুও নড়াচড়া করবেন না। রক্তক্ষয়ে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। রাত্রে পরিচারক এসে খাবার খাইয়ে দিয়ে যাবে। কেমন?

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই ভিনসেণ্ট দেখে, বিছানার পাশে থিয়ো বসে। আর্ত করুণ তার মুখ, চোখদুটো লাল।

অস্ফুটস্বরে ভিনসেণ্ট ডাকল,—থিয়ো!

চেয়ার থেকে নেমে বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল থিয়ো, দুহাতে জড়িয়ে ধরল ভিনসেণ্টের হাতটা। নির্লজ্জ তার দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা, লজ্জার বাধা মানলো না।

—থিয়ো, যখনই তোমাকে আমার বড়ো প্রয়োজন,—ঘুম ভেঙে দেখি—ঠিক তুমি আমার পাশে আছ।

উদ্‌গত অশ্রু দমন করতে চেষ্টা করল থিয়ো। কথা ফুটল না মুখে তার।

—থিয়ো, এতো কষ্ট করে কেন তুমি এলে? কে আসতে বলল তোমাকে?

—গগাঁ কাল টেলিগ্রাফ করেছিল। তার পেয়েই রাত্রের ট্রেনে রওনা হয়েছিলাম।

—ছিঃ, ছিঃ, ভারি অন্যায় গগাঁর। এতোগুলো টাকা মিছিমিছি খরচ! তারপর আবার—সারারাত ঘুম হয়নি তো? ট্রেনে জেগে ছিলে তো?

—তা ছিলাম।

কিছুটা চুপ থাকার পর থিয়ো বললে,—ডাক্তার রে-র সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ভিনসেণ্ট। উনি বলেছেন এ এমন কিছু নয়, মাথায় রোদ লেগে লেগে হঠাৎ সর্দিগর্মির ফল। বাইরে যখন কাজ করো মাথায় টুপি দাও না, না?

—না, দিই না।

—তার ফল এই দ্যাখো। এর পর থেকে বাড়ির বাইরে বার হলেই সব সময় মাথায় টুপি দেবে। তবে, কিছু ভয় পেয়ো না তুমি। এমনি সর্দিগর্মি আর্লসের লোকের লেগেই আছে। যা গরম!

ভিনসেণ্ট থিয়োর হাতে মৃদু চাপ দিলে। ঢোক গিলল থিয়ো।

—ভিনসেণ্ট, তোমাকে দেবার জন্যে একটা খবর আছে। তবে, আজ থাক, ক'দিন পরেই জানাবো।

—ভালো খবর থিয়ো?

—মনে তো হয় তোমার ভালোই লাগবে।

ডাক্তার রে এই সময় রোগীর ঘরে ঢুকলেন:—কী খবর? কেমন বোধ করছ সকালবেলায়?

—খুব ভালো ডাক্তার। আমার ভাই থিয়ো একটা নতুন খবর আমাকে শোনাতে চায়। খবরটাও খুব ভালো। বলবে?

—বেশ তো। আপত্তি কী? তবে, এক মিনিট। ঘা-টা একটু দেখে নিই। —বাঃ, সুন্দর সেরে আসছে।

ডাক্তার ঘর থেকে যাবার পর থিয়ো বললে,—ভিনসেণ্ট, আমি বলছিলাম কি—বলছিলাম কিনা—হ্যাঁ,—একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা কী হয়েছে তাতে?

—আমাদের দেশেরই মেয়ে, হল্যাণ্ডের। জোহানা বাঙ্গার নাম। অনেকটা যেন আমাদের মা-র মতন তার প্রকৃতি।

—ভালোবেসেছ থিয়ো?

—হ্যাঁ। প্যারিস ছেড়ে তুমি যখন চলে এলে ভিনসেণ্ট, তখন আমার এমন ভয়ংকর একলা লাগত! প্যারিসে তুমি আসার আগে এমন লাগেনি, কিন্তু এক বছর দুজনে একসঙ্গে থাকার পর—

—আমাকে নিয়ে থাকা তো তোমার খুব কষ্টকরই হয়েছিল থিয়ো।

—কে বললে ভিনসেণ্ট? তুমি যদি জানতে তুমি আসার পর কতোদিন আমি মনে মনে কতো কামনা করেছি—এই বুঝি সন্ধেবেলা রু লেপিকের ফ্ল্যাটে ফিরে দেখব দরজার পাশে তোমার জুতোজোড়াটা আর ঘরে ঢুকে দেখব বিছানার ওপর তোমার সদ্য-আঁকা ভিজে রঙের ছবি!—থাক। আমার খবরটা তো শুনলে, এখন আর কথা নয়। চুপটি করে বিশ্রাম করো। আমি আছি তোমার সঙ্গে ক'দিন।

থিয়ো দু-দিন আর্লসে রইল। ডাক্তার রে আশ্বাস দিলেন ভিনসেণ্টের

সেরে উঠতে আর দেরি হবে না, প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি, তাকে শুধু রোগী বলে নয়, বন্ধু বলে দেখবেন। নিশ্চিন্ত হয়ে থিয়ো প্যারিসে ফিরে গেল।

রোজ সন্ধ্যাবেলা রুলিন ফুল নিয়ে আসত। রাত্রে ঘুম আসে না ভিনসেন্টের, জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখে। ডাক্তার রে ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা করলেন।

চারদিন কাটবার পর ডাক্তার রে দেখলেন রোগীর মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার কোন লক্ষণ নেই, মাথা একেবারে পরিষ্কার। দরজা তালাবন্ধ থাকত বাইরে থেকে, খুলে দিলেন। আসবাবপত্র সাজিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে।

ভিনসেন্ট বললে,—ডাক্তার, এবার উঠি? নিজে-নিজে জামা-কাপড় বদলাই?

—নিশ্চয়! দুর্বল না লাগে তো একটু হাঁটতেও পারো। তারপর আমার অফিসে এসো।

হাসপাতালটি দোতলা বাড়ি, মাঝখানে চৌকো একটা উদ্যান, তাতে সরু নুড়ি-বসানো পায়ে-চলার পথ আর বর্ণবাহার ফুলগাছের সমারোহ। ভিনসেন্ট কয়েক মিনিট হেঁটে বেড়িয়ে একতলায় ডাক্তার রে-র অফিসে গেল।

—বোসো ভিনসেন্ট, বোসো। তারপর, নিজের পায়ে আবার দাঁড়াতে কেমন লাগছে?

—চমৎকার লাগছে ডাক্তার।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ভিনসেন্ট,—এমন কাজ তুমি করলে কেন?

চমকে উঠল ভিনসেন্ট। চুপ করে রইল অনেকক্ষণ, তারপরে বললে,—জানিনে ডাক্তার।

—আচ্ছা, যখন করলে,—তখন কী ভাবছিলে মনে পড়ে?

—ভাবছিলাম? না, কিছুই তো ভাবছিলাম না!

আরো কদিন কাটল। শরীর সেরে উঠল ভিনসেন্টের। একদিন ডাক্তার রে-র ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ধোওয়ার বেসিনের পাশের টেবিল থেকে সে একটা ক্ষুর হাতে নিল।

ক্ষুরটা খুলে নিয়ে সে বললে,—ওহে ডাক্তার, দাড়িটা তোমার কামানো নেই,—কামিয়ে দেব?

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ডাক্তার রে ঘরের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, আত্মরক্ষার্থে দুহাত সামনে ধরে চিৎকার করে উঠলেন,—না, না,—রেখে দাও, শিগগির রেখে দাও ক্ষুরটা!

—সত্যি বলছি ডাক্তার, নাপিতের কাজ আমি খুব ভালো পারি। দ্যাখোই না একবার!

—ভিনসেন্ট! ভিনসেন্ট! রাখো, রাখো বলছি ক্ষুরটা নামিয়ে! কথা শোনো আমার!

হেসে উঠল ভিনসেণ্ট। ক্ষুরটা নামিয়ে যথাস্থানে রেখে এসে বললে,—ভয় পেয়ো না বন্ধু, ও অবস্থা সত্যি এখন আর আমার নেই।

দ্বিতীয় সপ্তাহ পার হবার পর ডাক্তার রে ভিনসেণ্টকে ছবি আঁকার অনুমতি দিলেন। একজন লোক গেল হলদে বাড়ি থেকে ঈজেল ক্যানভাস আর রঙ আনবার জন্যে। রোগীকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে ডাক্তার নিজেই হলেন মডেল। রোজ একটু একটু করে ভিনসেণ্ট কাজ করতে লাগল। পোর্টেটটা আঁকা শেষ হলে সে সেটা উপহার দিল ডাক্তার রে-কে।

বললে,—আমার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এটা তুমি রেখো ডাক্তার। তুমি আমার ওপর কতো করুণা করেছ, তার কৃতজ্ঞতা জানালাম এইটুকু দিয়েই।

ডাক্তার বললেন,—ভারি চমৎকার হয়েছে ভিনসেণ্ট, অনুগৃহীত হলাম আমি।

বাড়ির দেয়ালে কোথায় একটা ফুটো ছিল। ছবিটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে সেটা দিয়ে সেই ফুটোটা ডাক্তার চাপা দিলেন।

আরো দু-সপ্তাহ ভিনসেণ্ট হাসপাতালে রইল। এ কদিন বড়ো একটা খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে হাসপাতালের বাগানে বসে বসে সে আঁকত। দু-সপ্তাহে সারা ফুলবাগানটাকে সে আঁকল।

যাবার দিন হাসপাতালের গেটে ডাক্তার রে ভিনসেণ্টের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন,—মনে আছে তো কী কী বলেছি? কোন রকম উত্তেজনা চলবে না, আবসাঁত খাওয়া চলবে না, আর খালি মাথায় রোদ্দুরে কাজ করা চলবে না। এ ছাড়া রোজ আমার সঙ্গে একবার করে দেখা করে যাবে।

—মনে আছে ডাক্তার। প্রতিজ্ঞা করছি। ধন্যবাদ ডাক্তার সবকিছুর জন্যে।

—আমি তোমার ভাইকে লিখে দিচ্ছি যে তুমি একেবারে ভালো হয়ে উঠেছ।

আবার হলদে বাড়ি, যে বাড়ির প্রতিটি দেয়াল তার নিজের হাতে রঙ করা, প্রতিটি ঘর নিজের হাতে সাজানো। তবে, নিছক একলা আবার।

ভয় করে, রাত্রে বুঝি ঘুম আসবে না। কারা বুঝি সর্বদা ফিস-ফিস করে কানের কাছে, কারা বুঝি তন্দ্রার কোণে কোণে দুঃস্বপ্ন সেজে উঁকি দেয়। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন, সেটা খুব উপকারে লাগে।

দুর্বলতা কাটেনি, বাইরে বাইরে আগের মতো কাজ করা অসম্ভব। তবে মনের প্রশান্তি ফিরে আসছে, ফিরে আসছে মস্তিষ্কের স্বচ্ছতা। দিনে দিনে ক্ষুধা বাড়ছে, রক্ত বাড়ছে শিরায় শিরায়। একদিন রুলিনের সঙ্গে খুব ফুর্তি করে সে ডিনার খেল। তার পরদিন রুলিনের স্ত্রীর অর্ধেক-আঁকা ছবিটা শেষ করতে বসল।

কাজে মন বসছে,—ছবিতে যেভাবে রঙের পর রঙ চড়াচ্ছে, বেশ ভালোই লাগছে দেখতে।

আস্তে আস্তে শরীর মন সারছে, আস্তে আস্তে আবার মন টানছে কাজকে।

একদিন বিকেলবেলা সে গেল র‍্যাচেলের ওখানে।

বললে,—বকবকম, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, মাপ করো।

র‍্যাচেল বললে,—কী আর হয়েছে লাল-পাগল? ভাবনা কী তোমার? এ শহরে এমনি দুর্ঘটনা অস্বাভাবিক নয় তো।

বন্ধুবান্ধবও তাকে বলে যে—প্রভেন্সে থাকলে রোগ-ভোগ আছেই, হয় জ্বর না হয় মাথার দোষ,—এ তো অহরহ ব্যাপার।

রুলিনও প্রবোধ দিয়ে বলে,—এ মোটেই অস্বাভাবিক নয়, ভিনসেন্ট। এই টারটারিনের দেশে আমরা সবাই তো কিছু না কিছু আধপাগল।

ভিনসেন্ট হেসে বললে,—যাক, তাহলে সবাই আমরা এক দলে। তাহলে আর ভাবনা নেই।

আরো কয়েক সপ্তাহ কাটল। ভিনসেন্ট এখন অক্লান্তভাবে সারা দিন স্টুডিয়োতে বসে কাজ করতে থাকে।

মত্ততা বা মৃত্যু দুই চিন্তাই তার মন থেকে একেবারে চলে গেছে। স্বাভাবিক হয়ে গেছে সে। আর দেরি নয়, আবার ছবি আঁকতে মাঠে বার হবার সময় এসেছে।

পথে সে আবার বার হোলো। কিন্তু আঁকতে আর পারে না। সময়ে খেয়ে, সময়ে শুয়ে, সময়ে বিশ্রাম করে বড়ো বেশি স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে সে।

ডাক্তার তো তাকে বলেছিলেন,—একেবারে স্বাভাবিক হওয়া তোমার মতো লোকের সম্ভব নয়, কখনো তুমি তা ছিলে না জীবনে। কারণ কোনো শিল্পীই স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের মানুষ নয়। যারা স্বাভাবিক মানুষ, খায় দায় ঘুমোয়,—নির্দিষ্ট রুটিন-বাঁধা পেশা নিয়ে জীবন নির্বাহ করে, শিল্পসৃষ্টি তাদের কর্ম নয়। প্রকৃতি আর জীবন—এই উভয়কে নিয়ে তোমার অনুভূতির তীব্রতা। সাধারণের বাইরে,—তাই তুমি শিল্পী। কিন্তু সাবধান হওয়া তোমার দরকার, নইলে এই অনুভূতির তীব্রতাই শেষ পর্যন্ত তোমার সর্বনাশ করবে।

ভিনসেন্ট বোঝে, তার সমস্ত আর্লসের ছবিতে যে প্রজ্বলন্ত হলুদ রঙের বন্যা সে বইয়েছে, সে বন্যা তার হৃদয়-বন্যা। মাথায় আগুন না জ্বললে, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় সারা অন্তর যন্ত্রণায় না ভরে উঠলে, উত্তেজনার তীব্রতায় স্নায়ুতন্ত্রীতে ঝঙ্কার না উঠলে এ সৃজন-বন্যা একেবারেই ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে না। কিন্তু সেই বন্যার পেছনে লুকিয়ে আছে আত্ম-ধ্বংসের প্রভঞ্জন।

কী হবে বেঁচে থেকে? সাধারণ হয়ে স্বাভাবিক হয়ে দীর্ঘ জীবন নিয়ে কী লাভ,—বিনিময়ে শিল্পীর যদি মৃত্যু হয়?

আবার সে খালি মাথায় প্রান্তরে প্রান্তরে ঘোরে, মাথার মধ্যে সৌরশক্তিকে যেন গ্রহণ করতে চায়। আকাশের বর্ণাঢ্য বর্ণালী আর সৌরগোলকের রক্তরশ্মি, প্রান্তরের সবুজ তরঙ্গ আর পুষ্পমঞ্জরীর বিচিত্র লীলা—আকণ্ঠ সে পান করে।

প্রভঞ্জন তাকে প্রহার করে আবার, আকাশের আঁধার ভার তাকে করে রুদ্ধমুখ ; সূর্যমুখী তার হৃদয়বিদারী কল্পনাকে সঞ্চারিত করে দেয় নিঃসীম দিগন্ত-প্রান্তে। মানসিক উত্তেজনা যতো বাড়ে, দৈহিক ক্ষুধা ততো কমে। আবার শুধু কফি, আবসাঁত আর তামাক—এই তিনটি বস্তু জুগিয়ে চলে দৈহিক ইন্ধন। রাত্রে ঘুম আসে না, একলা ঘরে অন্ধকারে রক্তবর্ণ অতন্দ্র চোখের সামনে কাতারে কাতারে ভেসে চলে রূপ আর রঙের শোভাযাত্রা।

শিল্পসৃষ্টির পূর্ণ প্রতিভায় বলীয়ান হয়ে ওঠে ভিনসেণ্ট। প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় চিরন্তন ছন্দের অনুভূতি স্পন্দিত হয় তার প্রাণে, তার সুদৃঢ় কুশলী হাতের ছোঁয়ায় বিরাট সাদা ক্যানভাস বর্ণবিহ্বল ছবিতে রূপান্তরিত হয় একান্ত নির্ভর আত্মনিবেদনে। বাধা নেই, ছেদ নেই, ছবির পর ছবি সে এঁকে চলে। এমনিভাবে মাত্র কদিনে, একটুও বিশ্রাম না করে পর-পর সাঁইত্রিশটি ছবি সে শেষ করে।

শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল একদিন, উঠল গুরুভার ক্লান্তি নিয়ে। কাজ করতে পারে না, উঠতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না। চুপ করে বসে রইল চেয়ারে সারাদিন, তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। ফিস-ফিস-ফিস-ফিস—আবার কারা কতো অস্ফুট কথা বলতে লাগল কানের কাছে, কারা যেন অন্তরের সুগুপ্ত অচেতনে হাতছানি দিতে লাগল। দিনশেষে আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বার হয়ে রেস্তোরাঁয় গেল। ছোট একটা টেবিল টেনে বসল। কিছু খাবার অর্ডার দিল।

পরিচারিকা ঝোলের বাটিটি নামিয়ে রাখল সামনে। অজ্ঞেয় জগৎ থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল কানের কাছে—সাবধান, সাবধান!

এক হাতের ঝটকায় ডিশটা টেবিল থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে ভেঙে গেল খান-খান হয়ে। চিৎকার করে উঠল ভিনসেণ্ট,—বিষ, বিষ! আমার খাবারে বিষ মেশাতে চাস তোরা? বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চাস আমাকে!

এক লাথিতে টেবিলটা উলটে পড়ল। আর্তনাদ করে কয়েকজন খরিদ্দার দৌড় দিল বাইরে। আর সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

—বড়ো সোজা, না! আমি কানা, আমার চোখ নেই, না? চোখের সামনে আমার ঝোলে বিষ মিশিয়ে দেবে! খুন করতে চাও আমাকে, খুনে, খুনে কোথাকার!

দুদিক থেকে দুজন পুলিশ এসে হাত পা চেপে ধরল,—পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে সোজা চালান দিল হাসপাতালে।

চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতে আবার স্বাভাবিক অবস্থা। ডাক্তার রে অন্য ব্যবস্থা করলেন। রোজ একটু একটু কাজ করা, কিছু কিছু মাঠে ঘুরে বেড়ানো, আবার দিনান্তে হাসপাতালে এসেই আশ্রয় নেওয়া। কখনো তার অন্তরের এপার থেকে ওপার বিদীর্ণ ব্যথায় রণিত হয়ে ওঠে, কখনো বা কোন্ অধরা যবনিকা মুহূর্তের জন্যে সরে যায়,—শিউরে ওঠে আপন ভবিষ্যৎ ভাগ্যের

কল্পরূপ দেখে।

ডাক্তার রে তাকে অনুমতি দিয়েছেন আঁকতে। একটা দৃশ্য সে আস্তে আস্তে আঁকল,—রাস্তার ধারে পীচগাছের একটি উদ্যান, পেছনে আলপ্‌স্ পর্বতমালা। আর-একটি ছবি একটি অলিভ-কুঞ্জের,—পাতাগুলি রুপোলি সবুজ, সেইসঙ্গে লাঙল-চষা মাটি, যার রঙ কমলা।

তিন সপ্তাহ হাসপাতালে কাটাবার পর ভিনসেণ্ট আবার হলদে বাড়িতে ফিরে এল। এরই মধ্যে সারা শহর, বিশেষ করে প্লেস লামার্টিন অঞ্চল তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে। যে লোক একবার নিজের কান নিজের হাতে কেটেছে, সাধারণ ভোজনাগারে খেতে বসে 'বিষ বিষ' বলে হাউ-হাউ করে উঠেছে, তার পাগলামিটা চোখ বুজে মেনে নিতে প্রতিবেশীরা নারাজ। আলর্সবাসীদের দৃঢ় ধারণা ছবি আঁকলে লোকে পাগল হয়। তাকে দেখলে আশপাশের লোকে কানাঘুষো করে, কখনো বা প্রকাশ্যে কোন কথা ছুঁড়ে মেরে দূরে সরে যায়। শহরের কোনো রেস্তোরাঁতে তার ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

এর সঙ্গে শুরু হয়েছে এক নতুন আপদ। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা হলদে বাড়ি ঘিরে তাকে ক্ষ্যাপাতে শুরু করেছে। তারা সবাই মিলে তারস্বরে চেঁচায়,—লাল-পাগল, লাল-পাগল,—তোমার আর-একটা কান দাও!

ভিনসেণ্ট দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। তবু ফাঁক দিয়ে শিশুদের চিৎকার আর হাসি তীরের মতো কানে এসে বেঁধে,—লাল-পাগল! লাল-পাগল! আর-একটা কান দাও।

বাচ্চারা ছড়া বানিয়েছে তার নামে। ভিনসেণ্ট জানলার ধারে এলে সমস্বরে তারা সুর করে গায়ঃ

লাল-পাগল, লাল-পাগল,
কানটা কেটেছে,—
যতই চেঁচাও, ভাবছ বুঝি
শুনতে পাবে সে?

ভিনসেণ্ট ঘরে তিষ্ঠোতে পারে না। ছুটে পথে বার হয়। বাচ্চারা পথে পথে আর পথ থেকে মাঠে মাঠে তার পেছনে পেছনে দৌড়োয় আর চিৎকার করে। পাগল ক্ষেপিয়ে তাদের ক্লান্তি নেই, ফুর্তির শেষ নেই।

দিনের পর দিন ছেলেরা দলে ভারি হয়, অসহ্য হয় তাদের সমস্বর। ভিনসেণ্ট কানে তুলো এঁটে বন্ধ ঘরে বসে নিজের পুরোনো ছবির কপি করতে চেষ্টা করে। পারে না কিছুতে। তীক্ষ্ন অস্ত্রের মতো ওদের চিৎকার ওর মাথার মধ্যে গিঁথে গিঁথে যায়।

ক্রমে এইসব শিশু-গুণ্ডাদের সাহস বাড়ে। বানরের মতো তারা জলের নল বেয়ে দোতলায় ওঠে, জানলার চৌকাটের ওপর বসে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে। দল বেঁধে চিৎকার করে—লাল-পাগল, কানটা কেটে দাও, কানটা কেটে দাও!

পাগল ক্ষেপানোর উৎসাহ সংক্রামক। সারা প্লেস লামার্টিনে যেন উৎসব লেগেছে। কাঠের মই লাগিয়ে ছেলেরা উঠেছে দোতলায়। জানলার খড়খড়ি শার্সি ভেঙেছে, এটা ওটা ছুঁড়ে মারছে পিঞ্জরাবদ্ধ উন্মাদটার গায়ে। নিচে রাস্তার ওপর অসংখ্য লোকের ভিড়। হৈ-হৈ করে তারা ছেলেদের উৎসাহ দিচ্ছে, চেঁচাচ্ছে ছেলেদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে—লাল-পাগল! কই, তোমার আর-একটা কান দাও!

—ও পাগল, কলা খাবে? বিষ মাখানো কিন্তু!

—ও পাগল, ঝোল খাবে? বিষ মেশানো কিন্তু!

লাল-পাগল, লাল-পাগল,
কানটা কেটেছে,—
যতই চেঁচাও, ভাবছ বুঝি
শুনতে পাবে সে?

—ও পাগল, কালা নাকি? সত্যি শুনতে পাও না?

ছোট বড় সবাই একসঙ্গে হাসছে নাচছে আর চিৎকার করছে ছড়া কেটে কেটে:

লাল-পাগল লাল-পাগল,—
কানটা ছুঁড়ে দাও।
লাল-পাগল, লাল-পাগল,—
কানটা ছুঁড়ে দাও!

লাফিয়ে উঠল ভিনসেণ্ট ঈজেলের ধার থেকে। জানলায় তিনটি ছেলে বসে। তাড়া করে গেল তাদের দিকে। মই বেয়ে তারা আর্ত ধ্বনি করতে করতে নামল। রাস্তার চিৎকার আরো বেড়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভিনসেণ্ট চেয়ে রইল ঐ জনতার দিকে।

হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এল অসংখ্য কর্কশ কাকের মতো কালো কালো ছায়ার পাল, আচ্ছন্ন করল তারা সামনের দৃশ্য, ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা ভিনসেণ্টের মাথায়,—কেউ ঢুকল মুখে, কেউ ঢুকল নাকে, কেউ ঢুকল কানে, কেউ ঘুরতে লাগল চুলের গোড়ায় গোড়ায়, আচ্ছন্ন করল মস্তিষ্ক,—ঘন কালোছায়ার আস্তরণে ঢেকে ফেলল সমস্ত চৈতন্য।

জানলার চৌকাটের ওপর লাফিয়ে উঠল ভিনসেণ্ট।

—চলে যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে শয়তানের দল, শান্তিতে থাকতে দে আমাকে!

উত্তরে খল-খল হাসি আর চিৎকার,—লাল-পাগল, লাল-পাগল, কানটা ছুঁড়ে দাও!

—চলে যা, দূর হয়ে যা, আপদ! দে, দে, একলা থাকতে দে আমাকে! দিবি নে? তবে? মারব! খুন করব! আমার সঙ্গে চালাকি?

টেবিল থেকে হাত ধোবার বেসিনটা তুলে ভিনসেণ্ট ছ্ৢঁড়ে মারল নিচে। রাস্তার পাথরের ওপর পড়ে চুরমার হয়ে গেল সেটা। শব্দটা যেন দেশলাইএর কাঠি, একেবারে আগ্ৢন জেৢলে দিল। উম্মত্ত আক্রোশে সে ঘরের মধ্যে হাতের কাছে যা পায় তাই ছ্ৢঁড়ে ছ্ৢঁড়ে ফেলতে লাগল জানলা দিয়ে পথের লোকদের মারবার জন্যে। চেয়ার গেল, ঈজেল গেল, আর্শি, পর্দা, টেবিল, বিছানা সব একের পর এক। দেয়াল থেকে খসিয়ে নিয়ে রাস্তায় ছ্ৢঁড়ে ফেলতে লাগল ছবির পর ছবি। কতোদিন কতো আশায় সে একট্ৢ একট্ৢ করে সাজিয়েছিল তার বাড়ি, তার স্বপ্নের শিল্পনিকেতন; প্রতিটি মিনিটের সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে লাগল তার কতো আশা আকাঙ্ক্ষা,—আর্লসের জনতা-ভরা পথে জমতে লাগল তার ব্যর্থ জীবন-স্বপ্নের ভগ্ন স্ত্ৢপ।

সারা ঘর যখন খালি হয়ে গেল, তখন সে আবার উঠে দাঁড়াল জানলার চৌকাটে। হাত পা, শরীরের প্রতিটি স্নায়্ৢ থর-থর করে কাঁপছে। ম্ৢর্ছিত হয়ে উল্টে সে পড়ল। মাথাটা ঝ্ৢলতে লাগল পাথর-বাঁধানো রাস্তার দিকে।

১০

ম্ৢহ্ৢর্তে নব্বই জন নাগরিক স্ত্রী-প্ৢর্ৢষের আবেদন গেল আর্লসের মেয়রের কাছে ঃ

আমাদের দ্ৢঢ় বিশ্বাস, ২নং প্লেস লামার্টিনের বাসিন্দা ভিনসেণ্ট ভ্যান গক একজন বদ্ধ উন্মাদ। তাকে ম্ৢক্ত অবস্থায় রাখা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। এখনই এই উম্মাদকে বন্দী করা হোক।

প্ৢলিশ এল। জানলার চৌকাট থেকে ভেতর দিকে গড়িয়ে এসে ভিনসেণ্টের অচৈতন্য দেহ ঘরের মেঝেতে ল্ৢটোচ্ছে। সেই অবস্থায় তাকে তুলে নিয়ে জেল-খানার একটা সেলে আবদ্ধ রাখা হোলো। তালাবন্ধ দরজার সামনে খাড়া রইল একজন প্রহরী।

জ্ঞান ফিরে আসতে ভিনসেণ্ট চাইল ডাক্তার রে-র সঙ্গে দেখা করতে বা ভাই থিয়োকে চিঠি লিখতে। অন্ৢমতি মিলল না।

অনেক কষ্টে ডাক্তার রে জেলখানায় প্রবেশের অন্ৢমতি পেলেন। ব্ৢঝিয়ে বললেন,—প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা কর ভিনসেণ্ট। এরা যদি প্রমাণ করতে পারে যে তুমি একজন বিপজ্জনক উম্মাদ, তাহলে আর তোমার রক্ষা থাকবে না। আমি তোমার ভাইকে ইতিমধ্যে চিঠি লিখছি আর এখান থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছি।

—তোমার পায়ে পড়ি ডাক্তার,—থিয়োকে তুমি এখানে আসতে লিখো না। দ্ৢদিন পরেই ও বিয়ে করছে। ওর জীবনের এতো বড়ো আনন্দটা যেন আমার জন্যে মাটি হয়ে না যায়!

—বেশ, তাই হবে। দেখি তোমার জন্যে আর কোন ভালো প্ল্যান আমি

বার করতে পারি কি না।

দু'দিন পরে ডাক্তার রে আবার এলেন। —শোনো ভিনসেণ্ট, এইমাত্র দেখে এলাম তোমার বাড়িওয়ালা তোমার বাড়িতে তালা আঁটিছে। তোমার ছবিগুলো সে আটকেছে, অন্য মালপত্র একটা কাফের গুদামে বন্ধ করেছে, বাকি ভাড়া মিটিয়ে না দিলে ছবি বা জিনিসপত্র কিছুই সে ছাড়বে না।

ভিনসেণ্ট চুপ করে রইল।

ডাক্তার বলে চললেন,—ওখানে যাওয়া আর তোমার চলবে না। আমার মনে হয় আমার পরিকল্পনাটা তোমার নেওয়া উচিত। মৃগীরোগ তোমার, এইরকম মূর্ছা আবার কখন যে তোমার হবে, কবার হবে, তা কেউ বলতে পারে না। যদি খুব শান্ত পরিবেশের মধ্যে বিনা উত্তেজনায় দিন কাটাতে পারো, তাহলে এই হয়তো শেষ। তা না হলে দু-এক মাস পরে আবার হয়তো রোগের নতুন আক্রমণ হবে। তোমার নিজেকে বাঁচানোর জন্যে, অপর সকলকে বাঁচানোর জন্যে আমার তো মনে হয় তোমার যাওয়া উচিত—

—কোথায় ডাক্তার রে? পাগলা-গারদে?

—ধরো, কোনো উন্মাদ-আশ্রমে।

—তাহলে ডাক্তার, তুমি বলছ, সত্যিই আমি পাগল হয়ে গেছি!

—না, তা আমি বলছিনে। তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ, আমি যেমন প্রকৃতিস্থ তুমিও তেমনি প্রকৃতিস্থ। কিন্তু মৃগীরোগের অমনি মূর্ছা হঠাৎ-জ্বরের মতো। সাময়িক উন্মত্ততা আসে বৈকি। তখন লোকে অস্বাভাবিক কাজ করে বসে নিজেরই অজান্তে। সেইজন্যেই তোমার এমন জায়গায় আশ্রয় নেওয়া উচিত যেখানে বিপদের সময়ে তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। বুঝেছ?

—বুঝলাম ডাক্তার।

—এখান থেকে ঠিক পঁচিশ কিলোমিটার দূরে সেণ্ট রেমিতে এমনি একটা ভালো জায়গা আছে। জায়গাটার নাম সেণ্ট পল দ্য মসোল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রোগী তারা নেয়। তৃতীয় শ্রেণীর রোগীর জন্যে মাসিক খরচ মাত্র একশো ফ্র্যাংক। এ খরচটা তুমি চালিয়ে নিতে পারবে। জায়গাটা আগে ছিল একটা সাধুদের মঠ, ঠিক পাহাড়ের গায়ে। ভারি নির্জন শান্ত পরিবেশ, —খুব ভালো লাগবে তোমার। ডাক্তার থাকবে তোমাকে উপদেশ দেবার জন্যে, সিস্টার থাকবে তোমাকে দেখাশুনো করবার জন্যে। পুষ্টিকর জিনিস খেতে পাবে, কদিনে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি।

—আঁকতে পারব সেখানে?

—নিশ্চয়ই। যা খুশি তাই করতে পারবে—কেবল নিজের পক্ষে যেসব কাজ ক্ষতিকর সেইসব কাজ ছাড়া। উন্মাদাগার বলে মনেই হবে না। মস্ত মাঠের মধ্যে ঠিক যেন একটা হাসপাতাল। এক বছর সেখানে বিশ্রাম করলে তুমি একেবারে নতুন মানুষ হয়ে ফিরে আসবে।

—কিন্তু এই কয়েদ থেকে মুক্তি পাব কী করে ডাক্তার?

—সে ভেবো না। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি যদি সেন্ট রেমিতে তোমাকে নিয়ে যাই, তো তোমাকে ছেড়ে দিতে তাঁর আপত্তি নেই।

—তুমি বলছ জায়গাটা ভালো?

—ভালো বলে ভালো? চমৎকার! ছবি আঁকার কতো যে খোরাক সেখানে!

—যাব তাহলে। মাসে একশো ফ্র্যাংক বেশি নয়। হয়তো বছর-খানেক পাগলা গারদে থাকাই আমার মঙ্গল,—মাথাটা তাতে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হবে।

—তোমার ভাইকে সব কথা খুলে লিখেছি। লিখেছি তোমাকে নিয়ে কী করতে চাই, এও বলেছি প্যারিস পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে যাওয়া এখন অসম্ভব।

—বেশ। থিয়ো রাজি হলেই হোলো। ওর ঝঞ্চাট আর আমি বাড়াতে চাইনে।

ডাক্তার রে-র সঙ্গে ভিনসেন্ট চলল আর্লস ছেড়ে,—জীবনের মতো। ট্রেন চলল টারাসকনে। সেখান থেকে ছোট ব্র্যাঞ্চ লাইনে সেন্ট রেমি।

স্টেশন থেকে সেন্ট পল দ্য মসোল অনেকটা পথ। পাহাড়ের একটা দীর্ঘ খাড়াই পার হতে হয়। কালো কালো পর্বতমালার গা বেয়ে রাস্তায় চলল ডাক্তার রে আর ভিনসেন্টকে নিয়ে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি। দূরে চোখে পড়ে সেই মঠের পিঙ্গল রঙের প্রাচীর, যেখানে তারা চলেছে। মঠের কাছাকাছি আশে-পাশে প্রাচীন রোমকদের নানা ভগ্নস্তূপ।

রাস্তার ধারেই মজবুত লোহার গেট। দুধারে পাইন গাছ। গেটের গায়ে লোহার একটা ঘণ্টা, ডাক্তার রে সেটা বাজালেন। গেট খুললেন ডাক্তার পেরন।

—কেমন আছেন ডাক্তার পেরন? আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম, পেয়েছেন তো? সেইমতো আমার বন্ধু ভিনসেন্ট ভ্যান গককে সঙ্গে এনেছি। এবার থেকে আপনার হাতেই এঁর ভার।

—ঠিক আছে ডাক্তার রে, ভার আমি নিলাম। কিছু ভাববেন না আপনি।

—তাহলে আমি যদি তাড়াতাড়ি বিদায় নিই কিছু মনে করবেন না ডাক্তার পেরন? টারাসকনের ফিরতি ট্রেনটা এখুনি গেলে ধরতে পারব।

—নিশ্চয়ই, ডাক্তার রে।

ডাক্তার রে বিদায় নিলেন। বললেন,—বিদায় ভিনসেন্ট। খুব ভালো থাকবে এখানে। সেরে উঠবে। সময় পেলেই আমি এসে তোমাকে দেখে যাব। এক বছরের মধ্যেই তুমি নতুন মানুষ হয়ে উঠবে, এ আমি বলে দিলাম।

—ধন্যবাদ ডাক্তার। অসীম তোমার অনুগ্রহ। হ্যাঁ, বিদায়।

ডাক্তার রে-র গাড়ি অদৃশ্য হোলো।

গেট ছেড়ে একধারে দাঁড়িয়ে ডাক্তার পেরন বললেন,—ঢোকো ভিনসেন্ট।

পা বাড়ালো ভিনসেন্ট।

বন্ধ হয়ে গেল উন্মাদ-নিকেতনের মজবুত লোহার দরজা।

———

সেণ্ট রেমি

১

ঠিক যেন কোন একটা গ্রাম্য রেল-স্টেশনের ওয়েটিং-র‍ুম। আসলে কিন্তু ওটা উন্মাদদের তৃতীয় শ্রেণীর ওয়ার্ড। ট‍ুপি বলো, চশমা বলো, ওভারকোট বলো,—উন্মাদরা সব কিছ‍ু পরে সব সময় তৈরি। যার ছড়ি আছে, তার সেই ছড়িটি পর্যন্ত হাতে। সামান্যতম সম্পত্তিও হয়ত আড়াল করতে তারা নারাজ।

ঘরটা যেন স‍ুদীর্ঘ একটা বারান্দা। সিস্টার ভিনসেণ্টকে নিয়ে এলেন খালি একটা খাটের কাছে।

—ম'শিয়ে, এই আপনার শোবার জায়গা। রাত্রিবেলা পর্দাগ‍ুলো টেনে দিতে পারেন। জিনিসপত্র গ‍ুছিয়ে রেখে ডাক্তার পেরনের সঙ্গে অফিসে দেখা করবেন।

নিভন্ত স্টোভটাকে ঘিরে এগারোটি প্রাণী। কেউ একটি কথা বলল না। নতুন একটি প্রাণী যে ঘরে এল, খেয়াল নেই কারো। সর‍ু ঘরের শক্ত মেঝের ওপর দিয়ে খট খট করতে করতে বিদায় নিল সিস্টার, কড়া-ইস্ত্রি-করা ধবধবে শাদা গাউন আর কুচকুচে কালো ওড়না সমেত।

ভিনসেণ্ট হাতের ভ্যালিসটা নামিয়ে চারিদিকটা দেখল। লম্বা ঘরের আড়াআড়ি দ‍ুদিকের দেয়ালের সামনাসামনি খাট পাতা সারি সারি করে। প্রত্যেকটা খাটের চারিদিকে ফ্রেমে আঁটা নোংরা ঘি রঙের পর্দা, রাত্রে সেগ‍ুলো টেনে দেওয়া চলে। নিচু কড়িগ‍ুলো মোটা মোটা অমস‍ৃণ কাঠের, সাদা চুনকাম করা দেয়াল, ঘরের মাঝখানে একটা স্টোভ। ছাদ থেকে ঠিক স্টোভের ওপর ঝোলানো একটিমাত্র আলো।

অন্যান্য রোগীদের এতো চুপচাপ দেখে ভারি আশ্চর্য লাগল ভিনসেণ্টের। একটি কথা বলছে না কেউ, বা পড়ছে না বা খেলছে না। লাঠির ওপর ভর করে বসে ফাঁকা চোখে প্রত্যেকে চেয়ে আছে স্টোভটার দিকে।

বিছানাটার মাথার দিকে দেয়ালে আটকানো একটা কাঠের বাক্স,—জিনিসপত্র রাখবার জন্যে। ভিনসেণ্ট তার পাইপ তামাক আর একটা বই কেবল রাখল ঐ বাক্সে,—বাকি জিনিসপত্র-ভর্তি ভ্যালিসটা ঠেলে দিল খাটের নিচে। তারপর ঘর ছেড়ে বাগানে গেল বেড়াতে। পথে পড়ল একসার অন্ধকার তালাবন্ধ ঘর, যার মধ্যে বহ‍ুকাল কেউ ঢ‍ুকবে বলে মনে হয় না।

সারা উদ্যানটা অযত্নরক্ষিত, জনবিবর্জিত। বড়ো বড়ো ঘাস উঠেছে এলোমেলো, ব‍ুনো গ‍ুল্মের জটলা; তাদের মাথায় বড়ো বড়ো পাইন গাছের জড়াজড়ি। চারিদিকে দেয়াল ঘেরা,—তার ফাঁক দিয়ে দিনান্তের স‍ূর্যরশ্মিটুকু এসে পড়ে এখানে ওখানে ঠিক যেন স্রোতহীন জলা। বাঁ হাতে একট‍ু এগিয়ে

আলাদা একটি বাড়ি,—সেখানে ডাক্তার পেরন থাকেন। ভিনসেণ্ট ধাক্কা দিল দরজায়।

ডাক্তার পেরন প্রথম জীবনে মার্সাইতে জাহাজী ডাক্তার ছিলেন। পরে বাতের আক্রমণে তাঁকে সে পেশা ছাড়তে হয়। শহরের বাইরে কম পরিশ্রমের কাজ তিনি খ‍ু'জছিলেন—এই উন্মাদশালার পরিচালকের কাজটি হয়েছে তাঁর মনের মতো।

ডাক্তার বললেন,—দ্যাখো ভিনসেণ্ট, আগে ছিলাম শরীরের ডাক্তার, দেহের রোগ সারাতাম। এখন হয়েছি মনের ডাক্তার,—আত্মার ব্যাধি নিয়ে নাড়াচাড়া করি। ডাক্তারি দ‍ুয়েতেই লাগে।

ভিনসেণ্ট প্রশ্ন করলে,—আপনার তো স্নায়বিক ব্যাধি সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। কিসের তাড়নায় আমি আমার কানটা কেটে ফেলেছিলাম,—বলতে পারেন ?

—তোমার রোগটা হোলো অপস্মার বা সন্ন্যাস-রোগ। ঐ রোগে কখনো-কখনো এইরকম উপসর্গ প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। শ্রবণেন্দ্রিয়টা অত্যন্ত অন‍ুভ‍ূতিপ্রবণ। রোগীর কানের কাছে কতো ভ্রান্ত স্বর যেন গ‍ুঞ্জন করতে থাকে,—রোগী ভাবে কানটা কেটে ফেললে ওদের হাত থেকে ম‍ুক্তি পাবে।

—তাও ব‍ুঝলাম। আচ্ছা, এখানে আমার চিকিৎসা কী করবেন ডাক্তার ?

—চিকিৎসা ? হ‍্যাঁ, চিকিৎসা হবে বৈকি। এই ধরো রোজ দ‍ুবার করে স্নান। প্রত্যেকবার স্নানের সময় দ‍ুঘণ্টা করে জলে ডুবে থাকতে হবে।

—তা ছাড়া ?

—তা ছাড়া একেবারে সম্প‍ূর্ণ শান্ত জীবন-যাত্রা—একট‍ুও উত্তেজনা যাতে না আসে। কাজ করবে না, বই পড়বে না, বেশি কথা বলবে না, তর্ক করবে না—

—কাজ! এতো দ‍ুর্বল আমি এখন,—কাজ তো করতেই পারব না।

—আর এখানকার সেণ্ট পল মঠ সংক্রান্ত যেসব ধর্মকর্ম আছে তাতে যদি যোগ দিতে না চাও তো বেশ,—সিস্টারদের আমি বলে দেব। এ ছাড়া যখনই যা দরকার বলে মনে হবে আমাকে এসে বললেই আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

—ধন্যবাদ ডাক্তার।

—ও, হ‍্যাঁ,—সন্ধে পাঁচটার মধ্যেই সাপার খেয়ে নিতে হবে। ঘণ্টা শ‍ুনতে পাবে এখনই। দেরি কোরো না তাহলে। মনে রেখো,—হাসপাতালের দৈনন্দিন র‍ুটিনের সঙ্গে যতো শীঘ্র নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারো, ততো শীঘ্রই তোমার উপকার শ‍ুর‍ু হবে।

এলোমেলো বাগান আর তালাবন্ধ অন্ধকার খ‍ুপরিগ‍ুলো পার হয়ে ভিনসেণ্ট আবার এসে পে‍ৌঁছল তার থার্ডক্লাস ওয়ার্ডে। এসে বসল তার বিছানায়। তখনো নিশ্চল নির্বাক তার এগারোটি সহবাসিন্দা। একট‍ু পরে ঘণ্টা বেজে

উঠল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব নিয়ে এগারো জন উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। ভিনসেণ্টও অনুসরণ করল তাদের।

খাবার ঘরটায় কাঁচা মাটির মেঝে। দেওয়ালে জানলা নেই একটিও। ঘর-জোড়া লম্বা একটি তক্তা দিয়ে বানানো টেবিল, দুপাশে তক্তা-পাতা বেঞ্চি। সিস্টাররা পরিবেশন করছেন,—খাবার কিন্তু জঘন্য। প্রথমে এক টুকরো কালো রুটি আর আরশুলা-ভাসা ঝোল। তারপর পাঁচমিশেলি ওঁচা তরি-তরকারির চচ্চড়ি। আর কিছু না। অন্য সবাই প্রাণপণে চেটেপুটে খেতে লাগল, ভিনসেন্টের কিন্তু প্যারিসের রেস্তোরাঁর কথা মনে পড়ে চোখ ফেটে জল আসতে লাগল।

খাওয়া শেষ হবার পর রোগীরা ঘরে ফিরে স্টোভের ধারে যে যার চেয়ারে গিয়ে বসল,—খাড়া হয়ে বসে রইল খাদ্যদ্রব্য হজম হবার আশায়। তারপর একে-একে জামা কাপড় ছেড়ে নিজের নিজের বিছানায় গিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল, টেনে দিল খাটের চারপাশের পর্দা। এ পর্যন্ত ভিনসেণ্ট কারো মুখে টুঁ শব্দটি শোনে নি।

সন্ধের অন্ধকার তখন সবে ঘনিয়ে আসছে। ভিনসেণ্ট জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। সামনে প্রসারিত সবুজ প্রান্তর, ফিকে নীলচে রঙের স্বচ্ছ আকাশ, দিগন্ত জুড়ে পাইন গাছের কালো পাড়। সারা ওয়ার্ডে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। যেটুকু আলো আর যেটুকু রঙ—শুষে নিতে লাগল প্রদোষের ধূসরতা। ঘরের মধ্যে জমতে লাগল ছায়া কালো কালো। আলোটা পর্যন্ত কেউ জেবলে দিয়ে গেল না। এমনি সায়াহ্ন-প্রহরে কিছু করবার নেই কেবল আপন আত্মার মুখোমুখি হয়ে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া।

জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় গেল ভিনসেণ্ট। নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল মাথার ওপরের কড়িকাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে। দেলাক্রোয়ার বইটা সে সঙ্গে এনেছিল। অন্ধকারে বাক্স হাতড়ে বইটা বার করে বুকের ওপর চেপে ধরল। মস্ত একটা আশ্বাস জাগল মনে। তাকে ঘিরে একই ঘরে একই ছাদের নিচে ঐ যেসব বাক্যহারা বাতুলের দল,—ওদের দলে সে নয়। পৃথিবীর মহান শিল্পীর সাহচর্যে সে আছে,—চামড়ার মোটা বাঁধাইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর বাণী তাঁর আশা তার ব্যাকুল চিত্তে আশ্বাস জাগাক, স্পর্শ দিক সফল সান্ত্বনার।

একটু পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল। কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানে না, হঠাৎ সে জেগে উঠল চাপা একটা গোঁ-গোঁ শব্দে। গোঁ-গোঁ শব্দটা ক্রমে ক্রমে বাড়তেই লাগল, শেষ পর্যন্ত ফেটে পড়ল আর্ত চিৎকারে,—যাও, চলে যাও! কেন আমার পেছনে লেগেছ? ও, ভেবেছ আমি বুঝতে পারিনি, তাই না? বোকা পেয়েছ আমাকে। জানি জানি, তুমি পুলিশ। কিন্তু আমার পেছনে কেন? বলছি তো আমি খুন করিনি,—আত্মহত্যা করেছে ও। তবু তুমি আমাকে ছাড়বে না? তবু আমার পেছু নেবেই? তবু একটু শান্তি দেবে না

আমাকে শয়তান ?

লাফিয়ে উঠল ভিনসেণ্ট। পর্দা সরিয়ে দেখে, বছর তেইশ বছরের সুপুরুষ এক যুবক দাঁত নখ দিয়ে নিজের গায়ের রাত্রিবাস ছিঁড়ছে। ভিনসেণ্টের ওপর চোখ পড়তেই ছেলেটি দৌড়ে তখন সামনে এল, হাঁটু গেড়ে বসে দুহাত জোড় করে বলতে লাগল,—মঁশিয়ে মুনে-সুল, আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন না। বিশ্বাস করুন, ও আমি করিনি। অস্বাভাবিক যৌন অপরাধের অপরাধী সত্যিই আমি নই! আমি উকিল, আপনার সব কেস আমি বিনি পয়সায় করে দেব। আমাকে গ্রেপ্তার করবেন না, দোহাই আপনার! আমি খুন করিনি, আমি টাকা চুরি করিনি! আমি, আমি—

সমানে চিৎকার করতে লাগল ছেলেটা আর বিছানার চাদরটা হাতে নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়তে লাগল সম্পূর্ণ অচৈতন্য উন্মত্ততায়। বাকি সমস্ত লোক তখন নিরুদ্বেগে ঘুমোচ্ছে।

ভিনসেণ্ট ছুটে গেল পাশের বিছানার ধারে। পর্দাটা সরিয়ে সে বিছানার লোকটাকে সজোরে ধাক্কা দিল। লোকটা জেগে উঠে বোকা-বোকা চোখে চেয়ে রইল ভিনসেণ্টের দিকে।

—উঠুন উঠুন, ছেলেটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে, নইলে নিজেরই কী বিপদ ঘটাবে বলা যায় না!

ধড়মড়িয়ে লোকটা উঠে বসল বিছানায়। মুখ দিয়ে হাউ-হাউ আওয়াজ করল খানিকটা। ঠোঁটের ধার দিয়ে লালা গড়াতে লাগল খালি।

কে কাঁধে হাত দিল ভিনসেণ্টের। চমকে লাফিয়ে সে মুখ ফেরালো। তৃতীয় বাসিন্দা। এ লোকটির বয়েস অনেকটা বেশি। বুড়ো-সুড়ো মানুষ। ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বললে,—ওটাকে টেনে তুলে লাভ নেই। জড়পিণ্ড ওটা,—এখানে এসে পর্যন্ত কথা বলেনি একটাও। আসুন আমরা দুজনে ছোঁড়াটাকে ঠাণ্ডা করছি।

চিৎকার করে চলেছে ছেলেটা। বিছানার গদি ফুটো করে তার মধ্য থেকে শুকনো ছোবড়া বার করে চারিদিকে ছড়াচ্ছে।

ভিনসেণ্ট কাছে এগিয়ে আসতেই পাগল ছেলেটা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিনসেণ্টের বুকের ওপর; দু-হাতে চাপড়াতে চাপড়াতে চেঁচাতে লাগল: স্বীকার করছি, স্বীকার করছি! হ্যাঁ, খুন—খুন করেছি। কিন্তু সে ঐ নোংরা কাজটার জন্যে নয়, সে কেলেংকারি আমি করিনি। খুন করেছি টাকার জন্যে। পুলিশ লেলিয়ে দেবে? গারদে পুরে রাখবে? ইঃ! কেস করো আমার নামে, হারিয়ে দেব! সব আইন আমার জানা আছে। ঠিক হারিয়ে দেব, হ্যাঁ!

—ধরুন ধরুন, ডানহাতটা চেপে ধরুন। এবার বিছানায় শুইয়ে দিন।

বিছানায় শুয়েও বক-বক করতে লাগল ছেলেটা। প্রায় এক ঘণ্টা পরে

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেও বিড়-বিড় করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে।

বয়স্ক লোকটি বললে,—ছেলেটা খুব ভালো ছিল মঁশিয়ে। আইন পড়ছিল। অত্যধিক পড়াশুনোর ফলে মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। এখন দিন-দশেক অন্তর একবার করে এরকম ক্ষেপে ওঠে। তবে মারধোর করে না কাউকে কখনো, এইটেই রক্ষা। আচ্ছা, গুড নাইট মঁশিয়ে।

আবার সব স্তব্ধ। কিন্তু বিছানায় গিয়ে আর শুতে পারল না ভিনসেন্ট। আবার সে খোলা জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। ভোর হতে এখনো দেরি, দিগন্তে দপ-দপ করছে শুকতারাটা। দ্যবিনির আঁকা এই প্রভাতী তারার চিত্রটা তার স্মরণে ভেসে উঠল,—অন্ধকার আকাশের ঐ ধ্রুবতারা, আর সেই চন্দ্রাতপের নিচে বিরাট বিশ্বের বিপুল প্রশান্তি,—আর অনাদ্যন্ত সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে অকিঞ্চিৎকর একটি মানুষ, যে একলা তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে ঐ তারার দিকে।

২

পরদিন সকাল বেলা প্রাতরাশ সারার পর বাতুলরা সব বাগানে গেল। সেখানে বল নিয়ে রুটিন-বাঁধা অনাসক্ত তাদের খেলাধুলো। পাথরের একটা বেঞ্চিতে বসে বসে ভিনসেন্ট তাদের দেখতে লাগল। প্রাচীরের বাইরে দেখা যাচ্ছে তৃণহীন পর্বতরাজি। সেন্ট জোসেফ দ্য অবেনাস সম্প্রদায়ের ধর্মযাজিকারা কালো সাদা পোশাক পরে প্রাচীন রোমক গির্জায় চলেছে,—গর্তে বসা ভাষাহীন তাদের চোখ। ডান হাতে মালা ঘোরাচ্ছে, আর বিড়-বিড় করছে প্রভাতী নাম-জপ।

একঘণ্টা পরে সবাই ফিরে এল ওয়ার্ডে। আবার বসল যে যার চেয়ারে। তাদের এমনি অপরিসীম অকর্মণ্যতা দেখে ভিনসেন্টের বিস্ময় লাগে। সারা ওয়ার্ডে একপাতা পুরোনো খবরের কাগজও নেই,—যে চোখ বোলানো চলে।

এমনি নির্বাক স্থাণুত্ব কতোক্ষণ সহ্য হয়! ভিনসেন্ট আবার বাগানে গেল, পায়চারি করতে লাগল উদ্দেশ্যবিহীন। সূর্যের আলোও এখানে যেন মুমূর্ষু, নিষ্প্রাণ। একবার ইচ্ছে করল ছুটে পালায় এখান থেকে। কিন্তু লোহার গেট তালাবন্ধ, আর পাঁচিলগুলো সব বারো ফুট উঁচু।

বুনো গোলাপের একটা ঝাঁকড়া ঝোপের ধারে বসে পড়ল ভিনসেন্ট। ভাবতে লাগল, কিন্তু ভেবে পেল না—কেন, কেন সে এই অর্ধমৃতদের আস্তাবল সেন্ট পলে এসে আস্তানা নিয়েছে! সমস্ত প্রাণ ভরে গেল অবসাদে, সমস্ত মন ডুবে গেল গভীর আতঙ্কে। আর ভরসা নেই, আর ফল নেই বৃথা ভাবনা ভেবে। ভরসাবিহীন আসক্তিবিহীন জীবন্মৃত্যু—এই শেষ-পর্যন্ত তার ললাট লিখন!

পায়ে পায়ে সে ফিরে চলল ওয়ার্ডে। বাড়ির বারান্দায় পা দেওয়া-মাত্র

তার কানে এল অদ্ভুত রকমের কুকুরের ডাক। ঘরের চৌকাঠে পা দেবার মধ্যেই কুকুরের ডাক নেকড়ের চিৎকারে পরিবর্তিত হয়েছে।

এগিয়ে চলল ভিনসেণ্ট। দীর্ঘ ওয়ার্ডের এক কোণে দেয়ালের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গত রাত্রের সেই বুড়ো লোকটা। ছাদের দিকে মুখ উঁচু করে লোকটা গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঐ অদ্ভুত জন্তুর চিৎকার করছে,—রক্তবর্ণ মুখে ফুটে উঠেছে কেমন একটা পাশবিক ভাব। নেকড়ের চিৎকারের পর আবার নতুন রকমের চিৎকার শুরু হোলো,—অরণ্যের কোন বন্য পশুর কান্না।

—এ কোন্ চিড়িয়াখানায় এরা বন্দী করেছে আমাকে! মনে মনে বলল ভিনসেণ্ট।

আর সবাই বসে আছে স্টোভের ধারে ধারে যে যার চেয়ারে,—বুড়োটা চেঁচিয়ে চলেছে—যেন কোন মার-খাওয়া জানোয়ারের মরণ আর্তনাদ! সহ্য করা যায় না।

ভিনসেণ্ট চেঁচিয়ে বলে উঠল,—একি! লোকটাকে থামানো যায় না কিছুতেই?

দু-পা সে এগিয়ে যেতেই তার পথ আটকে দাঁড়াল কাল রাত্রের সেই সুন্দর চেহারার তরুণটি।

বললে,—না, ওকে ঘাঁটাবেন না। তাহলে এমন ক্ষেপে যাবে যে আর সামলানোর উপায় থাকবে না। ঘণ্টা-কতক চেঁচিয়ে ও আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পালিয়ে গেল ভিনসেণ্ট ঘর ছেড়ে। লুকিয়ে গিয়ে বসে রইল বাগানের অনেক দূরের এক কোণে। মঠবাড়ির পাথরের দেয়াল ভেদ করে সারা সকাল ধরে তার কানে আসতে লাগল উন্মাদ মানুষের কণ্ঠে জানোয়ারের ভাষার বুক-ফাটা বীভৎস আর্তনাদ।

সন্ধেবেলা সাপার খেতে বসেছে সবাই। হঠাৎ একটি যুবা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার শরীরের সারা বাঁ দিকটায় পক্ষাঘাত। ডান হাত দিয়ে বুকের উপর একটা ছুরি ধরে হেঁকে উঠল সে,—সময় হয়েছে, এইবার আমি মরব, এই ছুরি বিঁধিয়ে নিজের হাতে মরব!

দুচোখ বিস্ফারিত করে ভিনসেণ্ট তাকিয়ে রইল মত্ততার আর-এক অভি-ব্যক্তির দিকে।

পাগলটার ডানদিকে আর-এক যে পাগল বসে ছিল, সে নিতান্ত ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। ছুরিশুদ্ধ লোকটার ডান হাতটা চেপে ধরে সে বললে,—আজ নয় রেমণ্ড; আজ যে রবিবার!

—হোক রবিবার! এই মুহূর্তে!—আমি আর বাঁচতে চাইনে! হাত-ছেড়ে দাও! হ্যাঁ, আজ, এখুনি...

—কাল রেমণ্ড, কাল। আজ দিনটা ভালো নয়।

—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার হাত! এই ছুরিটা আমি আমূল বিঁধিয়ে দেব আমার বুকের মধ্যে! দ্যাখো তোমরা সবাই!

—নিশ্চয়ই, দেবে বৈকি। কিন্তু এখনই নয়। এরও তো একটা দিন-ক্ষণ আছে। কাল···

রেমণ্ডের হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে লোকটা তাকে খাবার ঘর থেকে ওয়ার্ডে নিয়ে চলল। ব্যর্থতার আক্রোশে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল সে।

ভিনসেণ্ট তার পাশের চেয়ারের লোকটার দিকে তাকাল। চোখদুটো লোকটার লাল দগদগে,—উপদংশ ব্যাধির উপসর্গ। প্রশ্ন করলে,—ও-রকম করছিল কেন?

—ও তো রোজকার ব্যাপার! রোজই ও একবার করে ক্ষেপে ওঠে আত্মহত্যা করার জন্যে।

—তা এমনি সকলের সামনে কেন? একটা ছুরি লুকিয়ে রাখলেই পারে, তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নিশুতি রাতে ...

—আসলে বোধহয় মরতে ও চায় না, মঁশিয়ে।

পরদিন সকালে উন্মাদরা যখন মাঠে নিয়মিত ব্যায়াম করছিল, একজন লোক হাত পা ছুঁড়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে উল্টে পড়ল সশব্দে। শুরু হোলো তার প্রবল খিঁচুনি।

—এই সেরেছে, মৃগীরোগী উল্টেছে! চিৎকার করে উঠল একজন।

আর একজন বললে,—চেপে ধরো ওর হাত পা!

চেপে ধরতে লাগল চার পাঁচজন। মূর্ছাগ্রস্ত মৃগীর শরীরে অমিত শক্তি। গতকালকার সেই সুন্দর ছেলেটি পকেট থেকে চট্ করে একটা চামচ বার করে মৃগী রোগীর দুই চোয়ালের ফাঁকে পুরে দিল, যাতে সে নিজের জিভটাকে কামড়ে দু-টুকরো করে না ফেলে।

প্রায় আধ ঘণ্টার প্রবল তাড়সের পর লোকটা একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। পড়ে রইল নিশ্চল হয়ে। ভিনসেণ্ট আর দুজন তাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। ব্যস, এই পর্যন্ত। এ সম্বন্ধে কেউ আর কোন কথা বলল না।

দু-সপ্তাহের মধ্যে ভিনসেণ্ট তার এগারো জন পাগল সঙ্গীর প্রত্যেকের পাগলামির উপসর্গের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেল। একজন ক্ষেপে ক্ষেপে উঠে চিৎকার করে আর তার পোশাক পরিচ্ছদ বিছানা-পত্র সব ছেঁড়ে—একজন আর্তনাদ করে বিভিন্ন জন্তুর স্বরের অনুকরণে, একজন সর্বদা আত্মহত্যা করব বলে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে,—তাছাড়া দু-জনের মাথা খারাপ রতিজ রোগ থেকে, দু-জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত উন্মাদ, একজনের মৃগী, একজনের মত্ততার প্রকাশ দুর্বলের প্রতি নিষ্ঠুরতায়, একজন বোবা, আর একজন চমকে চমকে ওঠে এই ভয়ে—ঐ বুঝি পুলিশ ধরল তাকে।

একটি দিনও কাটে না যেদিন কারুর পাগলামি ফেটে না পড়ে। এমন দিন

যায় না যেদিন একজন উম্মাদের শুশ্রূষা ভিনসেন্টকে করতে না হয়। তৃতীয় শ্রেণীর যারা রোগী তারাই এর-ওর ডাক্তার, এর-ওর নার্স। দুনিয়া তাদের বরবাদ করে দিয়েছে,—আত্মীয় স্বজন করেছে আপদ বিদায়। সিস্টারদের টিকি দেখা যায় না প্রকৃত সেবার সময়ে,—ডাক্তার নিজেই আসেন সপ্তাহে মাত্র একবার। রোগীর দলের প্রত্যেকেই জানে কবে তার নিজের আসবে সম্বিতহারা মত্ততা। তখন এই অন্ধকূপের যারা তার জীবনসঙ্গী তারাই তাকে ধরবে, সামলাবে, সহ্য করবে, যতোটা পরিবর্তন করবার করবে। পারস্পরিক মায়া মমতায় ঘেরা পাগলদের এই থার্ড ক্লাস কামরা।

ভিনসেন্টের দুঃখ নেই,—বরং খুশিই সে এখানে এসেছে বলে। বিভিন্ন উম্মাদের দৈনন্দিন জীবন আর বিচিত্র উন্মত্ততার প্রত্যক্ষ পরিচয় তার পক্ষে মস্ত অভিজ্ঞতা,—পাগলামির ভয়টাও তার কাটছে। আস্তে আস্তে তার উপলব্ধি হচ্ছে যে বাতুলতা একটা ব্যাধি মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। সঙ্গী হিসেবে ততো ভয় নয়, যতো ভয় যক্ষ্মা বা ক্যান্সার রোগীকে।

মাঝে মাঝে ভিনসেন্ট আলাপ করবার চেষ্টা করে বোবা বাতুলটার সঙ্গে। লোকটা কথা বলতে পারে না, লালা-ঝরা মুখ দিয়ে কেবল হাউ-হাউ আওয়াজ করে। কিন্তু ভিনসেন্টের মনে হয়, সে যে ওর সঙ্গে আলাপ করে তাতে ও খুশিই হয়, তার কথা ওর সহসা-উপলব্ধির কোথায় গিয়ে যেন বাজে। নার্সরা এক হুকুম করা ছাড়া কোন রোগীর সঙ্গে কথা বলে না। সপ্তাহে একবার করে ডাক্তার পেরন এলে সে তাঁর সঙ্গে মিনিট পাঁচেক করে আলাপ করবার সুযোগ পায়,—সেইটুকুই তার সুস্থ স্বাভাবিক কথাবার্তার সুযোগ।

—আচ্ছা বলুন তো ডাক্তার,—একদিন সে প্রশ্ন করল,—এরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে না কেন? সুস্থ অবস্থায় এদের অনেকেরই তো বেশ বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে দেখি।

—ওরা কথা বলতে চায় না ভিনসেন্ট। বোঝে কথা বলতে বলতেই তর্ক শুরু হবে, আর মনে উত্তেজনা এলেই পাগলামি ওদের চেপে ধরবে। ওরা বুঝেছে যথাসম্ভব সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে হলে চুপ করে থাকাই ওদের দরকার।

—কিন্তু এর নাম কি বেঁচে থাকা! এ তো মরারই সামিল।

—তা বলতে পারো,—এটা হোলো মতের কথা।

—কিন্তু চুপ করে বই পড়লেও তো পারে। পড়াশুনো করলে তো—

—হ্যাঁ, পড়াশুনো করা মানে মনটাকে মন্থন করা। তার ফল প্রচণ্ড মত্ততা। না ভায়া, চারিদিক কালো দেয়াল দিয়ে ঘেরা ওদের নিজের নিজের বন্ধ স্থানটিতে চুপ করে বসে না থেকে ওদের উপায় নেই। ওদের জন্যে আর দুঃখ করবার প্রয়োজনও নেই। ড্রাইডেনের সেই কথাটা মনে নেই—'পাগল হওয়ার মধ্যেও সুখ আছে; সে সুখ কেবল পাগলেই উপভোগ করতে পারে।'

এক মাস কাটল। এই এক মাসের মধ্যে ভিনসেন্টের একবারও এ জায়গা

ছেড়ে যাবার অভিলাষ হয়নি। এই উন্মাদাশ্রম ছেড়ে যাবার জন্যে আর কারো যে ইচ্ছে আছে তাও তার একবারও মনে হয় নি। এমনি অভিলাষবিহীন স্বর্গ, সে জানে এর মূল কোথায়। প্রত্যেকে জানে, আশা নেই ভরসা নেই কারো,—কারো নেই বহির্বিশ্বে এক ইঞ্চি জায়গা। তাই এই কারাগারই ভালো, এইখানেই মুক্তি, এইখানেই পরিত্রাণ।

প্রতীক্ষা শুধু চরম পরিত্রাণের,—সারা ওয়ার্ড জুড়ে গন্ধ শুধু মরন্ত মানুষের।

শক্ত করে নিজের মনটাকে বেঁধে রাখে ভিনসেণ্ট। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় নয়,—কবে আবার শক্তি ফিরে পাবে, বাসনা ফিরে পাবে আঁকবার, সেই দিনের প্রতীক্ষায়। তার সঙ্গীরা যা পায় তাই শুধু তিনবেলা খায় আর অলস রোমন্থন করে। ভিনসেণ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করে বিনষ্ট জীবনের সেই জগদ্দলকে দূরে সরিয়ে রাখতে। থিয়ো তাকে এক ভল্যুম শেকস্পীয়ার পাঠিয়েছে :—'রিচার্ড দি থার্ড', 'হেনরি দি ফোর্থ' আর 'হেনরি দি ফিফথ' : সে পড়ে ফেলেছে, মনকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছে অন্য যুগে, অন্য রাজ্যে।

বুকের মধ্যে বেদনার জোয়ার বন্যার মতো ফুঁসে ফুঁসে ওঠে, ডুবিয়ে দিতে চায়,—প্রাণপণে বাঁধ বাঁধে সে আশ্বাসের।

বিয়ে করেছে থিয়ো। সে আর তার নববিবাহিতা স্ত্রী জোহানা প্রায়ই ভিনসেণ্টকে চিঠি লেখে। থিয়োর শরীর ভালো নয়। এ ভাবনা ভিনসেণ্ট ভাবে, জোহানাকে চিঠি লেখে—নিজের হাতে ভালো করে রান্না করে থিয়োকে খাওয়াতে। এতো বছর রেস্তোরাঁতে খেয়ে খেয়েই দেহ তার পাত হতে চলেছে।

সপ্তাহ দুয়েক পরে ডাক্তার পেরন তার জন্যে একটা ছোট স্টুডিয়োর ব্যবস্থা করে দিলেন। পাশুটে সবুজ রঙের ঘরটার দেয়াল। ম্লান গোলাপ ফুল আঁকা সবুজ রঙের দুটি পর্দা আর একটি পুরোনো আরামকেদারা—এ দুটি দ্রব্য পয়সাওলা এক মৃত রোগীর নিদর্শন। জানলার বাইরে সোজা চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র—মুক্তির আহ্বান। জানলায় অবশ্য কালো কালো মোটা মোটা লোহার গরাদে।

জানলা দিয়ে বাইরেটা চোখ পড়া-মাত্র ভিনসেণ্ট বহির্দৃশ্যটা আঁকা শুরু করে দিল। ছবিটার সামনের দিকে ঝড়ে নুয়ে পড়া শস্যক্ষেতের কিছুটা অংশ, ঢালু বেয়ে একটা দেয়াল, দূরে কয়েকটি অলিভ গাছ, কয়েকটি কুটির আর পাহাড়ের শ্রেণী। ছবির একেবারে মাথায় সুনীল আকাশের গায়ে মস্ত একটা ধূসর-সাদা মেঘ।

সারাদিন ছবি আঁকার পর সাপার খাবার সময় সে ওয়ার্ডে ফিরে এল। উৎফুল্ল তার মন,—ক্ষমতা সে হারায় নি,—প্রকৃতি তাকে পরিত্যাগ করেনি একেবারে। প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবার সৃষ্টির প্রেরণাকে ফিরে পেয়েছে।

ভয় কী তার? জীবন্মৃতদের এই আস্তানা আর তাকে মারতে পারবে না।

এইবার সে সেরে উঠল বলে। ক-মাস পরেই সে বার হবে এখান থেকে। ফিরে যাবে প্যারিসে—পুরোনো বন্ধুদের আড্ডায়। এই তো তার নব জীবনের সূচনা। লম্বা চিঠি লিখল থিয়োকে—রঙ চেয়ে, তুলি চেয়ে, ক্যানভাস আর নতুন নতুন আকর্ষণী বই চেয়ে।

পরদিন সকাল বেলা মেঘহীন উজ্জ্বল আকাশে উঠল জ্বলন্ত হলুদ সূর্য। ভিনসেন্ট তার ঈজেল নিয়ে ওয়ার্ড থেকে বাইরে বাগানে গেল,—পাইন গাছ, বন, ঝোপ আর বাগানের হাঁটা-পথ মিলিয়ে শুরু করল একটি দৃশ্যপট আঁকা। ওয়ার্ডের অন্য বাসিন্দারা পেছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সম্ভ্রমভরা চোখে দেখতে লাগল তার কাজ।

বিকেল বেলা সে গেল ডাক্তার পেরনের সঙ্গে দেখা করতে : —আমি একেবারে সুস্থ হয়ে গেছি ডাক্তার, বাইরে মাঠে গিয়ে ছবি আঁকতে আমাকে অনুমতি দিন।

ডাক্তার বললেন,—তা, তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে ভিনসেন্ট যে তুমি যথেষ্ট ভালো হয়েছ। স্নান আর বিশ্রাম এই দুয়ে মিলে তোমার খুব উপকার করেছে। তবু বাইরে যাওয়া এখনই কি তোমার উচিত হবে ?

—কেন ডাক্তার পেরন, কেন উচিত হবে না ?

—ধরো মাঠের মধ্যে একলা,—এমনি অবস্থায় যদি হঠাৎ তোমার আবার স্ট্রোক হয় ?

হেসে উঠল ভিনসেন্ট,—কী বলেন। আবার পাগলামির আক্রমণ ? ভুলে যান ডাক্তার, ও আর আমার হবে না। ওসব শুরু হবার আগে নিজেকে যতোটা ভালো লাগত, এখন তার চাইতে অনেক বেশি ভালো লাগছে আমার।

—তবু ভিনসেন্ট, আমার ভয় হয়—

—কিছু ভয় নেই ডাক্তার,—অনুরোধ আপনি রাখুন। যেখানে খুশি ঘুরব, যা ভালো লাগে আঁকব—বিশ্বাস করুন, এই হচ্ছে আমার এখন ওষুধ। কাজ না করলেই বরং আবার আমি ডুবব।

—বেশ, কাজ করলেই যদি তুমি ভালো থাকবে বলে মনে করো—

ভিনসেন্টের জন্যে উম্মাদ-নিকেতনের লোহার দরজা উন্মুক্ত হোলো। পিঠে ঈজেল বেঁধে পথে বার হোলো ভিনসেন্ট আবার,—ছবির উপাদানের অন্বেষণে। সারা দিন তার কাটতে লাগল উম্মাদাগার থেকে দূরে পাহাড়ে জঙ্গলে। সেন্ট রেমির আশেপাশের সাইপ্রেস-কুঞ্জ ভিড় করে এল তার ভাবনায়। আশ্চর্য সুন্দর ওরা,—সোনালি দৃশ্যপটের মাঝে ফুটে ওঠা ওদের কালো রূপের কী অপূর্ব মহিমা! কেন ওদের সে দেখেও দেখেনি এতোদিন,—আর্লসের সূর্যমুখীর ছবিগুলোর মতো ওদের নিয়েও কি প্রাণভরা ছবি আঁকতে সে পারবে না ?

আর্লসের দিনের পুরোনো অভ্যাসগুলো সব ফিরে এল আবার। প্রতি-

দিন ভোরবেলা সে রঙ-তুলি ঈজেল আর ক্যানভাস নিয়ে বার হয়, সম্পূর্ণ একটি ছবি এঁকে নিয়ে আসে সন্ধ্যাবেলা। সৃজনীশক্তিতে যদি বা একটু ভাঁটা পড়েছে, তা সে ধরতেও পারে না। মনে হয়, আবার সে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে।—শক্তি বাড়ছে দিনে দিনে, অনুভূতি হচ্ছে তীক্ষ্ন থেকে তীক্ষ্নতর।

তিন মাস কাটবার পর হঠাৎ একদিন তার রক্তে নেশা ধরিয়ে দিল ঐ সাইপ্রেস গাছ, সেই নেশা তাকে নিয়ে গেল দুঃখসুখের ঊর্ধ্বে,—সব বেদনা পেরিয়ে। বিরাট বিরাট গাছগুলো! ছবি শুরু করল ওদের নিয়ে। ছবির সামনের দিকটা নানাপ্রকার গুল্মে ভরা। পেছনে বেগুনি রঙের কয়েকটা পাহাড়, গোলাপি সবুজে মেশা আঁধার-করা আকাশ, তাতে ক্রম-হ্রাসমান চন্দ্র। সেদিন রাত্রে ঘরে গিয়ে ক্যানভাসটা যখন ভালো করে দেখল, বুঝল সে,—আর তার ভয় নেই। অন্ধকার গহ্বর-বাসের যুগ তার অতিক্রান্ত, আবার শক্ত মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে খোলা আকাশের নিচে—সামনে তার নবোদ্ভাসিত সৃজন-সূর্য।

আনন্দের বান ডাকল সারা প্রাণে। মুক্তি, মুক্তি! আবার সে মুক্ত মানুষ! পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর দুর্ভাগ্য তার কাটল এতোদিনে।

থিয়ো তাকে বেশি কিছু টাকা পাঠালো। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সে গেল আর্লসে,—হলদে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে তার ছবিগুলো ছাড়িয়ে আনবার জন্যে। প্লেস লামার্টিনের অধিবাসীরা তার সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করল, কিন্তু হলদে বাড়িটা দেখেই মাথাটা যেন কেমন করে উঠল। মনে হোলো এই বুঝি মূর্ছা যাবে। ঠিক ছিল প্রথমে যাবে ডাক্তার রে আর রুলিনের কাছে, কিন্তু মত বদলে তাড়াতাড়ি ছুটল মালিকের সন্ধানে। সকলের আগে ছবিগুলো উদ্ধার করা চাইই চাই।

কথা রাখতে পারল না। বলেছিল সেদিন রাত্রেই ফিরে আসবে আর্লস থেকে। পরদিন সকালবেলা তার মূর্ছিত দেহটা পাওয়া গেল টারাস্কন আর সেণ্ট রেমির মাঝামাঝি জায়গায়। পথের ধারে একটা খাদের মধ্যে উপুড় করা, মাথাটা ডোবানো।

প্রচণ্ড জ্বর, আচ্ছন্ন চৈতন্য। এমনি কাটল তিন সপ্তাহ। ওয়ার্ডের অন্য অধিবাসীরা খুব করল তার জন্যে। কী তার ঘটেছিল তা উপলব্ধি করার মতো মাথাটা যখন পরিষ্কার হোলো, বারে বারে সে বলতে লাগল,—ছি, ছি। কী করেছি! কী কেলেঙ্কারি!

তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে সে ওয়ার্ডের বারান্দায় একটু একটু চলাফেরা করতে পারছে। শরীর তখনো দুর্বল, কিন্তু মনটা সুস্থ হয়ে এসেছে অনেকটা। এমনি সময় একদিন সিস্টাররা একজন নতুন রোগীকে ভর্তি করল। রোগীটি বেশ শান্তভাবে তার বিছানায় এসে বসল, কিন্তু সিস্টাররা পেছন ফেরামাত্র ফেটে পড়ল

পাশবিক উন্মত্ততায়। লাফাতে লাফাতে চিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে, নিজের সমস্ত জামাকাপড় আর বিছানার চাদর বালিশ সব নখ দিয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে, তারপর খাট, বাক্স, পর্দার কাঠ, সব মড়-মড় করে ভাঙল।

আনকোরা নতুন রোগীকে পুরোনো বাসিন্দে রোগীরা ছোঁয় না, পাগলামিতে যতো সর্বনেশেই সে হয়ে উঠুক না কেন। হাসপাতালের কয়েকজন পরিচালক ছুটে এসে উন্মাদটাকে ধরে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে। বারান্দার পাশে খালি একটা কুঠরির মধ্যে তাকে তালা দিয়ে রাখা হোলো। প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে পাগলটা ঘা-খাওয়া বন্দী জানোয়ারের মতো দিন-রাত অবিশ্রাম আর্তনাদ করতে লাগল। তার এই নিরবচ্ছিন্ন চিৎকার অসুস্থ ভিনসেণ্টের মাথার মধ্যে বাজতে লাগল কশাঘাতের মতো। তারপর একদিন সব চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। ভিনসেণ্ট লক্ষ করল হাসপাতালের লোকেরা অদূরের কবরখানায় লোকটাকে মাটি-চাপা দিচ্ছে।

সাংঘাতিক একটা অবসাদ কালো কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন করল ভিনসেণ্টের মন। শরীর তার যতোই সেরে ওঠে, বিচারবুদ্ধি যতোই স্বাভাবিক হয়ে আসে, —এই অবসাদ ততো ঘন হয়ে মনের আকাশে জমে। কী হবে শিল্পী হয়ে? কী হবে ছবি এঁকে? কী মূল্য জীবনের? কিন্তু জীবন যতোদিন আছে,— কাজ না করে, ছবি না এঁকেই বা সে করবে কী!

ডাক্তার পেরন তার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে আলাদা করে কিছুটা মাংস ও মদের ব্যবস্থা করে দিলেন, কিন্তু তাকে স্টুডিয়োতে যাবার অনুমতি কিছুতেই দিলেন না। সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাগল সঙ্গীদের সঙ্গে কর্মহীন দিন কাটিয়ে আর অসহ্য অলসতা দেখে দেখে নিজেই আবার প্রায় পাগল হয়ে উঠল ভিনসেণ্ট, ছুটে গেল ডাক্তার পেরনের কাছে।

সোজাসুজি সে বললে—ডাক্তার পেরন, কাজ না করলে আমি কিছুতেই সুস্থ হব না। ঐসব পাগলদের সঙ্গে হাত গুটিয়ে চুপ করে থেকে যদি আমার জীবন কাটে, তাহলে আর কদিন পরে ওদেরই মতো পাগল হয়ে যাব আমি।

—তা বুঝি, ভিনসেণ্ট। কিন্তু বেশি কাজ করে করেই তোমার আবার ঐ রকম হয়েছিল। কাজ মানেই উত্তেজনা, ও তোমার চলবে না।

—না ডাক্তার, কাজ করে আমার কিছু হয় নি। হোলো আর্লসে যাবার ফলে। প্লেস লামার্টিন আর আমার পুরোনো সেই বাড়িটা দেখেই আমার মাথা ঘুরে উঠল। আর্লসে আর আমি যাচ্ছি নে, পড়ছিও নে খানার মধ্যে আবার যেতে চাই শুধু এখানকার আমার স্টুডিয়োতে।

ডাক্তার পেরন নিজে দায়িত্ব নিলেন না, লিখলেন থিয়োকে। থিয়ো উত্তর দিল সঙ্গে সঙ্গে—ছবি আঁকুক ভিনসেণ্ট, যা হয় হোক।

সেইসঙ্গে সে একটি শুভ খবর দিল ভিনসেণ্টকে। শীঘ্রই মা হতে চলেছে

জোহানা। এমনি সুখবরের খুশিতে মুহূর্তে সুস্থ হয়ে উঠল ভিনসেণ্ট। তখুনি সে লিখল থিয়োকে,—আমার কী মনে হচ্ছে জানো থিয়ো ? নীল আকাশ আর চষা ক্ষেত, সবুজ ঘাস আর গ্রাম্য কিষাণ—এদের কাছ থেকে যে ঐশ্বর্য আমি পেয়েছি, তোমার পরিবারের কাছ থেকেও তাই তুমি পাবে। তোমাকে উপহার দেবার জন্যে যে সন্তানটিকে জোহানা তার গর্ভে সৃষ্টি করে চলেছে,—সে-ই তোমাকে দেবে বাস্তবের সন্ধান. জীবন-সত্যের সঙ্গে তোমাকে নিত্যবন্ধনে বাঁধবে সে-ই। জোহানার গর্ভে শিশুটির নড়া-চড়া ধরতে পারবে, আর প্রস্তুতির গভীর প্রাণস্পন্দন তোমার প্রাণে এসে স্পন্দিত হবে।

আবার সে অনুমতি পেল স্টুডিয়োতে যাবার। জানলার ধারে বসে বসে আঁকল সামনের শস্যক্ষেতটা,—নিঃসঙ্গ একটি কৃষাণ আর আকাশে মস্ত সূর্য একলা। সারা ছবিটা জুড়ে হলুদ রঙের মেলা, কেবল জানলার ঠিক বাইরে গারদের প্রাচীরের কর্কশ রেখা আর দূরে বেগুনি পাহাড়ের দিগন্তস্পর্শ ছাড়া।

থিয়োর অভিলাষ অনুসারে ডাক্তার পেরন তাকে বাইরেও যেতে দিলেন কিছুদিন পরে।

আবার তার মনে সাইপ্রেস গাছের নেশা লাগল। আঁকল সাইপ্রেস, আঁকল অলিভ-সংগ্রহকারিণী কটি মেয়ের আশ্চর্য সুন্দর একটি ছবি।

মাঠে যেতে যেতে কোনো চাষীর সঙ্গে দেখা হলে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে শুরু করল সে। নিজেও সে চাষী, তার বেশি কিছু নয়। একদিন একজনকে বললে,—দ্যাখো, তুমি যেমন লাঙল চষো মাটিতে, আমিও তেমনি চষি ক্যানভাসের ওপর,—ফসল ফলাও তুমি, আমিও তাই।

এল শরতের শেষ। সারা প্রকৃতিতে রূপের পরম প্রকাশ, রঙের বিচিত্রতম লীলা। সারা মাটি ছেয়ে গেল ভায়োলেটে, বাগানে গোলাপ গাছের নিচে নিচে রৌদ্র-জ্বলা ঘাসে আগুন-মাখা লালচে আভা, কাঁচা রোদের রঙে রঙে গাছের সব পাতা সোনালি-হলুদ হয়ে উঠছে,—মেঘবিহীন আকাশে মন-উত্তাপ-করা নীলিমা।

আর এই শেষ শরতের সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ শক্তি ফিরে পেল ভিনসেণ্ট। কাজে সে বাধা পাচ্ছে না, ভালো ভালো আইডিয়া তার মাথায় আসছে, দানা বাঁধছে। এখানকার বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ও নিবিড় হচ্ছে দিনে দিনে। আর্লসের মতো সর্বনেশে মত্ততা-জাগানো জায়গা নয় এই সেণ্ট রেমি। সূর্যের তেজ কম, পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে দিগন্তপ্রান্ত থেকে ঝড় ফিরে ফিরে যায়। প্রকৃতির শোভা মনকে কেড়ে নেয়, বেঁধে রাখে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকে, উন্মাদাগারকে আর কয়েদখানা বলে মনে হয় না,—মনে হয় হাসপাতাল নয়, হোটেল। বেশ আছে ; কোথায় সে আবার ঘুরে মরতে যাবে এমন জায়গা ছেড়ে।

প্যারিসের চিঠি সর্বদা মনে খুশির খোরাক জোগায়। জোহানা নিজের হাতেই রাঁধছে ডাচ্ খাবার-দাবার, থিয়োর শরীর ভালো হচ্ছে দিনে দিনে। প্রসূতিরও

স্বাস্থ্য ভালো। তা ছাড়া শুধু চিঠি নয়,—থিয়ো প্রায়ই পাঠাচ্ছে তামাক বা চকোলেট, বই বা খুচরো টাকা। ছবি আঁকার সরঞ্জাম তো আসছেই যতো চাই।

আর্লসে গিয়ে যে উম্মত্ততার আক্রমণে পড়েছিল সে কথা ভুলেই যেতে চায় ভিনসেন্ট। তার দৃঢ় ধারণা, ঐ দুর্ভাগ্যের শহরে যদি সে পা না বাড়াতো তা-হলে ছটি মাস সে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারত। মাঝের কেলেংকারিটা ঘটত না। সাইপ্রেস আর অলিভ গাছের ছবিগুলো আঁকা শেষ করে সেগুলো একটু মদ দিয়ে ওয়াশ করে ভিনসেন্ট থিয়োর কাছে পাঠিয়ে দিল। থিয়ো উত্তরে লিখল, তার কয়েকটা ছবি ইন্ডিপেন্ডেন্টস গ্যালারিতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। এতে সে খুব যে খুশি হোলো তা নয়। এখনো যে তার হাত পাকে নি, শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি করতে তার যে এখনো অনেক দেরি—এরই মধ্যে?

থিয়ো সর্বদাই তাকে লেখে, খুব ভালো কাজ করছে সে, খুব উন্নতি হচ্ছে তার ছবির। ভিনসেন্ট ঠিক করেছে এই হাসপাতালের এক বছরের মেয়াদ শেষ হলেও এখানেই সে থাকবে। গ্রামের মধ্যে একটা বাড়ি ভাড়া নেবে। কতো কাজ এখানে তার বাকি! গগাঁ এসে জোটার আগে আর্লসে প্রথম-প্রথম যেমন সার্থক আনন্দের সন্ধান পেয়েছিল, তেমনি আনন্দে আবার তার মন ভরে উঠছে।

একদিন বিকেলবেলা শান্ত মনে মাঠের মাঝখানে বসে সে ছবি আঁকছে একলা,—হঠাৎ মাথার ভেতরটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। মুহূর্তপরে আর কিছু মনে নেই। গভীর রাত্রে হাসপাতালের রক্ষীরা খুঁজে পেল তাকে তার ঈজেল যেখানে পেতেছিল সেখান থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। একটা সাইপ্রেস গাছের কান্ডের সঙ্গে কাঠ হয়ে জড়িয়ে আছে তার অনড় মূর্ছিত দেহটা।

৪

পুরো পাঁচদিন পরে ভিনসেন্টের স্বাভাবিক চৈতন্য ফিরে এল। মানসিক ব্যাধির দ্বিতীয় বারের এই আক্রমণের পর সবাই এটাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছে,—এইটে জেনেই সবচেয়ে খারাপ লাগল তার।

শীতকাল এল। দিনের পর দিন বিছানায় পড়ে রইল ভিনসেন্ট—ওঠবার মতো মানসিক শক্তি নেই। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত রোগীরা ঘরে বসে থাকে স্টোভটাকে ঘিরে। দেয়ালের উঁচু উঁচু ছোট জানলাগুলো দিয়ে যতো না আলো আসে, বন্ধ ঘরে ছায়া জমে তার চেয়ে বেশি। স্টোভটার গরম শীত তাড়ায়, সারা ঘর ভরে যায় জীবন্মৃতের কটু গন্ধে। কালো কালো টুপি আর ওড়নার নিচে সিস্টারদের মুখ আরো ঢাকা পড়ে, মালা ঘোরাতে ঘোরাতে আর নাম জপ করতে করতে তারা ছায়ামূর্তির মতো সায়াহ্নে বারান্দায় ঘোরে। দূরে শষ্পহীন রুক্ষ পাহাড় যেন মৃত্যুর পাহারা।

ঘুম আসে না। চুপ করে বিছানায় পড়ে থাকে ভিনসেন্ট। মনে মনে ভাবে, শিল্প থেকে সে কী শিখেছে, কী শিখেছে মহৎ সাহিত্য থেকে?—দুঃখ

পাও কিন্তু অভিযোগ কোরো না,—বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হবে হৃদয়, কিন্তু ঘৃণা কোরো না বেদনাকে। এ শিক্ষা মহৎ, কিন্তু দিনে দিনে বেদনা আনে মত্ততা, —যন্ত্রণা নিয়ে চলে মৃত্যুর পথে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমনি একটা মুহূর্ত আসে যখন বুকের মধ্যে সঞ্চিত বেদনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় জীর্ণ কন্থার মতো।

দিন কাটে নিষ্ফলা পৌনঃপুনিকতায়। কোনো কল্পনা আসে না মনে, জাগে না কোনো আশা। সিস্টাররা তার ছবি আঁকা নিয়ে আলোচনা করে, বলাবলি করে—সে ছবি এঁকেই পাগল হয়েছে, না পাগল হয়েছে বলেই ছবি আঁকে ওদের কথা কানে আসে মাঝে মাঝে।

বোবা বাতুলটা কোন-কোন দিন বিছানার ধারে তার পাশে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাউ-হাউ করে যায়। নিজেকে সে ব্যক্ত করতে পারে না, ঐ ভাষাহারা ধ্বনির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে চায় বন্ধুত্বের উষ্ণতা। ভিনসেণ্ট তাকে তাড়িয়ে দেয় না, কখনো কখনো তাকে সামনে রেখে কথা বলে যায়। কথা বলার লোক চাই তো!

একদিন সিস্টাররা চলে যাবার পর ভিনসেণ্ট জড় লোকটাকে বললে,—ওরা কী ভাবে জানিস? ওরা মনে করে আমার কাজই আমাকে পাগল করেছে। এটা ঠিক যে শিল্পী শুধু তার দু-চোখ দিয়ে যা দেখে তাতেই মত্ত হয়ে যায়,—জীবনের সবকিছু খুঁটিনাটির ওপর সে আর কড়া নজর রাখতে পারে না। কিন্তু তাই বলে তাকে কি লোকে পাগল বলে? বলে, সমাজে বসবাস করবার অনুপযুক্ত?

শেষ পর্যন্ত দেলাক্রোয়ার বইএর একটি লাইন তাকে শক্তি দিল বিছানা ছেড়ে ওঠবার,—সেই যে লাইনটি—'যখন আমার বুকে নেই নিশ্বাসের জোর, মুখে নেই একটিমাত্র দাঁত,—তখন আমি আবিষ্কার করলাম অঙ্কন-শিল্পকে।'

শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দু-পা হেঁটে বাগানে যাবার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত নেই। কয়েক সপ্তাহ কাটল শুধু স্টোভের ধারে চেয়ারে বসে থেকে থিয়োর পাঠানো এটা-ওটা বইএর পাতায় চোখ বুলিয়ে। সঙ্গীদের কারো যখন উম্মত্ততার আক্রমণ হয় তখনো সে চেয়ার ছেড়ে ওঠে না। মত্ততাকে আর তার আশ্চর্য লাগে না, যা অস্বাভাবিক তাকে স্বাভাবিক মনে করে নিতে একটু তার বাধে না।

কর্মপ্রেরণার আভাসটুকু নেই মনে। এতো অবসাদ, এতো ক্লান্তি। যায় ডাক্তার পেরনের কাছে।

—না ভিনসেণ্ট, আমি দুঃখিত, কিন্তু ছাড়া তুমি পাবে না। গেটের বাইরে তোমাকে যেতে দেবার আমার উপায় নেই।

—কিন্তু আপনি আমাকে স্টুডিয়োতে বসে কাজ করতে দেবেন তো?

—তাতেও আমার মত নেই।

—আপনি আমাকে আত্মহত্যা করতে বলেন ডাক্তার ?

—বটে ? বেশ, স্টুডিয়োতে যেতে পারো। তবে বেশি খাটবে না, রোজ কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

কোনো লাভ হোলো না। ঈজেল আর রঙ-তুলির সান্নিধ্য বিন্দুতম স্পন্দন জাগালো না মনে। দিনের পর দিন সে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে নিশ্চল-ভাবে কাটিয়ে দিল জানলার লোহার গরাদের মধ্য দিয়ে শীতের শূন্য মাঠের দিকে শুধু তাকিয়ে।

ক'দিন পরে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি সই করে নেবার জন্যে ডাক্তার পেরনের অফিসে তার ডাক পড়ল। খামের মধ্যে চারশো ফ্র্যাঙ্কের একখানা চেক, আর থিয়োর চিঠি। চারশো ফ্র্যাক ! এতো টাকা সে জীবনে পায়নি একসঙ্গে ! কোথেকে থিয়ো পাঠালো ?

মাই ডিয়ার ভিনসেণ্ট,

হোলো শেষ পর্যন্ত ! গত বছর বসন্তকালে আর্লসে থাকতে সেই যে লাল আঙুরকুঞ্জের ছবিটি এঁকেছিলে, সেটি বিক্রি হয়েছে চারশো ফ্র্যাংক দামে। ডাচ্ শিল্পী বক্-এর বোন আনা বক্ ছবিটি কিনেছেন।

অভিনন্দন জানাই তোমাকে ; এবার থেকে তোমার ছবি সারা ইউরোপে বিক্রি হবে। চেকটা পাঠালাম,—ডাক্তার পেরন যদি রাজি হন তো এই টাকায় প্যারিসে চলে এসো।

সম্প্রতি আমার একটি চমৎকার লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ডাক্তার গ্যাচেট। অভার্সে থাকেন—প্যারিস থেকে মাত্র এক ঘণ্টার রাস্তা। দ্যাবিনি থেকে প্রত্যেকটি নাম-করা শিল্পী তাঁর আশ্রয়ে থেকে কাজ করেছে। তিনি বলেন তোমার কেসটা তিনি ঠিক ধরেছেন,—যেদিন তুমি অভার্সে যাবে সেদিন থেকেই তোমাকে তিনি তাঁর হাতে নেবেন।

কাল আবার লিখব।

থিয়ো।

ভিনসেণ্ট চিঠিটি ডাক্তার পেরন আর তাঁর স্ত্রীকে দেখালো। পেরন চিঠিটি মন দিয়ে পড়ে চেকএর অঙ্কটিতে চোখ বুলিয়ে খুব উৎসাহের কথা বললেন ভিনসেণ্টকে। ভিনসেণ্ট বিদায় নিল অন্যমনস্কভাবে। তার মাথায় তখন আবার নতুন উদ্দীপনা জেগেছে। বাগানের কাঁচা রাস্তার আধাআধি গিয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ল, চেকটা পকেটে করে এনেছে, কিন্তু থিয়োর চিঠিটা ডাক্তারের ঘরেই ফেলে এসেছে। তাড়াতাড়ি সে আবার ফিরে চলল।

দরজায় টোকা মারতে হাতটা তুলতেই কানে এল তারই নাম। তারই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে ঘরের মধ্যে। একটু চমকে সে চুপ করে দাঁড়ালো, শুনতে লাগল কান পেতে।

মাদাম পেরন বলছেন,—থিয়ো তাহলে এমন কাজটা করল কেন ?

—এই আশায়, ডাক্তার উত্তর দিচ্ছেন,—যে এতে হয়তো তার ভাইএর উপকার হবে।

—কিন্তু এতো টাকা একসঙ্গে খরচ করার তার সামর্থ্য কোথায় ?

—সামর্থ্যের বাইরেও লোক করে। যদি ভিনসেণ্ট আবার সুস্থ হয়ে ওঠে, এই দুরাশায়—

—তাহলে তুমি বলছ এই ছবি কেনার মধ্যে কোনো সত্য নেই ?

—কোত্থেকে থাকবে ? তুমি বুঝছ না মেরি, ছবিটা যে কিনেছে সে নাকি থিয়োর এক শিল্পী-বন্ধুর বোন। এর থেকেও বুঝতে পারছ না ?

নিঃশব্দে ভিনসেণ্ট ফিরে গেল বন্ধ দ্বারের সামনে থেকে।

সন্ধ্যাবেলা খাবার সময় থিয়োর কাছ থেকে এল এক টেলিগ্রাম।

—তোমার নামে খোকার নাম রাখলাম। জোহানা আর বাচ্চা ভিনসেণ্ট খুব ভালো আছে।

ছবি বিক্রির খবর, থিয়োর ছেলে হওয়ার খবর—এই দুইয়ে মিলে একরাত্রে ভিনসেণ্টকে চাঙা করে তুলল। পরদিন ভোর না-হতেই সে দৌড়ল স্টুডিয়োতে। পুরোনো সব এদিক-ওদিক ছড়ানো ছবি একধারে গুছিয়ে ঈজেল পাতল, তুলি-গুলো ধুয়ে নিল ভালো করে। বললে মনে মনে,—বুকে দম নেই আর মুখে দাঁত নেই, আর মাথায় আছে খালি পাগলামি। পারব আমিও।

নিঃশব্দ বিক্রমে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কাজে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার,—আর থামবে না। দেলাক্রোয়ার 'দি গুড্ সামারিটান' আর মিলেটের 'দি সোয়ার' আর 'দি ডিগার' ছবিগুলো কপি করল সে। সে জানে প্রচণ্ড বিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনের চিত্রশিল্প। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে কতো পুরোনো আদর্শ, মথিত হয়ে উঠছে কতো ধ্যান ধারণা। তবু ভাবনা কী তার, কিসের তার অনুযোগ ?

চেকখানা পাবার ঠিক দু-সপ্তাহ পরে থিয়োর কাছ থেকে ডাকে সে পেল 'মারকিউরি দ্য ফ্রান্স' কাগজের জানুয়ারি সংখ্যাখানা। প্রথম পাতার প্রবন্ধটি থিয়ো লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছে।

পড়তে লাগল সে :

'ভিনসেণ্ট ভ্যান গকের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যে অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে শক্তির প্রাচুর্য, আত্মপ্রকাশের প্রমত্ততা। বস্তুর মূল সত্যটি তাঁর শিল্পে উদ্ঘাটিত, তাই তাঁর শিল্পরীতিতে দেখা যায় কখনো কখনো অনাড়ম্বর সারল্যের বলিষ্ঠ উন্মোচন—যে উন্মোচনের রূপ শিল্পীর চোখের সামনের প্রকৃতির নগ্ন আত্মঘোষণায়। তাই শিল্পীর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে অনাবৃত আকাশের জ্বলন্ত সূর্য, তাই তীব্র রেখায় ও রঙে আদিম অনুভূতির প্রচণ্ড স্পন্দন। তাঁর শিল্পসৃষ্টি পুরুষের সৃষ্টি, যে পুরুষ নির্ভীক অভি-যাত্রী,—যার আত্মপরিচয় একাধারে কখনো নিষ্ঠুর ভয়াল কখনো পেলব মধুর।

'ভিনসেণ্ট ভ্যান গক ডাচ্ শিল্পী। ফ্রান্স হালস্-এর ঐতিহ্য তাঁর সাধনার ভিত্তিমূলে। তাঁর যাঁরা পূর্বসূরী তাঁদের স্বাস্থ্য ছিল হৃষ্টপুষ্ট, মন ছিল নিক্তির ওজনে বাঁধা। তাঁদের উপলব্ধিগোচর ছোটখাটো সত্য আর স্বল্প-পরিসর বাস্তবের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে ভিনসেণ্ট ভ্যান গকের সত্যানুসন্ধান আর বাস্তববোধ। বস্তুর আপাত রূপ নিয়ে ভিনসেণ্ট তৃপ্ত নন। বস্তুর মূল রহস্যটির উদ্ঘাটনের জন্য তাঁর নিত্য অনুসন্ধিৎসা,—চরিত্রের মৌলিক তথ্যটিকে আবিষ্কারের প্রেরণায় চিত্ত তাঁর নিত্য-সংবেদনশীল। প্রকৃতির প্রেমে, সত্যের অনুরক্তিতে উৎসুক প্রাণ তাঁর শিশুর মতো উন্মুখ।

'পরম শক্তিমান এই যে শিল্পী, নিত্য-সূর্যের আলোকচ্ছটায় অন্তর যাঁর উদ্ভাসিত, সাধারণের মর্মে কবে তাঁর বাণী গিয়ে পেঁছিবে? সহজে বলে মনে হয় না। তার কারণ সমসাময়িক বুর্জোয়া মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শিল্প-শৈলী অনাড়ম্বর অথচ নিপুণ, তাঁর অনুভূতি সহজ অথচ বড় গভীর। তাঁকে যদি কেউ সম্যক বুঝতে পারে, তো কেবল সমপথযাত্রী চিত্রশিল্পীরাই হয়তো পারবে, সাধারণে নয়।'

জি, অ্যালবার্ট অরিয়ার।

ভিনসেণ্ট প্রবন্ধটা ডাক্তার পেরনকে দেখালো না।

ফিরে এলো তার পূর্ণ শক্তি, উদ্দীপ্ত জীবন-জিগীষা। জাগল সৃষ্টির নব জোয়ার। লোহার দরজা তাকে আবদ্ধ রেখেছে, তাতে কী এসে যায়? পর-পর সে ছবি এঁকে চলল,—একখানা তার ওয়ার্ডের, একখানা ওখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের, একখানা তাঁর স্ত্রীর। মিলেট ও দেলাক্রোয়ার ছবির পর ছবি সে কপি করল। তার দিন রাতকে সে ভরিয়ে দিল উত্তেজিত পরিশ্রমে।

নিজের অসুস্থতার ইতিহাস গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে সে ভেবে দেখল যে তার মানসিক উন্মত্ততার আক্রমণটা চক্রবৎ ঘুরে ঘুরে আসে, ঠিক তিন মাস অন্তর। ঠিক আছে। এবার থেকে সে হিসেব রাখবে, সময় বুঝে সাবধান হবে। পরবর্তী আক্রমণের সময় ঘনিয়ে আসলে তখন সে কাজকর্ম বন্ধ করে কদিনের জন্যে সোজা বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। তারপর আবার ঘোর কাটবে, আবার সে সুস্থ মানুষ হয়ে কাজে লাগবে। ভয়টা কী? লোকের তো মাঝে মাঝে সর্দি-জ্বরও হয়, দু-দশদিন বিছানায় পড়ে থাকতেও হয় সেজন্যে—তার বেশি তো না!

তবে, অধুনা এখানকার ধর্মভাবটা তার পক্ষে খুব পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। শীতকাল, ধূসর অন্ধকার প্রতিটি দিন। তার মনে হতে লাগল শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিস্টারদের মনে যেন কেমন একটা ধার্মিকতার বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে।—এও এক রকমের মানসিক ব্যাধি। সিস্টাররা কালো পোশাকে ঢাকা প্রেতাশ্রিত মূর্তি নিয়ে নিঃশব্দে ঘরে বারান্দায় বাইবেলে চোখ লাগিয়ে ঘুরছে, সর্বদা মালা ঘোরাচ্ছে, নাম জপ করছে বিড়বিড় করে,—আর দিনের মধ্যে পাঁচ-ছয় বার লেগেই আছে উপাসনা। এ এক চূড়ান্ত বাতিক। ওদের ক্রিয়াকলাপ দেখে

দেখে ভিনসেণ্টের মনে ভাবনা হোতো—কারাই বা সত্যি পাগল, আর কারাই বা সেবিকা? বরিনেজ যখন ছাড়ে মোটামুটি তখন থেকেই ধর্মের নামে বাড়াবাড়িকে তার অসহ্য লেগেছে—সেই ভালো-না-লাগা ক্রমে আতংকে পরিণত হয়েছে তার মনে। সেই আতংকে আজকাল সে শিউরে শিউরে ওঠে যখন ঐসব ধর্মোন্মাদিনীর দিনগত জীবনযাত্রাকে নিরুপায়ে লক্ষ করে যেতে হয়। ঐ কালো কালো মূর্তি তার স্বপ্নে যেন ভিড় করে আসে, কিছুতে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না ওদের।

তৃতীয় মাসের সেই সম্ভাবিত তারিখটা আসার দুদিন আগে থাকতে সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। কাজকর্ম বন্ধ করে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিল। শরীর তার সুস্থ, মন সুস্থ ততোধিক। পাছে ঐ সিস্টারদের দেখে তার মনের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়, তাই বিছানার চারধারে পর্দা টেনে অন্তরাল সৃষ্টি করে নিল চমৎকার।

ঠিক যেদিন তার অসুখে পড়বার কথা সেই দিনটি এল। উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ভিনসেণ্ট। কিছুই হোলো না। আশ্চর্য হোলো, অনেকটা যেন আশাহত হোলো সে। দ্বিতীয় দিন কাটল, কাটল তৃতীয় দিন।

হেসে উঠল ভিনসেণ্ট,—বোকা আমি! ডাক্তার পেরনের কথা ভুল—মিছে আমারও ভ্রান্তি। সুস্থ আমি, সুস্থ থাকব, চিরদিন—এমনি মানসিক রোগের আক্রমণ আর আসবে না আমার জীবনে কোনোদিন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খালি সময় নষ্ট। কাল সকাল থেকে আবার স্টুডিয়োতে কাজে লেগে যাব।

গভীর রাত। সুষুপ্ত সারা হাসপাতাল। হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠল ভিনসেণ্ট। খালি পায়ে ওয়ার্ডের বারান্দা পার হয়ে চলল। পৌঁছোলো গিয়ে কয়লা রাখার ঘরে। খুপরি-ঘরটার দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। একমুঠো কয়লা-গুঁড়ো নিয়ে সারা মুখে মাখল।

—দেখুন, দেখুন মাদাম ডেনিস! এতোদিন পরে ওরা আমাকে আপনার করে নিয়েছে,—স্বীকার করেছে যে আমি ওদেরই একজন! ওরা আগে আমাকে বিশ্বাস করত না,—কিন্তু আজ? ঈশ্বরের বাণী ওদের কানে শোনাবার প্রকৃত অধিকার এতোদিনে আমি পেয়েছি!

ভোর হওয়ার একটু পরেই ওরা ভিনসেণ্টকে খুঁজে পেল। সেই একই জায়গায় বসে আছে, বিড়বিড় করে কখনো প্রার্থনা করছে, কখনো বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি আওড়াচ্ছে,—কখনো বা চুপ করে কান খাড়া করে কি শুনছে। ওর কানের কাছে কোন অশরীরী মায়াবীর শব্দহীন ভাষা। সম্পূর্ণ উন্মাদ সে—ধর্মোন্মাদ।

এমনি মত্ততা কদিন চলল। কিছুটা যখন স্বাভাবিক হোলো, ডাক্তার পেরনকে ডেকে পাঠালো।

ডাক্তার আসতে ভিনসেণ্ট তাঁকে বললে,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডাক্তার, এবার

আমার কিছুই হোতো না যদি চারদিকে সিস্টারদের ধর্মের হিস্টিরিয়ার মধ্যে আমাকে থাকতে না হোতো। এমনি দৃশ্য দেখে দেখে সুস্থ মানুষও পাগল হয়!

ডাক্তার পেরন তাড়াতাড়ি ভিনসেণ্টের খাটের চারদিকের পর্দাগুলো টেনে দিলেন। বললেন,—কী করি বলো, শীতকাল হলেই সিস্টারদের ধর্মের বাতিক বাড়ে। আমি পছন্দ করিনে, তবে বাধা দেওয়াও সমীচীন মনে করিনে। হাজার হোক এই সিস্টারদের মতো এমনি নিঃস্বার্থ সেবিকা পাব কোথায়?

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার অবস্থাটাও ভেবে দেখুন। চব্বিশ ঘণ্টা তো আসল পাগলের পালের সঙ্গে ঘর করে কাটে, এর ওপর যদি আবার ধর্মের নামে হঠাৎ-পাগলদের এখানে ছেড়ে দেন, তাহলে আমার মতো আধ-পাগলের আর আশা কী? আমি তো আক্রমণের সময়টা প্রায় পার করেই দিয়েছিলাম—

—নিজেকে ঠকিয়ো না ভিনসেণ্ট। এমনি আক্রমণ হোতোই। তোমার স্নায়ুমণ্ডলী ঠিক তিনমাস অন্তর একবার করে অচল হয়ে যায়, যাবেই। তার অন্যথা নেই। ফলে এমনি মতিভ্রম। ধর্ম নিয়ে যদি না হোতো—অন্য একটা কিছু নিয়ে ঠিক হোতোই।

—আর-একবার যদি আমার এ রকম হয় ডাক্তার, আমি আমার ভাইকে লিখব এখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে।

—বেশ, যেমন তোমার ইচ্ছে।

বসন্তকালের প্রথম উজ্জ্বল দিনটিতে ভিনসেণ্ট আবার স্টুডিয়োয় পা বাড়ালো। জানলার বাইরের দৃশ্য সে আঁকল। ঘন বেগুনি রঙের লাঙল-চষা মাটিতে হলুদের আভাস। বাদাম গাছের কুঁড়িগুলো ফুটছে,—আবার সন্ধেবেলায় আকাশে মন-কেমন-করা নীলিমা।

কিন্তু প্রকৃতির জীবন-লীলায় এই চিরন্তন অথচ অপূর্ব নূতন রূপ কোন নূতন সাড়া জাগালো না শিল্পীর অন্তরে। সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল আতঙ্কে। উপায় নেই, উপায় নেই। কোন পথ নেই মুক্তির, ঐ উদার দিগন্ত আর ঐ নিঃসীম আকাশ, প্রকৃতির ঐ চির-নবীন আমন্ত্রণ,—তার জন্যে নয়। বাতুল আর ধর্মোন্মাদ,—ওরা তাকে জড়িয়ে রেখেছে নাগপাশে,—ওরাই তার জীবনে সত্য। রেখা নয়, রঙ নয়,—সত্য শুধু উন্মাদাগারের লৌহ-অর্গল!

ভাইকে লিখল আতঙ্ক-কাতর ভাষায়—থিয়ো,সেণ্ট রেমি ছাড়তে সত্যি আমি চাইনে। কিছুই দেখলাম না এখানকার, কিছুই আঁকলাম না। কিন্তু আর-একবার যদি গতবারের মতো ধর্মোন্মত্ততার খপ্পরে পড়ি, তাহলে বুঝব সে এই হাসপাতালের আবহাওয়ার দোষ, আমার স্নায়ুর দোষ নয়। এমনি মানসিক রোগের আক্রমণ দু-তিন বার যদি হয়, তারপর আমি আর নেই।

—তোমার সেই ডাক্তার গ্যাচেটের খবর কী? তিনি কী বলেন? তাঁর হাতে আমার উদ্ধারের কি আশা নেই? আর একবার আমি দেখব, তারপর

নির্ঘাত পালাবো এখান থেকে যেখানেই আশ্রয় পাই।

থিয়ো উত্তরে লিখল,—ডাক্তার গ্যাচেট তোমাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে ইচ্ছুক। তিনি শুধু মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ নন, শিল্পী ও শিল্পেরও বিশেষজ্ঞ। তোমার ছবি তিনি দেখেছেন, তিনি চান তুমি তাঁর কাছে থাকো আর নিজের কাজ করে যাও। অতএব তোমার যখন খুশি চলে আসতে পারো।

না, এখনই নয়। আর একবার। আর তিনটি মাস।

নতুন গরম। মে মাস। সময় হয়েছে আবার। কারা কানে কানে কথা কয়, আর চমকে চমকে উঠে চিৎকার করে উত্তর দেয় পাগল। প্রতিধ্বনি ফিরে আসে ভাগ্যের ক্রূর অট্টহাসির মতো। কারা ঘুরে ঘুরে আশে-পাশে ফেরে অ-ধরা ছায়ামূর্তি যেন।

এবার ওরা তাকে পেল গির্জার মধ্যে মূর্ছিত অবস্থায়। আবার কদিন লাগল সুস্থতা ফিরে পেতে।

থিয়ো চাইল নিজে সেণ্ট রেমিতে এসে তাকে নিয়ে যেতে। ভিনসেন্টের তাতে আপত্তি। একলাই সে প্যারিস পর্যন্ত যাবে, টারাসকনে কেউ তাকে ট্রেনে তুলে দিলেই যথেষ্ট। লিখল সে:

—ভাই থিয়ো, আমি শয্যাশায়ী রোগী নই, মত্ত কোনো দানবও নই এখনো পর্যন্ত। সাধারণ অবস্থায় আমি যে সুস্থ স্বাভাবিক লোক, সেইটে প্রমাণ করতে দাও। আমি যদি উন্মাদাগার থেকে মুক্তি পেয়ে অভার্স গিয়ে আবার নতুন জীবন শুরু করতে পারি, এই স্নায়বিক ব্যাধিকে আমি জয় করবই।

—আর একটিবার ভাগ্যপরীক্ষা আমি করছি। এখানে সবাই পাগল, আমিও তাই পাগল হবার পথে। সুস্থ জগতে এলে আমিও কি সকলের মাঝখানে সুস্থ হয়ে উঠতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব। তারপর ডাক্তার গ্যাচেট তো থাকবেনই।

—তোমাকে তার করে জানিয়ে দেবো কখন ট্রেনের সময়। তুমি স্টেশনে থেকো। শনিবার এখান থেকে যাব। তাহলে রবিবারটা বাড়িতে কাটাতে পারব—তুমি, জোহানা আর বাচ্চাটি, তিনজনকে নিয়েই। রবিবার তোমার ছুটি তো?

অভাস'

১

দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত থিয়োর চোখে একফোঁটা ঘুম ছিল না। সকাল হতে না হতেই সে তৈরি হয়ে নিল, ট্রেনের সময়ের দু-ঘণ্টা আগে থাকতে রওনা হোলো স্টেশনের উদ্দেশে। শিশুটিকে নিয়ে বাড়িতে রইল জোহানা। বাড়ির চার-তলার ছাদে উঠে সামনের কালো ঝাঁকড়া গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল জোহানা,—কখন বাড়ির সামনে দুই ভাইকে নিয়ে গাড়ি এসে থামবে।

স্টেশন থেকে থিয়োর বাড়ি দূরে কম নয়। জোহানার মনে হতে লাগল সময় আর কাটে না, অপেক্ষার আর শেষ নেই! শেষ পর্যন্ত খোলা একটা গাড়ি বাঁক ঘুরে রাস্তায় ঢুকল,—চোখে পড়ল দুটি উৎফুল্ল মুখ,—আরোহীরা হাত নাড়ছে তার দিকে চেয়ে।

থিয়োর পেছনে পেছনে সপদদাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ভিনসেণ্ট। জোহানা ভেবেছিল সে বুঝি হবে কোনো দুর্বল আধো-শয্যাশায়ী রোগী। ভিনসেণ্ট দৃঢ় বাহুতে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল,—কোথায় সেই রোগী? সমর্থ দেহ, চমৎকার গায়ের রঙ, হাসি মুখ, চোখে প্রতিভার দৃঢ় দৃষ্টি।

প্রথম দৃষ্টিতেই জোহানার মনে হোলো,—ভিনসেণ্টের তো দেখি আমার স্বামীর চাইতেও অনেক সুস্থ সমর্থ চেহারা!

খালি তার ডান কানটার দিকে সে কিছুতেই চোখ তুলে চাইতে পারল না।

জোহানার হাতদুটো দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে আর তার মুখের দিকে সপ্রশংস চোখে চেয়ে ভিনসেণ্ট বললে,—বাঃ, চমৎকার বৌ জোগাড় করেছ দেখছি হে থিয়ো!

থিয়ো হেসে বললে,—তাই নাকি? সত্যি বলছ?

থিয়োর পছন্দ তার মারই ধাঁচের মেয়ে। আনা কার্নেলিয়ার ছিল যেমন মৃদু করুণ ব্রাউন রঙের চোখ, মুখে যেমন স্নেহ সহানুভূতির মিষ্টি ভাব,—জোহানারও ঠিক তেমনি। এর ওপর আবার সবে মা হয়েছে,—মেদুর মাতৃ-মূর্তিতে আরো তাকে মানিয়েছে। সুঠাম তার দেহশ্রী, গোল-গোল মুখটি, উঁচু ডাচ্ কপালের ওপর দিয়ে একরাশ ফিকে হলুদ চুল পেছন দিকে টান টান করে বাঁধা। থিয়োকে সে ভালোবাসে,—সেই ভালোবাসাকে সে বিস্তৃত করেছে থিয়োর ভাই ভিনসেণ্টের ওপরেও।

থিয়ো ভিনসেণ্টকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, খোকা সেখানে দোলনায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। দোলনার ধারে দাঁড়িয়ে ছলোছলো চোখে ভিনসেণ্ট থিয়োর শিশুটিকে দেখতে লাগল। জোহানা বুঝল দুই ভাইএর কিছুক্ষণ একলা থাকা দরকার। পা টিপে টিপে সে বাইরে গেল। ভিনসেণ্ট তার দিকে চেয়ে

হাসিমুখে বললে,—ও বোন, শুনছ? বাচ্চাকে অতো সিল্ক আর লেস দিয়ে সাজিয়ো না,—লোকের নজর লাগবে।

জোহানা চলে যেতে ভিনসেণ্ট আবার অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল শিশুটির মুখে। হঠাৎ কেমন একটা ব্যথার গুঞ্জরণ উঠল বুকে—নির্বংশ সে, সংসারহীন, সন্তানহীন; তার রক্তধারাকে বহন করবে না কোনো বংশধর, তার মৃত্যুতে হবে একান্ত নির্বাপিত শিখা।

থিয়ো ভাইএর মনের কথা বুঝি বুঝতে পারল। বললে,—তোমারও সময় আছে ভিনসেণ্ট। মনের মতো স্ত্রী তুমিও একদিন পাবে, যে হবে তোমার দুঃখসুখের সঙ্গিনী।

হাসল ভিনসেণ্ট,—না ভাই, সে আর হয় না। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

—এই তো সেদিন একটি মেয়ের খবর পেলাম, যে একেবারে তোমার উপযুক্ত সঙ্গিনী হবার মতো।

—কে সে?

—তুর্গেনিভের উপন্যাসের এক নায়িকা।

—ও বাবা! ঐ যারা সব নিহিলিস্টদের দলে নাম লেখায়, আর বে-আইনি কাগজ লুকিয়ে লুকিয়ে চালান করে,—তাদের মতো কোনো মেয়ে?

—হ্যাঁ। তোমার যে স্ত্রী হবে, তার অনেকটা ঐ রকম মেয়ে হওয়াই দরকার,—অতলস্পর্শী দুঃখবেদনার অভিজ্ঞতা যার আছে—

—আর আমার মতো পুরুষকে নিয়ে সে করবে কী, যার এক কান কাটা?

কথা আর এগুলো না। বাচ্চা ভিনসেণ্ট চোখ মেলল,—হাসল তাদের দিকে চেয়ে। থিয়ো দোলনা থেকে তাকে তুলে নিয়ে ভিনসেণ্টের হাতে দিল।

বুকের কাছে শিশুটিকে ধরে আপন মনে ভিনসেণ্ট বললে,—কী নরম, কী গরম,—ঠিক যেন ছোট্ট কুকুরছানাটি!

—দূর বোকা! আরে, কী করে বাচ্চা ধরতে হয় তাও জানো না?

—কী করে জানবো বলো? জানলাম তো খালি তুলি ধরতে।

থিয়ো ছেলেকে নিয়ে কাঁধের কাছে ওর মাথা রাখল,—বাচ্চার কোঁকড়া চুলগুলি মিশে গেল নিজের মাথার চুলে। ভিনসেণ্টের মনে হোলো, পিতা আর প্রথম সন্তান—ওরা যেন একই পাথরে কোঁদা দুটি মূর্তি।

একটা নিশ্বাস ফেলে মুক্তির হাসি হেসে ভিনসেণ্ট বললে,—বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে! আমার মিডিয়ম রঙ, তোমার মিডিয়ম সংসার! আমি সৃষ্টি করি ছবি, তুমি সৃষ্টি করো জীবন্ত মানুষ, কী বলো?

—ঠিক বলেছ ভিনসেণ্ট,—বেশ বলেছ।

রাত্রিবেলা ভিনসেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে কয়েকজন পুরোনো বন্ধু এল থিয়োর ওখানে। সবপ্রথম এসে পেঁছিলো শিল্প-সমালোচক অরিয়ার। সুপুরুষ যুবা, কোঁকড়া চুলের বাবরি, দাড়ি, থুতনির কাছটা পরিষ্কার। ভিনসেণ্ট

অরিয়ারকে নিয়ে গেল থিয়োর শোবার ঘরে। সেখানকার দেয়ালে মন্তিচেলির আঁকা একটি পুষ্পস্তবকের ছবি।

ভিনসেন্ট বললে,—আপনি আপনার প্রসঙ্গে বলেছেন, মঁশিয়ে অরিয়ার, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রাণরহস্যকে আমিই প্রথম উপলব্ধি করেছি। এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। মন্তিচেলির ছবির কথা মনে করুন—

ঘণ্টাখানেক তর্ক করেও ভিনসেণ্ট অরিয়ারের মত বদলাতে পারল না। তখন তাঁর প্রবন্ধের জন্যে শেষ ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে উপহার দিল নিজের আঁকা সেণ্ট রেমির একটি ছবি।

হৈ-হৈ করে ঢুকল তুলস-লোত্রেক। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার পরিশ্রমে সে হাঁপাচ্ছে, তবু প্রাণটা ফুর্তিতে ডগমগ—মেজাজটার কোনো পরিবর্তন হয়নি এতদিনেও।

ভিনসেণ্টের করমর্দন করতে করতে লোত্রেক হেঁকে উঠল,—আরে ভিনসেণ্ট, সিঁড়ির গোড়াতেই কার সঙ্গে এখন দেখা হোলো জানো? এক ব্যাটা কফিন-বানানেওলা। বলো তো, লোকটা কার খোঁজে এসেছিল—তোমার না আমার?

—তোমার লোত্রেক, তোমার! আমি ওর খদ্দের হতে যাব কেন এরই মধ্যে?

—বটে? আচ্ছা বাজি ধরো,—কে আগে ওর খদ্দের হবে, তুমি না আমি!

—বেশ, রাজি। বাজিটা কী, বলো?

—বাজি? কাফে এথেন্সে এক-পেট খাওয়া আর তারপর সন্ধেবেলা অপেরা।

থিয়ো অল্প হেসে বললে,—আচ্ছা, তোমাদের ঠাট্টাগুলো কি এমনি অলুক্ষুনে না হলেই নয়।

একটি অচেনা লোক ঘরে ঢুকে কোণের একটা চেয়ারে চুপ করে বসল। লোত্রেকের সঙ্গেই এসেছে। লোত্রেক কিন্তু লোকটিকে আলাপ করিয়ে দিল না কারুর সঙ্গে, নিজের খেয়ালে বক-বক করেই চলল।

ভিনসেণ্ট বললে,—তোমার বন্ধুটিকে আমারসঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে না?

একগাল হেসে লোত্রেক বললে,—বন্ধু? আরে ও আমার বন্ধু নয়,—আমার রক্ষক।

কয়েক মুহূর্ত কেমন বেদনাকর স্তব্ধতা।

লোত্রেক বললে আবার,—তুমি শোনোনি বুঝি ভিনসেণ্ট? মাঝে কয়েক-মাস আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সবাই বললে খুব টানার ফলেই, তাই আজকাল স্রেফ দুগ্ধপানের ওপরই আছি। এবার আমার পার্টিতে যে নিমন্ত্রণপত্রটা পাবে সেটা ভালো করে দেখো। ছবি আঁকা থাকবে তাতে যে তুলস লোত্রেক উঁচু হয়ে বসে দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট একটি গাভীর দুধ দুইছে,—তবে কিনা বাঁটের দিক থেকে নয়, অন্যদিক থেকে।

খুব জমে উঠল আসর। জবর আড্ডা,—সারা ঘর তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার। মাঝে মাঝে এর-ওর সামনে খাবারের ডিশ এগিয়ে ধরছে জোহানা।

প্যারিসের অনেক পুরোনো স্মৃতি ভিনসেণ্টের মনে ঘনিয়ে উঠল।

—জর্জেস সিউরাতের খবর কী? কেমন করছে সে?

—সেকি? তার খবরও বুঝি জানো না?

—না। থিয়ো তো কিছু লেখেনি।

—যক্ষ্মায় সে তিলে তিলে মরছে। ডাক্তার বলেছে বড়ো-জোর একত্রিশটা বছর তার আয়ু।

—যক্ষ্মা! সেকি? জর্জেসের স্বাস্থ্য যে ছিল চমৎকার! তার এ রোগ কী করে হোলো?

—অতিরিক্ত পরিশ্রমে। তুমি তাকে যা দেখেছিলে তার পর দু-বছরের বেশি গেছে। একেবারে দানবের মতো খেটেছে সে এই দু-বছর,—সারাদিনে দু-তিন ঘণ্টা মাত্র ঘুম, বাকি সময় কাজ আর কাজ। অমন মা পর্যন্ত কিনা ওকে এই কালরোগের হাত থেকে ফেরাতে পারল না!

ভিনসেণ্ট ভাবতে ভাবতে বললে,—তাহলে,—জর্জেস তাহলে চলল!

রুসো এল,—ভিনসেণ্টের জন্যে এক ব্যাগ-ভর্তি ঘরে-তৈরি খাবার দাবার নিয়ে পীয়ের ট্যাঙ্গি এল ঠিক সেই আগের মতো গোল খড়ের টুপি মাথায় দিয়ে। ভিনসেণ্টকে একটি জাপানী প্রিণ্ট উপহার দিয়ে সে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে ছোটখাটো একটি মিষ্টি বক্তৃতাও দিয়ে ফেলল।

রাত দশটা নাগাদ ভিনসেণ্ট পথে বার হয়ে একঝুড়ি অলিভ কিনে আনল। প্রত্যেককে সে এই অলিভ খাওয়ালো জোর করে,—লোত্রেকের রক্ষককে পর্যন্ত।

উচ্ছ্বসিত গলায় সে বললে, থাকো তো তোমরা এই শহরের অন্ধকূপে! প্রভেন্সের রুপোলি সবুজ অলিভ-কুঞ্জ একবার যদি চোখে পড়ত তাহলে সারা জীবন ধরে অলিভ ছাড়া আর কিছুই খেতে চাইতে না।

লোত্রেক চোখ টিপে বললে,—হ্যাঁ, অলিভের কথাতেই মনে পড়ল। ওখানকার মেয়েদের কেমন লাগল বলো তো?

পরদিন সকালবেলা থিয়ো অফিসে যাবার পর ভিনসেণ্ট খোকার গাড়িটাকে একতলায় নামিয়ে দিয়ে এল। গাড়িতে শুয়ে মার সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বাচ্চা ভিনসেণ্টের এখন রোদ পোহানোর সময়। ফিরে এসে সে সারা ফ্ল্যাটের দেয়ালগুলো দেখতে লাগল ভালো করে। সর্বত্র তার আঁকা ছবি টাঙানো। খাবার ঘরে ম্যাণ্টেলপীসের ওপর তার 'আলুভোজীরা', বসবার ঘরে 'আর্লসের দৃশ্যপট' আর 'রোন নদীর ওপরে রাত্রি', শোবার ঘরে 'ফুটন্ত পুষ্পকুঞ্জ'।

এ ছাড়া খাটের তলায়, টেবিলের তলায়, আলমারির তলায়, মালপত্র রাখার ঘরে—সেখানে যেটুকু ফাঁকা জায়গা,—সব ভরে আছে তার ছবির গাদায়।

থিয়োর ডেস্কে কি একটা জিনিস খুঁজতে গিয়ে সে দেখল মোটা ফিতে দিয়ে বাঁধা মস্ত একবাণ্ডিল চিঠি। একি? সব চিঠি যে তার! বিশ বছর আগে সে

প্রথম ঘর ছেড়ে যেদিন হেগ-এ গ্যুপিল কোম্পানিতে চাকরি করতে বার হয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত থিয়োকে যতো চিঠি সে লিখেছে তার প্রত্যেকটি থিয়ো পর-পর করে সাজিয়ে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছে। সবশুদ্ধ সাতশো চিঠি। ভিনসেণ্ট ভেবে পেল না তার এইসব পুরোনো চিঠি জমিয়ে রেখে থিয়োর কী লাভ।

ডেস্কের আর-একটা জায়গায় সে দেখল গত দশ বছর ধরে সে থিয়োকে যত ড্রয়িং পাঠিয়েছে সব কালক্রমিকভাবে তাড়া করে করে রাখা। বরিনেজের খনি-শ্রমিক, ইটেনের মাঠের কৃষাণ-কৃষাণী, হেগ-এর বুড়ো-বুড়ি, গীস্ট-এর ক্ষেত মজুর, শেভেনিনজেনের আলুভোজী তাঁতি পরিবার, প্যারিসের রেস্তোরাঁ আর রাস্তার দৃশ্য, আর্লসের সূর্যমুখীর কাঁচা স্কেচ আর সেণ্ট রেমির বাগানের দৃশ্যাবলী,—এহেন অসংখ্য ড্রয়িং আলাদা আলাদা ভাগে সুন্দর করে বাঁধা।

—আরে, তাহলে আমার একটা প্রদর্শনী তো এখুনি লাগানো যায় দেখছি।

দেয়াল থেকে সব ছবি সে একে-একে নামিয়ে নিল,খাট টেবিল প্রভৃতির নিচে থেকে টেনে বার করল তার সবগুলো বাঁধাই-না-করা ক্যানভাস। ডেস্কের স্কেচের তাড়াগুলোকেও বাদ দিল না। এইবার সমস্ত ছবিকে সে কালক্রমে ভাগ করে ফেলল। প্রত্যেকটি ভাগের মধ্যে খুব মনের মতো মনে হোলো যেসব স্কেচ বা তেলরঙের ছবি, সেগুলো সযত্নে নির্বাচন করে আলাদা করে রাখল। ফ্ল্যাটে ঢোকবার পথে সামনের বারান্দায় সে টাঙালো বরিনেজের সাদা-কালো ড্রয়িং-গুলো। বললে,—এটা হোলো প্রদর্শনীর চারকোলের কাজের বিভাগ।

বাথরুমের দেয়ালে সে পাশাপাশি টাঙালো ইটেনে আঁকা চারখানা পেন্সিল-স্টাডি।—এটা হোলো পেন্সিল-স্কেচের বিভাগ।

হেগ আর শেভেনিনজেনের জলরঙের ছবিগুলো সে টাঙালো রান্নাঘরে।

—এটা হোলো তিন নম্বরের বিভাগ। জলরঙের ছবি।

পাশের ছোটো ঘরটার সামনে দেয়ালটার ঠিক মাঝখানে সে টাঙালো তার প্রথম সার্থক তৈলচিত্র,তার পুরোনো বন্ধু ডিক্রুকদের ছবি,—'আলুভোজীরা'। তার আশেপাশে সে গোটা-বারো নিউনেনের স্কেচ আঁটল—কয়েকটা গির্জার আর সমাধিক্ষেত্রের দৃশ্য,—কয়েকটা কৃষাণ-কৃষাণীর ড্রয়িং।

নিজের শোবার ঘরে টাঙালো সব প্যারিসের ছবি। বসবার ঘরের চারটে দেয়াল সে একেবারে ভরে দিল আর্লসের ছবি দিয়ে। আর থিয়োর শোবার ঘরে সে সাজালো তার সাম্প্রতিক কাজ—সেণ্ট রেমির দৃশ্যাবলী।

এই বিচিত্র প্রদর্শনী সজ্জিত করার পর সে সারা বাড়ির মেঝে ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে হাত-মুখ ধুয়ে কোট পরে মাথায় টুপি চাপিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে নেমে গেল নিচে। বাচ্চা ভিনসেণ্টের গাড়ি ঠেলে আর জোহানার সঙ্গে নানা গল্প করে কাটিয়ে দিল বেশ কিছুটা সময়।

বারোটা বাজার একটু পরেই থিয়োর আবির্ভাব। দূরে থেকে হাত নাড়তে

নাড়তে সে দৌড়ে এল। পেরাম্বুলেটর থেকে বাচ্চাকে তুলে নিল কোলে। গাড়িটাকে নিচে দারোয়ানের জিম্বায় রেখে সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওপরের ফ্ল্যাটে।

দরজার সামনে পেঁছিতেই পথরোধ করে দাঁড়াল ভিনসেণ্ট। বললে,—সাবধান, একটা দারুণ আশ্চর্য জিনিস দেখবার জন্যে প্রস্তুত হও। মহাশিল্পী ভিনসেণ্ট ভ্যান গকের চিত্রপ্রদর্শনী!

—কোথায়?

—ম্যাজিক! চোখ বোজো দুজনে।

দরজাটা হাট করে খুলে দিল। সবাই একসঙ্গে ঢুকল ফ্ল্যাটের মধ্যে। থিয়ো আর জোহানা চারিদিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল।

ভিনসেণ্ট আবেগের সঙ্গে বললে,—আমি যখন ইটেনে ছিলাম,—মনে আছে বাবা একদিন বলেছিলেন—মন্দ থেকে ভালোর সৃষ্টি কখনো হতে পারে না। আমি তর্ক করেছিলাম, বলেছিলাম, হতে পারে,—শুধু তাই নয়, হতে বাধ্য। —লক্ষ্মী আমার ভাই, আমার বোন, এসো আমার সঙ্গে তোমরা। দ্যাখো আমার কথা সত্যি হয়েছে কি না। বিশ বছর আগে খেয়ালী একটা লোকের শিল্পী হবার বাসনা হয়েছিল—কিন্তু অক্ষম সে, নিতান্ত অশক্ত তার হাত—শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান শিশুর চাইতে বেশি নয়। তার বিশ বছরের জীবনের কাহিনী তোমাদের সামনে মেলে ধরেছি—বিচার করো, কতোটা সে সার্থক হয়েছে।

একটার পর একটা ঘরে সে নিয়ে চলল প্রিয় দর্শক দুজনকে। একটা মানুষের সারা জীবনের প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশ ভেসে উঠতে লাগল চোখের সামনে। শিল্পীর আত্মপ্রকাশের পথ কতো কঠোর,—কতো বন্ধুর! সার্থকতার পথে কতো বেদনা, কতো বঞ্চনা! শিক্ষার্থীর দুরন্ত অধ্যবসায়,—পদে পদে কতো আঘাত, নিরবলম্ব প্রচেষ্টায় কতো ব্যর্থতা স্পষ্ট প্রমাণিত রয়েছে প্রথম যুগের শিল্পচর্চার মধ্যে! প্রকাশ-শৈলী ও আদর্শবোধ নিয়ে এক বৈপ্লবিক বিবর্তনের ইতিহাস লেখা আছে প্যারিসের ছবিগুলির রঙিন রেখায়। আর্লসের ছবিতে জীবনদর্শনের উজ্জ্বলতম বলিষ্ঠতম উদারতম বিকাশ—তারপর প্রচণ্ড ভাঙনের পরিচয় সেণ্ট রেমির ছবিগুলোতে। ভাঙছে, বাঁধ ভাঙছে চৈতন্যর,—তবু বেঁধে রাখতে চেতনাকে—সংহত করে রাখতে আপন শিল্পপ্রতিভাকে সে কী উন্মত্ত প্রয়াস, সে কী মর্মন্তুদ আকৃতি! কিন্তু মধ্যাহ্নসূর্য যেমন ঢলে পড়েই, —তেমনি ঢলে পড়ছে সৃষ্টির তুঙ্গধৃত গরিমা,—ঢলে, নিভে আসছে জ্যোতি—অপ্রতিরোধ্য তার নিম্নগামী গতি ধূসর দিগন্তের অমোঘ আকর্ষণে।

অপরিচিত দর্শকের চোখ দিয়ে ওরা দেখে চলল ছবির পর ছবি,—লাগল আধটি মাত্র ঘণ্টা,—একটি মানুষের সারা জীবনের ইতিবৃত্ত ধরা পড়ল ঐ ক্ষণস্থায়ী কালটুকুর মধ্যে।

দুপুরবেলাকার খাওয়া খেতে বসল দুজনে। জোহানা রেঁধেছে খাঁটি

ব্র্যাবাণ্টের রান্না। ভিনসেণ্টের মুখে অমৃতের আস্বাদ। বাসনপত্র টেবিল থেকে জোহানা সরাবার পর দুভাই পাইপ মুখে দিয়ে গল্প করতে বসল।

—ডাক্তার গ্যাচেট যা বলেন তাই কিন্তু শুনবে ভিনসেণ্ট। একটুও অন্যথা করবে না।

—নিশ্চয়ই, থিয়ো।

—মনে রেখো, ইনি স্নায়বিক অসুখের একজন বিশেষজ্ঞ। এঁর হাতে নিশ্চয়ই তুমি একেবারে ভালো হয়ে যাবে। আর-একটা ব্যাপার জানো? গ্যাচেট ছবিও আঁকেন। প্রত্যেক বছর পি, ভ্যান রাইসেল এই ছদ্মনামে তাঁর ছবি ইন্ডিপেন্ডেন্টস গ্যালারিতে টাঙানো হয়।

—আঁকেন কেমন? ভালো?

—তা বলব না। তবে এক ধরনের লোক আছে, অন্যের ক্ষমতাকে চিনে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা যাঁদের থাকে। এমনি লোকও বিরল। ডাক্তার গ্যাচেট এই ধরনের লোক। বিশ বছর বয়সে ইনি ডাক্তারি পড়তে প্যারিসে আসেন। কুর্বে, মুর্গার, প্রুধোঁ প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তারপর আড্ডা জমে মানে, রেনোয়াঁ, ডেগা, ক্লড মনে প্রভৃতির সঙ্গে। ইম্প্রেশনিজমের নাম পর্যন্ত যখন কেউ জানত না, তখন এঁর বাড়িতে বসে দ্যাবিনি আর দ্যমিয়ার ছবি এঁকেছে।

—সত্যি বলছ?

—হয় এঁর বাড়িতে না-হয় এঁর বাগানে বসে ছবি আঁকেনি কে? পিসারো, গিলামিন, সিসলে, দেলাক্রোয়া অভার্সে এঁর কাছে গিয়ে থেকেছে, ছবির পর ছবি এঁকেছে। সেজান, লোত্রেক আর সিউরাতের তো কথাই নেই। এদের সবাইকার ছবি দেখবে বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো। আজকের দিনের এমন কোন নাম-করা শিল্পী পাওয়া দুষ্কর ডাক্তার গ্যাচেট যার বন্ধু নন।

—কী কাণ্ড! তুমি দেখছি আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে হে! এইরকম সব ডাকসাইটে শিল্পী যাঁর বন্ধু,—সেখানে কিনা আমি—! আচ্ছা, আমার ছবি দু-একটা দেখিয়েছ?

—বোকা কোথাকার! তোমাকে অভার্সে নিয়ে যাবার জন্যে ডাক্তার এতো উদ্‌গ্রীব কেন বুঝতে পারছ না?

—কী করে বুঝব?

—আর্লসের রাত্রের যে দৃশ্যগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টস প্রদর্শনীতে দিয়েছিলাম সেগুলো দেখে তো পাগল ডাক্তার গ্যাচেট। তাঁর মতে ওগুলো প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি। এর পর তোমার হলদে সূর্যমুখীর ছবিগুলো তাঁকে দেখাই। বিশ্বাস করো,—ভদ্রলোকের চোখে তো জল এসে গেল ওগুলো দেখে। আমাকে বললেন, —ভ্যান গক, তোমার ভাই একজন বিরাট শিল্পী। চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে এর আগে কখনো ঐ হলদে সূর্যমুখীর পাশে দাঁড়াবার মতো আর কিছু আঁকা হয়নি। শুধু এই ছবিকটার জন্যেই তোমার ভাই

অমর হয়ে থাকবে !

ভিনসেণ্ট মাথাটা একটু চুলকে নিয়ে একগাল হাসল,—আমার সূর্যমুখী-গুলো যদি ডাক্তার গ্যাচেটের এতোটা পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার বনবে ভালো।

২

ডাক্তার গ্যাচেট নিজেই স্টেশনে এসেছিলেন ভিনসেণ্ট আর থিয়োকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। ছোটখাটো চেহারা,—নার্ভের ডাক্তার হলে কী হয়, নিজেই যেন অত্যন্ত নার্ভাস ধরনের লোক, ছোট ছলোছলো চোখদুটি সদা ঔৎসুক্যে ভরা। আগ্রহভরে তিনি ভিনসেণ্টের করমর্দন করলেন—বেশ বেশ ভায়া, বড়ো খুশি হলাম তুমি আসাতে। তোমারও নিশ্চয় খুব ভালো লাগবে জায়গাটা,—এ একেবারে ছবি-আঁকিয়েদের মনের মতো গ্রাম।—বাঃ! ঈজেলটা সঙ্গে এনেছ দেখছি! যথেষ্ট রঙও এনেছ তো? দেরি করলে কিন্তু…ভালো কথা, আর্লসের মতো অমন হলুদ রঙটি এখানে পাবে না, তবে হ্যাঁ, অন্য জিনিস—অনেক অন্য জিনিস মিলবে তোমার। আর, আমার বাড়িতে এসেও আঁকতে হবে। জানো, আমার ওখানে এমন কয়েকটা জিনিস আছে, যা দ্যাবিনি থেকে লোত্রেক পর্যন্ত এমন আর্টিস্ট নেই যে আঁকেনি। তুমিও ভায়া আঁকবে সেগুলো—শরীরটা যাই বলো বেশ ভালোই দেখাচ্ছে তোমার। হুঁ, তারপর কটা মাস এখানে কাটাও না! একেবারে চাঙা করে তোমাকে ছেড়ে দেব আমি। কী বলো থিয়ো?

স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকেই দেখা যায় নদী,—অদূরে বয়ে চলেছে শ্যামলা উপত্যকার ওপর দিয়ে। কয়েকটি গাছের ফাঁক দিয়ে ভিনসেণ্ট দৃশ্যটা দেখতে লাগল। এই অবসরে নিচু গলায় থিয়ো বললে,—আমাকে আপনি কিন্তু ঠিকমতো কথা দিন ডাক্তার গ্যাচেট, আমার ভাইএর ওপর আপনি খুব নজর রাখবেন। যখনই দেখবেন কোনো রকম মানসিক উপসর্গের লক্ষণ আবার ওর মধ্যে ফুটে উঠছে তক্ষুনি আমাকে তার করবেন। আমি নিজে এসে থাকব ওর সঙ্গে। লোকে বলে, সত্যি ও নাকি—

ছাগল-দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে অসহিষ্ণু গলায় ডাক্তার বললেন,—আরে রাখো, রাখো! কী বললে? পাগল তো? নিশ্চয় পাগল। কী হয়েছে তাতে? সব আর্টিস্টই একটু না একটু পাগল,—পাগল বলেই ওরা শিল্পী, পাগল বলেই ওদের আমি ভালোবাসি। সময়-সময় আমার মনে হয়, আমিও যদি অমনি পাগল হতে পারতাম! 'যে চরিত্র সত্যিকারের অসাধারণ, তার মধ্যে কিছু-না-কিছু উন্মত্ততা থাকবেই।' কার কথা জানো? অ্যারিস্টটলের।

—আমি বুঝি, ডাক্তার। তবে কী জানেন? বয়েস ওর বেশি নয়, সবে সাঁইত্রিশ সারাটা জীবন ওর সামনে।

ডাক্তার গ্যাচেট মাথা থেকে অদ্ভুতদর্শন টুপিটা খুলে কবার মাথার এলো-

মেলো চুলে দ্রুত আঙুল চালিয়ে নিয়ে বললেন,—আমার হাতে যখন ছেড়ে দিয়েছ তখন আর ভাবনা নেই। শিল্পীদের ধাত আমি জানি, এক মাসের মধ্যে ওকে আমি নতুন মানুষ করে তুলব। অসুখের সমস্ত দুর্ভাবনা এখুনি,ওর মন থেকে তাড়িয়ে দেব। আজ বিকেলেই আমার বাড়িতে ওকে কাজে লাগিয়ে দেব। বলব আমার একটা পোর্ট্রেট আঁকতে। কাজ করলেই সেরে উঠবে ঠিক।

ভিনসেণ্ট পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কাছাকাছি। গ্রামাঞ্চলের পরিচ্ছন্ন পার্বত্য বাতাস তার নিশ্বাসে। বললে সে,—জো আর বাচ্চাটাকে তোমার এখানে নিয়ে আসা উচিত থিয়ো। শহরে বসে ছেলেপুলে মানুষ করা পাপ!

গ্যাচেট চেঁচিয়ে উঠলেন,—ঠিক, ঠিক। ধরো, রবিবার। ছুটির দিনে তোমরা সবাই এখানে এসে আমাদের সঙ্গে সারাদিন কাটাবে।

—ধন্যবাদ ডাক্তার। বেশ তো, নিশ্চয়ই।—আচ্ছা, আমার ফিরতি ট্রেন এল। চলি আমি। ভিনসেণ্টকে দেখবেন ডাক্তার। আর হ্যাঁ, তুমি রোজ আমাকে এক লাইন করে চিঠি লিখবে। ভুলো না।

ভিনসেণ্টের বাহুমূল ধরে তাকে ঠেলতে ঠেলতে ডাক্তার গ্যাচেট এগোলেন। নার্ভাস গলায় বক-বক-করা তাঁর স্বভাব। উত্তরের প্রত্যাশা করেন না। নিজের মনেই কথার জাল বুনে চলেন।

—এই যে রাস্তাটা দেখছ, এটা সোজা একেবারে গ্রামে চলে গেছে। না, এ রাস্তায় না। চলো, ঐ পাহাড়ের ওপর উঠলে চারিদিকের দৃশ্যটা চমৎকার দেখতে পাবে। ঈজেল পিঠে নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না তো? ওই দ্যাখো বাঁদিকে, ওটা ক্যাথলিক গির্জে। লক্ষ করেছ যে ক্যাথলিকরা সব সময় পাহাড়ের ওপর গির্জে বানায়, লোককে যাতে মুখ উঁচু করে তার দিকে তাকাতে হয়। না, সত্যি দিন-দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, এই খাড়াইটুকু উঠতে আজকাল কষ্ট হয়। চারিদিকে কী চমৎকার শস্যের ক্ষেত দেখছ? এই চাষের ক্ষেত অভার্স গ্রামটাকে ঘিরে রেখেছে। হ্যাঁ, প্রভেন্সের মতো অতো হলুদ এ ক্ষেত নয় তা ঠিক—তবু এই দৃশ্য তোমাকে আঁকতে হবে, হবে না?—এইবার পাহাড়ের মাথায় ঐ ডানদিকে দ্যাখো, ওটা হচ্ছে সমাধিক্ষেত্র,—সুন্দর জায়গাটা না? আচ্ছা, যে মরেছে তার দেহটা কোথায় কবর দেওয়া হবে তাতে এমন কিছু এসে যায় না, না? তবু মৃতের প্রতি সম্মান বলে একটা কথা আছে। সমাধিক্ষেত্রের জন্যে বেছে বেছে সবচেয়ে মনোরম জায়গাটা আমরা ঠিক করেছি। চলো না ভেতরে। হ্যাঁ, গেটটা ঠেলে খোলো। দ্যাখো, সমস্ত খোলা উপত্যকাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল, তাই না? আর ঐ দ্যাখো আমাদের মিষ্টি নদীটা...

ডাক্তার গ্যাচেটের কথার তোড় থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে ভিনসেণ্ট কাঁধ থেকে ঈজেলটা নামিয়ে তাড়াতাড়ি গেট পার হয়ে এগোলো। ঠিক একেবারে পাহাড়টার মাথায় দেয়াল-ঘেরা চৌকো একটুকরো জায়গা। একটা দিকে ঢালু বেয়ে গড়ানো। এইটেই গ্রামের সমাধিক্ষেত্র। সত্যিই ভারি অপূর্ব স্থানটি।

পেছনের দেয়ালের ওপারে চোখের সামনেই অইস নদী। ছায়াঘেরা সবুজ রঙের জলরেখা শস্যশ্যামলা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা গতিতে চলেছে। যতো দূরে চোখ যায়, স্রোতস্বিনীর দুটি তীর শ্যামায়িত। ডানদিকে উৎরাই ছাড়িয়ে গ্রাম,—বাড়িগুলোর সব ছাদ খড়ে ছাওয়া। অনতিদূরে আর-একটি অনুরূপ উঁচু টিলা, তার মাথায় পুরোনো একটা পাকা বাগানবাড়ি। ছোট্ট সমাধিক্ষেত্রটি আলো হয়ে আছে মে মাসের প্রসন্ন সূর্যালোকে আর নব-বসন্তের রংবাহার কুসুমসজ্জায়। আকাশ জুড়ে পেলব নীলিমা। দিগন্তঘেরা অনির্বচনীয় প্রশান্তি,—সে প্রশান্তি সত্যিই যেন সমাধিপ্রান্তরের।

ভিনসেন্ট বললে,—দক্ষিণ ফ্রান্সে যে গিয়েছিলাম তা ভালোই হয়েছিল,, ডাক্তার গ্যাচেট। সেইজন্যে উত্তর দিকের দেশটা আবার নতুন করে চোখে ফুটে উঠছে। দেখুন, ঐ দূর নদীতীরে, ঐ যেখানে সবুজ ঘাসে সূর্যের আলো এখনো পড়েনি, কতো ভায়োলেট ওখানে ফুটে আছে!

আপন কথার তোড়ে আপনিই মত্ত ছিলেন ডাক্তার গ্যাচেট। চমকে উঠে উত্তর দিলেন,— অ্যাঁ? ও হ্যাঁ, ভায়োলেটই তো! খাসা ভায়োলেট!

—আর কী সুস্থ, কী শান্ত, কী শ্রান্তিহরা সমস্ত পরিবেশ!

পাহাড় থেকে নেমে শস্যক্ষেত ছাড়িয়ে ডাক্তারের সঙ্গে চলল সে গ্রামের মধ্যে।

ডাক্তার বললেন,—আমার বাড়িতে তোমাকে থাকতে বলতে পারছিনে বলে দুঃখিত, ঘরের অভাব। তবে, আমার বাড়িতে রোজ আসবে, ছবি আঁকবে।

ভিনসেন্টের হাত ধরে টানতে টানতে সোজা নদীর ধার পর্যন্ত চললেন ডাক্তার। ভ্রমণকারীদের জন্যে আধুনিক একটি হোটেল সেখানে। মালিকের সঙ্গে গ্যাচেট কথাবার্তা বলে নিলেন। থাওয়া দাওয়া বাবদ দৈনিক খরচ ছ-ফ্র্যাংক।

ডাক্তার বিদায় নিলেন,—নাও, চটপট গুছিয়ে নাও। ঠিক একটার সময় আমার বাড়ি আসবে, ডিনার খাবে আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে ঈজেল আর রঙ-তুলি আনতে ভুলো না। আজই আমার একটা পোর্ট্রেট শুরু করতে হবে। নতুন ছবি দু-একখানা এনো। অনেক গল্প হবে তখন! কেমন?

ডাক্তার চোখের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে ভিনসেন্ট জিনিসপত্র হাতে তুলে পা বাড়ালো।

হোটেলওয়ালা বললে,—আরে কী হোলো মশাই? কোথায় চললেন?

—যেখানে খুশি, তবে আপনার এখানে নয়। ভেবেছেন কী? আমি কি ক্যাপিট্যালিস্ট? হোটেল খরচ ছ-ফ্র্যাংক রোজ? আমি দিন-মজুর মশাই, দিন-মজুর।

সোজা বাজার অঞ্চলে গিয়ে ভিনসেন্ট একটা কাফে খুঁজে নিল। কাফেটার নাম রাভেঁা,—দৈনিক চার্জ সেখানে ছ-ফ্র্যাংকের জায়গায় মাত্র সাড়ে তিন।

রাভেঁা কাফেটা অভার্সের ধারে-কাছের যত শ্রমিক আর কৃষাণদের আড্ডা। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে একটি মদের বার,—আর সারা বাঁ

দিক জুড়ে আধো অন্ধকার খাবার ঘর, মোটা মোটা কাঠের টেবিল আর বেঞ্চি সাজানো। কাফের পেছন দিকে ময়লা আধছেঁড়া সবুজ বনাত-মোড়া একটা বিলিয়ার্ড টেবিল। এইটেই রাভোঁর গর্ব। তারপর সিঁড়ি, আর একেবারে শেষে রান্নাঘর। সিঁড়িটা উঠেছে দোতলায়,—সেখানে পর-পর তিনটে শোবার ঘর। ভিনসেণ্টের ঘরের জানলা দিয়ে চোখে পড়ে পাহাড়ের ওপর ক্যাথলিক গির্জার চূড়াটা, সমাধিক্ষেত্রের ঝকমকে ব্রাউন রঙের পাঁচিলের খানিকটা অংশ।

ঈজেল, রঙ-তুলি আর আর্লসবাসিনীর একটি ছবি নিয়ে ভিনসেণ্ট ডাক্তার গ্যাচেটের বাড়ির খোঁজে বার হোলো। বাজারের প্রধান রাস্তাটা যেটা স্টেশন থেকে চলে এসেছে সেটা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে পড়ল সে তিন রাস্তার এক মোড়ে। ডানদিকের রাস্তাটি গেছে সেই বাগানবাড়ির পাড়া ছাড়িয়ে, বাঁ দিকের রাস্তাটি গেছে শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে নদীতীর পর্যন্ত। মাঝের রাস্তাটি গেছে পাহাড়ের গা দিয়ে। এই রাস্তাটির কথাই গ্যাচেট বলে দিয়েছিলেন। এই পথেই সে এগোলো। রাস্তার ধারে ধারে বাড়ি—কুটিরগুলো ভেঙে পড়ছে, সেখানে উঠছে পাকা বাড়ি,—গ্রাম্য রূপের ওপর শহরের আক্রমণ শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে।

উঁচু পাথরের পাঁচিল ঘেরা ডাক্তার গ্যাচেটের তিনতলা পাকা বাড়ি। সামনে মস্ত বাগান। সামনের গেটে পেতলের ঘণ্টা। ঘণ্টা বাজাতেই গ্যাচেট নিজে এসে সমাদর করে ভিনসেণ্টকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। প্রথমে নিয়ে গেলেন বাড়ির পেছনদিকের উঠোনে, যেখানে হাঁস মুরগি ময়ূর বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীপশুর আড্ডা।

সেখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত বর্ণনা করবার পর তিনি ভিনসেণ্টকে টেনে নিয়ে গেলেন বাড়ির ভেতর, বসবার ঘরে।

মস্ত ঘরটা। বিরাট উঁচু ছাদ, সামনে বাগানের দিকে তিনটি কেবল ছোট-ছোট জানলা। সারা ঘরভর্তি আসবাবপত্র আর অসংখ্য টুকিটাকির এতো ভিড় যে একটু অসাবধানে হাঁটা-চলা করলেই বিপদ। জানলার অপ্রাচুর্যে ঘরটা অন্ধকার-অন্ধকার, তার ওপর প্রত্যেকটি আসবাবের রঙ কুচকুচে কালো।

গ্যাচেট সেই বস্তুর ভিড়ের মধ্যে এদিক-ওদিক দৌড়োন আর এটা-ওটা তুলে ভিনসেণ্টের হাতে দেন। ভালো করে ভিনসেণ্ট সেটা দেখবার আগেই আবার সেটা ছোঁ মেরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হাতে ধরিয়ে দেন আর-একটা বস্তু।

—এই, এই যে ফুলদানিটা দেখছ। এই ফুলদানিতে ফুল রেখে দোলাক্রোয়া সেটা এঁকে গেছে। দ্যাখো, দ্যাখো, ভালো করে হাত দিয়ে দ্যাখো। ঠিক ছবির আঁকা ফুলদানির মতোই লাগছে না কি? আর ঐ যে চেয়ারটা দেখছ। জানলার ধারে ঐ চেয়ারে বসে কুর্বে আমার বাগানের দৃশ্য আঁকত। আচ্ছা, এই পিরিচগুলো কেমন লাগছে? ভারি চমৎকার না? জানো, দিমুলিন জাপান থেকে আমার জন্যে এগুলো এনেছিল!....এই এটার ওপর ফুল সাজিয়ে

ক্রুড মনে এঁকেছিল। ছবিটা আমার কাছেই আছে, দোতলায়। চলো তোমাকে দেখাই।

খাবার টেবিলে গ্যাচেটের ছেলে পলের সঙ্গে ভিনসেন্টের আলাপ হোলো—বছর পনেরো বয়সের ভারি সুদর্শন আর প্রাণখোলা কিশোরটি। গ্যাচেট পেটরোগা মানুষ,—ডিনার কিন্তু পঞ্চ ব্যঞ্জনের। শুকনো কালো রুটি আর দুর্ভোজ্য চচ্চাড় খেয়ে ভিনসেন্ট অভ্যস্ত। এমনি রাজভোগ সে খুব বেশি খেয়ে উঠতে পারল না।

খাওয়া শেষ হতেই গ্যাচেট ঘোষণা করলেন,—ব্যস, আর আড্ডা নয়, এবার কাজ। তুমি আমার একটা পোর্ট্রেট শুরু করো ভিনসেন্ট। যেমনি আছি তেমনিই বসে পড়ি, কী বলো!

ভিনসেন্ট সবিনয়ে বললে,—দেখুন ডাক্তার, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আর-একটু ঘনিষ্ঠ হবার আগে আপনার পোর্ট্রেটে আমি হাত দেব না। নইলে সে ছবি সত্য ছবি হবে না।

—তা বটে, তা বটে! ঠিকই বলেছ কথাটা। তবে ভায়া, বসে থাকা চলবে না, আঁকো,—আমি দেখব না?

—তাহলে ধরুন, বাগানের একটা দৃশ্য....

—বাঃ বাঃ, চমৎকার! চলো, আমি তোমার ঈজেল পেতে দেব। এই পল, মঁশিয়ে ভিনসেন্টের ঈজেলটা বাগানে নিয়ে চল্ তো।—নাও ওঠো এখন, ঠিক কোন্ জায়গায় ঈজেলটা রাখতে হবে দেখিয়ে দেবে। আমিও তোমায় বলতে পারব ঠিক একই জায়গায় বসে অন্য কোন শিল্পী এঁকেছে কি না।

ভিনসেন্ট আঁকতে শুরু করল। ডাক্তার গ্যাচেট তাকে ঘিরে চারপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন, আর ক্ষণে-ক্ষণে নানারকম দেহভঙ্গি, মুখভঙ্গি আর চিৎকার করে করে উঠতে লাগলেন—কখনো আনন্দে, কখনো বিস্ময়ে, কখনো আশঙ্কায়, মুহূর্তে ভাবে ভাষায় তাঁর উত্তেজনার নব-নব অভিব্যক্তি।

—দেখি, দেখি! হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ তুমি রঙটা,—হ্যাঁ, ভুল হবে লালচে। বাঃ, চমৎকার। অ্যাঁ, এই রে! বলছি গাছটা তুমি খারাপ করবেই! নাঃ, তা তো নয়! ঠিকই তো করলে দেখছি। বহুৎ আচ্ছা! আরে, ওটা আবার কী রঙ দিলে? আর-একটু নীল দাও! এ কি তোমার প্রভেন্স পেয়েছ নাকি! সাবধান, সাবধান, লাইনটা যেন মোটা করে ফেলো না!...আহা, আর-একটু হলদে করো না ফুলটাকে! হ্যাঁ এই তো চাই,—আঁকছ দৃশ্য, জীবন্ত দৃশ্য,—স্টিল লাইফ তো নয়। তবে অমনি সঙের মতো ওটাকে....ওটাকে... না, না, আমার ভুল হয়েছে, ঠিক করেছ...আহা তাই বলে অতোটা নয়! এই! কেমন, আমার কথা ঠিক হোলো তো?...কী সর্বনাশ, এ যে একেবারে যা-তা...না, না, বুঝতে পেরেছি, ধরতে পেরেছি,...হ্যাঁ, ছেড়ো না, চেপে ধরো প্রাণপণে—বাঃ বাঃ, চমৎকার, অপূর্ব! মার্ভেলাস, ভিনসেন্ট!

ডাক্তারের এই সশব্দ অঙ্গবিকৃতি ভিনসেণ্ট শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করে উঠতে পারল না। ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে বললে,—দেখুন মঁশিয়ে গ্যাচেট, এতোটা উত্তেজনা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই খারাপ নয় কি? নিজে ডাক্তার হয়ে এটুকু আপনার বোঝা উচিত যে নার্ভকে ঠাণ্ডা রাখাটা কতো দরকার।

কিন্তু সামনে বসে যদি কেউ ছবি আঁকে, গ্যাচেটের পক্ষে সে অবস্থায় ঠাণ্ডা থাকা অসম্ভব।

আঁকা শেষ করে ডাক্তারের সঙ্গে ভিনসেণ্ট বাড়ির মধ্যে গেল ও তাঁকে আর্লসবাসিনীর ছবিটা দেখালো। ডাক্তার চোখ বেঁকিয়ে ছবিটা দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে আপন মনে বহুক্ষণ সরব তর্কবিতর্ক করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি হাঁকলেন,—না, এ আমি নিতে পারিনে। এ ছবিকে গ্রহণ করা অসম্ভব আমার পক্ষে। কী তুমি বলতে চেয়েছ এ ছবিতে?

—কিছু না। আর্লসের সব মেয়ের প্রতিভূ আমার ছবি, এইটুকু বলতে পারেন। সমস্ত আর্লস-কন্যার মৌলিক যে চরিত্র-রূপ, তাকে আমি রঙের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি, এইমাত্র।

দুঃখব্যঞ্জক স্বরে ডাক্তার বললেন,—তা তো বুঝলাম,—কিন্তু আমি ছবিটাকে স্বীকার করে নিতেই পারছিনে যে!

ভিনসেণ্ট বললে,—আপনার শিল্পসংগ্রহগুলি একটু দেখতে পারিনে?

—পারো, পারো। যাও, সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দ্যাখো। তোমার এই মহিলাটিকে নিয়ে আমি রইলাম, দেখি এর সঙ্গে আমার ভাব জমে কি না।

প্রায় এক ঘণ্টার ওপর ভিনসেণ্ট সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে নানা শিল্পসংগ্রহ দেখে বেড়াতে লাগল,—সঙ্গে রইল সুবোধ বালক পল। একটা ঘরে সে দেখল এক কোণে নিতান্ত হেলাফেলায় পড়ে রয়েছে গিলামিনের একখানা ছবি—বিছানায় শোয়া নগ্ন নারীমূর্তি। ছবিটার কোনো যত্ন নেই, ক্যানভাসে ফাটল ধরেছে। ভিনসেণ্ট যখন ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছে এমন সময় দ্রুত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন ডাঃ গ্যাচেট। তার আর্লসবাসিনীর সম্বন্ধে একরাশ প্রশ্ন একসঙ্গে করে গেলেন।

—বলেন কী? এতোক্ষণ ধরে একলা ছবিটা আপনি দেখছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছে, আসছে! ধরতে যেন পারছি তোমার সুন্দরীকে!

ভিনসেণ্ট বললে,—রাগ করবেন না ডাক্তার, এমন চমৎকার গিলামিনটা এমনি অযত্নে আপনি ফেলে রেখেছেন, শিগগির বাঁধাই করিয়ে নিন, নইলে একেবারে যাবে।

গ্যাচেটের কানে গেল না সে কথা।

—*তুমি বলছ তুমি ছবিটার ড্রয়িং-এ গগাঁকে অনুসরণ করেছ। আমি তা মানিনে....আর তা ছাড়া পদে পদে প্রতিকূল রঙের এ কী সংঘর্ষ!* নারীর নারীত্বটা তো এখানেই গেছে...না না...কী বললাম? না, তা বোধহয় ঠিক নয়,

তাহলে ও আমার কাছে আসছে কেন? কাঠামো থেকে বেরিয়ে আমার বুকে এসে স্পর্শ করতে চাইছে কেন? যাই, আবার গিয়ে দেখি।

সমস্ত সুদীর্ঘ বিকেলবেলাটা গ্যাচেট ভিনসেন্টের ঐ আর্লসবাসিনীকে নিয়ে কাটালেন। কখনো তার সামনে এসে চোখ পাকিয়ে দাঁড়ান, কখনো নেচে বেড়ান চারপাশে, হাজার রকমের মুখভঙ্গি আর দেহভঙ্গি,—হাজার প্রশ্ন করেন নিজেকে, নিজেই তার উত্তর দেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও চোখ ফেরে না অন্যদিকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। এতোক্ষণে ঐ নারী সম্পূর্ণ করে তাঁর হৃদয় জয় করে নিল। তার কাছে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। এই ধরা পড়ায় কতো তৃপ্তি, কতো সংশয়ের অবসান!

শেষ পর্যন্ত ছবিটার সামনে শান্ত, পরিশ্রান্ত, আনন্দ-অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললেন,—সত্যি, সহজ হওয়া কী শক্ত! এত সুন্দর ও! সহজ বলেই সুন্দর, সহজ বলেই গভীর। একটা ছবির মধ্যে চরিত্রের এতো গভীর-তার উপলব্ধি আগে আমার কখনো হয়নি!

ভিনসেন্ট বললে,—ভালো যদি লাগে ডাক্তার,—নিন আপনি ওকে। আর আজকের আঁকা বাগানের এই ছবিটাও।

—কিন্তু এ সব ছবি তুমি আমাকে দেবে কেন ভিনসেন্ট? ওগুলোর কি যা-তা দাম?

—দুদিন পরেই হয়তো আমার দেখাশোনা সবকিছু আপনাকেই করতে হবে। তার মূল্য পয়সা দিয়ে আমি দেব, সে সঙ্গতি কোথায়! তার কিছুটা মূল্য দিয়ে রাখতে চাই—ছবি দিয়ে।

—কিন্তু আমি কি পয়সার জন্যে তোমার ওপর ডাক্তারি করব বলেছি? সম্পর্কটা তো বন্ধুত্বের।

—ঠিক তো, তাহলে আপনাকে ছবি দেওয়াও তো আমার পক্ষে আরো সহজ হয়ে গেল। সম্পর্কটা তো বন্ধুত্বের।

৩

ভিনসেন্ট শান্ত মনে জমিয়ে বসল অভার্সে। নতুন করে আরম্ভ করল শিল্পীজীবন। ঠিক করল রোজ রাত্রে শুতে যাবে ঠিক নটায়। ভোর পাঁচটায় উঠে দিনের কাজ শুরু করবে। আবহাওয়াও চমৎকার, মিষ্টি মেদুর রোদ, সারা উপত্যকা জুড়ে সবুজের নবোদ্ভাস। সেন্ট পলের উন্মাদশালায় থাকতে যতোবার সে অসুখে পড়েছিল, তার প্রতিফল পাচ্ছে বৈকি। হাতে তুলি ধরলে হাত থেকে খসে খসে পড়ে যেতে চায়। বুঝল সে, ছবি আঁকার অভ্যাস-টাকেই নতুন করে রপ্ত করতে হবে।

থিয়োকে সে লিখল বার্গের ষাটখানা চারকোলে আঁকা স্টাডি পাঠাতে কপি

করার জন্যে। মানুষের চেহারা, বিশেষ করে নগ্ন দেহ আবার ছাত্রের মতো অনুশীলন করা দরকার,—নইলে কোথায় ভুল ধরা পড়ে যাবে। অভার্সে সে এদিক-ওদিক ছোটখাটো একটা বাড়ির খোঁজ করতে লাগল স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধবার জন্যে। মাঝে মাঝে মনের কোণে একটি মধুর ভাবনা উঁকি দিতে লাগল,—থিয়ো যে বলেছিল এখনো তার সময় আছে সংসারী হবার, সত্যিই কি সংসার-সঙ্গিনী কোনোদিন আসবে? সেণ্ট রেমিতে অর্ধেক- আঁকা কয়েকখানি ছবি সাজিয়ে নিয়ে বসল সেগুলোকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে।

এ কিন্তু হঠাৎ-আলোর ঝলকানি। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের জ্বলন্ত আকুতি। উন্মাদাগারে দীর্ঘ দিন অজ্ঞাতবাসের পর এক-একটি দিন মনে হয় এক-একটি সপ্তাহের মতো। এতো সময় নিয়ে কী করবে সে? কী তার কাজ? আজকাল সে আর ছবি আঁকতে পারে না সারাদিন। ছবি আঁকার সেই উদ্দাম ক্ষিপ্র শক্তিও সে হারিয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে ছবি এঁকে যাবার বাসনাও আর নেই। আর্লসের দুর্ঘটনার আগে প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় সে দুঃখ করত দিনটা আরো দীর্ঘ হোলো না কেন এই বলে। এখন দিন আর তার কাটে না।

প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব কমই আজকাল তাকে আকর্ষণ করে। যদি-বা দৃশ্যপট আঁকে, আঁকে শান্ত নির্লিপ্ত নিরাসক্ত মন দিয়ে। উত্তপ্ত রক্তের উত্তেজনা নিয়ে পটের ওপরে রঙ-তুলির আঘাত করে যাবার দুর্দাম উদ্দীপনা তার চিত্ত থেকে অপগত। আঁকতে পারে না সে আজকাল সত্যিকারের আঁকা যাকে বলে,—আঁকা-আঁকা খেলা করে শুধু। সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে একদিনে একখানা ছবি শেষ নাই-বা হোলো—কী তাতে আসে যায়!

অভার্সে তার বন্ধু বলতে একমাত্র ডাক্তার গ্যাচেট। রোজ তাঁকে প্যারিসে যেতে হয়, সেইখানেই তাঁর রোগী দেখার প্রধান চেম্বার। প্রায়ই রাত্রের দিকে কাফে রাভেঁাতে এসে ভিনসেণ্টের কাজ দেখে যান। ডাক্তারের চোখে কেমন একটা চরম আশাভঙ্গের মূক বেদনার স্পর্শ—কেন, তা ভেবে ভেবে ভিনসেণ্ট অবাক হয়।

একদিন সে বলে ফেললে,—আপনি এত অসুখী কেন ডাক্তার?

—আ ভিনসেণ্ট, সখেদে ডাক্তার বললেন,—সারাটা জীবন ধরে কতো খাটলাম,—বুড়ো বয়েসে কেবলই মনে হয়, লাভ হোলো কার কী? ডাক্তার যে,—অসুখী হব না? সারাটা কাল অসুখ দেখে দেখেই যে কাটল,—রোগ, যন্ত্রণা, বেদনা....

—কী যে বলেন! আপনার কাজটা আমি যদি পেতাম...

কেমন একটা আত্মহারা উদ্দীপনার আলো জ্বলে উঠল গ্যাচেটের চোখে। বললেন,—না ভিনসেণ্ট, না। চিত্রকর হওয়া,—পৃথিবীতে এর চাইতে মহত্তর কৃতি আর কিছু নেই। সারা জীবন ধরে আমি ভেবেছি, যদি আমি চিত্রকর হতে পারতাম! পারলাম না কিছুতেই। এখান থেকে ওখান থেকে এক-আধ

ঘণ্টা চুরি করি, কিন্তু পরিপূর্ণ মুক্তি নেই। কতো রোগী,—যারা আমাকে চায়,—তাদের এড়িয়ে যাব কেমন করে ?

ডাক্তার গ্যাচেট হাঁটু গেড়ে বসে ভিনসেণ্টের খাটের তলা থেকে একগাদা ছবি টেনে বার করলেন। চোখের সামনে মেলে ধরলেন রৌদ্র-উদ্ভাসিত একগুচ্ছ হলুদ সূর্যমুখী।

—এইরকম একটি ছবি যদি আমি আঁকতে পারতাম ভিনসেণ্ট,—তাহলে বুঝতাম জীবন আমার সার্থক। সারাটা জীবন আমি কাটালাম অসংখ্য লোকের ব্যাধি বেদনা সারিয়ে সারিয়ে,—কিন্তু কতো আর সারাবো? মানুষ যে মরণশীল। তোমার এই সূর্যমুখীর গুচ্ছ, এরা চিরন্তন,—শতাব্দীপারেও এরা মানুষের অন্তর-বেদনাকে ঘোচাবে, যুগান্ত-পরেও মানুষের হৃদয়ে করবে আনন্দের সূর্যরশ্মিসম্পাত। সেইজন্যেই, ভিনসেণ্ট, তোমার জীবন সার্থক,—কোনো দুঃখ তোমার থাকার কথা নয়।

কদিন পরে ভিনসেণ্ট ডাক্তার গ্যাচেটের একটা পোর্ট্রেট আঁকল। নীল ফ্রক-কোট গায়ে, মাথায় সাদা টুপি। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা গাঢ় নীল। মুখ আর হাতের রঙটা সে দিল ঠিক চামড়ার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। পোজটা হোলো এইরকম যে গ্যাচেট একটা লাল টেবিলের ওপর হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। টেবিলটার ওপরে হলদে রঙের একটা বই আর লাল টকটকে ফুলফোটা গাছের একটি টব।

ডাক্তার একেবারে ক্ষেপে উঠলেন ছবিটা পেয়ে। এতো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভিনসেণ্ট জীবনে কখনো শোনে নি। এমনি আবেগ-বিহ্বল স্তুতিভাষণের সঙ্গে কখনো হয়নি তার পরিচয়। ছবিটার কপি করতে সে ডাক্তারের কথায় রাজি হোলো। এতে ডাক্তারের খুশির আর সীমা নেই।

—তাহলে ওপরে চলো। সেখানে আমার প্রিণ্টিং মেশিন আছে। আমার কারখানা, চলো তোমাকে দেখাই। ....প্যারিসে চলো একবার ভিনসেণ্ট, সেখানে তোমার সব ছবির আমি লিথোগ্রাফ করিয়ে দেব।

কারখানা ছাদের চিলেকোঠায়। পৌঁছতে হয় সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছোট্ট একটা চোরা দরজা খুলে। কতো রকমের অদ্ভুত যন্ত্রপাতিতে ভর্তি সেই ঘর। ধুলোপড়া বোতল ভর্তি কতো বিচিত্র রঙের রস। ভিনসেণ্টের মনে হোলো কোন মধ্যযুগের রাসায়নিকের গুপ্তগৃহে বুঝি সে পা দিয়েছে।

আবার নিচে নামতে নামতে তার চোখে পড়ল গিলামিনের আঁকা সেই নগ্ন নারীর ছবিটি তেমনি অযত্নে পড়ে আছে। সে বললে,—ডাক্তার গ্যাচেট, সত্যি আপনি একটা মাস্টারপীস নষ্ট করছেন। ছবিটা বাঁধাচ্ছেন না কেন বলুন তো?

—হবে হবে। এই বাঁধাবো এবার।—কবে প্যারিস যাবে বলো তো? যতো চাও লিথোগ্রাফ আমি করিয়ে দেব। সেজন্যে যা জিনিস লাগে সব দেব আমি।

মে মাস গেল, এল জুন। পাহাড়ের ওপরের ক্যাথলিক গির্জাটা আঁকতে বসল ভিনসেণ্ট একদিন। মাঝপথে বিকেলের দিকে এমন ক্লান্ত লাগল যে

ছবিটা শেষ করা হোলো না। খালি অধ্যবসায়ের গুণেই সে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কোনো রকমে একটা শস্যক্ষেত্রের দৃশ্য এঁকে তুলল। মাদাম দ্যবিনির বাড়ির একটা বড়ো ছবি সে আঁকল, আঁকল আর-একটা বাড়ির ছবি—দৃশ্যটা রাত্রির। আর সর্বশেষ, সন্ধ্যার একটি দৃশ্য দিনান্তের হলুদ আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে স্তব্ধ কৃষ্ণ দুটি পিয়ার গাছ।

আঁকার মধ্যে পুরোনো রঙটুকু আছে, কিন্তু রস নেই কোনো আর। যেটুকু আঁকতে পারে তা শুধু অভ্যাসবশে। উন্মাদ ব্যাকুলতায় গত দশ বছর ধরে প্রতি মুহূর্তের তার আত্ম-উন্মোচন, আকাশচুম্বী তার সৃষ্টিসাধনা—তারই কিছুটা অবশেষ—উচ্ছ্বসিত জীবনাবেগের বাকি কিছুটা রেশ। এর বেশি নয়।

প্রকৃতি আগে তাকে রোমাঞ্চিত করত ক্ষণে ক্ষণে, অধুনা সে উদাসীন। পিঠে ঈজেল বেঁধে ছবির সন্ধানে একলা ঘুরতে ঘুরতে আপন মনে সে বলে,—নাঃ, কতো এঁকেছি,—আর নতুন কিছু আঁকবার নেই, বলবার নেই। বাকি শুধু নিজেরই অনুকরণ। তা করে কী লাভ?

প্রকৃতিকে সে ভালোবেসে এসেছে চিরদিন। সে ভালোবাসা তার মন থেকে মরে যায় নি। সেই প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় আনবার, নিজের ক্যানভাসে বর্ণে রেখায় বন্দী করবার এতোদিনের ব্যাকুলতাটা বিসর্জিত হয়ে গেছে। আসলে জ্বলে গেছে তার বুকের ভেতরটা। সৃষ্টির রস গেছে শুকিয়ে। উর্বরতা নেই,—শুধু শুষ্ক অঙ্গার।

পুরো জুন মাসটায় পাঁচটা ছবি মাত্র সে এঁকেছে। দেহে মনে ক্লান্তির আর শেষ নেই। খালি হয়ে গেছে সে, নিঃশেষ হয়ে গেছে,—যা একদা ছিল রসভারাক্রান্ত ফল তা এখন শুকনো খোসা। মনে জ্বলেছিল যে অগ্নি, গত দশ বছরে ছবির পর ছবি তার এক-একটি স্ফুলিঙ্গকে হরণ করেছে,—এখন নির্বাপিত শিখা, পড়ে আছে শুধু বিবর্ণ ধূম্ররাশি।

তবু যে আঁকে তা শুধু এই কথা ভেবে যে, থিয়োর ঋণ তাকে হাল্কা করতে হবে যতোটা পারে। কিন্তু আবার যখন ভাবে যে থিয়োরই বাড়িতে এতো ছবি তার জমে আছে যে দশ জন্মেও বিক্রি হবে না, তখন আবার বিস্বাদে সে ঈজেলটা দূরে ঠেলে দেয়।

দিন ঘনিয়ে আসছে,—জুলাই মাসে আবার পাগল হওয়ার পালা। শঙ্কিত দুশ্চিন্তায় মন ভরে থাকে,—আবার তখন কী না কী করে ফেলবে—এ গ্রামেও আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না তাহলে। প্যারিস থেকে আসবার সময় থিয়োর সঙ্গে পয়সাকড়ির পাকাপাকি ব্যবস্থা করে আসতে পারেনি—থিয়ো কতো টাকা যে পাঠাবে তারও ঠিক নেই। এদিকে দিনে দিনে গ্যাচেটের চোখের দৃষ্টিতে যুগপৎ প্রশংসা আর আত্ম-অনুশোচনার উদ্দাম জোয়ারভাঁটা মাথায় তার কেমন একটা ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে চলেছে।

অবস্থাটা চরমে পোঁছলো, যখন খবর এল থিয়োর শিশুর খুব অসুখ।

দুর্ভাবনায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠল ভিনসেণ্ট। সোজা চেপে বসল প্যারিসের ট্রেনে। তার উপস্থিতি থিয়োর সংসারে বিড়ম্বনা বাড়ালো বই কমালো না। থিয়ো নিজে অসুস্থ, তাছাড়া ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ভিনসেণ্ট নানা কথায় তাকে সাহস দিতে চেষ্টা করল।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল থিয়ো,—কেবলমাত্র ছেলের অসুখের জন্যেই আমি ভাবছি নে ভিনসেণ্ট।

—কী হোলো? এ ছাড়া আবার কী থিয়ো?

—ভ্যালেডন, আমার অন্নদাতা। ভয় দেখিয়েছে চাকরিটা আমার থাকবে না।

—সেকি? গুপিলসে তুমি যে ষোলো বছর ধরে আছ!

—তাতে কী এসে যায়! মালিকের অভিযোগ, আমি তার ব্যবসার দিকে যথেষ্ট নজর দিচ্ছনে,—তা ঐ ইম্প্রেশনিস্টদের খাতিরে। সত্যি, ইম্প্রেশনিস্ট-দের ছবি তো বেশি বিক্রি করতে পারিনে, যা-ও বা বিক্রি হয় খুব সামান্য দামে। ভ্যালেডন বলছে আমার দোকান নাকি গত বছর লোকসান দিয়েছে।

—কিন্তু সত্যি কি ও তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারে?

—ইচ্ছে করলে পারবে না কেন? আমাদের ভ্যান গক পরিবারের কোন স্বার্থই তো আর গুপিলসের কারবারে নেই। সব বিক্রি হয়ে গেছে।

—তা...তা যদি করে তো তুমি কী করবে? নিজের একটা দোকান করতে পারবে না?

—তা কী করে পারব? মূলধন কোথায় আমার? যে কটা টাকা জমেছিল তা তো প্রথমে বিয়েতে আর তারপর বাচ্চার অসুখেই খরচ হয়ে গেল।

—ওঃ থিয়ো, এই আমার পেছনে সারাজন্ম কাঁড়ি-কাঁড়ি তুমি যদি না ঢালতে....

—ও কথা বোলো না! তুমি জানো আমি...

—কিন্তু কী তুমি করবে থিয়ো? এখন আবার জোহানা রয়েছে...খোকাটি হয়েছে তার!

—জানিনে তা...যা হয় হবে। বাচ্চার ভাবনই তো এখন ভাবি। কী বলো? ভিনসেন্টের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হাসল থিয়ো।

আর দিনকয়েক প্যারিসে রইল ভিনসেণ্ট। রুগ্ণ শিশুর যাতে অসুবিধে না ঘটে তাই বেশিরভাগ সময়ই সে বাড়ির বাইরে কাটালো। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হোলো। তার ওপর প্যারিসের জীবন। অনেক হৈচৈ, অনেক উত্তেজনা। বাচ্চা ভিনসেণ্ট একটু ভালো হতেই সে অবিলম্বে ফিরে গেল অভার্সের শান্ত পরিবেশে।

কিন্তু শান্তি কোথায়? পঙ্গপালের মতো তার মাথার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যতো দুশ্চিন্তার পাল। থিয়োর চাকরি যাবে, থিয়োর রোজগার বন্ধ হবে। কী হবে তাহলে তার? কে খেতে দেবে? শেষ পর্যন্ত আধ-পাগলা

ভিখিরি হয়ে ঘুরতে হবে নাকি পথে পথে? আর জোহানা আর তার শিশু—তাদেরই বা কী হবে? হ্যাঁ, শিশু, বাচ্চা ভিনসেন্ট,—প্রিয়তম তার ভাই থিয়োর খোকা—কেমন আছে সে এখন? যদি না সে বাঁচে? সে শোক কি রোগা শরীর নিয়ে থিয়ো সামলাতে পারবে?

ঘন্টার পর ঘন্টা ভিনসেন্ট কাফে রাভোঁর অন্ধকার খাবার ঘরে বসে থাকে। বাসি বিয়ার আর তামাকের বন্ধ ধোঁয়ার গন্ধভরা কাফে লামার্টিনের কথা মনে পড়ে। কখনো বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে লাঠি নিয়ে রঙ-চটা বলগুলোতে এলোমেলো ঠোকাঠুকি লাগায়। হাতে পয়সা নেই,—মদ কিনতে পারে না, রঙ কিনতে পারে না। কিসের নেশায় দুর্ভাবনাকে ডোবাবে? এমনি সময় থিয়োর কাছে টাকা চাওয়াও যায় না। এদিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে জুলাই মাস—তার পাগল হওয়ার দিন। না জানি কী সে করে ফেলবে উন্মত্ত অবস্থায়,—তখন সেই সামলাতে আবার কতো টাকা খরচ হবে থিয়োর!

মাঝে মাঝে কাজ করতে চেষ্টা যে করে না তা নয়। পারে না। যা কিছু আঁকবার সব তার আঁকা হয়ে গেছে,—সব বলা হয়ে গেছে যা কিছু ছিল বলবার। সারা জীবন তাকে টেনেছিল প্রকৃতি, আজ সেই আকর্ষণও ফুরিয়েছে। ক্লান্ত হয়ে গেছে তার শিল্পী-জীবন।

জুলাই-এর মাঝামাঝি এল। গরম পড়ল ভীষণ। থিয়োর মাথার ওপর ভ্যালেডনের উদ্যত খড়্গ, এদিকে ঘরে রুগ্‌ণ সন্তান,—তবু সে কোনো রকমে পঞ্চাশটা ফ্র্যাংক জোগাড় করে ভিনসেন্টকে পাঠালো। ভিনসেন্ট সেটা তুলে দিল মাদাম রাভোঁর হাতে। মাসটা এতেই চলে যাবে। এই শেষ,—আর টাকা হাতে আসবে না। তারপর?

গনগনে দুপুরে জ্বলন্ত সূর্যের নিচে সে মুখ বুজে চুপ করে শুয়ে থাকে সমাধিক্ষেত্রের পাশের ফাঁকা ক্ষেতের মধ্যে। কখনো বা নদীর শ্যামল তীর বেয়ে উদ্দেশ্যহারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। গ্যাচেটের কাছে কখনো যায়, ডিনারে বসে স্বাদবিহীন অভ্যাসে খাবার মুখে পোরে। তার শিল্পকৃতি নিয়ে ডাক্তার উচ্ছ্বসিত ভাষায় আলোচনা করেন, সে শুধু চুপ করে শোনে। মনে মনে ভাবে,—কার কথা নিয়ে এতো বক-বক করছে ডাক্তার? আমার? না না, আমার না। ওসব ছবি আমার আঁকা নয়। কখনো আঁকিনি আমি,—জীবনে কখনো তুলি ধরিনি। ছবিগুলোর গায়ে ওসব নাম-সইও আমার নাম-সই নয়, তুলির একটি আঁচড়ও আমি টানিনি ওসব ছবির ওপর। যে এঁকেছে সে আমি নই,—অন্য কোন লোক।

অন্ধকারে নিজের ঘরে চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে সে বিনিদ্র প্রহর কাটায়। ভাবে শুধু,—হ্যাঁ, এও তো হতে পারে, থিয়োর চাকরিটা যাবে না! ঠিক সে আমাকে মাসে মাসে দেড়শো ফ্র্যাংক করে পাঠাবে। কিন্তু তখন আমি আমার এই সর্বরিক্ত জীবনটাকে নিয়ে করব কী? প্রবঞ্চিত করব কাকে? না এঁকে

উপায় ছিল না, বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বলছিল,—রঙ আর রেখায় সে আগুনকে বুক থেকে নিংড়ে বার করে না দিয়ে উপায় ছিল না,—তাই তো বেঁচে ছিলাম। ভাইএর কাছে এতোটা জীবন হাত পেতেও বেঁচে ছিলাম কিন্তু এখন তো আর বুকে কোনো আগুন নেই, নিবে-যাওয়া ঠান্ডা-হয়ে-যাওয়া শুধু মুঠো মুঠো ভস্ম। এখন থেকে বেঁচে থাকা শুধু ঐ সেন্ট পলের আশাহারা জীবন্ম তদের মতো, যতো দিন না মৃত্যু নিয়ে আসে চরম পরিত্রাণ।

—না! এও তো হতে পারে আবার আমি সুস্থ হয়ে উঠব, আবার ফিরে পাব ছবি আঁকার বাসনা। হতে পারে বৈকি! অসম্ভব নয়। হ্যাঁ, কিন্তু তখন? তখন আমি আর কোন্ মুখে থিয়োর কাছ থেকে টাকা নেব—যে টাকার এখন থেকে তার কতো দরকার জোহানার জন্যে, বাচ্চা ভিনসেন্টের জন্যে। আমার পেছনে টাকা খরচ করা আর তার উচিত নয়। জোহানা আর তার শিশুকে বাইরে পাঠানো উচিত—যেখানে তারা সুস্থ হতে পারে, শক্ত হয়ে উঠতে পারে। দশ-দশটা বছর ভাই আমাকে টেনেছে। তাই কি যথেষ্ট নয়? আরো? আমি যদি এখন সরে না পড়ি বাচ্চা ভিনসেন্টের ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার। আমার যা বলবার তা তো আমি বলেছি,—এখন যে আমার নামে যে শিশুর নাম তার কথা বলার দিন এসেছে!

সব কিছু দুশ্চিন্তার মূলে চরম দুশ্চিন্তা—দিন ঘনিয়ে আসছে। এবারে উম্মত্ততার ফল কী হবে? এখনো তার মাথা ঠিক আছে, বিচারবুদ্ধি আছে, সংকল্প গ্রহণের ক্ষমতা আছে। কিন্তু এর পরের বার আক্রমণের পর আর যদি সেরে না ওঠে, চিরদিনের মতো যদি একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়? যদি জড় বস্তুতে পরিণত হয়, কিংবা উন্মত্ত জানোয়ারে? থিয়ো তখন কী করবে? সারা জীবনের মতো পাগলা গারদে কয়েদ করে রাখবে তাকে?

ডাক্তার গ্যাচেটকে আরো দুটো ছবি উৎকোচ দিয়ে সত্যি কথাটা বার করে নিতে সে চেষ্টা করল।

ডাক্তার বললেন,—না ভিনসেন্ট, ও রকম আক্রমণ আর হবে না। তুমি একেবারে সুস্থ হয়ে গেছ, আমি বলছি। তবে কিনা, এতোটা ভাগ্য সব সন্ন্যাস-রোগীর হয় না।

—সেসব রোগীর শেষ পর্যন্ত কী হয় ডাক্তার?

—বার-বার ক্রাইসিসের পর শেষ পর্যন্ত একেবারে পাগল হয়ে যায়।

—তখন আর তাদের সারবার কোন উপায় থাকে না?

—না ভিনসেন্ট। শেষ হয়ে যায় তখন তারা। হয়তো জীবনের বাকি কয়েক বছর কোনো উম্মাদাগারে বন্দী হয়ে থাকে, কিন্তু চেতনা আর তাদের ফিরে আসে না।

—কোন্ আক্রমণটা যে চরম ক্রাইসিস তা কী করে বোঝা যায় ডাক্তার?

—তা অবশ্য কেউ বলতে পারে না। তবে, থামো তুমি। এসব অলক্ষুণে

কথা থাক। চলো, কটা এচিং করবে।

পরবর্তী চারদিন ভিনসেণ্ট একবারের জন্যেও ঘর থেকে বার হোলো না। মাদাম রাভৌ তার ঘরে খাবার পেঁছে দিয়ে আসতে লাগলেন। সমানে সে শুধু ভাবতে লাগল। এখন আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি, প্রকৃতিস্থ আছি। কিন্তু এবার যখন আমি পড়ব,—তখন যদি মাথাটা একেবারে বিগড়ে যায়, একেবারে পাগল হয়ে যাই! তখন আমার আর কোনো উপায় থাকবে না,— আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারব না তখন! থিয়ো,থিয়ো! তখন আমার কী হবে!

চতুর্থ দিন বিকেলের দিকে সে গেল ডাক্তার গ্যাচেটের বাড়ি। বসবার ঘরেই ছিলেন গ্যাচেট। সোজা সে গেল যেখানে গিলামিনের নগ্ন নারীর ছবিটি ছিল। ছবিটি হাতে নিয়ে ধমকের সুরে সে বললে,—আমি আপনাকে বলিনি ছবিটা বাঁধাতে?

চমকে মুখ তুলে ডাক্তার উত্তর দিলেন,—বলেছ ভিনসেণ্ট। এই আসছে সপ্তাহে বাঁধাইওলার কাছে নিয়ে যাব।

চিৎকার করে উঠল ভিনসেণ্ট,—আসছে সপ্তাহে নয়! আজ! এখুনি! এই মুহূর্তে!

—কী পাগলের মতো তুমি কথা বলছ ভিনসেণ্ট!

—পাগলের মতো? পাগল আমি?

রাগে গনগনে চোখে এক মুহূর্তে ডাক্তারের চোখে তাকিয়ে তাঁর দিকে আক্রমণের ভঙ্গিতে সে এগিয়ে গেল। তারপর ডানহাতটা পুরল কোটের পকেটে। ডাক্তার গ্যাচেটের মনে হোলো পকেটের মধ্যে সে চেপে ধরল একটা রিভলভার।

—ভিনসেণ্ট! প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

কেঁপে উঠল একবার ভিনসেণ্ট। থমকে দাঁড়ালো। তারপর চোখ নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে এক দৌড়ে বার হয়ে গেল বাড়ি থেকে।

পরদিন ভোরবেলা ঈজেল আর ক্যানভাস নিয়ে পথে বার হোলো। স্টেশনের রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে পাহাড়ে উঠে সমাধিক্ষেত্র ছাড়িয়ে সে গিয়ে পেঁছিলো হলুদ শস্যক্ষেত্রে। বসে পড়ল সেখানে।

ঠিক দুপুর। ঠিক মাথার ওপর অগ্নিবর্ষী সূর্য। এমনি সময় কোথা থেকে নেমে এল ছায়া। আকাশের কোন্ কিনার থেকে উড়ে এল কাকের পাল—ছায়া কালো কালো। আকাশ তারা ভরে দিল, সূর্যকে তারা নিভিয়ে দিল;—তারা উড়ে এল তার মাথায় চোখে মুখে চুলে,—ঢুকতে লাগল তার কানের মধ্যে, মুখের মধ্যে, নাকের ছিদ্রপথে, কালো কালো অসংখ্য ডানার ঝাপটে ডুবিয়ে দিল তার চৈতন্য।

ভিনসেণ্ট কাজ করে চলল। সোনালি-হলুদ রঙের দিগন্তবিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্র, তার ওপর দিয়ে উড়ে আসছে কৃষ্ণবর্ণ কাকের পাল,—আঁকতে লাগল দৃশ্যটা। কতোক্ষণ,—কতোক্ষণ ধরে আঁকল মনে নেই। শেষ হল ছবিটা,

ক্যানভাসের এক কোণে লিখল—'শস্যক্ষেত্রে কাকের পাল'। তারপর সব গুছিয়ে নিয়ে রাভোঁতে ফিরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। ঘুম এল সঙ্গে সঙ্গে।

পরদিন বিকেলবেলা আবার সে বার হোলো পথে। এবার গেল অন্য রাস্তায়। সেই বাগানবাড়ির পাহাড়টা পার হয়ে সে চলে গেল খোলা প্রান্তরে।

একজন চাষা তাকে দেখেছিল,—একটা গাছের ওপর উঠে বসে আছে,—আর মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে নেড়ে হেঁকে উঠছে,—অসম্ভব !

কিছুক্ষণ পরে গাছ থেকে সে নামল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সদ্য-লাঙল-চষা ক্ষেতের মধ্যে।

ঘণ্টা বেজেছে এইবার, শেষ প্রহরের ঘণ্টা। এই ঘণ্টার ধ্বনি সে শুনেছিল অনেক আগেই, সেই আর্লসে থাকতেই,—কিন্তু তখন শেষ দাঁড়িটা সে টেনে দিতে পারে নি। এবার পারতেই হবে।

এবার বলতে চাই শেষ কথাটি। বলতে চাই,—বিদায় দাও। যায় যদি যাক,—ছিল সে ভালো, ছিল সে মধুর ধরণীতে। অন্ধকার ছিল বৈকি,—কিন্তু আলোও ছিল উদার।

—বেশ কথাটা গগাঁ বলেছিল একদিন—যেখানে বিষ সেখানেই বিষৌষধি ! ঠিক, খাঁটি কথা। তাই এখন জীবনের ম্লান প্রদীপ কালসমুদ্রে ভেসে যাক, কোনো দুঃখ নেই। শুধু বলতে চাই,—দাও হাসি মুখে বিদায়টুকু। জীবনের প্রদীপে বারে বারে দুঃখসুখের আলো যারা জ্বালিয়েছ,—বিদায় দাও। উরসুলা, তোমার উপেক্ষাই প্রথম সহজ জীবনযাত্রা থেকে আমাকে দূরে ঠেলে দিল সমাজতাড়িতদের বন্ধুর পথে। মেণ্ডিস ডাকস্টা, তুমি শুনিয়েছিলে আশার বাণী, বলেছিলে ব্যর্থ হবে না আমার সাধনা, বলেছিলে আত্মপ্রকাশের মধ্যেই পাব আমার পরিপূর্ণতা। কে ভস, তোমার ঐ 'না না কখনো না' এই কটি কথা দুঃখের অগ্নিতিলক পরিয়েছে আমার ললাটে। মাদাম ডেনিস, জ্যাকেস ভার্নি, হেনরি ডিক্রুক,—প্রিয় বন্ধু আমার তোমরা,—তোমরাই আমাকে শিখিয়েছ দুনিয়ায় যারা প্রবঞ্চিত অবজ্ঞাত তাদের ভালোবাসতে। পীটারসেন, তুমি বপন করেছ আমার প্রাণে শিল্পজীবনের বাসনা-অঙ্কুর। বাবা মা, যতোটা ভালোবাসবার তার চেয়ে কম তোমরা আমাকে বাসো নি। ক্রিশ্চিন ! স্ত্রী আমার ! ক্ষণকালের জীবন-সঙ্গিনী আমার ! মভ, ডি বক, উইসেনব্রাক,—তোমরা আমার প্রথম শিল্পজীবনের উপদেষ্টা ও বন্ধু ! মার্গট,—একটিমাত্র নারী, যে আমাকে দিয়েছিল সর্ব-সমর্পিত ভালোবাসা !—বিদায় দাও আমাকে সবাই !

—তারপর প্যারিসের বন্ধুরা ! লোত্রেক, যে আবার উন্মাদাগারে বন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে,—জর্জেস সিউরাত, যে মাত্র একত্রিশ বছর বয়েসে খেটে খেটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে,—পল গগাঁ, ব্রিটানির পথে পথে যে আজ ভবঘুরে,—রুসো, প্যারিসের অন্ধ চিলেকোঠায় যার আস্তানা,—সেজান, একসএর নিঃসঙ্গ পর্বতচূড়ায় যে সন্ন্যাসী—হ্যাঁ,আর তুমি বন্ধু, পীয়ের ট্যাঙ্গি

—আর তুমি রুলিন—হৃদয়-সারল্যের সৌরভে আমাকে মুগ্ধ করেছ যারা—বিদায় দাও।

—লক্ষ্মী মেয়ে র‍্যাচেল, ভ্রাতৃসম ডাক্তার রে, তোমরা দিয়েছ পরম দুঃখ-তিমিরে স্নেহ-সান্ত্বনার আলো,—অরিয়ার আর ডাক্তার গ্যাচেট—সারা পৃথিবীতে দুটিমাত্র লোক যারা আমাকে স্বীকার করেছ মহৎ শিল্পী বলে,—তোমাদেরও কাছে বিদায়—

—আর, সবার শেষে,—থিয়ো, ভাইটি আমার—কিছু পেলে না, সব দিলে আমাকে,—এবার চলি ভাই।

ভাষা নিয়ে সে কারবার করেনি কখনো, আঁকিয়ে সে। সব আঁকা যায়, কিন্তু এই বিদায়টুকুকে সে রঙে রেখায় প্রকাশ করবে কেমন করে!

থাক, থাক।

চোখ তুলে ভিনসেন্ট তাকালো আকাশের দিব্যভাতি সবিতার দিকে। ঐ নিত্যআলোকজ্যোতির দিকে অপলক দৃষ্টি রেখে সে রিভলভারের ঘোড়াটা ডান হাতে টানল। লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নরম উষ্ণ কালো মাটি, মুখটা ডুবিয়ে দিল ঐ মাটির মধ্যে,—আশ্রয় পেল যেন মাতৃগর্ভের অন্ধকারে।

৪

প্রায় ঘণ্টাচারেক পরে ভিনসেন্ট টলতে টলতে এসে ঢুকল কাফেতে। রক্তে ভাসছে অঙ্গের পোশাক। মাদাম রাভো সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে গেলেন। তারপর ঘর ছেড়ে দৌড়োলেন ডাক্তার গ্যাচেটের সন্ধানে।

ডাক্তার গ্যাচেট ভিনসেন্টের ঘরে পা দিয়েই আর্তনাদ করে উঠলেন,—ভিনসেন্ট, ভিনসেন্ট, এ কী কাণ্ড তুমি করেছ।

ডাক্তার গ্যাচেট আঘাতটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

—ভিনসেন্ট, বন্ধু আমার, কোন্ দুঃখে তুমি এমনি কাজ করতে গেলে? আমি কেন জানতে পারিনি তা? আমাদের সকলের এতো ভালোবাসা তোমাকে ঘিরে রয়েছে—তবু তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও কেন? তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে? কতো ছবি, কতো অপরূপ ছবি যে এখনো তোমার আঁকা বাকি ভিনসেন্ট।

—ডাক্তার, দয়া করে আমার কোটের পকেট থেকে আমার পাইপটা এগিয়ে দেবেন?

—নিশ্চয়, বন্ধু!

পাইপে তামাক ভরে নলটা ভিনসেন্টের দুই দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিলেন।

—বাঃ!—এবার একটু আগুন।

ভিনসেন্ট শান্তভাবে পাইপ টানতে লাগল।

—ভিনসেন্ট, আজ রবিবার। তোমার ভাই দোকানে নেই, বাড়িতেই আছে।

বাড়ির ঠিকানাটা কী তার ?

—তা তো আপনাকে আমি বলব না।

—কেন ভিনসেণ্ট ? তোমার ভাইকে যে এখুনি খবর পাঠানো দরকার।

—সপ্তাহের এই একটা ছুটির দিনে থিয়োকে কিছুতেই বিরক্ত করা চলবে না। আমি জানি ও বড়ো ক্লান্ত, দুর্ভাবনার ওর শেষ নেই। এ দিনটা ওর বিশ্রামের দিন।

শত অনুরোধেও ঠিকানা আদায় করা গেল না। গভীর রাত পর্যন্ত ডাক্তার গ্যাচেট তার কাছে রইলেন, পরিচর্যা করলেন যতোটা সম্ভব। তারপর বাকি রাতটা তাঁর ছেলে রইল ভিনসেণ্টের পাশে।

সমস্ত রাত ভিনসেণ্ট নির্বাক হয়ে পড়ে রইল। চোখে একফোঁটা ঘুম নেই। শুধু মাঝে মাঝে তামাক ভরে নিয়ে পাইপটা টানতে লাগল সর্বক্ষণ।

পরদিন সকালবেলা গুপিলুসে পেঁাছে থিয়ো পেল ডাক্তার গ্যাচেটের টেলিগ্রাম। দৌড়ল সে স্টেশনে একটি মুহূর্ত দেরি না করে।

—থিয়ো, এসেছ ভাই।

কথা বলতে পারল না থিয়ো। বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে শিশুর মতো করে দুহাতে বুকে জড়িয়ে নিল দাদাকে।

ডাক্তার যখন এলেন, থিয়ো বাইরে বারান্দায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলল।

দুঃখভরে গ্যাচেট মাথা নাড়লেন—না, কোনো আশা নেই। শেষ চেষ্টা অপারেশন করে গুলিটা বার করা। কিন্তু এতো দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তাও সম্ভব নয়। আসলে শরীরটা ছিল লোহা দিয়ে গড়া,—অন্য কেউ হলে মাঠেই তো মারা পড়ত।

সমস্ত দিন থিয়ো ভিনসেণ্টের বিছানার পাশে বসে রইল—নিজের হাতে তার ডানহাতটি মুঠো করে ধরে। রাত্রিবেলা আর কেউ কাছে রইল না। একান্ত নির্জনে নিচু গলায় দুই ভাই শুরু করল তাদের ছেলেবেলাকার গল্প।

থিয়ো বললে,—রাইসউইকের সেই মিলটার কথা মনে পড়ে ভিনসেণ্ট ?

—হ্যাঁ। ভারি সুন্দর ছিল সেই মিলটা, তাই না ?

—মনে পড়ে, নদীর ধারে বাঁধের ওপর আমরা দুজনে বেড়াতাম,—কতো প্ল্যান করতাম ভবিষ্যৎ জীবনের।

—হ্যাঁ। আর শরৎকালে মাথা-উঁচু শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দুজনে খেলে বেড়াতাম। তখন, ঠিক আজ যেমন তুমি আমার হাত ধরেছ, ঠিক এমনি ধরতে, —মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ, ভিনসেণ্ট।

—আর্লসের হাসপাতালে থাকতে জুণ্ডেরার্টের কথা প্রায়ই মনে পড়ত। তোমার আমার ছেলেবেলার কথা। ভারি ভালো কেটেছে সেসব দিন। ভুলে

গেছ, সেই যে রান্নাঘরের পেছনের বাগানে আমরা খেলা করতাম আর রান্নাঘরে বসে মা পিঠে ভাজতেন....

—ভুলিনি। কতোদিন আগেকার কথা সে ভিনসেণ্ট!

হ্যাঁ...ঠিক বলেছ...অনেক দিন....ভালো কথা থিয়ো, নিজের দিকে নজর রেখো,—নিজের শরীরের যত্ন কোরো এবার থেকে। জো-র মুখ চেয়ে, খোকার কথা ভেবে এ তোমাকে করতেই হবে। ওদের নিয়ে বরং শহরের বাইরে কোথাও কদিন থেকে এসো—হাওয়া-বদলে সকলেরই ভালো হবে।...আর একটা কথা। গুপিলদের আর থেকো না। ওরা তোমার সারাটা জীবন কিনে রেখেছে,—তার বদলে দেয়নি কিছুই—

—আমি আমার নিজেরই গ্যালারি একটা খুলছি ভিনসেণ্ট। তাতে প্রথমেই থাকবে শুধু একজনের ছবি—ভিনসেণ্ট ভ্যান গকের একক প্রদর্শনী। তুমি আমার বাড়িতে যেমন করে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে ঠিক তেমনি—

—আমার ছবি, আমার কাজ! কম দিলাম না এর জন্যে—বুদ্ধিটা গেল, জীবনটাও গেল শেষ পর্যন্ত —

বন্ধ হোলো কথাবার্তা। ঘরে নেমে এল সারা অভার্সের নীরব রাত্রির করুণ প্রশান্তি।

শেষরাত্রের দিকে ভিনসেণ্ট একবার থিয়োর দিকে মুখ ঘোরাল, ফিসফিস করে বললে,—ইচ্ছে করে,—এবার আমি যাই থিয়ো!

কয়েক মিনিট পরে চোখ বুজোলো ভিনসেণ্ট।

থিয়োর ভাই বিদায় নিয়েছে,—চিরদিনের মতো।

৫

প্যারিস থেকে এলো রুসো, পীয়ের ট্যাঙ্গি, অরিয়ার আর এমিলি বার্নার্ড অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে।

কাফে রাভোর দরজা বন্ধ, জানলার খড়খড়িগুলি নামানো। সামনে কালো ঘোড়ায় টানা শবাধারবাহক কালো গাড়ি অপেক্ষমান।

বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর ভিনসেণ্টের শবাধারটি রাখা হোলো। টেবিলটি ঘিরে দাঁড়ালো থিয়ো, ডাক্তার গ্যাচেট, রুসো, পীয়ের ট্যাঙ্গি, অরিয়ার, বার্নার্ড আর রাভো। কথা নেই কারো মুখে, কেউ চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারছে না।

কোনো ধর্মযাজকের উপস্থিতির প্রয়োজন কারো মনে এল না।

গাড়ির চালক সামনের দরজায় ধাক্কা দিল,—আর দেরি নয়, সময় হয়ে গেছে।

চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার গ্যাচেট,—না না, এমনি করে আমরা ওকে বিদায় দিতে পারি নে!

ভিনসেণ্টের ঘর থেকে তার সব ছবিগুলো তিনি নামালেন,—পল-কে

পাঠালেন নিজের বাড়িতে, সেখানে ভিনসেণ্টের আঁকা যেসব ক্যানভাস আছে সেগুলো সব নিয়ে আসতে।

দু-জনে মিলে বিলিয়ার্ড-ঘরের সারা দেয়ালে সমস্ত ছবিগুলো টাঙালো। থিয়ো একলা দাঁড়িয়ে রইল কফিনের ধারে।

দেয়ালে দেয়ালে ভিনসেণ্টের সূর্যালোকদীপ্ত চিত্রাবলী আধো অন্ধকার কাফের রূপ ফিরিয়ে দিল,—মনে হতে লাগল এ যেন কোন প্রদীপ্ত উপাসনা-গৃহ, কোন আলোক-মন্দির !

ছবি সাজানো শেষ হলে আবার সবাই এসে দাঁড়াল বিলিয়ার্ড টেবিলের চার পাশে। গ্যাচেট একলা কেবল কথা বলতে পারলেন।—আমরা যারা ভিনসেণ্টের বন্ধু,—দুঃখ করব না আমরা, শোক নেই আমাদের। আমরা জানি অবিনশ্বর তার প্রাণ। তার মানব-প্রেম, তার প্রতিভা, তার শক্তি কখনো ম্লান হবে না, —নীরব হবে না কখনো তার বাণী,—অনির্বচনীয় সৌন্দর্য তার স্পর্শে মূর্ত হয়েছে, তার অনির্বাণ আলো পৃথিবীকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে চিরদিন। প্রহরে প্রহরে আমি তার ছবি দেখি,—যতোবার দেখি, ততোবার জীবনের নতুন অর্থ নতুন আশ্বাস খুঁজে পাই। ভিনসেণ্ট—ভিনসেণ্ট ছিল বিরাট স্রষ্টা...বিরাট শিল্পী...ছিল সে বিরাট দার্শনিক। বৃথা সে জীবন দেয় নি, তার মৃত্যু শিল্পের বেদীমূলে আত্মাহুতি।

থিয়ো ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করল ডাক্তার গ্যাচেটকে—আমি...আমি—কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এল উদ্গত অশ্রুভারে। আর একটি কথাও তার মুখে সরল না।

শবাধারের ওপর আচ্ছাদন পড়ল।

ছ-জন বন্ধু শবাধার বহন করে নিয়ে গেল কাফের দরজা দিয়ে বাইরে। সযত্নে তারা সেটিকে রাখল গাড়ির ওপর।

কালো গাড়ি চলল রৌদ্রখচিত পথ দিয়ে। দুপাশে সারি সারি গ্রাম্য কুটির। শেষকৃত্যের বন্ধুরা চলল পেছনে।

স্টেশনের কাছে এসে গাড়ি বাঁ দিকে মোড় নিল। আস্তে আস্তে উঠতে লাগল পাহাড়ের চড়াই বেয়ে। পাশে পড়ে রইল ক্যাথলিক গির্জা। এবার দুধারে কাঁচা হলুদ ক্ষেত।

সমাধিক্ষেত্রের দরজার সামনে এসে গাড়ি থামল।

স্থাণুর মতো একপাশে দাঁড়িয়ে রইল থিয়ো। ছ-জনে মিলে শবাধার নামালো গাড়ি থেকে।

প্রথমদিন ভিনসেণ্ট এই সমাধিক্ষেত্রে পা দিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে নদীর কিনার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ শ্যামল উপত্যকার দৃশ্যটি দেখেছিল, ঠিক সেই জায়গাটাই নির্দিষ্ট করেছিলেন ডাক্তার গ্যাচেট।

শবাধার অদৃশ্য হোলো সমাধিগহ্বরে। হারিয়ে গেল গভীরে, নরম মাটি চাপা পড়ল তার ওপর।

সাত জনে মিলে ফিরে এল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শোকাচ্ছন্ন নীরবতায়।

কদিন পরে ডাক্তার গ্যাচেট আবার সমাধিক্ষেত্রে এলেন। যেখানে ভিনসেণ্ট শুয়ে আছে তার চারিদিকে তিনি পুঁতে দিলেন সূর্যমুখী ফুলের গাছ।

ফিরে গেল থিয়ো প্যারিসে। এই শোক তার বাকি জীবনের দিবস-রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তকে ঠেলে নিয়ে চলল সান্ত্বনা-সীমান্তবিহীন দুঃখতিমিরসাগরে।

ভেঙেছে তার বুক, ভাঙল তার চৈতন্য।

উট্রেক্ট-এ মানসিক রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র। মার্গট আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। থিয়োকে জোহানা সেখানে নিয়ে গেল।

ছ-মাস পরে, ভিনসেণ্ট যে তারিখে মারা গিয়েছিল প্রায় সেই দিনটিতেই থিয়োও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। তার সমাধি হোলো উট্রেক্ট-এ।

কিছুদিন পরে শোকাকুলা জোহানা একদা বাইবেল পড়তে পড়তে একটি লাইনের সামনে চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। লাইনটি এই ঃ

—এমনকি মৃত্যুতেও তারা বিচ্ছিন্ন হয় নি।

থিয়োর দেহ উট্রেক্ট থেকে জোহানা তুলে নিয়ে গেল অভার্সে। শুইয়ে দিল ভিনসেণ্ট যেখানে শুয়ে আছে তারই পাশে।

চারিদিকে সোনালি হলুদ শস্যক্ষেত্র,—মাঝখানে স্বল্পপরিসর সমাধিস্থানটি অভার্সের খর-সূর্যের দীপ্ত রশ্মিপাতে উদ্ভাসিত। পরম শান্তিতে থিয়ো শুয়ে আছে তার প্রিয় ভাই ভিনসেণ্টের পাশে ;—দুজনের চরম শয্যার ওপর ছায়া-লিম্পন এঁকেছে প্রচুর প্রফুল্ল সূর্যমুখী।